প্রথম প্রকাশ, অগ্রহায়ণ ১৩৪৯

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন — অনুপ রায়
মুদ্রণ — চয়নিকা প্রেস

SINRI BHANGA ANKA
A novel by Ashapurna Debi

Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt Ltd
10 Shyama Charan Dey Street Calcutta 700 073

ISBN 81-7293-070-4

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পেজমেকার্স ২৩ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬ হইতে লেজার কম্পোজ করিয়া অটোটাইপ ১৫২ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীমান রবীন্দ্রনাথ সরকার
স্নেহভাজনেষু

সিঁড়িভাঙা অঙ্ক

হল-এর মধ্যে থেকে বোঝা যায়নি ফাংশানের শেষে পথে বেরিয়ে রাস্তাটা এমন সুনসান দেখাবে। বসেছিল তো একটি সুরের মূর্ছনায় ভারাক্রান্ত অনাস্বাদিত স্বাদের মধ্যে ! হাত তুলে ঘড়িটা দেখবারও খেয়াল হয়নি।

তাছাড়া দর্শকের আসনে একটি আসনও তো খালি ছিল না, লোকে ঠাসা ছিল। কী করে ভাববে, অনুষ্ঠানান্তে পথে বেরিয়েই রাস্তাটা এমন ঝিমঝিমে দেখবে। অতগুলো লোক হঠাৎ ভোজবাজির মতো উপে গেল না কী ?

আসলে মেখলার তেমন জানা ছিল না, যারা কলামন্দিরের টিকিট কেটে এ হেন একটি শৌখিন অনুষ্ঠানে এসে বসে, তাদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে গাড়ি থাকে। অর্থাৎ গাড়িবান-গাড়িবতীদের জন্যেই এসব অনুষ্ঠান। কেউ কেউ-বা ওই গাড়িবানেদের কাছে একটা লিফ্‌ট পাবার আশ্বাস পেয়েই এসে বসেছেন। বাকি যে ক'জন ? এই মেখলা আর শিলাদিত্যর মতো ? তারাই পথে বেরিয়ে ঝিমঝিমে রাস্তা দেখেই সুরের মায়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে বাস-ট্রামের লক্ষ্যে ছুট মারে।

ওরই মধ্যে যারা একটু ইতস্তত: করে, বোদ্ধার মতো ইতি-উতি চেয়ে ভাবতে থাকে কোনটা সুবিধে হবে ? বাস ? ট্রাম ? না কী দুর্গা বলে একটা ট্যাক্সিরই চেষ্টা করবে ? তাদের চোখের সামনেই হলভর্তি লোক পথে বেরিয়ে এসেই ভোজবাজির মতো হাওয়া হয়ে যায়।

মেখলা বলল, কী ব্যাপার রে ছোড়দা ? এই ক' মিনিটেই এতো লোক হাওয়া হয়ে গেল ?

শিলাদিত্য এখন ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরিলে বলল, সঙ্গে হাওয়া গাড়ি থাকলে, আর 'হাওয়া' হতে কতক্ষণ রে বাবা।

তো এখন কী করবি ? ট্রামে যাবি ? না বাসে ? কোনটা সহজ হবে ?

কোনোটাই মাখনমার্কা সহজ হবে না হে চাঁদু। দুটোতেই তো বদলের ঝামেলা আছে। যা একখানি জায়গায় বাস আমাদের। আসার সময় তবু একটা সুবিধে পাওয়া গিয়েছিল, তাই—

মেখলা বলল, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে শেষ অবধি বসে তো থাকা হলো, এখন বাড়ি গিয়ে কী হয় দ্যাখ ?

হঠাৎ পিছন থেকে কে একজন বলে উঠল, কেন ? বাড়ি ফিরে পিটুনি খাবার ভয় আছে না কী ?

কথাটা কৌতুকের, তবে স্বরটা বেশ ভরাট ভারী।

শিলাদিত্য চমকে পিছন ফিরে তাকিয়ে বলে উঠল, আরে যুধাজিৎ ! তুই ? কী ব্যাপার ? এতোক্ষণ হল-এর মধ্যেই ছিলি না কী ?

যুধাজিৎ ভান-করা আক্ষেপের গলায় বলে উঠল, কেন বাবা ! থাকতে নেই ? আমার মতো গোলা লোকের দৈবাৎ একদিন রবিশঙ্করের সেতার শোনার ইচ্ছেটা বেআইনী ?

বাজে কথা বলছিস কেন ? কে আবার কবে তোকে 'গোলা'-মার্কা দিয়েছে ? বরং—

আগে দিতো না, এখন দিচ্ছে। হরদমই দিচ্ছে রে। যেদিন থেকে মা সরস্বতীর চরণে সেলাম ঠুকে তাঁকে টা টা করে চলে এসে লক্ষ্মীঠাকুরের দরবারে হত্যে দিতে শুরু করেছি, সেদিন থেকেই দিচ্ছে।....এমন কী মা পর্যন্ত খুঁৎ খুঁৎ করেছে, ব্যবসা করছিস করছিস, পরীক্ষাটা না দিয়েই পড়াটা ছেড়ে দিলি ? আর ক'মাস গেলেই তো—

শিলাদিত্য বলল, তা সত্যি। তোর ওই হঠাৎ পড়া ছেড়ে দিয়ে ব্যবসায় নেমে পড়া দেখে আমরা সকলেই একটু ইয়ে হয়ে গিয়েছিলাম। পরীক্ষাটা অন্ততঃ দিতে পারতিস! তোর রেজাল্ট নিশ্চিতই ভালো হতো।

যুধাজিৎ অগ্রাহ্যের গলায় বলল, তা হয় তো হতো। না হয় ফার্স্টক্লাসটাই পেতাম, কিন্তু তারপর? রিসার্চ ধরতে হতো। একটা ডক্টরেট না করে নিতে পারলে তো আর মফস্বল শহরের কলেজেও একটা লেকচারারের পোস্ট জুটতো না? বল? জুটতো?

শিলাদিত্য ঈষৎ দ্বিধার গলায় বলল, তা হয়তো জুটতো না। আজকাল তো—

যুধাজিৎ একটু হেসে বলে, হ্যাঁ, আজকাল সর্বত্রই আইনের বড় কড়াকড়ি। তবে চিচিং ফাঁক-এর মন্ত্রটি প্রয়োগ করতে পারলেই ওই কড়াকড়ির দড়াদড়ি আলগা করে ফেলা যায় এই যা। তো—এখন বাড়ি ফিরছিস তো?

তাছাড়া?

তবে চল তোদের সঙ্গে আর খানিকটা সময় কাটাবার সুযোগ করে নিই। অনেক দিন পরে দেখা হলো, তাই না?

মেখলা মনে মনে ভাবল, এই সেরেছে। ও কী ভেবেছে আমাদের সঙ্গে গাড়ি আছে? তাই গায়ে পড়ে আলাপ করতে এসেছে? ...ভঙ্গীটা খুব স্মার্ট।... চেহারাটাও হ্যান্ডসাম। ছোড়দা তো নেহাৎ বেঁটে নয়, তবু ওর থেকে কতখানিটা লম্বা। কিন্তু—

কিন্তু শিলাদিত্য বোনের এই বোকাটে সমস্যার সমাধান করে দিয়ে বলে উঠল, কেন? সঙ্গে গাড়ি আছে না কী?

ওই আছে একখানা যা হোক, তা হোক। দু-চার দিন পরে হয়তো আর থাকবে না। তো আজ তো রয়েছে, চল।

শিলাদিত্য কুণ্ঠিতভাবে বলে, আরে আমরা তো এমনিই চলে যাচ্ছিলাম। তুই আবার কেন? ইয়ে—

যুধাজিৎ চশমার ফাঁকে একটু বিদ্যুতের ঝিলিক হেনে বলল, কেন? পরের গাড়িতে চাপতে তোর বোনের আপত্তি আছে না কী?

ধ্যাৎ। ওর আবার আলাদা কী আপত্তি থাকতে যাবে? আমিই বলছিলাম, আমাদের তো যেতে হবে সেই শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে, আর তোর বাড়ি হচ্ছে—

থাক। আমার বাড়ির ঠিকানাটা তোর কাছ থেকে না জানলেও চলবে। আমার প্রশ্নটার উত্তরটাই দরকার। মেয়েদের আবার অনেক রকম সব ফেজিং থাকে কিনা।

শিলাদিত্য বলে উঠল, এই টুসকি, আমার বন্ধু কী বলছে শুনলি?

একেই তো ছোড়দার ওই অতিস্মার্ট বন্ধুটির কথার ধরনে গা জ্বলে উঠেছিল, তার ওপর ছোড়দার এই অগ্নিতে ঘৃতাহুতি। বাইরের লোকের সামনে ফস করে ওই নেহাৎ বাড়ির ডাকনামটা ধরে ডাকা! আচ্ছা—বাড়ি ফিরে নিচ্ছি একহাত।...কিন্তু নাঃ, রেগে যাওয়াটা প্রকাশ করা চলবে না। তাতে মান থাকে না। বাবু ভারী স্মার্ট ভাব দেখাচ্ছেন। মেখলাও হারবে না। তাই সঙ্গে সঙ্গে চটপট বলে উঠল, শুনলাম। তবে কী দেখে উনি আমায় এতোটা জ্ঞানগম্যিহীন ভেবে নিলেন, সেটাই ভাবছি।

জ্ঞানগম্যিহীন।

নয়? চিরকালের কথা—'ধনবানে কেনে গাড়ি, জ্ঞানবানে চড়ে।' অথচ উনি ধরে নিচ্ছেন—

যুধাজিৎ শব্দ করে হেসে উঠে। বলে, নাঃ, দেখছি আমারই জ্ঞানগম্যির অভাব প্রকাশ পেয়ে গেছে।... যাক ধন্যবাদ! তাহলে চলে আসুন এদিকে। শিলাদিত্য আয়। সত্যিই রাত অনেকটা হয়ে

গেছে। নটা পঞ্চান্ন।

গাড়ি যেখানে পার্ক করা ছিল সেখানে চলে আসতেই শিলাদিত্য বলে উঠল, এইটা না কী? এই তোর যেমন তেমন একখানা? এতো দারুণ গাড়ি! মারুতি না? কত দিন হলো কিনেছিস?

যুধাজিৎ বলল, এই কিছুদিন। তবে বললাম তো আজ আছে, হয়তো কাল থাকবে না।

তার মানে?

মানে ভালো খদ্দের পেলেই বেচে দেব।

সেকী রে? মানে?

মেখলা বলে ওঠে, তার মানে, অতঃপর বোধহয় একখানা 'কনটেসা' কিনে নেবেন।

যুধাজিৎ বলে, তা নাও হতে পারে। অতঃপর হয়তো একখানা রংজ্বলা, পার্টস খোওয়ানো অ্যামবাসাডারই কিনতে পারি।

শিলাদিত্য একটু চকিত হয়ে বলল, মানে বুঝলাম না।

বোঝাব। গাড়িতে উঠে আয়।

গাড়ির ভিতরটা দেখে মেখলা প্রায় মোহিত। চড়ার মধ্যে তো ট্যাক্সিই চড়া হয়। তাও এমন কিছু হরবখৎ নয়। মাঝে মাঝে ঘরের গাড়ি চড়ার অভিজ্ঞতা হয় মার সেই মামাতো দাদার গাড়িতে। কাজেকর্মে গেলে বা দৈবাৎ বেড়াতে গেলে, ফেরার সময় তিনি হয়তো ড্রাইভারকে ডেকে বলেন, গাড়িটা বার করে পিসিমাকে পৌঁছে দিয়ে এসো ননী।

মাকে একটু বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখেন বলেই।

তো সেই গাড়ি, আর এই গাড়ি। তুলনা করতেই হাসি পাচ্ছে।

পিছনের বৃহৎ আসনটায় একা মেখলা আরামে যেন ডুবে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে। শিলাদিত্য বসেছে বন্ধুর পাশে সামনে।

একটুক্ষণ চালিয়ে যুধাজিৎ বলে উঠল, তুই এখন কী করছিস?

কী আর করব? ওই যা করছিলাম তাই চালিয়ে যাচ্ছি। আর দু-একটা টিউশনি চালাচ্ছি, এই আর কী। অবশ্য থিসিসটা শেষ হয়ে এসেছে—

অতঃপর?

অতঃপর আর কী? তুই-ই তো বললি তখন, হয়তো কোনোমতে একটা মফস্বল শহরের কোনো কলেজে একখানা লেকচারার পোস্ট পেয়ে বর্তে যাওয়া।

যুধাজিৎ মসৃণভাবে গাড়িটা চালাতে চালাতে বলে, দ্যাখ, আমার বাবা চিরদিন স্কুল মাস্টারি করেছে। কিছু মনে করিস না, ওতে ছেলেবেলায় বড় অছেদ্দা ছিল আমার। মনে হতো কাজটায় যেন তেমন মানসম্মান নেই, অথচ ওই লাইনটা ছাড়া অন্য কিছু ভাবনাতেও আসতো না। তাই ভাবতাম, আমি বড় হয়ে কলেজের প্রফেসর হবো। পড়ছিলামও সেইটা মাথায় রেখেই। হঠাৎ একদিন হেসে উঠে বা মানে লোকে যেমন দৈবাদেশে স্বপ্নাদ্য মাদুলী পায় তেমন হঠাৎ একদিন দিব্যজ্ঞান লাভ হয়ে গেল, দিব্যদৃষ্টি খুলে গেল। দেখলাম ওতে কোনো প্রসপেক্ট নেই। টাকা চাই। অনেক টাকা! ওইভাবে টিকিয়ে টিকিয়ে লেকচারার থেকে রীডার, রীডার থেকে হয়তো ভাগ্যে থাকলে প্রফেসর অতঃপর—নাঃ, ওর কোনো মানে হয় না। ঘষটে ঘষটে নয়, টপাটপ সিঁড়ি ভেঙে চূড়োয় উঠে যেতে হবে। টাকা এসে পড়বে ঝপাঝপ, টাকায় বাড়ি ভরে যাবে—

হঠাৎ একটু থামে। তারপর একটু মুচকি হেসে বলে, অবশ্য 'ডাক্তার' 'মাস্টার' এসব প্রফেশনেও আজকাল অনেক রস এসে গেছে। কিন্তু সে ছিঁচকেমি করে উঠতে পারব না জানি, তাই মা সরস্বতীকে টা টা বাই বাই।.... 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'—এ তো শাস্ত্রবাক্য—তাই না?

শিলাদিত্য আস্তে বলল, কিসের বিজনেস ?

কিসের নয় ? যখন যা হাতের কাছে এসে যায়। এই এখন ধর গাড়ি কেনাবেচা চালাচ্ছি। সেকেণ্ড হ্যাণ্ড গাড়ি-ফাড়ি কিনে তাকে নবকলেবর করিয়ে ফেলে, মোটা কিছু মুনাফা রেখে বেচে ফেলা। এই যেমন এই গাড়িখানা—এখন একে দেখে ধারণাও করতে পারবি না, পূর্ব অবস্থা কী ছিল! আসলে একটা অ্যাকসিডেন্টে পড়ে যা-তা হয়ে গিয়েছিল।

মেখলা পিছন থেকেই এ প্রসঙ্গে যোগ দিয়ে বলে উঠল, ওমা, আমি ভাবছিলাম একদম নতুন।

যুধাজিৎ একটু ঘাড় ফিরিয়ে বলল, পুরনোকে নতুন চেহারায় দাঁড় করানোয় একটা রোমাঞ্চ আছে। তবে—এতেই তো দাঁড়িয়ে থাকব না, এর পর জমি কেনাবেচায় নামব। তাতে দারুণ লাভ। ছাপ্পর ফুঁড়ে টাকা।

হঠাৎ শিলাদিত্য বলে ওঠে, এতো টাকায় তোর কী দরকার ? খুব একখানা মহাবড়লোকের মেয়ের প্রেমে পড়ে বসে আছিস বুঝি ? যারা টাকা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। অনেক টাকা না করতে পারলে জামাই করবে না ?

মেখলা একটু উৎকর্ণ হয়।

যুধাজিৎ বলে, দূর। ওসব প্রেম-ফ্রেমের মধ্যে যুধাজিৎ সরকার নেই। সে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছতে চায়, যাতে মেয়েরাই তার প্রেমে পড়বার জন্যে ছুটে আসবে।

মেখলার মুখটা লাল হয়ে ওঠে। অকারণই। কারণ এ প্রসঙ্গে তার কোনো যোগসূত্র নেই। তবু লাল লাল মুখে বলে ওঠে, মেয়েদের সম্পর্কে তো দেখছি আপনার বেশ উচ্চ ধারণা। টাকার পাহাড় দেখলেই তারা প্রেমে পড়বার জন্যে ছুটে আসে ?

যুধাজিৎ অত্যন্ত অবহেলায় বলে, এখনো পর্যন্ত সেই ধারণাতেই আছি। এ যুগে টাকা দিয়ে সব কিছুই কিনে ফেলা যায়, বুঝলেন ? রমণীর মন ? সে তো অতি সহজেই।

শিলাদিত্য একটু অস্বস্তির গলায় বলে, তোর মতবাদটা একটু উগ্র।

হয়তো।...তবে সত্য। খাঁটি সত্য।

শিলাদিত্য বোধহয় আবহাওয়াটা একটু হালকা করতেই বলে ওঠে, মনে হচ্ছে বোধহয় কোথাও দাগা পেয়েছিস, তাই রাতারাতি দিব্যদৃষ্টি খুলে গেছে। তো এর পর তাহলে প্রোমোটার হচ্ছিস ?

যুধাজিৎ বলল, ধরে নে তাই। তবে আমি আমার মতবাদ থেকে সরে আসছি না। দুনিয়াখানা আরো কিছুদিন দ্যাখো মানিক। তারপর দেখো আমার মতবাদে আসো কিনা!

...আসলে এখন আর সে যুগ নেই রে যে মানুষ বুনো রামনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।...এখন সন্ন্যাসীরও আড়ম্বর দরকার, চাকচিক্য দরকার। এয়ারকনডিশানড় ঘর, এয়ারকনডিশানড গাড়ি এবং ঘরে রঙিন টি. ভি. এসব দরকার। গেরুয়া-পরা সন্ন্যাসীদেরও, বোঝ ? তো অন্যদের কথা বাদই দে। ...'খালিপদ' মন্ত্রীদের যুগ শেষ হয়ে গেছে। 'আদর্শ' শব্দটা একটা হাস্যকর বাতিল শব্দ। এ যুগে টাকাই ঈশ্বর। টাকাই পরমেশ্বর।

মেখলা আবার উত্তেজিত হলো। মেখলাকে উদ্দেশ করে অবশ্য বলেনি কথাটা যুধাজিৎ। তবু মেখলা বলে উঠল, সবাই একরকম নয়।

যুধাজিৎ ঘাড়টা আবার একটু ঘোরাল। বলল, হ্যাঁ, এ বিষয়ে অবশ্য আমি আপনার সঙ্গে একমত। সব্বাই একরকম নয়। ব্যতিক্রম তো কিছু থাকবেই সংসারে। তবে অধিকাংশ নিয়েই তো বিচার। তাই না ? আচ্ছা—শিলাদিত্য, তোদের বাড়িটা চিনে আসতে বোধহয় খুব ভুল করছি না ?....যদিও বহুদিনই আসিনি। আর খুব বেশিবারও আসিনি।

তা ঠিক।

শিলাদিত্য বলল, তোর বাড়িটা কলেজের কাছাকাছি বলে আমারই যাওয়াটা বেশি হয়ে যেতো। আচ্ছা, তোর বাবা তো—

নাঃ, নেই। বছর পাঁচেক হলো মারা গেছেন।

তোর দাদা ?

বিয়েটিয়ে করে একটি পুত্রের পিতাও হয়ে গিয়ে এখন সপরিবারে নিজ কর্মভূমি দুর্গাপুরে বাস করছে।

ওঃ। তাহলে বাড়িতে শুধু তুই আর তোর মা।

তাছাড়া আর কে ? দিদি তো নিজের সংসার নিয়ে এমন ব্যস্ত যে একদিন বেড়াতে আসতেও সময় পায় না। তবে পাবে। আমি একটু বড়লোক হয়ে নিই, তখন পাবে।....

তোর বোধহয় চশমাটা পালটানো দরকার যুধাজিৎ।

বলছিস ?...আরে দেখিস। তখন তো পরিস্থিতিও বদলে যাবে হে। 'মার তোদের জন্যে মন কেমন করছে' বলে, ঘনঘন জামাইবাবু কোম্পানীকে বাড়িতে ডাকব, ভালোমন্দ খাওয়া-দাওয়ার ঢালাও ব্যবস্থা করব, আসতে গাড়ি পাঠিয়ে দেব, গাড়ি করে ফেরৎ দেব।...তখন সময় না পেয়ে যাবে কোথায় ?

শিলাদিত্য হেসে ফেলে।

বলে, এখন তোকে অনেকটা বুঝতে পারছি।

কচু পারছো ? কী পারছো শুনি ?

বললে রেগে যাবি। ...আর তোর সেই কাকাটির খবর কী ? যিনি সবসময় খেলোয়াড়ের সাজ করে ঘুরে বেড়াতেন ! কী হাসিই পেতো। বাঘডোরা টাইট গেঞ্জি—আর কিছু মনে করিস না, সেই কাঁধ ঝাঁকানো আর শরীরে মোচড় দেওয়া।

তিনি ? তিনি মহাত্মা মানুষ। এদেশে তাঁকে মানায় না বলে, চলে গেছেন ওদেশে। এখন শুনতে পাই ওয়াশিংটনে আছেন।...

হঠাৎ গম্ভীর হয়ে যায় যুধাজিৎ। বলে, ওর জন্যেই বাবার শেষ জীবনটায়—থাক সে কথা। এই তো এসে পড়েছি মনে হচ্ছে। নলিন সরকার স্ট্রীট, তাই না ?...উঃ, চারিদিকে অনেক বাড়ি হয়ে গেছে। তা কোথায় বা না হচ্ছে ?

আচ্ছা—

নেমে পড়ে দরজাটা খুলে ধরে, একটু নমস্কারের ভঙ্গী করে মেখলাকে উদ্দেশ করে বলে, কথা হলো, ঝগড়াঝাঁটিও হয়ে গেল একটু, কিন্তু আপনার ডাকনামটা ছাড়া আসল নামটা জানা হলো না। যদিও ডাকনামটি দারুণ।

দারুণ না ছাই। বিচ্ছিরি। আমি তো ঠিক করে বসে আছি— বাইরের লোকের সামনে এভাবে ওই বাজে নাম প্রকাশ করে বসার জন্যে এই ছোড়দাকে একহাত নেব।

আমার কিন্তু সত্যিই দারুণ লেগেছে।

শিলাদিত্য বলে ওঠে, ভালো নাম মেখলা। দাদুর রাখা নাম। বাড়ির দরজা থেকে চলে যাচ্ছিস, আর একদিন আসিস। বিজনেসম্যান। সারা শহর তো চষে বেড়াস। তাই নয় ? এদিকে এলে একদিন—

যুধাজিৎ বলল, কেন ? শুধু এখানে আসার জন্যেই এদিকে আসা যায় না ?

শিলাদিত্য থতমতভাবে বলে, আরে সে হলে তো কথাই নেই। ...তো তোকে আর ধন্যবাদ কী দেব ? অনেকদিন পরে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল।

সেটা উভয়তঃ। তবে ধন্যবাদটা তোদেরই প্রাপ্য। গাড়িখানা একটু ধন্য হলো।

মেখলা ফস করে বলে ওঠে, তা একে তো দুদিন পরে বেচেই দেবেন!

যুধাজিৎ একবার ওর মুখের দিকে তাকাল।

একটু তফাতেই রাস্তার আলোটা আলোক বিকীরণ করছে, সেই আলোয় মুখটা বেশ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। একটু গম্ভীর গলায় বলল যুধাজিৎ, দেব কিনা তাই ভাবছি এখন। আচ্ছা....

গাড়িটা চোখছাড়া হয়ে যাবার পর তবে শিলাদিত্য দরজার কড়াটা নাড়ল। ...হ্যাঁ, ওদের বাড়িতে—অথবা এ পাড়ায় অনেক বাড়িতেই এখনো দরজায় কড়ানাড়ার ব্যবস্থাটাই রয়ে গেছে।

এটা ইচ্ছে করেই করল শিলাদিত্য। বাবাকে তো জানে, এতো রাতে দরজা খুলে দিতে তিনি নিজেই নেমে আসবেন, এবং দরজা খুলে গাড়ি এবং গাড়ির মালিকটিকে দেখলেই হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে বসবেন। ....আর ততটা সুযোগ না পেলেও ছেলে-মেয়েকেই প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করতে বসবেন লোকটা কে, কী বৃত্তান্ত।

কিন্তু ইত্যবসরে মেখলা একনজর ওপর দিকে তাকিয়ে দেখে নিয়েছে। দোতলা তিনতলা দুই বারান্দাতেই একটি করে নারী-মূর্তি।

গাড়িটা ছেড়ে দিতেই মেখলা বলে উঠল, তোর বৃথাই সাবধানতা ছোড়দা। যথারীতি 'ওয়াচ' হয়ে গেছে। আশ্চর্য, বুড়িও এখনো পর্যন্ত জেগে পাহারা দিচ্ছে।

শিলাদিত্য বলল, স্বভাব যায় না মলে।

তারপর বলে উঠল, যাক। কীরকম দেখলি আমার বন্ধুকে?

দেখলাম মানে? 'কনে দেখা'র মতো বলছিস যে?

তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে উঠল, একটা ছোটলোক।

ছোটলোক!

না তো কী! 'টাকা দিয়ে সংসারের সব কেনা যায়।'...অসভ্য।

শিলাদিত্য বলে, খুব একটা ভুলও বলেনি। যা অবস্থা চারদিকে! সবকিছুই তো—

খুব একটা ভুল যে বলেনি, সে কথা মেখলাও হয়তো মানতো, যদি না লোকটা 'রমণীর মন' শব্দটি ওই সবকিছুর সঙ্গে যোগ করে বসতো।

কথাটা তো সমগ্র নারীসমাজের পক্ষে রীতিমত অবমাননাকর। ...তবে—

ভাবাটা শেষ হলো না।

ভিতরে প্রথমে ছিটকিনি নামানোর 'খটাস্' শব্দটা শোনা গেল, তৎপরে দরজার বুকের ওপর চাপানো লোহার খিলটা নামানোর ঘড়াং।

সাবেকি বাড়ি। সদর দরজা 'লোহা কাঠের'! ...তার বুকে লোহার খিলই মানানসই।

খিল নামানোর পরও দরজার নিচের দিকের ছিটকিনি ওঠানোর খটাস্ শব্দটা শোনা গেল। অতঃপর দরজা খুলে গেল। ...দরজায় স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আদিত্য গাঙ্গুলী।

দু'জনেই ভেবেছিল, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই ভয়ঙ্কর একটা ঝড়ের দাপট তাদের ওপর আছড়ে পড়বে। সেটাই স্বাভাবিক ছিল। কড়া গলায় কাটা কাটা প্রশ্ন করবেন, স্বেচ্ছাচারিতার একটা সীমা থাকা উচিত কিনা? ছেলেরা জবরদস্ত যা করে চলেছে তা মেয়ের পক্ষেও সঙ্গত কিনা? এবং এই খারাপ দিনকালে দুটো ছেলেমেয়ে এতো রাত পর্যন্ত বাইরে থাকবেই বা কেন?

কিন্তু আদিত্য গাঙ্গুলী নীরব নির্বাক। একবার শুধু জরিপ করার ভঙ্গীতে দুজনের আপাদমস্তক অবলোকন করে নিয়ে নিঃশব্দে পিছন ফিরে ভিতরে ঢুকে গেলেন।

শিলাদিত্য বলতে যাচ্ছিল, কী ব্যাপার! আমরা কী ফিরব না ভেবেছিলেন না কী? তাই দরজার

সমস্ত সাজসজ্জা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল? কিন্তু বলবে কাকে?

বাড়িটা তিনতলা। তবে তিনতলাটা একতলা দোতলার মতো পূর্ণাবয়ব নয়। অর্থাৎ একতলা দোতলায় যেমন চারখানি করে ঘর তিনতলায় তেমন নয়, মাত্র দুখানি ঘর। বাকিটা খোলা ছাত। তবে ছাতের পাঁচিলে ইঁট সিমেন্টের গাঁথুনি নেই, দোতলার বারান্দার মতো রেলিং বসানো। রাস্তা থেকে তাই বারান্দা বলেই মনে হয়। শুধু মনে হওয়াই নয়, মেখলা বলেও। 'ওই যে বারান্দায় দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছেন!' ও পাহারাই বলে।

নয়নতারা সেই রেলিঙের ধার ধরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে নির্নিমেষ নেত্রে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কতক্ষণে মেয়েটা বাড়ি ফেরে। দিনকাল যে কত খারাপ তা তো ক্রমশঃই মালুম হচ্ছে। পরাধীন দেশে যা নিরাপত্তা ছিল, আজ স্বাধীন দেশে তা নেই।

ভাবলেন নয়নতারা, তখন যারা স্বাধীনতার সংগ্রামে নেমেছিল তাদের কথা অবশ্য বাদ দিতে হয়, তারা তো রণক্ষেত্রে। 'শত্রুপক্ষ'। তাদের ওপর অকথ্য অত্যাচার হবে, সেটা অভাবিত নয়। 'বন্দে মাতরম' বললেই পিটুনি। কিন্তু সাধারণ গেরস্থ মানুষ, যাদের মধ্যে শুধু জীবনযাত্রা নির্বাহ করে চলা ছাড়া আর কোনো উচ্চচিন্তার বালাই ছিল না, তাদের কোনোদিন এমন সদাসশঙ্কিত হয়ে থাকতে হতো না। ...এখন এ কী হয়েছে? ঘরের ছেলেমেয়েরা যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে, ততক্ষণ বসে বসে দুর্গানাম জপ করতে হয়।

অবশ্য মেখলার মা-বাপ, বিশেষ করে মা ভাবতে রাজী নন যে তাঁদের মেয়ের জন্যে চিন্তাকাতর হয়ে বসবেন 'নয়নতারা' নামের এই হাড়জিরজিরে বৃদ্ধাটি। যেন সেটা তাঁর পক্ষে একরকম অনধিকার চর্চা। আমাদের মেয়ের ব্যাপার আমরা ভাবছি না? তোমার আবার ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে আসবার দরকারটা কী? ...আর কিছুই নয়, মেখলার মা-বাপ যে ছেলে-মেয়েকে যথেষ্ট পরিমাণে শাসনের মুঠোর মধ্যে রাখতে পারছেন না, সেটা প্রমাণিত করার জন্যেই ছেলেমেয়ের কোনোখান থেকে ফিরতে দেরি হলেই বারবার গলা তুলে প্রশ্ন করা, হ্যাঁরে। অমুক এখনো ফেরে নাই?

ছেলেমেয়ের কাছে এ সন্দেহ প্রকাশ করে নীহারিকা, আমরা রয়েছি, তবু উনি একেবারে ভাবনায় মরে যাচ্ছেন। আর কিছুই নয়, এটি হচ্ছে পাহারা দেওয়া। পাছে বলি, হ্যাঁ, অনেকক্ষণ এসেছে তো।

ছোট থেকে সদাসবদা এ ধরনের কথা শুনতে শুনতে ছেলেমেয়েদের মনের মধ্যেও যেন 'দাদু' 'ঠাকুমার' প্রতি একটা বিরুদ্ধ ভাব গড়ে উঠেছে। মনে করতে অভ্যস্ত হয়েছে, ওঁরা যেন তাদের মা-বাবার 'প্রতিপক্ষ'। এবং নাতি-নাতনীর ব্যাপারে কোনো মন্তব্য বা অভিমত প্রকাশ করে বসলে, সেটা হবে ওঁদের বিরোধী পক্ষের ভূমিকা। এবং অনধিকার চর্চাও।

না, স্নেহের ব্যাকুলতার কোনো প্রশ্ন নেই। নয়নতারা অথবা সত্যব্রত নাতি-নাতনীর অসুখ করলেও যদি একটু ব্যস্ততা প্রকাশ করেন, তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ সেটাকে অহেতুক বাড়াবাড়ি বলে মনে করে। ...যেন অনেকটা লোক দেখানোও।

আর ওষুধ পথ্য বা ডাক্তার সম্পর্কে কোনো পরামর্শ দিতে এলে? নিতান্তই বিরক্তি বোধ করে। কেন? আমরা কী এতই অজ্ঞ? নিজের ছেলেমেয়ের অসুখে যথার্থ ব্যবস্থা নিতে পারি না? তোমাদের সেই আদ্যিকালের অভিজ্ঞতার অহঙ্কার নিয়ে কী একখানা আহামরি পরামর্শ দিতে আসছো? ওসব এখন বাতিল হয়ে গেছে।

অবশ্য ওরা যখন বাচ্চা ছিল, তখনই শুধু নয়নতারা বা সত্যব্রত নিজেদের 'অভিজ্ঞতা'র ফসল ওঁদের কাছে এনে ধরে দিতে চেষ্টা করতেন। অবোধের নিঃশঙ্কতা আর কী।

অ বৌমা। জ্বর হয়েছে বলে ছেলেটাকে এই দুপুর রোদেও মোজা-টুপি পরিয়ে রাখছো? শীতকাল? তা কী হলো। অত আটেকাটে বন্দী করে রাখলে জ্বর কমে না। ...অ আদিত্য! বাবা তোর ওই চড়া চড়া ওষুধ দেওয়া ডাক্তারকে এবার ছাড়ান দে। একজন হোমিওপ্যাথ দেখা! বাচ্চাকাচ্চার অসুখে হোমিওপ্যাথি ভালো।

বলতেন এসব কথা। আগে আগে। পরে আর বলতে আসতেন না। দেখতেন পরামর্শ তো গ্রাহ্য করবেই না, উল্টে বিরক্ত হবে বেজার হবে।

জ্বর কত উঠেছে? অ বৌমা? অ আদিত্য, কথা কস না ক্যান? বলে উদ্বেগ প্রকাশ করলে, বৌ এতো চটে যাবে, ছেলে বৌয়ের সেই রাগী মুখ দেখে ভয় পেয়ে মিথ্যে করে জ্বরের মাপ কমিয়ে বলবে।

প্রতিনিয়ত এই সব ছোটখাট অভিজ্ঞতার কাঁটাবন পার হয়ে এসে প্রায় নির্লিপ্তই হয়ে গেছেন এখন সত্যব্রত আর নয়নতারা। তবু উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এগুলোর হাত এড়াতে পারেন কই?

তা তার কণামাত্র প্রকাশ করে ফেললেই তো পরিস্থিতি বিগড়ে যায়।

ক্রমশঃই তাই নয়নতারা তাঁর এই তিনতলার নির্বাসন কক্ষে নিজেকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেন।

হ্যাঁ, তিনতলার এই ঘর দুখানাতেই এখন গৃহের প্রাক্তন গৃহিণী ও গৃহকর্তার বসবাস। ...অবশ্যই ওঁদের প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট। ...বাড়িটার গড়নপেটন আর চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, পুরনো কালের। এ যুগে কেউ সাধারণ একখানা বসতবাড়িতে এমন বৃহৎ বৃহৎ ঘরের কথা চিন্তাই করতে পারে না। তাছাড়া রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর বাদ দিয়েও তিনটে তলা মিলিয়ে দশ দশখানা ঘর। জমির অপচয়ের নমুনা একখানা! ...তবু এইভাবেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অভ্যাস হয়ে গেছে। কারণ প্রাক্তন হলেও, সেই একদার গৃহকর্তার একান্ত অমত নিচের তলায় ভাড়াটে বসানোয়।

না বাবা। আমি যতকাল আছি, বসতবাড়িতে ভাড়াটে বসাস না। তাতে বাড়ির কোনো আব্রু থাকে না। তাছাড়া এখন তো আবার দেখছিস, ভাড়াটে একবার ঢুকলে আর জীবনে বেরোয় না। তার মানে চিরকালের মতো 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে থাকা।

তা প্রাক্তন গৃহকর্তার অন্য কোনো বাক্য গ্রাহ্য হোক না হোক, এটি গ্রাহ্য করতেই হয়েছে। কারণ—বাড়িখানা ওই লোকটারই স্বোপার্জিত অর্থে কেনা। দেশঘর ছিল পাবনায়। সেখানেই দাপটের সঙ্গে ওকালতি করতেন, কিন্তু—আরো হাজার হাজার জনের মতো তাঁর ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেল দেশভাগের সময়।

কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন সত্যব্রত টিকে থাকবার, অতঃপর অনেকের যা হয়েছে শেষ অবধি তাঁরও তাই। আর টিকে থাকা সম্ভব হয়নি। পৈত্রিক বাড়ি, বাড়িভর্তি জিনিসপত্র, সাজানো সংসার সবকিছু ফেলে চলে আসতে হয়েছে উদ্বাস্তুর ভূমিকায়। ...তবে নেহাৎ কিছু নির্যাতিত হননি, এবং নগদ টাকা মোটামুটি যথেষ্ট পরিমাণেই নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। টাকাকড়ি, কিছু জামাকাপড়, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা এবং চলে আসার বিরুদ্ধে অত্যন্ত উত্তেজিত সদ্যবিধবা মা, এই সম্বল করে এক রাষ্ট্র থেকে আর এক রাষ্ট্রে। পুত্র আদিত্যর বয়েস তখন বছর দশ। ...কন্যা সন্ধ্যাতারা আট।

চলে এসে কলকাতার এক বন্ধুর সঙ্গে চিঠি লেখালিখি করে নলিন সরকার স্ট্রীটের এই বাড়িখানা ভাড়া করে বাস করতে শুরু করেন। এবং নগদ টাকা জলের মতো ফুরোচ্ছে দেখে, সেই বাড়িটাই বাড়িওলার সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে কিনে ফেলেন। ...বাড়িখানা তাঁদের পাবনার তুলনায় 'কিছুই না' হলেও, মোটামুটি সঙ্কুলানের পক্ষে যথেষ্ট। এবং রাস্তার ওপর বলে আলাদা সুখ।

কলকাতায় এসে বহু চেষ্টায় আবার ওকালতিই ধরেছিলেন সত্যব্রত।

পুরনো বাড়ি মেরামত করিয়ে নিয়ে নতুনতুল্য করে ফেলেছিলেন, এবং সর্বদা বিরক্ত খুঁতখুঁতে

শুচিবাইগ্রস্ত মাকে বিশুদ্ধভাবে রাখবার জন্যে তিনতলাতেই ছাতের এক কোণে বানিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর জন্যে নিজস্ব স্নানের ঘর ইত্যাদি। ...দুখানা ঘরের মধ্যে একখানা ছিল বিন্দুবাসিনীর শোবার ঘর এবং অপরখানা ঠাকুরঘর, প্লাস রান্না-ভাঁড়ার ঘর।

বেশ কয়েকটা বছর পুত্র-পুত্রবধূর হাড় ভাজাভাজা করে তবে ক্ষুব্ধ বেদনার্ত বাতিকগ্রস্ত বিন্দুবাসিনী পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তদবধি ঘর দুটো এলোমেলোভাবেই পড়েছিল সংসারের বাতিল বাড়তি জিনিসপত্র বুকে করে। ...দোতলাটায় সত্যব্রত সপরিবারে এবং একতলাটায় বৈঠকখানা ঘর, মক্কেলের ঘর, আর খাবার ঘর ইত্যাদিতে ব্যবহার হতো। ...কে জানতো—সংসারচক্রের পাকচক্রে একদিন সত্যব্রতকেই তাঁর মায়ের অধ্যুষিত এলাকাটিতেই প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তবে আপাততঃ তাই আছেন। কারণ মানুষও কোনো একসময় জিনিসেরই মতো বাতিল বাড়তি হয়ে যায়।

এখন আর মক্কেলের রমরমা নেই। কারণ কিছুদিন যাবৎ কানে কিছু কম শুনছেন সত্যব্রত, এবং চোখেও কম দেখছেন।

তাছাড়া পাবনার সেই পসার তো আর এখানে হওয়া সম্ভব নয়। এখানে তাঁকে লোকে বহিরাগতই ভেবে আসছে। সেখানে ছিলেন গাঙ্গুলীবাড়ির গাঙ্গুলী।

তবে ইতিমধ্যে সংসারজীবনটি প্রায় দাঁড়ি টানবার পথে নিয়ে এসেছিলেন। কন্যা একটি বৃহৎ সংসারের ব্যস্ত গৃহিণী, পুত্র-পুত্রবধূ কে জানে কখন কোন ফাঁকে সত্যব্রত দম্পতীকে রিটায়ারের দলে ফেলে দিয়ে নিজেরা কর্তা-গিন্নীর পোস্টে উঠে বসেছে।...

তা সেও তো নেহাৎ বালক নয় যে বরাবর নাবালকের ভূমিকায় থাকবে? তা থাকতেই বা দেবে কেন তার গৃহিণী সচিব? তারই তো এখন বড় ছেলে পলিটিকস্ করছে, ছোট ছেলে এম এ পাশ করে গবেষণাপত্র তৈরী করছে। এবং মেয়ে একই সঙ্গে কলেজের পড়া এবং গান শেখা চালিয়ে যাচ্ছে।

নীহারিকার নির্দেশেই এখন সংসারের কুটোটিও নড়ে এবং নড়তে পায় না।

তবে ভগবান জানেন তাঁরই নির্দেশে কি, কারো বিনা নির্দেশেই একদিন আদিত্য বলে বসল দেখো মা, আমার মনে হয়, তোমরা যদি এখন ঠাকুমার অ্যাপার্টমেণ্টটায় থাকো, অনেক আরাম পাবে। সংসারের গোলমাল থেকে একটু দূরে থেকে শান্তি হবে।

নয়নতারা চমকে উঠেছিলেন। এ আবার কী প্রস্তাব।

প্রথমটা বলেও ফেলেছিলেন। ক্যান? সংসারে আবার গোলমালটা কিসের?

কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙল ছেলের দ্বিতীয় কথায়। ছেলে দেয়ালমুখো হয়ে দেয়ালের একটা টিকটিকির দিকে তাকিয়ে থেকেই গম্ভীরভাবে বলল, গোলমালের সৃষ্টি করলে, সেটা হবেই।

নয়নতারা ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সেখানে যেন একটি স্থির সংকল্পের ভাব। ...আস্তে বললেন, তর যদি মনে লাগে, সেটা আমিই সৃষ্টি করছি, তো—যা ভাল বুঝছিস কর।

তখন আদিত্য একটু থতমত খেয়ে বলেছিল, আসল কথা সবাই তো সমান বুঝমান নয়। ...তা তুমি তো সারাজীবন ঢের খাটলে, সেই পাবনার বাড়ি থেকেই তো দেখে আসছি। চিরদিন প্রাণপাত। নিঃশ্বাস নেবার অবকাশ নেই। এবার নয় একটু বিশ্রাম করো না।

নয়নতারা বলে উঠতে পারতেন, কে তোকে বলতে গেছল, আমি বিশ্রাম চাই? হ্যাঁ, যতদিন তোর ঠাকুমা ছিল, এক এক—সময় প্রাণ হাঁপিয়ে উঠতো বটে, এখন তো আমি দিব্যিই আছি।

কিন্তু তা বললেন না। শুধু বললেন, তোর বাবার কী এই উঁচুতলায় উঠে সুবিধে হবে? হাঁটুতে ব্যথা। বারবার সিঁড়ি ভাঙাভাঙি।

আদিত্য বলে উঠল, বারবার এতো—দরকারটা কী বাবার? ...এখানে তো কল-পায়খানা সবই

রয়েছে। পাম্পটা বসানো পর্যন্ত জলেরও অসুবিধে নেই। বরং এখানটা খোলামেলা। সকালে একবার মর্নিং ওয়াক-এর জন্যে নেমে, নিচে থেকেই চা খেয়ে কিছুক্ষণ না হয় বৈঠকখানায় বসে তারপর উঠে আসবেন। ...তেমন দরকারি মক্কেল হলে, তাকে ওপরেও পাঠিয়ে দেওয়া যায়। অবশ্য আজকাল আর কই তেমন? ...আর বাবাকে খাবার-টাবারও তো অনায়াসেই এনে দিতে পারবে।

নয়নতারা বুঝলেন দাবার ছক সাজানো হয়ে গেছে। এখন প্রথমটা শুধু একটা বোড়ের চাল ঠোকা হলো। আস্তে বললেন, তো তোর বাবাকে বল? দ্যাখ রাজী হয় কিনা!

বাবাকে? ও বাবা। সে আমার কর্ম নয়! বাবাকে একটা কথা বোঝাতে আকাশ ফাটাতে হয়। তুমিই বলে দিও। তোমার ফিসফিস কথাটিও তো বেশ শুনতে পান দেখি। আমাদেরই গলা চেরে।

অপমানে কান-মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। তবু নয়নতারা কষ্টে নিজেকে সামলে নিলেন। বলে উঠতে পারলেন না, তোমাদের মধ্যে যদি তেমন ছেদ্দাভক্তি থাকতো তাহলে গলা চিরতে হতো না। ...তোমরা কিছুতেই মানবে না, কাছে বসে ধীরে ধীরে বললে ঠিকই মানুষটার মাথায় ঢোকে। আসলে মাথাটাই একটু কম চটপটে হয়ে গেছে। কান থেকে কথাটা পৌঁছে যেতে সময় নেয়। তোমরা দূর থেকে পরিত্রাহি চেঁচাবে।...

কিন্তু নতুন করে আর বলে লাভ কী? বহুবার বলেছেন, জনে জনে সবাইকে। সকলেই একই ভুল করে। দূরে থেকে চেঁচায়। কাছে এসে বসবার সৌজন্যটুকু স্বীকার করে না। যাক। উপায় কী? ভগবানই যখন অমন চৌকস মানুষটাকে এমন বেচারীর ভূমিকায় ফেলে দিয়ে বসেছেন।

বললেন, আচ্ছা বলব। তবে বোঝাতে দেরি হবে, হঠাৎ আমাদের 'বিশ্রাম আর শান্তির' দরকারটা তদের মাথায় এলো ক্যান?

মুখটা কালো হয়ে গেল ছেলের। একটু চমকে গেল।

তারপর বলে উঠল, আমাদেরও তো বয়েস হয়েছে মা? আমাদেরও তো সংসার চালাবার মতন বোধবুদ্ধি হয়েছে একটু-আধটু। ছেড়ে দিয়ে দ্যাখোই না একটু পারি কিনা। ফেলিওর হই কিনা। সংসারখানা চিরকাল একই ছাঁচে চলবে, তার কী মানে আছে? তোমাদের এলাহি মেজাজ। চারদিকে রাতদিন অপচয়, বুঝে চলতে পারলে—

নয়নতারা কথার মাঝখানেই বলেছিলেন, আমাদের জিনিসপত্তরগুলা উঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে দে তবে। আমি আমার ঠাকুরঠাকুরদের নিয়ে যাচ্ছি।...

আহা এক্ষুণিই কী একেবারে—

চলে গেছল তাড়াতাড়ি। যেন পালিয়ে গেল। তবে দেখে মনে হলো যেন, তেমন কিছু প্রতিরোধ এল না দেখে বেঁচে গেল।

নয়নতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছিলেন।

ধাত্রীর হাতটা কী নিপুণ! তার হাতের অস্ত্রটা কী সূক্ষ্ম। ...কখন কোন সময় নিঃশব্দে নাড়িচ্ছেদ হয়ে গেছে টেরও পাওয়া যায়নি।

পাবনার বাড়ি থেকে চলে আসার সময় যে ছেলেটা তার উঠোনের সেই জারুল গাছটায় টাঙানো দড়ির দোলনাটা ধরে হাপুস নয়নে কেঁদেছিল, কিছুতেই সেটা খুলে দিয়ে আসতে দেয়নি। বলেছিল, থাক, থাক বলছি। কখনো খুলবে না। এ কী সেই ছেলেটাই?

বাড়ির সামনে একটা গাড়ি থামল। বুকটা হিম হয়ে গেল। নয়নতারা একটু গলা ঝুলিয়ে ঝুঁকে না দেখে পারলেন না। আহত কাউকে ধরাধরি করে নামাচ্ছে না তো? কারুরই বাড়ি ফেরার সময় পার হয়ে গেলেই যে কেবল বিপদের চিন্তাগুলোই মাথায় আসে। ...রাস্তাঘাটে কোনো অ্যাকসিডেন্ট

হলো না তো? ...অহরহই যে পথ-দুর্ঘটনা।

না, হাসতে হাসতেই দুই ভাইবোন গাড়ি থেকে নামল। ...ওই লম্বা ছেলেটি কে? বোধহয় কোনো বন্ধু-টন্ধু? গাড়িটা তাহলে ওরই। ...পৌঁছে দিয়ে গেল। ভাল তো। ছাতটুকু পার হয়ে ঘরে চলে এলেন।

সত্যব্রত একটা ইজিচেয়ারে বসে একখানা বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলেন। মাথার কাছে একটা উঁচু টুলের ওপর একটা টেবল ল্যাম্প জ্বলছে। ...তবে দেখে মনে হচ্ছে না বইয়ের মধ্যে ডুবে বসেছিলেন।

নয়নতারা পাশেই বিছানার ধারে বসে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, অরা এলো।

সত্যব্রত তাকালেন। চশমাটা চোখ থেকে খুলে একবার মুছে নিয়ে আবার পরলেন। নয়নতারা বললেন, একটা ঢ্যাঙাপানা ছেলে গাড়ি চাপিয়ে পৌঁছা করে দিয়ে গেল।

সত্যব্রত বললেন, কাদের ছেলে?

নয়নতারা তাড়াতাড়ি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে আস্তে কথা বলার ভঙ্গী করলেন। ...নিজে ভালো শুনতে পান না বলেই আজকাল সত্যব্রতর গলাটা জোরালো হয়ে গেছে। বোধহয় মনে করেন, অন্যেও সহজে শুনতে পাচ্ছে না।

নয়নতারা গলা আরো নামিয়ে এবং মুখকে স্বামীর কানের আরো কাছে সরিয়ে এনে বললেন, জানি না। অদের কোনো বন্ধু হবে। ...তো অখন শান্ত হয়ে শুয়ে পড়ো।

সত্যব্রত বললেন, হুঁ। তারপর বললেন, তোমার তো খাওয়া হয় নাই?

এইবার যাব।

অরা এটা পছন্দ করে না। তুমিও এইখানে আমার সঙ্গে খেয়ে নিলেই ভালো হয়।

নয়নতারা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, মন লাগে না। অরা কেউ বাড়ির বাইরে থাকলেই মন উচাটন লাগে। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়া যায়?

ওরা তো তাই চায়।

বলে বইটা বন্ধ করে উঠে এসে বিছানায় বসলেন সত্যব্রত। সাবধানে আস্তে বললেন, ওরা যা চায় তাই করাই ভালো।

নয়নতারা ক্লান্তভাবে বললেন, আর কত 'ভালো' করব? ...মানুষের প্রাণ তো? ভয় লাগে যদি পথে কোনো—

সবসময় অত বিপদের কথা ভাব কেন?

ইচ্ছে করে কী আর ভাবি? ভাবনা এসে যায়। আচ্ছা তুমি—

এই সময় দরজার পর্দাটা নড়ে ওঠে। কাজের মেয়ে কাজলের মুখটা উঁকি মারে। কী গো ঠাকমা, এখনো খিদা হয় নাই?

নয়নতারা বলেন, তেমন হয়নি। চল—যা হোক দুটি খেয়ে আসি।

হ্যাঁ, ইতিপূর্বে সত্যব্রতর খাবারটা দিতে আসার সময় কাজল বলেছিল, মাসিমা বলল, আপনিও এই সঙ্গে খেয়ে ন্যান না। একসঙ্গে দু'জনার ভাতটাই এনে দিই। আপনিও তো বুড়ো মানুষ!

নয়নতারা বলেছিলেন, মোটে খিদে হয়নি রে এখন। সন্ধ্যেবেলা চায়ের সঙ্গে কী যেন খাওয়া হলো?

কী আবার? শুধু তো একগাল মুড়ি। ...আপনি খেয়ে নিলে আমার একটু সুবিধা হয়।

নয়নতারা রেগে উঠে বলেন, ক্যান? তর আবার এতে কিসের সুবিধা?

না, ইয়ে, আর কিছু না। তুমি তো কেবল টিকটিক করবে, সকড়ি হাত ধুলি না; ভাতের

ফাঁকিতে মানসো মুরগীর হাত দিচ্ছিস না তো?

ওঃ। সেটুকুও করতে পারবি না? রাজার দুলালি।

হ্যাঁ, বড়জোর এই কাজলের ওপর রাগ ফলানো যায়। কিন্তু আশ্চর্য। নিজেদের মানসম্মান সম্পর্কে জ্ঞান টনকে হলেও তেমন ক্ষেত্রে নীহারিকা অনায়াসে নিতান্ত অমায়িক গলায় বলে, তা সত্যি মা। আপনার ওই এঁটো সকড়ি বাতিকে ছেলেমানুষ বেচারার মাথা গুলিয়ে যায়।

নয়নতারা হয়তো একটু হেসে বলেন, এইতেই মাথা গুলিয়ে যায়? তোমার দিদিশাশুড়ীটিকে তো দেখেছ কিছুদিন? যদি তার হাতে পড়তে হতো কাজললতার?

এ কথা বলতে পারেন না, অথচ ওই কাজলকে নিজেদের অবস্থা মতো, বেলা দুটো তিনটে পর্যন্ত না খেয়ে বসিয়ে রাখো, 'ছেলেমানুষ' বলে মনে পড়ে না।

একদিন নয়নতারা বলে ফেলেছিলেন, আহা, ছেলেমানুষ। এতোটা বেলা, এতোক্ষণ দুটো মুড়িটুড়ি খেলে পারতো।

সেই স্নেহ প্রকাশে রসাতল হয়ে গিয়েছিল। এই উক্তি না কী নীহারিকার পক্ষে রীতিমত অপমানজনক হয়েছিল।

কাজল বলল, আচ্ছা, খিদা হলে নেবে যেও।

আর সবাই খেয়ে নিচ্ছে না কী?

শোনো কতা। দিদি-দাদারা তিনজনাই তো এখনো বায়রে, খেয়েটা নেবে কে? মাসিমা, মেসোমশাই?

তরতরিয়ে নেমে যায়।

নয়নতারা সেই নামাটা তাকিয়ে দেখেন।

খিদা না হলেও এখন নেমে যান নয়নতারা। ...দেখেন টেবিলে মেয়ে, ছোট ছেলে, আর তাদের মা।

একধারে নয়নতারার নির্দিষ্ট কোণটায় স্পর্শদোষ বাঁচিয়ে তাঁর থালা। ভারী তো খাওয়া। একমুঠো ভাত আর একটু মাছের ঝোল। ক্রমশঃই আর 'মুরগী মাংস ঠেকানো' বলে বিরক্তি প্রকাশ করতে সাহস করেন না।...কাজ হয় না, শুধু সংঘর্ষ হয়।

নয়নতারাকে দেখেই মেখলা বলে ওঠে, আচ্ছা ঠাকমা। আমাদের কত কারণে দেরি হতে পারে। তোমার বসে থাকবার কোনো মানে হয়?

নয়নতারা জোর করে মুখে হাসি এনে বলেন, তদের জন্যি বসি থাকতি আমার দায় লেগেছে। ...খিদে হয় নাই, তাই খাই নাই। তো বাপ্পা ফেরে না?

নীহারিকা সংক্ষেপে বলে, সে আজ ফিরবে না বলে গেছে।

কোথায় গেছে? ফিরবে না কী গো?

এমন প্রশ্নের সাহস নেই। টেবিলে পাতা থালার দিকে তাকিয়ে বলেন, তো খোকা?

'খোকা' অর্থে আদিত্য।

বাবার মাথা ধরেছে। খাবে না। ...বলে চেয়ারটাকে শব্দ করে টেনে খেতে বসে শিলাদিত্য।...

ওরা রাতে ভাত ছোঁয়ও না। কখনো কখনো ঠাট্টা করে বলে, বাঙাল বুড়ির রাতে ভাত না হলে চলে না।

আজ ঠাট্টার মেজাজ নেই।

বাবা যে মেজাজ দেখাতেই মাথা ধরার ছুতো করে খেল না, এটা তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

এতে তাদের মানের হানি হয় না? রোসো, এবার থেকে রোজ এই করব। ক'দিন রাগ দেখাবে দেখি!

॥ দুই ॥

তখন থেকেই অপমানের জ্বালায় জ্বলছে মেখলা। বাবা যথারীতি অভিযোগে সোচ্চার হয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠতো, কী? এতোক্ষণে বাড়ির কথা মনে পড়লো? অথবা 'তোমরা সব ভেবেছ কী?' এইরকম কিছু একটা বলে, তাহলে অবশ্যই রাগ হতো কিন্তু অপমান হতো না। রাগের প্রতিক্রিয়ায় পরে বাবাকে শুনিয়ে শুনিয়ে মাকে বলা যেতো, কী পরিস্থিতিতে এতো দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু নিঃশব্দ অভিযোগের উত্তর হয় না।... শুধু মনে মনেই উত্তরগুলো ডালাবন্ধ ঝাঁপির মধ্যে সাপের মতো গজরাতে থাকে। ...কেন? মেখলা কী কিছু গর্হিত কাজ করে ফিরল? তাই অমন বরফ শীতল নীরব দৃষ্টি হেনে চলে যেতে হবে? এবং মাথাধরার ছুতো করে না খেয়ে ঘুমোতে যেতে হবে?

বয়ে গেছে। আমি ভাল করেই খেয়ে দেয়ে নিচ্ছি। বাবা হয়েছ বলেই মাথা কেননি তুমি। অবচেতনের কুটিল অন্ধকার থেকে একটা তীক্ষ্ণ মন্তব্য উঁকি মারে, বাবা হতে যে কত কাঠখড় লাগে, তা ভালই জানা হয়ে গেছে। ছেলেবেলার মতো এখন আর বাবাকে পরম পিতা তুল্য মনে করবার বোকামি নেই।

অবশ্য মেখলার এতোটা সাহস পৃষ্ঠবল হিসেবে ছোড়দাকে পাওয়ায়। এ বছর গানের স্কুলে ফার্স্ট হওয়ায় শিলাদিত্য হঠাৎ ছোট বোনটার ভবিষ্যৎ গড়ে দেবার চেষ্টায় দায়িত্ববান হতে চাইছে। কাজেই কোনোখানে ভালো গানের জলসা হলে, বা নামকরা গাইয়ে বাজিয়েদের আসার সম্ভাবনা থাকলে নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে টিকিট কিনে সঙ্গে করে নিয়ে যায় মেখলাকে। খুব একটা অনেক বড় দাদা নয় পিঠোপিঠিই, তবু দাদা তো? ...আর তাদের পারিবারিক পরিবেশে মেখলা একা কোথাও যাবার কথা তো ভাবতেই পারবে না। তাই যেদিন বলেছিল, জীবনে কোনোদিন সামনে বসে 'চাক্ষুষ চক্ষে' দেখে রবিশঙ্করের সেতার শুনিসনি? বেচারা। আহা ঠিক আছে হয়ে যাবে।

মা অবশ্য তার ছোটছেলের এ ধরনের সুমতিতে খুশী। মা তো সর্বদাই বলে, তেমন চেষ্টার জোর থাকলে, এতোদিনে টুসকি রেডিওতে টি. ভিতে গান গাইবার চান্স পেয়ে যেতো। ওর থেকে কত নীরেস গলা নিয়েও কতজনা কেমন এগিয়ে যাচ্ছে. খুঁটির জোর আছে। এই যে ওদের 'সুর ঝঙ্কার'-এর প্রধানা? তিনি একটু চেষ্টা করলে হতো না কিছু? হুঁঃ। মুখে তো ওর গলার খুব প্রশংসা করেন, কিন্তু আসল কাজের বেলায় কিছু না। শিলুটা যদি অন্তত—

শিলুর কাছে অবশ্য কোনো খুঁটির আশ্বাস নেই, তবে সে চায় তার গুণী বোনটা নিজস্ব জগতের একটু স্বাদ পাক, সে-জগতের বাতাসে একটু নিঃশ্বাস নিক। প্রশংসনীয় ইচ্ছাই। বড়দা বাপ্পাদিত্যটি একদম অন্য গ্রহের জীব। তার সঙ্গে সপ্তাহেও দুটো কথা হয় কিনা সন্দেহ।

কিন্তু মায়ের মনোবাঞ্ছা আর বাবার মানসিকতায় কোনো মিল নেই। বাবা এসব দেখলেই রাগে গরগর করে। বলে, 'নিজে উড়ছিস ওড়, ধরে রাখবার উপায় নেই, বোনটাকেও আবার উড়তে মদত দেওয়া কিসের জন্যে?'

তবে তেমন প্রকাশ্যে বলতে পারে না, নীহারিকার থাবাড়ি খেয়ে সামলে যায়। আজকের অভিযানের খবরেও আদিত্য অভিমত প্রকাশ করেছিল, সিনেমা নয়, থিয়েটার নয়, বাজনা শোনা। তার জন্যে আবার ঘটা করে যাবার কী দরকার? গানবাজনার জ্বালায় তো কান ঝালাপালা। টি.ভি. খুললেই গানবাজনা, রেডিও খুললে গানবাজনা, রাতদিন তোমাদের ক্যাসেটে গানবাজনা। আবার

সময় নষ্ট করে ছুটে ছুটে যাবার কী আছে?

বাবার এসব কথা অবশ্য ওরা অমৃতং বালভাষিতং হিসেবেই ধরে নেয়। গোলা লোকেদের তো এইরকমই মানসিকতা হবে।

জানে, যাব, দেখব, ফিরতে একটু দেরি হলে, একটু তর্জন গর্জন শুনব, তেমন হলে তার বদলাও নিয়ে নেব, ব্যস। কিন্তু আজ পরিস্থিতি অন্য।

দোতলায় চারখানা ঘরের একখানা বাপ্পার দখলে, একখানা শিলাদিত্যর, একখানা বর্তমান কর্তা গিন্নীর আর একখানা আপাততঃ যতদিন না ভিন্ন গোত্র হয়ে যাচ্ছে ততদিন মেখলার। অতএব নিজেকে নিয়ে ভাববার সুযোগ আছে।

আগে যখন প্রাক্তন কর্তা গিন্নীর এই দোতলাতেই ঠাঁই ছিল তখন মেখলাকে শুতে হতো ঠাকুমার খাটে। অন্য খাটে দাদু। পচা লাগতো। বিছানায় শুয়েই ওঁদের যতো গল্প। আর দুই ভাইকে শুতে হতো একই ঘরে। বাপ্পার পক্ষে সেটা ছিল বিরক্তিকর। ব্যবস্থার বদল হয়ে বাঁচা গেছে। বুড়ো-বুড়িকে ছাতের ঘরে চালান করবার বুদ্ধিটা যে মার খুব জুৎসই হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই।

এখন মেখলা একা ঘরে আলো নিভিয়ে আর পাখা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়ে নিজেকে নিয়ে ভাবতে পাচ্ছে। আর আশ্চর্য, হঠাৎ দেখছে বাবার বিরুদ্ধে যে অভিযোগটা তীব্র হয়ে উঠেছিল সেটা কখন বিলীন হয়ে গেছে। এখন চোখের সামনে ছায়া ফেলে ফেলে ঘোরাঘুরি করছে একটা সদ্য দেখা মূর্তি। যার আকৃতিটা রীতিমত আকর্ষণীয় হলেও প্রকৃতিটা নয়। ওঃ। কী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা। যেন বিশ্বনস্যাৎ ভাব। টাকায় সব কেনা যায়। রমণীর মন তো তুচ্ছ ব্যাপার। টাকার পাহাড় জমিয়ে তুলতে পারলেই দিকবিদিক থেকে মেয়েরা ছুটে এসে দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে সেই পাহাড়ের মালিকের প্রেমে পড়তে আসবে। ছোটলোক।...

কিন্তু সেই ছোটলোকটাকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারা যাচ্ছে না। তার শেষ কথাটা যেন একটা মোহময় মায়াজাল বিস্তার করতে চাইছে।.... এখন ভাবছি গাড়িটা বেচে ফেলবো কি না।

কেন এই ভাবনা? মেখলা একবার চড়েছে বলে? ন্যাকামি। ঢং। মেখলাকে ঠাট্টা করা?

যতই বিরুদ্ধবাদকে জড়ো করতে থাকুক মেখলা, ঘুমের আগে পর্যন্ত সেই বাজে লোকটাই তার চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।...

সত্যিই কী কোনোদিন হঠাৎ এসে পড়বে না কী?

বলা তো হলো, কেন? শুধু এখানে আসার জন্যেই এ পাড়ায় আসা যায় না? দূর। কথার কায়দা ছাড়া আর কিছুই নয়। ভীষণ কায়দাবাজ। আচ্ছা ছোড়দা ঠাট্টা করে যা বলল, সেটাই সত্যি নয় তো? কোনো বড়লোকের আহ্লাদি মেয়ের প্রেমেফ্রেমে পড়ে কোনো দাগা পায়নি তো? কোনো দাগা আর কী? গরীব বলে হ্যানস্থা। যা স্বাভাবিক। লোকটা তাতেই মরীয়া হয়ে টাকাই পরমার্থ বলে এমন উগ্র মতবাদের আশ্রয় নিয়ে বসেছে। কীরকম বাড়ির ছেলে কে জানে?

ছোড়দাকে বেশী কিছু জিগ্যেস করতে গেলেই হয়তো সন্দেহ করে বসবে। টুকটাক প্রশ্নে জেনে নিতে হবে। কেন হবে, কোন দরকারে, সেটা অবশ্য মাথায় আসে না।

তা রাতেই যত গল্পের দোষে দোষী কী একা মেখলার বুড়ো বুড়ি ঠাকুমা ঠাকুর্দা? তার মা বাবাই বা কী? কিন্তু কেনই বা তা হবে না? নিতান্ত নিভৃত হবার জন্যেই তো রাত্রির সৃষ্টি। সংসারের আর কারো সঙ্গে এমন নিজেকে মেলে দিয়ে আলাপ করা সম্ভব?

আবার আর কার সঙ্গেই বা যথেষ্ট পরিমাণে হ্যড়াই ডোমাই ঝগড়া হয়ে যাবার পরক্ষণেই আবার গলাগলি সন্ধি সম্ভব?

যে যার স্বস্থানে প্রস্থান করলে নীচে নামবার সিঁড়ির দরজাটায় তালা লাগিয়ে নিজের ঘরে এসে ঢোকে নীহারিকা। হ্যাঁ, ও তালাটা সে নিজের হাতে লাগায়, এবং চাবিটা নিজের কাছেই রাখে। না রাখলে হয় ? কাজলকে ভার দিলে ? কে বলতে পারে নীহারিকার অজ্ঞাতসারে ওই ধুরন্ধর মেয়েটি নিঃশব্দে নীচের তলায় নেমে যাবে কিনা ! নীচের তলায় লক্ষ্মীছাড়া তারকটার স্থিতি না ? সবদিক ভাবতে হয় নীহারিকাকে।

নিজের ঘরে ঢুকে এসেও দরজায় খিল লাগিয়ে, 'পানপরাগ'-এর কৌটোটা হাতে নিয়ে গুছিয়ে বসে শায়িত স্বামীকে একটা ঠ্যালা মেরে কাঠগড়ার আসামীর প্রতি জজের উক্তির স্বরে বলে, তোমার আজকের আচরণটা কী রকম হলো ?

উত্তর অবশ্য এলো না।

জেগে ঘুমোলে এতো চট করে ঘুম ভাঙার কথা নয়।

নীহারিকা আর একটা ঠ্যালা মেরে বলে, মেজাজ দেখিয়ে না খেয়ে পড়ে থেকে ধাষ্টামো ছাড়া আর কিছু হলো ?

তথাপি নীরবতা।

বলি, মেয়েটা ছেলেটাকে যে তুমি না হোক এমন অপমান করলে, তার পরিণামটা ভেবেছ ?

অপমান। ঘুমন্ত বাঘ গর্জে ওঠে।

অপমান মানে ?

নয়তো কী ? তোমার মেয়ে একটু গানবাজনা শুনতে গেছলো বৈ কোথাও গিয়ে ক্যাবারে ডান্স নাচতে যায়নি ? তাও তো শুনি আজকাল অনেক মেয়ে মা বাপের অজান্তে তা যায় রোজগারের চেষ্টায়

আদিত্য ক্রুদ্ধ গলায় বলে, এসব অ-সভ্য কথার অর্থ ?

অর্থ ? অর্থ হচ্ছে তোমার চৈতন্য করানো। আজকের কালকে তো চেনোনি এখনো। ভাই আদর করে বোনকে একটু এখান ওখান নিয়ে যায়, এতে তো তোমারই বর্তে যাওয়া উচিত। আজকালকার দিনে কটা ভাই এমন করে ? বলি একটা মাত্রই তো মেয়ে ? বাপ হয়ে মেয়ের জন্যে কিছু করেছ কোনোদিন ?

আদিত্য আহত গলায় বলে, কিছুই করিনি ?

করবে না কেন ? মেয়েকে খেতে পরতে দিয়েছ। ইস্কুল কলেজের মাইনেটাও দিয়েছ, আর সেটাই যথেষ্ট ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করছ।

আদিত্য গম্ভীরভাবে বলে, আর কী করতে হয় ছেলেমেয়ের জন্যে ?

নীহারিকা ধিক্কারের গলায় বলে, তা জানি। তোমার জানার জগতের দৌড় ওই পর্যন্তই। ছেলেমেয়ের বিশেষ করে আজকাল মেয়ের কেরিয়ার গড়ে তোলার জন্যে লোকে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল চষে বেড়িয়ে কী না করছে। যে লোকের নিজের এক পয়সার মুরোদ নেই, সেও কীভাবে কোথায় ধর্ণা দিয়ে স্কলারশিপ যোগাড় করে মেয়েকে হয়তো বিদেশেই পড়তে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এই তো তোমার নিজের বোনের দেওরই তো—

তার কথা বাদ দাও। একের নম্বরের ধান্দাবাজ।

তা আজকালকার যুগে ধান্দাবাজেদেরই জয়জয়কার বুঝলে ? 'ধান্দাবাজ' বলে নাক কোঁচকালে কী হবে ? কত ছেলে একটু তবলা পিটতে শিখেও ধান্দার জোরে আমেরিকা চলে যাচ্ছে।

সকলকে দিয়ে সব হয় না।

না হলে নতিস্বীকার করে মেনে নিতে হয়। বুঝলে ? মেজাজ দেখাতে আসলে চলে না।

নীহারিকা উষ্ণ হয়, মেয়েটার ছেলেবেলা থেকে গানের ঝোঁক, গলাও ভালো, শিখে নিতে পারে তাড়াতাড়ি—তোমার একটু চেষ্টা যত্ন থাকলে ও অনেক উন্নতি করতে পারতো। তো এতো করে বলে মরে আজ পর্যন্ত মেয়েটাকে নিয়ে একদিন রেডিওতে অডিশান দেওয়াতে নিয়ে যাওয়াতে পারলুম না ! গানের ইস্কুলটায় ভর্তি করে দিয়েছিলুম সেও আমি। সাঁতার ক্লাবে ভর্তি করে দিয়েছিলাম সেও আমি—

দিয়েছিলে—তো মেয়েটা ডুবে যেতে যেতে রয়ে গিয়েছিল তাই রক্ষে।

নীহারিকা ওই অতীত প্রসঙ্গের উল্লেখে উত্তপ্ত হয়ে বলে, সেটা তোমার মেয়ের নার্ভাসনেসের ফল। তোমারই মেয়ে তো ! কতই আর হবে ? খেলাধ্‌লোতেও তো...।

আদিত্য আবার শুয়ে পড়ে বলে, তা একটা মেয়েকে ः ব বিদ্যেয় চৌকস হতে হবে তার কোনো মানে আছে ?

মানে তোমার মতো কূপমণ্ডূকের কাছে নেই, আজকের সমাজের কাছে আছে। আজকের যুগে একটা 'চৌকস মেয়ে' হচ্ছে স্ট্যাটাস সিম্বল। বুঝলে ? তায় তো তোমার মেয়ে দেখতে সুন্দরীও। তা এসবের মানেই জানলে কোনোদিন ? জানো শুধু ঘরে দুটো টাকা এনে দিলেই সকল কর্তব্য সমাধা হলো। আর মনের জগতে ? সেখানে তো সর্বদা এই চিন্তার চাষ—'বাবা মার কোনো অসুবিধে হচ্ছে না তো ? মা বাবা ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন না তো ? ওনাদের সম্যক মান মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে তো ?'

আদিত্য আবার উঠে বসে, এই সব বলি আমি ?

মুখে বল না, মনের মধ্যে কী হয়, সে কথা আমার ভালই জানা। ওই ওনাদের জন্যেই আরো পুরনো খুঁটি আঁকড়ে বসে থাকতে হয়েছে।

আদিত্য গম্ভীরভাবে বলে, ওঁরা তো সংসারের কোনো কথাতেই থাকেন না।

নীহারিকা ঝাঁজের সঙ্গে বলে, 'থাকেন না' তবে—অবলোকন করেন। কখন কে ফিরছে, তাতে নজর ফেলে বসে থাকেন। বাধ্য হয়েই আমায় মিছে করে বলতে হলো 'বাপ্পা বলে গেছে আজ রাতে না ফিরতেও পারে।'

এই কথা বলতে হলো !

তা না বললেই তার বারোটা পর্যন্ত বাপ্পা বাপ্পা করে হামলাবেন। না খেয়ে বসে থাকবেন। আমার যে জ্বালা কত ! এই যে টুসকিরা ফিরলো, যে ছেলেটা গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল, সে কে, কী বৃত্তান্ত সব হয়তো জিগ্যেস করতে বসবেন কাল। ছাতের আলশের ধারে দাঁড়িয়ে এই অবধি জেগে বসে থাকাটাই কেন ? অ্যাঁ ?

প্রসঙ্গর পরিবর্তন ঘটে।

আদিত্য বলে, গাড়ি করে পৌঁছে দিয়ে গেল ? কোন ছেলেটা ?

কেন ? তুমি দেখোনি ?

নাঃ। আমি কোনো গাড়িফাড়ি দেখিনি। দরজা খুলে শুধু ওই দুই অবতারকেই তো দেখলাম।

চমৎকার। আমি কোথায় ভাবছি, তোমায় বলবো, শিলুকে জিগ্যেস করে জেনে নেবে ছেলেটি কে ? কতদিনের বন্ধুত্ব ? আর তুমি দ্যাখোইনি ? দেখবে কোথা থেকে ? রাগে যে অন্ধ হয়ে ছিলে ! ও আমাকেই খোঁজ নিতে হবে। তোমার দ্বারা যে কত হয় তা জানা আছে আমার ! তবে এইটি বলে রাখছি—এখন আর ছেলে মেয়ের ওপর বেশী মেজাজ দেখানো চলবে না, সেটি মনে রেখো।

মনে রাখবো !

ব্যঙ্গ করার কিছু নেই। এ যুগের এরা, কথার একটু উনিশ বিশে হয়তো নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, হয়তো বা গায়ে কেরোসিন ঢেলে দেশলাই জ্বালায়। এ আমাদের আমল নয় যে সব মুখ বুজে সহ্য

করবো। মেজাজ দেখিয়ে খেতে বসা হলো না বাবুর। লোকলজ্জায় আমাকে দিব্যি বসে গরগরিয়ে খেতে হলো!

এখন নীহারিকার কণ্ঠস্বর ভারাক্রান্ত, আজ—চিংড়ি দিয়ে নতুন কপির তরকারি রাঁধা হয়েছিল।

আদিত্য হঠাৎ একটু হেসে ফেলে বলে, তা আমার ভাগটা কী আর ফ্রীজে তোলা নেই?

আচ্ছা! খুব হয়েছে! নীহারিকা বলে, এখন ওঠো দিকি। ঘরে একটু মিষ্টি এনে রেখেছি, খেয়ে একটু জল খেয়ে ঘুমোও।

আদিত্য বিনাবাক্যব্যয়ে সেই চমচম দুটি গলাধঃকরণ করে চোঁ চোঁ এক গ্লাস জল খেয়ে বলে, তো আমায় তো কই তখন একবার কেউ সাধতেও এলে না। সবাই তো বেশ—

নীহারিকা একটু ঢোক গিলে বলে, তখন তোমার ছেলে মেয়ের মেজাজ যা টনকো।

কথাটা অবশ্যই সত্য। তবে এক্ষেত্রে আংশিক সত্য।

'বাবা খাবে না। মাথা ধরেছে।' শুনে, নয়নতারা কী একটু উসখুস করে বলে ওঠেননি, 'অ মা! মাথা ধরার কারণে রাতে উপুস থাকবে? খালি পেটে মাথা আরো অধিক ধরে। কই দেখি—ঘুমায় গেছে না কী?' বলে ছেলের ঘরের দিকে আসছিলেন, নীহারিকাই নিবৃত্ত করেছে। বলেছে, 'আঃ ঘুমের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়েছে—এখন আর—'

দরজার পর্দাটা বোধহয় একটু বেশী করে টেনে দিয়েছে।

তখন অবশ্য শিলাদিত্য বলেছে, 'আশ্চর্য! একরাত্তির না খেলে মানুষ মারা যায়? ডিসটার্ব করার দরকার কী?'

আর মেখলা হি হি করে বলেছে, 'জানিস না রাত উপ্‌সে হাতী কাবু! তাই না বুড়ি?'

অতএব ওদের ওপর দোষটা চাপানোয় দোষ হয়নি।...

কিন্তু নীহারিকা?

তার তো 'চিংড়ি মাছ সম্বলিত নতুন ফুলকপির তরকারি'র জন্য মনটা করকর করছিল।

তবু ওই এক মনোভঙ্গী, যেটা অবচেতনের কারসাজি। যদি মায়ের ডাকাডাকিতে লোকটা উঠেই আসে। আসতে পারে। মাতৃভক্ত পুত্র তো। তাহলে ছেলেমেয়ের সামনে তার 'প্রেস্টিজ' থাকবে? হয়তো বলেই বসবে, 'বাবার অবস্থা হয়ে উঠেছিল—একবার ডাকিলেই খাইতে যাইব। তাই না মা?'

তা ওরা পারে। মা বাপকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করতে ওদের বাধে না।

তাছাড়াও—আরও একটি ভাবভাবনা কাজ করেছে বৈকি। একটা গোলমেলে পরিস্থিতি যদি নীহারিকার বিরোধী পক্ষের হস্তক্ষেপে আয়ত্তে এসে যায়? তাতে তো নীহারিকারও প্রেস্টিজের প্রশ্ন।

নয়নতারাও সিঁড়ি বেয়ে উঠে সিঁড়ির দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিলেন। তালা অবশ্য নয় শুধুই ছিটকিনি।

দু'জনের দু'ঘরে খাট বিছানা। সিঙ্গল খাট। এ বয়সে যেমন হওয়া সঙ্গত। কিন্তু বেশীর ভাগ দিনই গল্প করতে করতে হাই ওঠা দেখলে, সত্যব্রত বলেন, 'এইখানেই একটু গড়িয়ে নাও।' এবং নয়নতারাও নিতান্ত বাধ্য মেয়ের মতো গুটিসুটি হয়ে, সেই সরুরই একাংশে শুয়ে পড়েন। রোগা হাড়-জিরজিরে মানুষ, কতটুকুই বা জায়গা লাগে?

তবু সত্যব্রত বলেন, 'দেখো যেন পড়ে আছাড় খেও না।' এবং সাবধানার্থে নিজেকে খানিকটা সঙ্কুচিত করে নেন।

বিয়েটা বলতে গেলে নেহাৎই বালো। বারো বছর পার হয়েছে মাত্র। বর অবশ্য বছর দশেকের বড়। বলতে গেলে আজীবনের সম্পর্ক '...সেই কাল থেকে এই কাল, জীবনের কত বাঁকে বাঁকে

কত সুখদুঃখ, কত ওঠাপড়া, অতঃপর এই দেশভাগের অভাবিত ভয়ঙ্করতা। তবু দুটো মানুষ কোনো সময়ই বিচ্ছিন্ন থাকেননি। থাকা সম্ভব, সেটাই যেন মনে আসে না।

নদে জেলার মেহেরপুরের মেয়ে নয়নতারা, তাহেরপুরে মামার বাড়ি। পিসির বাড়ি শান্তিপুরে। ছেলেবেলাটায় এই তিনটে জায়গাই ছিল পৃথিবী। বিয়ে হলো পাবনায়।... বড় দুঃস্বপ্নেও ছিল না, এই সবের মাঝখানে হঠাৎ ভয়ানক এক বিদারণ রেখা পড়ে যাবে।... তবু পাবনায় থাকতে থাকতে—কথায় একটা 'টান' এসে গিয়েছিল। বাপের বাড়ি এলে সবাই বলতো 'তুই দেখছি বাঙাল হয়ে গেছিস।'

নয়নতারা রেগে বলতো, 'কী যে কও তমরা। আমি তো বুঝি না।'... এদের মধ্যে হাসির ঢেউ পড়ে যেতো।

তা বাপের বাড়ি আসাআসিই বা ক'দিন? পাবনায় বৃহৎ বাড়ি বৃহৎ সংসার। বৌ ভিন্ন অচল।... নয়নতারার শ্বশুর পূণ্যব্রত গাঙ্গুলীও ছিলেন উকিল। খুব নামডাক।.... বাড়িতে জনা তিন খুড়শ্বশুর খুড়শাশুড়ী, তাঁদের সন্তানসন্ততি, তাছাড়া—আশ্রিত প্রতিপাল্য কত লোক।... 'কাজের লোক'ই কম ছিল? বালিকা নয়নতারার মনে হতো—বুঝি অগুণতি। কত জনা যে কত সময় আসছে, খাচ্ছে।.... কেউ বা দালানের ওপর পেতল কাঁসার বাসনে, কেউ কেউ বা উঠোনে কলাপাতা পেতে। নিত্যদিনের খাওয়া, তবু ওটাই ওদের সুবিধে। আসবার সময় সঙ্গে একটা বড়সড় পেতলের ঘটি আনতো, আর একখানা কলাপাতা কেটে আনতো।... অভাব তো নেই। বাড়ির ধারেকাছেই যত্রতত্রই তো কলাবাগান।... পাতা কাটলে গাছের ক্ষতি এটা জানা থাকলেও মানা হতো না। কতই ক্ষতি হবে? কত কলা খাবে গেরস্থ?...

ওরা পাতাটা বিছিয়ে বসতো, জনা ঘটিটা পেতে। একটা গিন্নীবান্নী দাসী এসে ঘটিটায় জল ঢেলে দিয়ে যেতো, আর পাতের পাশে রাখতো এক খামচা নুন, আর মুঠোখানেক কাঁচালঙ্কা।.. অতঃপর সেই দাসীই রান্নাঘরের সামনের দাওয়ায় একখানা বড় গামলা আর একটা বড় কাঁসি পাততো।

হেঁশেল থেকে ভাত ডাল আর মাছ তরকারি আলগোছে ঢেলে দিতেন মেজখুড়ি।... আবার দাসী ক্ষেত্তরের মাও সেই উঠোনে পাতা পাতায় আলগোছে ঢেলে দিত সেসব।

এই ব্যবস্থায় কেউ কোনো উচ্চমার্গের নীচতা দেখতে পেতো না, এবং ভোজনকারীও অপমানাহত হতো না। এই নিয়মটি তো চন্দ্র সূর্যের মতই নিশ্চিত নিয়ম। এর মধ্যে আবার প্রশ্ন কিসের?.....

খাওয়ার পর লোকটা পাতাটা মুড়ে নিয়ে চলে যাবে। আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে, ঘটিটা পুকুর থেকে ভরে এনে জায়গাটা ধুয়ে পরিষ্কার করে দিয়ে যাবে।

একজন নয়, দফায় দফায় এমন কতজন। যাদের দালানে বসবার অধিকার, তাদের সম্পর্কে এ নিয়ম নয়। তাদেরও আলগোছেই, তবে স্বয়ং মেজখুড়িই পরিবেশনকারিণী।...

নতুন বৌ হাঁ করে বসে বসে দেখতো, কী বিশাল একখানা ভাতের পাহাড় লোকগুলোর পেটের মধ্যে চালান হয়ে যেতো।... মেজখুড়ি বলতেন, 'হ্যাঁরে আর দুটি ভাত দিই?'

সে একগাল হেসে বলতো, 'তা আজ্ঞে দেন চারটি।'

যতবার জিজ্ঞেস করা হবে, একই উত্তর।

অবশ্যই আবার তার সঙ্গে ডাল চচ্চড়ি, দু'একখানা মাছ। ঘরের পুকুরের মাছ। গোনাগুনতির ধার কে ধারে?...

উঠোনে বসাদের ভার ক্ষেত্তরের মার হাতে। সে যে বারবার জিগ্যেস করবে না, এ সন্দেহ ছিল বলেই নয়নতারার এক পিসশাশুড়ী তসর থান পরে মালা জপতে জপতে তদারকি করতেন, 'অ ক্ষেত্তরের মা! গামলাখান আর একবার হেঁশেল ঘরের দুয়োরে পাত গে যা।..... ব্যামনও আনাবি

খানিক।'

বৌ নয়নতারা ভাবতো, এরা তো রোজই খায়, তবে আবার নেমন্তন্নির মতো এমন 'আর নিবি ?....আর দুটো নে—'বলা হয় কেন ? পেট না ভরলে তো চেয়েই নেবে।

তো একদিন বলেই ফেলেছিল এক ননদকে। বড়দের সঙ্গে তো কথা বলার রেওয়াজ ছিল না! সে তো হেসে গড়িয়ে বলল, 'অতো খেয়ে আর চাইতে লজ্জা লাগে বোধহয়।' আবার কথাটা চাউরও করল।

পিসশাশুড়ী শুনে একটু হাসলেন, 'মানুষজনকে খেতে বসিয়ে শুধোতে হয় বৌ! এটা নিয়ম।... বাড়ির জনদের শুদোই না ? ছানাপোনাগুলানদের বারবার শুদোই না ?... তো শিখে রাখো এসব। দু'দিন বাদে তো তোমারেও হেঁশেলের ভার নিতি হবে।'

তখন অবশ্য নয়নতারা শুনে শিউরে উঠেছিল রান্নাঘরে ভাতের হাঁড়ির আয়তন দেখে। দাউ দাউ করে কাঠের উনুন জ্বলছে, আর পরপর হাঁড়ি চড়ছে।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই নয়নতারা অবাক হয়ে দেখলো নিজেই সে তার লিকলিকে দু'খানা হাতে সেই বিশাল হাঁড়ি নামাচ্ছে।... বড় বড় পেতলের গামলার ওপর ঝুড়ি পাতা, ভিজে গামছা দিয়ে চেপে ধরে তাতেই হাঁড়িদের উপুড় করে দেওয়া।... ওতেই ফ্যান ঝরবে।... পরে রান্নাঘর সাফ করতে এসে ক্ষেত্তরের মা সেই সব ফ্যান ভর্তি গামলাদের বয়ে বয়ে নিয়ে যাবে গোয়ালে। ঢেলে দেবে তাদের ডাবায়। অতঃপর বাসনমার্জুনিদের এলাকায় নামিয়ে দেবে গামলাদের।

গামলাগুলো যখন সোনা হেন ঝকঝকে হয়ে দাওয়ার ধারে উপুড় হয়ে হয়ে পড়তো, কিশোরী নয়নতারা ভাবতো, 'বাবাঃ, এদের বাড়ি যে রোজই যজ্জি।'

হ্যাঁ, তখনও 'এদের বাড়ি।'

কখন কোন ফাঁকে হয়ে গেল 'আমাদের বাড়ি'। দৈবাৎ বাপের বাড়ি গেলে, অনেক কিছুই দেখে বলতো, 'আমাদের বাড়িতে এটি হবার জো নাই।'...

কিন্তু খুব বেশীদিন কী নয়নতারাকে সেই বিশাল হাঁড়ি নামাতে হয়েছিল ? 'দেশভাগের' সূচনা বা নামেতেই বাড়ির লোকজন যেন কমতে শুরু করলো। দালানে উঠানে দু'প্রস্থ নেমন্তন্নি বসায়ও কিঞ্চিৎ ভাঁটা পড়লো।... ছোট খুড়শ্বশুর সপরিবারে কেষ্টনগরে শ্বশুরবাড়িতে চলে এলেন। পরে আরও গেলেন সেজখুড়ো।

তথাপি নয়নতারার বয়েসের হিসেবে, যা ছিল, তাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু কেউ বলেনি 'আহা ছেলেমানুষ'। বৌ তো খাটবার জন্যেই।

শ্বশুর তখন বিগত। বিধবা শাশুড়ী শুচিবাইয়ের দাপটে, সকাল থেকে বিকেল অবধি পুকুরঘাটেই পড়ে থাকতেন।

ভোর রাত্তির থেকে প্রায় মাঝরাত্তির পযন্ত কাজকর্মের দায় মিটিয়ে শুতে আসা। এসে স্বভাবতঃই দেখতে হতো বরটি নিদ্রাগত। বেচারী বউ সেই বৃহৎ জোড়া খাটেও আস্তে আস্তে উঠে একপাশে গুটিসুটি হয়ে শুয়ে পড়তো।

তবে বর তো আর কুম্ভকর্ণের চ্যালা নয়, যে এই ঘটনার পরও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন থাকবে ?... দরজায় খিল দেওয়ার শব্দ, চুড়ির শব্দ, এটুকুই প্রতীক্ষারতের ঈষৎ ঘুম এসে যাওয়া চেতনার ওপর ধাক্কা দেবেই। বর তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে, 'আরে পড়ে যাবে না কী ?' বলে সাপটে টেনে নিতো।...

আবার কোনো কোনোদিন কপট নিদ্রাও ছিল। সেদিন অন্য নাটক।

আজ এই গভীর হয়ে যাওয়া রাত্তিরে শুতে এসে নয়নতারার হঠাৎ পাবনার সেই বাড়ির বধূজীবনের কথা মনে পড়ে গেল।... সেও বৃহৎ বাড়ির একাংশের একটি নিভৃত দিকেই ছিল পুত্র

সত্যব্রতের এলাকা। শোবার ঘর, সংলগ্ন ছোট্ট একটা ঘর বাক্স প্যাঁটরা রাখবার। আর একটুকরো জাফরি দেওয়া বারান্দা। যেখান দিয়ে দেখা যেতো বাড়ির পিছনের কলাবাগান আর গোয়ালবাড়ি।

তবু কী মনোরম সেই দৃশ্য। যেন স্বর্গভূমি।

প্রথম যুগে তো সেই ভোর থেকে মাঝরাত পর্যন্তই স্বর্গ থেকে বিচ্যুতি। ভোরে নেমে যাবার সময় সেই জাফরিতে একবার উঁকি দিয়ে চলে যাবার সময় মনে হতো যেন—'স্বর্গ হতে বিদায়'। আর রাতে আস্তে এসে ঘরের সামনেটায় দাঁড়ালেই অনুভবে এসে যেতো স্বর্গে পুনঃপ্রবেশ।... পরে ছেলে মেয়ের জন্মের পর অবশ্য অনেক পটপরিবর্তন হয়েছিল, তবু নিজের সেই ঘর বারান্দাটিতে যেন ছিল স্বর্গদ্বার।...

পাবনার বাড়িতে উদয়াস্ত খাটুনি ছিল, সাজপোশাকের কোনো পারিপাট্যের প্রশ্ন ছিল না, সকলের মিটিয়ে ভাত খেতে বসতে দুপুর গড়িয়ে বিকেল, একবারের জন্যে হয়তো ভাঁড়ারের মেজেয় একটু আঁচল পেতে গড়িয়ে নিয়েই আবার 'সন্ধ্যাবাতির' তাড়ায় উঠে পড়া। এবং অতঃপর রাতের হেঁশেল।... তথাপি কোনোদিন কী মনে হয়েছে তরুণী নয়নতারার, 'খুব কষ্টে আছি'। এখনো মনে হয় কী সুখের দিনই ছিল সেসব।

তরুণী ছাড়া আর কী? পনেরো বছর বয়সে আদিত্য জন্মেছে, সেই আদিত্য মাত্র দশ বছরের হতেই তো দেশছাড়া।... মাত্র পঁচিশ বছর। এখন এ বয়সে বেশীর ভাগ মেয়েরই বিয়ে হয় না।...

অথচ নয়নতারা?

পাবনার সেই বাড়ির আর পাড়ার সবাই জানতো নয়নতারা গাঙ্গুলীবাড়ির গিন্নী।... সত্যব্রত যে মাত্র একটিই ছেলে পুণ্যব্রত গাঙ্গুলীর।... খুড়শাশুড়ীদের অবশ্য মাথার মণি করেই রাখতেন নয়নতারা, পিসশাশুড়ীকে গুরুদেবী-তুল্য। তবু আশ্রিতজন প্রতিবেশীজন সকলেই জানতো নয়নতারার কাছেই প্রত্যাশার পাত্রটি ধরলে পূরণ হবেই। নয়নতারার ওপরই অগাধ আস্থা, অগাধ ভালবাসা।

এখন নয়নতারা মাঝেমাঝেই সেই ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেন।... সে কোন নয়নতারা?... এখনকার এই মানুষটাই না কী? এখন যাকে নিজস্ব নিত্য প্রয়োজনের তুচ্ছতম বস্তুটির জন্যেও অপরের মুখাপেক্ষী হয়ে অপেক্ষার ক্ষণ গুনতে হয়।... হয়তো নিজের প্রয়োজন আরো সঙ্কুচিত করে ফেলা যেতো, কিন্তু সত্যব্রত নামের এই মানুষটিকে নয়নতারা অসুবিধেয় পড়তে দেবেন কোন প্রাণে?... তাছাড়া—তাকে আজকের সমাজ অবস্থাটির স্বরূপ থেকে যতটা সম্ভব আগলে রাখতে চেষ্টা যে।... মানুষটা তো এখন সবকিছু স্বকর্ণে শুনতে পায় না, তবে তার কানে সাংসারিক সংবাদসমূহ শোনাবার সময় সংবাদটাকে মিহি চালুনিতে ছেঁকে মোলায়েম করে ফেলায় দোষ কী।...

বয়েস হলে কী নিজের থেকে বয়েসে অনেক বড়, আর চিরকাল যার কাছে ছিল আপন মানসিক আশ্রয়, তার উপর বাৎসল্য স্নেহের মতোই একটা মমতা জন্মায়?...

নয়নতারা এসে দেখলেন, টেবিল ল্যাম্পটা নিভোনো, জানলা দিয়ে আকাশের আলো আসছে, সেই মায়াময় আলোয় সত্যব্রতর ঘুমিয়ে পড়া মুখের দিকে তাকিয়ে যেন সময়ের সীমা হারিয়ে গেল।... উজান ঠেলে নিয়ে গেল নয়নতারাকে অনেকখানি পিছনে। যেন নবীনা নয়নতারা নিঃশব্দে এসে শয়নকক্ষে ঢুকে এলেন।... তাকিয়ে দেখলেন মানুষটা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে আলো জ্বলছে না, জানলা দিয়ে আকাশের আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত মুখটার ওপর।

নিজের শূন্যতাবোধের থেকেও, মন কেমন করে উঠতো, ওই ঘুমিয়ে পড়া লোকটার জন্যেই। রাগ করতে জানতো না, অভিমান দেখাতেও না। বরং ষোলো আনা সহানুভূতি ওই বেচারী বৌটার

ওপরই।... তার যে এতোক্ষণে ছুটি মিলল, এতে যেন নিজেই কিছুটা অপরাধী !...

অথচ তখন নয়নতারা তার সমবয়সিনীদের কাছে গল্প শুনেছে রাত্রে ঘরে যেতে দেরি হলে কতসময় রাগীবাবুরা রাগ দেখাতে ছাতে গিয়ে শুয়ে থাকেন। অথবা—সারারাত্তিরে আর কথাই কইতেন না, কখনো ঘুমের ভান করে পড়ে থাকেন। বৌ বেচারাকেই কেঁদে-ককিয়ে অবস্থা সামাল দিতে হয়।

এই মানুষটি চিরকাল বড় স্নেহশীল।

সেই নবীনা নয়নতারা যেন এই প্রবীণা নয়নতারাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। তেমন কুণ্ঠিত আর দুঃখিত মনটি নিয়ে আস্তে ঘুমন্ত মানুষটার কাছ ঘেঁষে গুটিসুটি শুয়ে পড়েন।

আশ্চর্য ! ওই লোকটাও কী উজান বেয়ে পিছনে চলে গিয়েছিল এতোক্ষণ ? তাই 'কপট নিদ্রা'র পার্ট প্লে করছিল ? আর এখন সেই যুবক সত্যব্রতর মতই আবেগঘন স্বরে 'আরে পড়ে যাবে নাকি ?' বলে কাছে টেনে নেয়।

নয়নতারা রোগা একটুখানি, পাবনার গাঙ্গুলীবাড়ির কাঠামোয় গড়া সত্যব্রত এখনো বেশ পুষ্ট বলিষ্ঠ।

কানটাই তাঁকে মেরেছে। নচেৎ আরো বেশ কিছুদিন ওকালতিটা চালিয়ে যেতে পারতেন।

কাছে টেনে নিয়ে বললেন, একটা চড়াই পাখির শরীর।

নয়নতারা একটু হেসে বললেন, তা বলে ফুড়ুৎ করে উড়ে যাবো এমন ভয় করো না।

সত্যব্রত তাঁর মাথায় একটু আদরের হাত বুলিয়ে বললেন, নীচে খুব একখানা নাটক হচ্ছে বোধহয় ?

নয়নতারা বললেন, আজ আবার অন্যরকম। যাকগে ওসব কথা।... তবে ছেলেটা মাথা ধরেছে বলে খায়নি, সেটাতেই মনটা কেমন করছে। সুখের সংসার বাইরের কোনো জ্ঞাতিগোত্তর নাই, শুধু নিজেদের মধ্যেই যে কোন এমন অশান্তি সৃষ্টি করে !... দুর্মতি !... আজ আমার কী মন হচ্ছিল জানো ? যেন পাবনার বাড়িতে রয়েছি। আর—

সত্যব্রত ব্যাকুল গলায় বললেন, সত্যি ? তোমারও ? আমারও যেন ঠিক তাই। আজকের বাতাসটা যেন সেই আগের মতো—

তা নয়নতারার ছেলে যদি মাকে বলে, 'তোমার ফিসফিস কথাও বাবা বেশ শুনতে পান—' খুব ভুল বলে কী ?

সত্যিই তো—নয়নতারা তো এসব কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিলেন না।...

ওদের নামিয়ে দিয়ে যুধাজিৎ গাড়িটাকে আস্তে আস্তে চালিয়ে নিয়ে ফিরতে থাকে। অথচ—এখন রাস্তা অনেকটাই ফাঁকা, ঝড়ের বেগেই চলে আসতে পারতো। তা এলো না। কেন এলো না কে জানে ? সময়টুকু একটু তারিয়ে উপভোগ করার জন্যে ?

উত্তর থেকে দক্ষিণ। সময় নেহাৎ কম লাগবে না।

খানিকক্ষণ যেন কিছুই ভাবছিল না যুধাজিৎ। হঠাৎ একসময় ভাবল, আচ্ছা আসবার সময় আমি অমন একটা বোকাটে সেন্টিমেন্টালের মতো কথা বললাম কেন ? গাড়িটা তো আমায় বেচতেই হবে। খদ্দেরের সঙ্গে কথা প্রায় ঠিক। শুধু নিজে হাতে দু'দিন চালিয়ে দেখতে চায় বলেই গাড়িটাকে নিয়ে বেরিয়েছিল। না বেচলে চলবে ?

চলে এসে ল্যান্সডাউন মার্কেটের কাছাকাছি একটা গাড়ি-সারাইয়ের কারখানায় এলো। করোগেটের সিটের দিগগজ একখানা গেট খুলে বেরিয়ে এলো কারখানার মালিক। পরনে লুঙ্গি,

গায়ে একখানা চেককাটা ফতুয়া। ভেতরে অনেকখানি জায়গা।

নীচু গলায় দু'একটা কথা হলো। মনে হলো যুধাজিৎ গাড়িটার মেরামতির যৎসামান্য একটু খুঁৎএর কথা বলছে। মালিক জোরে জোরে মাথা নাড়ল। ভাবটা যেন ও কিছু না।

তারপর গাড়িখানাকে ওই এবড়ো-খেবড়ো ফাঁকা জমিটার ধারে একটা ঢাকা গ্যারেজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিল। এরপর যুধাজিৎ খুব জোর পায়ে একটু হেঁটে এসে ওই কারখানার কাছাকাছি একটা বাড়িতে এসে কড়া নাড়লো।

কিন্তু এ কী শিলাদিত্য কথিত সেই কলেজের কাছের (অর্থাৎ ওদের কলেজ আশুতোষ কলেজের) বড়সড় দোতলা বাড়িটা? যেখানে শিলাদিত্য ছাত্রাবস্থায় মাঝে মাঝেই আসতো!

নাঃ। এ সে বাড়ি নয়। এবং সত্যি বলতে 'বাড়ি' নামের যোগ্য কিনা তাই সন্দেহ। 'বাসা' বলাই সঙ্গত। যেখানে বাস করা হয়, সেটাই 'বাসা'। পাখির বাসাও বাসা। এই গলি রাস্তাটার নাম একটা আছে তবে সেটা চিঠির ঠিকানা লেখার সময় ছাড়া অন্য কোনো সময়ে ব্যবহার হয় না। সবাইয়ের মুখে মুখে 'শীতলাতলা'।

হ্যাঁ, এখানে কোনখানটায় যেন একটি শীতলামাতা প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাই জায়গাটা 'শীতলাতলা' নামেই পরিচিত হয়ে গেছে। যুধাজিৎ-এর মনে পড়ে ছেলেবেলায় তার একবার জলবসন্ত হয়েছিল, সেরে যাওয়ার পর মা এই শীতলাতলায় পুজো দিতে এসেছিলেন।

কিন্তু শুধুই কী ওই একদিন, কত কারণেই তো একদা বনছায়া এই রাস্তাটা পার হয়ে হয়ে এদিকওদিক গেছেন। ছেলেদের নিয়ে ম্যাডাক্স পার্কের দুর্গাঠাকুর দেখতে, তিনকোণা পার্কের জমজমাট কালীঠাকুর দেখতে। তখন কোনোদিন কী ভাবতে পেরেছিলেন এই শীতলাতলায় মন্দিরের সেবাইতের জীর্ণ একখানা একতলা বাড়ির একাংশ ভাড়া নিয়ে সেখানে বাস করবেন?... মানুষ কত কীই ভাবে। কত কীই স্বপ্ন দেখে। আবার কতসময় এমন অনেক অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপিত হয়, যা তার দুঃস্বপ্নের মধ্যেও ছিল না কোনোদিন।

অথচ এটাই ঘটনা যে গোপাল ভটচায্যির বাড়ির একাংশে দু'খানা ছোট ছোট্ট ঘর আর আনুষঙ্গিক যা লাগে, রান্নার জায়গা, স্নানের ঘর ইত্যাদি তাই নিয়ে ছোটছেলেব সঙ্গে বাস করছেন।...

হ্যাঁ যুধাজিৎকে বনছায়া চিরকালই 'ছোটছেলে'ই বলেন। এটাই বনছায়ার শিক্ষা-সংস্কৃতি সভ্যতা।

দরজা খুলে দিলেন বনছায়া। বললেন, কী রে এতো রাত হলো? বলেছিলি যে ফাংশান সাড়ে ন'টা পর্যন্ত। তারপর দলকে হল ছেড়ে দিতে হয়।

যুধাজিৎ ঢুকে এসে সেই দীনহীন বাড়ির মধ্যেও সোফাসেটি ডিভান সাজানো ঘরের মধ্যে চলে এসে বসে পড়লো। এই ডিভানটাই এখন যুধাজিতের রাত্রির শয্যা।

চিরকালের বাড়িটা ছেড়ে চলে আসতে হয়েছে, তার বহুবিধ আসবাবপত্রকে নয়ছয় করে বাড়ি খালি করে দিতে হয়েছে, তবু যতটা সম্ভব এর মধ্যেই এনে ভরাতে হয়েছে। পাশের ঘরটাতেও তো বনছায়ার চিরকালের জোড়া খাটটা পাতা। যাতে ঘরটার প্রায় সবটাই ভর্তি।

বসে পড়ে বলে উঠল যুধাজিৎ, যা বলেছিলাম, তা কাঁটায় কাঁটায় সত্য মা।

তাহলে?

তাহলে? যুধাজিৎ বলল, বলতে পারো একটা অ্যাডভেঞ্চার করে এলাম।... কী? অবাক হচ্ছো? কই হাঁ করছো না তো? একটু হাঁ করবে তো?... কী হয়েছিল জানো?... হল থেকে বেরিয়ে দেখি আমার এক কলেজীকালের বন্ধু—ও, শিলাদিত্যকে তো তুমি জানো? কত সময় কলেজফেরৎ এসে তোমার কাছে খাবার খেয়ে গেছে।... তো তার সঙ্গে দেখা। শুধু সে নয় সঙ্গে আবার তার এক ছিচকাঁদুনি বোন।... রাত হয়ে গেছে দেখে প্রায় কাঁদো কাঁদো, ছোড়দা বাড়ি গিয়ে কী হবে?... তো

এবারের গাড়িটাও টেস্ট করতে নিয়ে বেরিয়েছিলাম জানো তো ?... খুব রাজাই চালে বললাম, 'চল তোদের পৌঁছে দিয়ে আসি।'...

হেসে উঠে বলে, তো তার বাড়ি হচ্ছে সেই শ্যামবাজারের মোড়ের কাছে।... কাজেই—

মা বললেন, তারপর ? এখন খাওয়াদাওয়া হবে তো ? না কী বন্ধুর বাড়িতে দারুণ খেয়ে আসা হয়েছে ?

মাই গড। আমি তাদের বাড়ির মধ্যে ঢুকেছি না কী ?... বন্ধ দরজার সামনে দুটি ভীতকাতর ভ্রাতা ভগিনীকে দাঁড় করিয়ে রেখে সঙ্গে সঙ্গে গাড়িতে স্টার্ট মারা।

ওমা। চল চল। বিকেলেও কিছু খেলি না—। এখন তো আবার চান করতে বসবি। চটপট সেরে নে বাবা।...

ছোট্ট ঘর দু'খানাই শুধু জিনিসপত্রে বোঝাই নয়, রান্নাঘরেও জায়গার বালাই নেই, ছোট একটা খাবার টেবিল আর একটা চেয়ারেই।

বনছায়া ছেলের খাবারটা সাজাতে বসেন সেই টেবিলে। খাওয়াদাওয়ায় বরাবরই একটু 'বাবু' তাঁর এই ছোটছেলে।... সেই মতই ব্যবস্থা রাখেন বনছায়া। বহিরঙ্গে অবশ্যই দারিদ্র্যের চেহারা যথেষ্ট পরিস্ফুট, তবে ভিতরটা তত নয়।

যুধাজিতের বাবা বলতেন, "মানুষের 'অবশ্য প্রয়োজনের' মধ্যে তিনটি হচ্ছে—'খাওয়া', 'পরা' এবং 'থাকা' তাই না ? তা কোনটিকে তুমি সবথেকে প্রাধান্য দেবে বলো তো ?"

ছেলেমানুষ যুধাজিৎ বলতো, 'তা কী জানি ? বোধহয় খাওয়াই। না খেলে মানুষ বাঁচে না।'

'তা ঠিক। তবে আমার মতে বাকি দুটো খারাপ হলে, সে বাঁচার কোনো মানেই হয় না।'

অতএব ?

অতএব তার মধ্যে প্রথম প্রাধান্য দেওয়া উচিত 'পরা'কে। কারণ তোমার সম্পর্কে যা কিছু ধারণা বা জানা, সেই বাবদ তুমি শুধু ওইটুকুই নিয়ে লোকসমাজে প্রকাশিত হচ্ছো। তাই কি না ? সবাই তোমার বাড়িতে চলে এসে দেখবে না তোমার 'খাওয়া' 'থাকার' ব্যবস্থা। 'পরার' পর প্রধান হচ্ছে থাকা। সম্ভবমত ভাল জায়গায় ভালভাবে থাকাটাই জরুরি।... লোকে সেটাই দেখবে।... তোমার রান্নাঘরে কী রান্না হচ্ছে দেখতে আসবে না।'

বনছায়া বলেছেন, ছেলেকে তো বেশ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে! লোক দেখানোটাই বুঝি সব ?

রণজিৎ বলেছেন, সব কিছুতে অবশ্যই নয়, তবে—নিতান্ত 'ব্যক্তিগত' এই তিনটিতে লোক দেখানোর দরকার আছে ছায়া। সামাজিক মানুষজীবনে এই জিনিসটা তো সব থেকে বড় দরকার, অন্যের চোখে শ্রদ্ধা সমীহর পাত্র হওয়া। তাই না ? তো কেউ যদি লোকসমাজে একটা ছেঁড়া ময়লা সাজে সেজে যায়, কেউ তাকে সমীহ করবে ? সমাজছাড়া সাধুসন্নিসী হয় আলাদা কথা।... আবার দেখো— কেউ যদি এসে দেখে তুমি নেহাৎ দীনহীনভাবে থাকো, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সম্মানের পারা অনেক ডিগ্রী কমে গেল। উল্টোটা হলে, ফলটা উল্টোই।

বনছায়া হাসতেন। বলতেন, তোমার যুক্তি অকাট্য।

কে জানতো পাকেচক্রে সেই বনছায়াকে আর তার ছেলেকে এমন দীনহীনভাবে থাকতে হবে! যুধাজিৎ অবশ্য রোজ একগাল উপদেশ বর্ষণ করে, আর কিছুটা দিন মা। তারপর দেখো—ধরে নাও তোমার এখন রাক্ষসের হাতে বন্দিনী রাজকন্যার মতো দশা।

ওমা। রাক্ষসটা আবার কে ?

কেন ? এই আমি।... আমি বাদ না সাধলে, ছোটখাটো নতুন আর সুন্দর একটা বাড়ি তো তোমার হতো!

বনছায়া বলেন, নাঃ। এখন তোর স্টাইলেই ভেবে দেখছি—ছোট্টয় তেমন সুখ নেই। কোনোমতে একটা মাথা গোঁজার আশ্রয় বানিয়ে ফেললে সেই মাথা গোঁজাটাই থেকে যাবে। মাথা তোলা আর হবে না।

মা। মনে হচ্ছে এই ভাবধারার কপিরাইটটা আমার।

বনছায়া হেসে ফেলে বলেন, তা হতে পারে। অজ্ঞাতসারে আত্মসাৎ করে বসে আছি।

ভিজে ভিজে পিঠটার ওপর একখানা বড়সড় শুকনো তোয়ালে চাপা দিয়ে খেতে বসে যুধাজিৎ বলে, আচ্ছা মা, এতোরকম করার কী দরকার বলো তো ' শুধু শুধু খাটুনি?

বনছায়া বলেন, এতো আবার কী? আর খাটুনিই বা কী? একটা ছেলের রান্না! এই তো কাজ।

একটা ছেলের যে একশোটার তুল্য ঝক্কিই বাবা। না না, কাল থেকে খুব সামান্য কিছু রাঁধবে।

তোর হুকুমে না কী? তোর হুকুম মানতে আমার দায় পড়েছে।

আমার আচরণটা কিন্তু বাবার মতবাদের বিরোধী হয়ে যাচ্ছে মা। বাবা কী বলতেন মনে আছে তো?

বনছায়া একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলেন, শেষজীবনে কোন কাজটাই বা তাঁর মনের মতো হয়েছিল জিতু?... মনের কষ্টেই মানুষটা—

হঠাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে সহজ গলায় বলেন, তোর দাদার একটা চিঠি এসেছে।

তাই না কী ' বিরাট ব্যাপার।

তা ব্যাপারটা বিরাট হলেও—চিঠিটা বিরাট নয়। পোস্টকার্ডে দু'লাইন। ছেলের স্কুলের ছুটি হয়েছে, কলকাতায় যেতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু গিয়ে কোথায় উঠবে ভেবে—

যুধাজিৎ বলল, কেন? প্রধান জায়গাটির কী হলো? সেটা তো কেউ কেড়ে নেয়নি।

বনছায়া একটু মলিন হাসি হেসে বলেন, কে যে কখন কার কী কাড়ে রে '... এর আগে সেই যে একটা খামে চিঠি দিয়েছিল? তাতে লিখেছিল, 'শাশুড়ী মারা যাওয়ায় শ্বশুর হঠাৎ যেন চোখের চামড়াহীন হয়ে গেছেন।... আমরা 'যাবো' বলা সত্ত্বেও লিখে পাঠিয়েছেন, রাঁধুনী দেশে গেছে, বৌমার শরীর ভাল নয়, এ সময় তোমাদের বোধহয় না আসাই ভালো। এসে কষ্ট, একটুও সুখ পাবে না।'... ভাবতে পারিস, 'না আসাই ভালো' বাপ হয়ে মেয়েকে বলছে।... খুব শ্বশুরের ওপর চটে গিয়েই তোর দাদা হঠাৎ মাকে অতবড় একখানা চিঠি লিখে ফেলেছিল '... তো যাক—সেই মেয়েটা কত বড় রে?

মেয়েটা।

যুধাজিৎ আকাশ থেকে পড়ে। কোন মেয়েটা?

আহা ওই যে শিলাদিত্যের বোন না কে?

সর্বনাশ। মেয়েদের গায়ে কী বয়েস লেখা থাকে মা?... কুড়ি থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রায় সব মেয়েই তো একই রকমের।

কুড়ি থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ? যা হয় বললেই হলো।

কী জানি বাবা। আমার তো তাই মনে হয়। কত সময় রাস্তায় দুটো মেয়েকে দেখে ভাবি দুটো পিঠোপিঠি বোন। হঠাৎ শুনতে পাই একজন আর একজনকে 'মা' বলে ডাকছে।

বনছায়া জোরে হেসে ওঠেন।

॥ তিন ॥

টুক টুক টুক।

জানলার কপাটে তিনটি বিশেষ ভঙ্গির টোকা পড়ে। পরিচিতই অবশ্য। বলতে গেলে সাঙ্কেতিকও বলা যায়, এ ব্যবস্থা নীহারিকার। তিনিই ছেলেকে বলে রেখেছেন, কী তোর রাজকার্য ভগবান জানেন। তবে যদি কোনোদিন ফিরতে বেশি রাত হবার চান্স থাকে সেদিন বলে রাখিস। আমি এনাদের বলে রাখবো, 'আজ ও মিটিং করতে কলকাতার বাইরে যেতে পারে। হয়তো রাতে ফিরতে পারবে না।'... নাহলে বাড়িসুদ্ধ সবাই রাত দুপুর অবধি না খেয়ে জেগে বসে থাকবে আর হাজার কথা কইবে। জানিস তো তোর বাপকে। আবার 'চাঁদের ওপর চূড়ো' মা-বাপ! তাঁরাও তো কম জ্বালাল না। মিনিটে মিনিটে খোঁজ নেওয়া চলবে। 'অ বৌমা 'বাপু' আলো? অ বৌমা 'বাপু' বলে গেছে? এতো রাত অবধি কী করছে?' অসহ্য লাগে বাবা। এগারোটা সাড়ে এগারোটা পার হয়ে গেলে আর কড়া নাড়া দিবি না। চুপিচুপি জানলা থেকে তারককে ডেকে দোর খুলিয়ে নিবি।... রাতটা নিচের তলায় বসবার ঘরেই শুয়ে পড়বি। লম্বা সোফাটা আছে। তাছাড়া একখানা ক্যাম্পখাটও তো রয়েছে? তারককে বলবি, খুলে পেতে দিতে। তারকের কাছেই তোর খাবারটা টিফিন কৌটোয় করে দিয়ে রাখবো, খাবার জলও থাকবে। তোকে নিয়ে যে আমার কী জ্বালা তা কী বুঝবি?

বাপ্পাদিত্য বলেছে, তোমায় তো বলি বাবা, আমায় ছেড়ে দাও, আমি পার্টি অফিসেই পড়ে থাকি। হোলটাইমার ক্যাডারদের সে সুবিধে আছে।

নীহারিকা এমন কথায় কেঁদে ফেলে। বলে, বলতে তোর মুখে আটকালো না বাপু? তোকে ছেড়ে দেব?

কী আছে? তোমাদের তো আর একটি সোনার চাঁদ ছেলে রয়েছে বাবা? আহ্লাদীপুতুল মেয়েও রয়েছে একখানা। আমার মতো একটা উড়নচণ্ডে হতভাগা থাকলো, আর না থাকলো।

বলিসনি বাবা অমন কথা।

তোমাদের এই স্যাঁতসেঁতে মাতৃস্নেহই দেশটাকে জখম করে রেখেছে।

মা মরে গেলে বুঝবি, এই স্যাঁতসেঁতে মাতৃস্নেহটা কী।

চমৎকার। হঠাৎ মরতেই বা যাবে কেন? কত বয়স হলো?

মরার আবার হঠাৎ কী? মরার কী বয়েস আছে?

সে তো আমিও যে কোনো মুহূর্তে মরতে পারি। বরং আমারই চান্স বেশী।

ষাট! ষাট! এমন যা-তা কথা মুখে আনিস। দ্যাখ, তোর এই পার্টির কাজ করার ইচ্ছেয় আমি তোর বাবার সঙ্গে কী কম লড়ালড়ি করেছি। সমানেই করে চলেছি। উনি তো কিছুতেই মেনে নিতে চান না।

আশ্চর্য! কী যে সব বুঝি না। প্রত্যেকটা মানুষ একই ছাঁচে ঢালাই হবে? ভালো ছেলে হয়ে লেখাপড়া শিখবে, চাকরিবাকরি করবে। বিয়ে করবে ঘরে সংসার আর বংশবৃদ্ধি করবে। তারপর একদিন অক্কা পাবে। আর কোনো ছাঁচের কথা ভাবতেও পারা যায় না?

আমি তো বাপু তোকে বিয়ে করতেও বলি না, সংসার করতেও বলিনি। শুধু বলি বাড়িতে থাকবি। সারাদিন যতই টো টো করে বেড়াস, বাড়িতে দুবেলা দুটো খাবি, আর রাতটায় ঘরের বিছানায় শুবি। এই তো।

তোমার মনে হচ্ছে 'এই তো'। ওইটিই দারুণ আটক, বুঝলে? কখন কোথায় গিয়ে পড়তে

হয়। সর্বদা মাথায় রাখতে হয়, 'বাড়ি গিয়ে খেতে হবে, মা বসে আছে'।

তা মার জন্যে এটুকু কষ্ট করবি। কী আর করা!

মনে মনে ভাবে নীহারিকা, আমার হয়েছে ভালো। লোকেদের মোদো মাতাল স্বভাব চরিত্র খারাপ ছেলে রাত করে বাড়ি ফিরলে মায়ের যে জ্বালা, আমারও দেখি তার থেকে কম কিছু না। কত মিছে কথার চাষ করতে হয়।... আরো জ্বালা ওই 'ওনাদের' জন্যে। 'ছেলে কোন দলে মিশছে, তাদের কী রীতিনীতি, বিপদের ঝুঁকি আছে কিনা' এই সবকিছু খোঁজ নেওয়া চাই। কেনরে বাবা, তোমাদের এতো কী মাথা ব্যথা? উনি আবার 'উকিলবাবু' হওয়ার ফলে অনেক কিছুর নাড়ি নক্ষত্র জানেন তো!... উঃ আমার জীবনটা যে কী মহানিশা। যে মানুষটার হাতে পড়েছি, সে তো কোনোদিনই আমার জ্বালা বুঝল না।

হায় নীহারিকা! এ সংসারে কে কার জ্বালা বোঝে? সকলেই ভাবে একমাত্র তারই যত 'জ্বালা'।

এই যে তারক, সেও এখন ওই জানলায় টোকা পড়াতেই নিয়মমাফিক একটা ফলস কাশি কেসে জানান দিল 'জেগেছি, শুনতে পেয়েছি'। তবু কী আর একবারও না ভেবে পারল, এই এক জ্বালা হয়েছে আমার। ঘুমিয়ে স্বস্তি নাই।

তবে বড়দা সম্পর্কে ওর বেশি বিরুদ্ধে কিছু ভাবতে পারে না তারক। বড়দা সম্পর্কে তার আলাদা একটা ভালবাসা আছে। বড়দা তার কাছে 'ফ্যান'-এর কাছে হিরোর মতো। একদা তো 'ভক্ত হনুমানের' ভূমিকাতেই থাকতো।

সেই 'একদা' যখন তারকের পাঁচ বাড়ি বাসন মেজে বেড়ানো মা এই পীলে পেটা হাড্ডিসার দাঁত বার করা ছেলেটাকে এ বাড়িতে এনে বাড়ির গিন্নীর কাছে ধরে দিয়ে বলেছিল, এটারে আপনি আপনার ঘরে একটু ঠাঁই দ্যাও মাসিমা। আমি ঘরে থাকি না, বস্তির যত ধাড়িধাড়ি বজ্জাত ছেলের সঙ্গে মিশে পথে বেরিয়ে হুড়ুদ্দুম খেলা খেলতে যায়। আজ আরটু হলে গাড়িচাপা পড়ে প্রাণটা যাচ্ছিল। তোমার বাড়িতে কাজে ভর্তি করে ন্যাও আমি নিশ্চিন্দি থাকবো। দিনভোর থাকবে, রাতে এসে ঘরে নে যাব। আবার ভোরবেলা বাসন ধুতে আসবার সময় সাথে নে আসব। পাঁচটা টাকা মাইনে দিলেই হবে।

তখন সেই তারকের মার সেই 'মাসিমা' অর্থাৎ বাড়ির 'গিন্নী' ছিলেন অবশ্য নয়নতারা। তিনিই তখন চৌকস হয়ে সংসার করছেন। রান্নাঘরে রাঁধুনী ঢোকেনি তখনো। বাসনমাজনী ঘরমুছুনিদের কাছে নীহারিকা তখন বৌদিদি।

নয়নতারা অবাক হয়ে বলেছিলেন, এ কী কাজ করবে রে?

তা এখন হাতনুড়কুৎ ফাইফরমাসটা তো খাটতে পারবে। ক্রমশ আরো শিখবে। কীরে তারক পারবি নে?

তারক বত্রিশ পাটি দাঁত মেলে দিয়ে ঘাড় কাৎ করেছিল।... তখন তারক হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল, প্রায় তারই বয়সী বড়দাবাবুকে। ...অবশ্য সে ভাবেনি, তারই বয়সী। আকৃতিতে অনেকটাই বড়। আর পরে দেখেছে প্রকৃতিতে যে কত বড় তার ঠিকই নেই। তবে তখন সে দেখছিল, কী ফরসা রে বাবা। যেন সায়েবদের ছানা।...কই ছোড়দাটা তো অত না।

আসলে বাপ্পাদিত্য তার আকৃতিটি পেয়েছিল অবিকল দাদুর মতো। মুখ, চোখ, গড়ন, রঙ।

'ওঁরা যে কেন আমার ছেলের ব্যাপারে নাক গলাতে আসেন!' বলে বিরক্তি প্রকাশ করলেও 'প্রকৃতির' রহস্যপ্রিয়তায় নীহারিকার গর্ভজাত পুত্র, ওই পাবনার সত্যব্রত উকিলের মতো রূপ নিয়ে উদিত হয়ে বসে থাকে।

তারক অবশ্য তখনো সেই সত্যব্রত উকিলকে দেখেনি। তিনি তো তখন পুরোদমে কোর্ট কাছারি করছেন। পরে দেখে বলেছিল, আপনিও তোমার ঠাকুদ্দার মতন উকিল হবে, তাই না বড়দা?

বড়দা বলেছিল, দূর! উকিল হতে আমার বয়ে গেছে, আমি এরোপ্লেনের ড্রাইভার হবো। বোঁ করে আকাশে উঠে গিয়ে বাঁই বাঁই পাক খাবো। আর দেখব সব্বাই নিচেয়।

হিরো তখন বছর আষ্টেকের, ফ্যান বছর সাত। তা তখন থেকেই বড়দা তারকের ত্রাণকর্তা।

বাপ্পা এসে হাঁক পাড়ে, ঠাক্‌মা তারককে এবার ছাড়ো তো। আমার নাটাইয়ে সুতো জড়িয়ে দেবে।....ঠাক্‌মা তারককে ছাতে নিয়ে যাচ্ছি, আমার ঘুড়ির ধরতাই দেবে। খবরদার ডাকাডাকি করবে না। ...ঠাক্‌মা ওই রোগা পটকা তারককে এতো খাটাও কেন বল তো? লজ্জা করে না? মায়া হয় না?

ঠাক্‌মা গালে হাত দিয়ে বলেন, শোনো কথা। তর তারককে কত খাটাচ্ছি? অ্যাঁ!

আহা! ছাত থেকে গাদা গাদা শুকনো কাপড়জামা তুলে নিয়ে আসে না? বাড়ির যত বিছানা ঝাড়ে না? জুতো বুরুশ করে না? ওর বুঝি কষ্ট হয় না?

ত অরে কী আমি অর ঘর থে টেনে আনে মজুর খাটুনি খাটাচ্ছি? অর মা কাজকাম করবে বলে লাগিয়ে গেছে না?

ওর মা তোমারই মতন! ইস আমার থেকে ছোট একটা ছেলে--আমাকে যদি অন্য লোকের বাড়ি গিয়ে কাজ করতে হতো?

ঠাকমা বলতেন, হরি! হরি। অ বৌমা! কী কথা কয় গো তোমার ছাওয়াল? ....তো বাপুরে তুই তো দেখিস নাই। আমাগোর পাবনায় ওইটু ছেলেই বাগাল ছিলো।

বাগাল? বাগাল মানে?

বাগাল। মানে গোরু চরানোর কাম। ...ওইটু অ্যাকটা পটকা ছেলেই দশ-বারোটা গোরুকে গোয়ালঘর থে বার করে নে মাঠ চরাতে যেতো ...তো--

হেসে উঠতেন নয়নতারা। কোঁচড়ে যা জলপান নে যেতো তা একটা জোয়ান মানুষে খেয়ে উঠতে পারবে না।

তোমার খালি সব কথায়—আমাদের পাবনায়! আমাদের পাবনায়। পাবনা যদি এতো ভালো, তো চলে এসেছিলে ক্যানো? অ্যাঁ। নাতির তীব্র প্রশ্ন।

ঠাকুমার দীর্ণ উত্তর, চলে এসেছি কী আর সাধে রে দাদা? ঘাড় ধাক্কিয়ে বিদেয় করে দেছে!

উঃ। অমনি তোমার কান্না পেয়ে গেল। 'পাবনা'র কথা হলেই কান্না। তো এখানে তো অর গরু নেই, আর তারকও রাখাল না বাগাল কী যেন নয় তো, ওকে এখন ছাড়ো তো! ও আমায় গুলতি বানিয়ে দেবে।

তো দিক্‌গে না। আমি কী তর তারকরে ধরে রেখেছি? ...তারক তর একবারে 'প্রাণ'।

হাসতেন নয়নতারা।

কিন্তু নীহারিকা ছেলের এই তারক-প্রীতিটি দু'চক্ষের বিষ দেখতো। 'বাবু'দের ছেলে আবার বাসনমাজুনির ছেলের সঙ্গে এতো খেলবে কী?

কিন্তু ছেলেকে যদি বলে, খেলতে ইচ্ছে হয়, নিজের ভাইয়ের সঙ্গে খ্যাল না বাবা।

যদিও 'নিজের ভাইটি' তখন মাত্র পাঁচ বছরের!

বাপ্পা অবজ্ঞা ভরে উত্তর দেয়, আহা। 'নিজের ভাই'। ওই শিলুটা আবার খেলার কী জানে? আর ও আমার কোনো কথা শোনে?

'শোনে না' বললে অবশ্য শিলাদিত্যর প্রতি অন্যায় দোষারোপ হবে। আসলে সে দাদার

প্রোগ্রামসমূহ বোঝেই না। ...তাছাড়া তারকের তুল্য বশংবদ আর কে হবে ? যে খেলা ভাল লাগছে না, সে খেলায় আটকে থাকবে, নিজের ভাই বলে ? হ্যাৎ। অতএব তারক!

তা তার সঙ্গে আবার ঠাক্‌মার মদত। ছানাপোনার কী আর জাত গোত্তর গেয়ান থাকে বৌমা ? ছেলের বন্ধু ছেলে ?...

তবে আর কী। নীহারিকার ছেলে তারকের গলা ধরে বন্ধুত্ব করে বেড়াক। ....তারকেরও সাহসের কমতি নেই। 'বড়দা বড়দা' করে কী গায়ে পড়া ভাব। কমতি থাকবেই বা কেন ? বাবুর ছেলেরা যা খাবে, বাসনমাজুনির ছেলেও তাই খাবে। ...এ নাকি গিন্নীর 'পাবনাই' প্যাটার্ন। মুড়িমিছরির এক দর! আমার ছেলেরা জলখাবারে পরোটা, আলুচচ্চড়ি রসগোল্লা খাচ্ছে, তারকও তাই খাচ্ছে। ...অসহ্য। শুধু খরচ বলেই নয়, এতে যেন প্রেস্টিজেরও হানি।

অন্তত নীহারিকার তাই মত। ঘরে এসে ঝাল ঝাড়ে নীহারিকা। আমার মা বলেন, 'অপচয়ে কুবেরের ভাণ্ডারও শূন্য হয়ে যায়।'

কিন্তু তখনো খরচের টাকা আসে উকিল কর্তার পকেট থেকে। তাই সেই অপচয় নিবারণের প্রকল্পটি তৈরি হয়ে ওঠেনি। ...পরে হলো। যখন উকিলের পকেট শূন্য হয়ে গেল। অপচয় নিবারণের অনেক পথ আবিষ্কার হলো। আশ্চর্য! তবু তারক নামের সেই ছেলেটা এই বাড়িতেই রয়ে গেছে। এখন আবার নীহারিকার হা তারক! জো তারক! কারণ বোঝে সে, তারক ব্যতীত তার সংসার অচল হয়ে উঠবে। তারক যে কোন ফাঁকে ঠাকমার রান্নাঘরের দরজায় বসে থেকে থেকে রান্নাটা এতখানি শিখে ফেলেছিল, তা কে জানতো! এখন তারকই সেখানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার। নীহারিকা তাকে তোয়াজ করে চলে।

'কাজল' হচ্ছে খিদমদগারিনী।

তথাপি নীহারিকার মনে হয়, নিজে সে খেটে খেটে সারা হয়ে গেল। আসলে সর্বদাই যে মনে হয় সংসারটা তার অহেতুক ভারী। 'অহেতুক ভার' বড় বেশি ভার। তার উপর আবার বড় ছেলেকে নিয়ে সমস্যা।

কিন্তু ছেলেমেয়ে দুই বড় হয়ে উঠলে ক্রমেই যে সমস্যা হয়ে ওঠে, সে জ্ঞানটা নীহারিকার এখনো আসেনি। নীহারিকা তাই এখন বড়ছেলের ব্যাপারে আপাত সমস্যার সমাধান করে তারকের সাহায্যে। তার সঙ্গে গোপন সমঝোতায়। ভাবে অন্য দুটোকে নিয়ে তো কোনো ভাবনা নেই। ওই বাপ্পাটাই!

দরজাটা খুলে দিয়ে তারক নিঃশব্দে পাশ হয়ে সরে দাঁড়াল। বাপ্পা ও ঢুকে এলো নিঃশব্দে। তারপর ভিতরে ঢুকে এল। নিচের তলাটা সবই তারকের দখলে।

সিঁড়ির দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর আর কেউ নিচে নামে না। অতএব তারক বড়দার জন্যে ক্যাম্প খাট পেতে শয্যা রচনা করেই রেখেছে—বসবার ঘরের একাংশেই।

তারকের রাজশয্যা পূর্বেকার রান্নাঘরে। যেখানে দেয়ালের একধারে ইঁট সিমেন্টে গাঁথা একজোড়া উনুন পাতা আছে। কয়লার উনুন।

নয়নতারার আমলে এই নিচের তলাতেই ছিল রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, খাবার ঘর। নীহারিকা সব ব্যবস্থাই দোতলায় উঠিয়ে নিয়ে গিয়েছে। অত কে খাটে ? তাছাড়া রান্না তো গ্যাসের উনুনে, ঝুলকালি হবার ভয় নেই।

বসবার ঘরেরই একটা ছোট টেবিলে তারক বড়দার 'খাবার' সম্বলিত টিফিন কৌটোটাও রেখেছে।

বাপ্পা একটু হেসে ইশারায় প্রশ্ন করলো, সবাই ঘুমিয়েছে ?

তারকও ইশারায় জানালো, ঘুমিয়েছে কিনা জানিনা তবে শুয়েছে। বাপ্পা নিচের তলারই স্নানের

ঘরে ঢুকে গেল।

তারকের ব্যবস্থাপনায় শুকনো তোয়ালে ফ্রেশ জামা-পায়জামারও অভাব হলো না তার বড়দার।

বাপ্পা হেসে সেগুলো নিয়ে বললো, তুই যদি কারো বৌ হতিস তারক, তাহলে খুব ভালো বৌ হতিস।

তারক কৃতার্থমন্যের মতো একটু হাসে। দাঁত উঁচু তারকের এই হাসিটা সেই ছেলেবেলার মতো দেখতে লাগে। একদা যখন সেই ঘুড়িতে ভালো ধরতাই দিয়ে প্রশংসা পেয়ে কৃতার্থ হাসি হাসতো, এখনো প্রায় সেইরকমই। অথচ বাড়ির আর সকলের মতে তারকের হাবভাব চালচলন যেন 'রাজ্যপালের পুষ্যিপুত্তুরের' মতো। তারক একখানি নবাব খাঞ্জা খাঁ।

বড়দার সামনে অন্য তারক। খেয়ে এসেছেন নাকি?

খেয়ে? আরে, যেখানে গিয়ে পড়েছিলাম সেখানে 'খাওয়ার' কথাই ওঠে না। ...আছে নাকি কিছু?

থাকবে না? আসুন।

হৃষ্টচিত্তে খাবারটা গুছিয়ে প্লেটে সাজিয়ে দেয় তারক।

বাপ্পাও প্লেটটা টেনে নিয়ে দেখে শুনে একটু হৃষ্টচিত্তেই বলে, রাত্তির একটার সময় পরোটা, চিংড়ি ফুলকপির ডালনা, বেগুন ভাজা, আলুর দম! ম্যাজিক ম্যাজিক লাগছে রে!

তারপরই একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, একসঙ্গে আর যারা যারা গিয়েছিলাম, তাদের ভাগ্যে কী জুটলো কে জানে।

সে নিয়ে মাথা ঘামিও না। যার ভাগ্যে যা লেখা থাকে তাই জোটে। ...তো কোথায় গেছলেন গো বড়দা?

সে কাছাকাছি একটা গ্রামে। জগৎবল্লভপুরে।

কী হলো সেখানে? মিটিং?

তা তো হলোই। তাছাড়াও কিছু। যা হয়েছে সেটা আপাতত প্রকাশিতব্য নয়।

বাপ্পার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করার সাহস তার মা-বাপের হয় না। ভাইয়ের তো বাদই দাও। বোন টুসকি অবশ্য কখনো কখনো সে দুঃসাহস করে। দাদার মেজাজ ভালো থাকলে কিছু কিছু উত্তর পায়, মেজাজ ভালো না থাকলে শীতলতার কাঠিন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। কিন্তু তারকের?

তার হচ্ছে অবোধের দুঃসাহস। তাই তারক বলে, আচ্ছা বড়দা এই যে আপনি রাত নাই, দিন নাই প্রাণপাত খাটছো, তাতে কাদের কী ভালো হচ্ছে?

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল, তবু বাপ্পা বসে থেকেই একটু সোজা হয়ে বলে, এ কথা তো রোজ একবার করে জিগ্যেস করিস।

রোজ আপনারে পাচ্ছি বুঝি? তা সত্ত্বেও বলি, জিগ্যেসই করি, সদুত্তর তেমন পাই কই? আপনাদের এতটা খাটুনির বিনিময়ে কার কী লাভ হচ্ছে, সেটাই তো ধন্ধ রয়ে যায়।

বললে তুই বুঝতে পারবি?

তো বড়দা, আপনাদের কাজ তো রাজ্যির যতো নিরোক্ষার মুখ্যু গরীবদের নিয়েই। তাদেরকে বোঝাতে হলে, সেই মতোই বলতে হয়। হয় না? ...এদিকে কতজনা কত রকম বলে—শুনে—

চট করে চেহারা বদলে যায়।

বাপ্পা শক্ত হয়ে বসে। শক্ত গলায় বলে, কে কী বলে? কী শুনিস?

আহা বাড়ির লোক কী আর বলে? শুনি যত সব হাটে বাজারে পথে ঘাটে। দেশসুদ্ধু লোকই

তো এখন 'পলিটিক্স' হয়ে গেছে। তাই নিয়েই কথা বলে। ফড়ে থেকে রিকশাওলারা পর্যন্ত খেটে খাওয়া জনেরাই বেশি বলে। শুনে শুনে—

বাপ্পা এখন একটু শিথিল ভঙ্গিতে বলে, বলেটা কী?

ওই তো বলে, গরীবের আর ছাই হচ্ছে। গরীব চেরকাল যে অন্ধোকারে, সেই অন্ধোকারেই। ভালোটালো যা হচ্ছে, তা নেতাদের। আর—

তারক একটু ঢোঁক গেলে।

ও। আর কী বলে?

শুনলে আপনি রেগে যাবে হয়তো।

আরে বাবা, আমি তো আর নেতা নই? আমিও ে' খেটে খাওয়া জনেদের একজন।

ইয়ে বলে, একদা আগে নেতারা সব গরীবী চালে থাকতো, কৌটো বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা তুলে পার্টি ফাণ্ডে জমা দিয়ে কোনোমতে দিন চালাতো। তখন বাবুয়ানা বিলাসিতাকে পাপ বলতো। বলতো— আমরা গরীব, গরীবের জন্যে লড়তে নেবেছি। তা এখন তো সব উল্টোপাল্টা কাণ্ড হয়ে চলেছে। নেতাদের হালচাল আকাশপাতাল বদলে গেছে।

বাপ্পা স্থির গলায় বলে, এসব তোদের ওই হাটেবাজারের লোকেরা বলে?

বলেই তো বড়দা। বেশির ভাগ জনাই বলে। বলে, এখন যতসব পেটমোটা বিজিনেসম্যানরা পার্টি ফাণ্ডে এনতার মোটা মোটা চাঁদা দিয়ে নেতাদেরকে কিনে নিয়েছে। নেতারা এখন পয়সার মুখ দেখে ইষ্টমন্তর ভুলে গিয়ে নবাব বাদশার চালে চলছে।

বলতে বলতে তারক উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, মিথ্যেও তো বলে না বড়দা। বলে, অগ্রে রাইটার্সে যারা রাজত্ব করতো তেনাদের আড়ম্বর বাবুয়ানার ব্যবস্থা দেখে নতুন কর্তারা কতো টিটকিরি দিয়েছে।...আর এখন সেই তারা নিজেরাই হাজার হাজার লাখ লাখ টাকা শুধু বাহারের জন্যে ঢালছে। আথাচো বস্তির লোকেদের যে নরককুণ্ডু সেই নরককুণ্ডু। আর নেতাদের বিরাট বিরাট অট্টালিকা হচ্ছে। দু'পাঁচখানা গাড়ি হচ্ছে। তাদের আত্মজনেরা পর্যন্ত আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে—

বড়দা গম্ভীরভাবে বলে, ওরা সব শোনা কথা বলে বুঝলি? খবরের কাগজে বানিয়ে বানিয়ে যত সব মিছে কথা বলে, তাই শুনে শুনে—

তারকও হঠাৎ বেশ শক্ত হয়ে বলে, এটা আপনি কী বলছো বড়দা? আপনার মতন জ্ঞানীগুণীর মুখে এ কথা কী সাজে? লোকের শুধু কানই আছে? চোখ নাই।

ও। আমায় খুব জ্ঞানীগুণী ঠাওরেছিস বুঝি?

আমার কাছে তাই।

তারক ঈষৎ গাঢ় স্বরে বলে, লোকে চোখে দেখে না? ...নেতারা এখন সব ঠাণ্ডিগাড়ির মধ্যে বসে ভেঁপু বাজিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে ভিন্ন চলে না। ...সবাই এক একখানি ক্ষুদে নবাব। ...এই যে বন্যেয় দেশ ভেসে যায়। —অনেকদিন আগেকার নেতারা নাকি নিজের শালতি চেপে-ডোঙা চেপে-নৌকো চেপে তাদের দুঃখদুর্দশা দেখতে গেছে, কাছে বসে শুনেছে তাদের কথা। আর এখন? এখন নেতারা 'হেলিকেপ্টারে' চেপে আকাশ থেকে পরিদর্শন করছেন। এসব তো আর বানানো কথা না? সবাই তো চোখেই দেখছে।

বড়দা আরো গম্ভীর হয়ে গিয়ে উঠে পড়ে বলে, তখন পরিস্থিতি অন্য ছিল। ওসব শালতি ডোঙা সম্ভব ছিল। এখন পরিস্থিতি অনেক বদলে গেছে।

তারক একটা হাই তুলে বলে, তো সেই কথাই বলাবলি করে সবাই। নেতাদের অবস্থা আকাশ পাতাল বদল হয়ে গেছে। গরীবের যা ছিল তাই আছে।..... ওই নিয়ে তো একদিন নতুন বাজারে

বেদম মারপিট হয়ে গেল। এক দল বলছে, নেতাদের এতো টাকা আসে কোথা থেকে? সবাই দুর্নীতি করছে। আর এক দল তাই শুনে এই মার সেই মার। তারপর একখানা রক্তারক্তি কাণ্ড। ...আর পুলিশের যা স্বভাব, সব মিটে গেলে, দুটো ফালতু লোককে 'হ্যাট হ্যাট' করে তুলে নিয়ে চলে গেল। তো আচ্ছা বড়দা—

বড়দা গম্ভীরতর হয়ে বলে, এবার থাম তারক। বেদম ঘুম পাচ্ছে।

তারক ত্রস্তচিত্তে সরে আসে।

বাপ্পাদিত্য নামের ছেলেটা ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে তার ক্যাম্প খাটের বিছানায়। ঘুম পাচ্ছে বললেও অনেকক্ষণ ঘুম আসে না। মনে মনে প্রাণপণে মন্ত্র জপার মতো বলতে থাকে, আমাদের প্রথম শর্তই হচ্ছে প্রশ্নহীন আনুগত্য। প্রশ্নহীন আনুগত্য।...

কিন্তু আশেপাশে সামনের দেওয়ালে যদি তীক্ষ্ম তীব্র সব প্রশ্নরা দাঁত খিঁচিয়ে তাকিয়ে থাকে?... কী করে তাদের সেই দাঁতদের ভেঙে উড়িয়ে দেওয়া যাবে? ...এদিকে—আরো তীব্র প্রশ্ন উঠবে না, কেন? কেন? কেন? কেন এই আদর্শচ্যুতি? ...কেন আমাদের মতো নিঃশঙ্কচিত্ত ছেলের দল দলে দলে যে আলোকরশ্মির আকর্ষণে ছুটে এসেছিল, তাদের চোখের সামনে থেকে সে আলো মুছে ফেলা হচ্ছে? কেন তাদেরকে একটা দিশেহারা অবস্থায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে?

হাটে বাজারে পথে ঘাটে যেসব কথা উচ্চারিত হতে থাকে, সে সমস্তই কি ভিত্তিহীন 'মিথ্যা কথা' মাত্র? ...এখন কী সেই দিশেহারা দলটাকে ঠেলে নিয়ে যাবে তোমরা এমন এক কিনারায়, যেখান থেকে তাদের সহজেই ঠেলে ফেলে দেওয়া যাবে একটা অনিশ্চিত গহ্বরে? যেখানে পড়ে থাকতে থাকতে তারা নিজের সঙ্গে লড়াই করতে করতে আর ক্ষতবিক্ষত হতে হতে কোনো এক সময় স্রোতে ভেসে যাবে।...

তখন অবশ্য আর তারা 'ছেলে' থাকবে না, হয়ে পড়বে এক একটা জীবনে ব্যর্থ আধবুড়ো লোক। যাদের জীবনে তখন জীবিকা অর্জনের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য থাকবে না।...

আর—আর যদি কেউ নিজের সঙ্গে লড়াইয়ে না নামে? তাদের জন্যে অবশ্যই জুটবে আরাম, আয়েস, নিশ্চিত অন্নের প্রতিশ্রুতি, নিশ্চিত আশ্রয়ের আশ্বাস।...

বাপ্পা নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলো, হয়তো বেশিরভাগ লোকই এই 'শেষের পথের' সামিল হবে। ...এক স্বপ্নময় মায়াগোলকের পিছনে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একসময় যদি দেখা যায়, সেটা সাবানের ফানুস হয়ে গেছে, তাহলে আর কিসের প্রেরণায় খাড়া থাকতে পারা যাবে?

আরাম আয়েস সুবিধা, ইচ্ছাপূরণের যথেচ্ছ সুখ, ক্ষমতা, এসবের আকর্ষণ কী সোজা? কে ধার ধারবে তখন ওটা 'সুনীতি' আর ওটা 'দুর্নীতি' বলে।...ভাবতে ভাবতে অস্থির হলো, আবার শেষ পর্যন্ত একসময় ঘুমিয়েও পড়লো।

সারাটা দিনের ক্লান্তি তো কাজ করবেই। ...অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় একটা সংঘর্ষের মোকাবিলা করতে করতে কোথা দিয়ে দিনটা গড়িয়ে রাতে এসে পৌঁছে গেছলো! টের পেয়েছে ফেরার সময়।

তারক নামের মুখ্যু ওই ছেলেটাও অনেকক্ষণ না ঘুমিয়ে ভাবতে থাকে, কে জানে কী করে বেড়ায় বড়দা! সেই সায়েরের মতন রংটা জ্বলে পুড়ে, একদম তাঁবা হয়ে গেছে। চুলগুলো যেন কাকের বাসা, হাতে পায়ে খড়ি ওঠা। ...ছোটদা তো রঙে বড়দার ধারেকাছে ছিল না, তবু কেমন চেকনাই। বড়দার জনোই যে কেন প্রাণটা কাঁদে. ওনার জন্যেই এখানে পড়ে থাকা।...

তারকের মা এখন আর পাঁচবাড়ি বাসন মেজে বেড়ায় না, একটা গেরস্থবাড়িতে খাওয়া-পরার কাজে লেগে মোটামুটি ভালই আছে। এ যুগে তো আর গেরস্থর রান্নাঘরে ঢুকে পড়বার জন্যে 'জাতপাত জলচল' এইসব কূটকচালে প্রশ্নর মুখোমুখি হতে হয় না। অতএব সহজেই কাজ জোটে।

তারকের মা স্বপ্ন দেখে, এই যে এখন মাইনের টাকাটি সব জমে যাচ্ছে, এক পয়সাও খরচা হচ্ছে না, পান দোক্তার খরচটি পর্যন্ত মালিকের, এই টাকাটা নিয়ে তাদের লক্ষ্মীকান্তপুরে জ্ঞাতিদের সঙ্গে যে ধানজমিটুকু আছে, তার সঙ্গে এক লপ্তে আর একটু জমি কিনে, একখানা ঘর তুলে গুছিয়ে 'গেরস্থ' হয়ে বসবে। শেষজীবনে 'মানুষ' পরিচয়ের মধ্যে থাকবে ! ...ছেলের বিয়ে দিয়ে 'শাওরীর' পোস্ট পাবে, নাতি-নাতনীকে কোলেপিঠে করবে।

তা স্বপ্ন আর কে না দেখে ?

মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীরাই যে দেখে না, তাই বা কে বলতে পারে ? ...হয়তো কখনো কখনো শুকনো রুক্ষ অঞ্চলের পাখিরা কোনো অজানা দ্বীপের ফলভারাবনত সমারোহময় সবুজের স্বপ্ন দেখে। হয়তো খরা দুর্ভিক্ষে জর্জরিত ভূমির গরুরা স্বপ্ন দেখে আদিগন্ত তৃণাচ্ছাদিত ভূমির। তারকের মা তো মানুষ। স্বপ্ন দেখার তো রাইটই আছে তার।

জমির ধান্ধায় মাঝে মাঝেই দু একবেলা ছুটি নিয়ে গ্রামে এসে ঢোকে, জমির খোঁজখাঁজ করে। এখানের ঘরগেরস্থী মেয়েদের তুলনায় তার সাজসজ্জায় চলনেবলনে রীতিমতো শহুরে অভিজাত্যের ছাপ আছে। যার সঙ্গে দেখা হয়, তার কাছ থেকে সমীহই পায়। ...একদা যে সদ্যবিধবা বৌটা, একটা নিতান্ত শিশুপুত্রকে নিয়ে পেটের দায়ে কাজের চেষ্টায় গ্রাম ছেড়ে যাবার সময় এক জ্ঞাতি সম্পর্কে ননদাইয়ের সহায় নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল, সেই 'ছোট্ট' কথাটা এখন আর কেউ মনে রাখেনি। এখন যে পরাণের বৌ শহরে চাকরি করে টাকা পয়সা জমিয়ে গ্রামে আসছে জমি কিনে ঘর তুলবে বলে, কনের খোঁজ করছে ছেলের বিয়ে দেবে বলে, এতে তার মানমর্যাদাটি অনেকখানি বেড়ে গেছে।

জ্ঞাতি ভাসুর বলে, তা পরাণের বৌ যদি নেয়, আমি সুবিদে দরে জমির সন্ধান দিতি পারি। তবে এতোদিন কলকেতার বাবুর বাড়ি থাকা তারক কী গাঁয়ে এসে চাষাবাদের কাজ করতে পারবে ?

ভাসুরের বৌ বলে, চাষবাস না পারুক। গাঁয়েও তো এখন কত কাজ পেতেছে ছেলেপুলে। ...কতো সব 'পোকল্প' হয়েচে, তা বাদ পঞ্চায়েতিতে কতো কাজ পাচ্ছে। ...দ্যাকো না, এই সিদিন মণ্ডলদের যে ছেলেডা ট্যানা পরে ঘুরেচে আর চুরি করে অপরের পুকুরে মাচ ধরেচে, এখোন তার পরনে শাট পেন্টুন, গলায় 'উমাল'। হাতে হাতঘড়ি। তারক তেমন কাজও পেয়ে যেতি পারে।

অতঃপর সেও স্বপ্ন দেখে তার গলায় পড়ে থাকা মা-বাপ মরা বোনঝিটাকে তারকের ঘাড়ে গছাতে পারে কিনা।

এই দেখনের অঞ্চলের বেটাছেলেদের সঙ্গে শহুরের যতটা না যোগসূত্র, মেয়েছেলেদের তার থেকে অনেক বেশী। এখান থেকে অনেক মেয়েমানুষই ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে। ভোরের ট্রেনে চাপে, শহরে গিয়ে নেমে পড়ে, এখানে ওখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে সারাটা দিন বাসনমাজুনি কাপড়কাচুনির ভূমিকা পালন করে আবার পড়ন্ত বেলার ট্রেনে ফিরে আপন সংসারের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারাদিনে ঘোরাফেরার মধ্যে হয়তো তিন চার বাড়ি থেকে জোটা চা রুটি। সেই কাকভোরে যা দুটো পান্তা খেয়ে বেরোয় তাতেই পিত্তি রক্ষে। সংসারে যে বুড়িটুড়ি একটা থাকে, শাশুড়ী পিসশাশুড়ী মা মাসি, তাদের দৌলতেই স্বামীসন্তান সময়ে দুটো ভাতজল পায়। এই বৌ মেয়েরা নগদ টাকা রোজগার করে বলে পুরুষের তুল্য মান্য না পাক, ব্যবহারটা পায়। বাড়ি ফিরলে, কেউ মুখনাড়া দিতে আসে না 'এতোক্ষণ বাইরে কাটিয়ে এলি ?' বলে।

ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে বলে যে এরা ট্রেনের ভাড়া গোনে, এমন ভাববার কোনো কারণ নেই। ওরা অনায়াসেই বলে, টেরেন ভাড়া দিতে গেলে কী আর আমাদের পোষায় বৌদিদি ? তালে.পেটে কী খাবো ?

ট্রেন কোম্পানী কিছু বলে না ?

কোম্পানী তো আর টেরেনে বসে নেই বৌদিদি ? যারা থাকে তারা তো আমাদের চেনা জানা। আমাদের আবস্তা জানে, বোঝে।

শহরে আসা যাওয়া করতে করতেই এদের চোখ কান ভালো মতোই ফোটে এবং সেখানের চাহিদাটিও বোঝে। তাই এরা এদের মেয়েগুলো একটু মাথা ঝাড়া দিলেই সঙ্গে করে শহরে নিয়ে এসে বাবুদের বাড়িতে 'কাজের মেয়ে' রূপে ভর্তি করে দেয়।

এখন কাজের মেয়ের যে দারুণ চাহিদা। আজকের আধুনিক সংসারজীবন, 'সুখী পরিবার ছোট পরিবার'রা কেবলমাত্র একটি 'কাজের মেয়ের' বৃন্তে ভর করেই বিকশিত হয়ে থাকে। আর কাউকে প্রয়োজন হয় না তাদের। সেই মেয়েই একাধারে—সর্বার্থসাধিকা। তাকে বিহনে গৃহিণীর চোখে সর্ষেফুল।

সেই গৃহিণীটির নিজের চাকরি বজায় রাখা সম্ভব হয় একমাত্র ওই একটি তরুণী কাজের মেয়ের ভরসাতেই। মেয়েটা সংসারের যাবতীয় কাজ করবে, সারাদিন বাড়ি পাহারা দেবে, ছোট বাচ্চাকে সামলাবে, অপেক্ষাকৃত বড় হলে তাকে স্কুলে 'আনা যানা' করবে, এবং এলে নাওয়াবে খাওয়াবে ঘুম পাড়াবে।

এর বিনিময়ে অবশ্যই মনিবানী মহিলা রীতিমতো তোয়াজের পথ ধরেন। অর্থাৎ গ্রামের সেই চাষীবাসী বাবার মেয়েটাকে আধুনিক জীবন আর বাবুয়ানায় রপ্ত করে তোলেন। মনিবানীর প্রসাদী শাড়ি ব্লাউসে যে বাড়ির মেয়ের চেহারায় ঘুরে বেড়ায়, এবং শত কাজের মধ্যেও ক্রমশঃই শতরূপে বিকশিত হয়ে ওঠে।...বাবুর মেয়ে বা বৌদির্দির মতো টাইট করে শাড়ি পরতে শেখে, শাওয়ার খুলে চান করতে শেখে, নিজের জামাশাড়ি সাবানে কেচে নেবার বদলে লণ্ড্রীতে আর্জেন্ট কাচিয়ে আনতে শেখে, টি ভি-র ছবি দেখাদেখি ব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজতে শেখে, হিন্দি সিনেমার নায়িকার মতো কাঁধ ঝাঁকিয়ে গা মোচড় দিয়ে কথা বলতে শেখে, বাসি রুটি অথবা পান্তা ভাত দেখলে শিউরে উঠতে শেখে, এবং চুল নিয়ে এলিয়ে ছড়িয়ে কায়দা করতে শেখে, শেখে আরো অনেক কিছুই। তবে যেটা শেখাতে চাইলেও শিখতে চায় না, সেটা হচ্ছে লেখাপড়া। সে পথে একটু আধটু হাঁটাতে চেষ্টা করলেও তার দিক দিয়ে হাঁটতে চায় না। কিন্তু তাতে কী ? অক্ষর পরিচয় না হয়েও কেবলমাত্র টি ভি-র দৌলতেই তো তার বিশ্বপরিচয় ঘটে যায়।

সে গ্যাস স্টোভ জ্বালাতে শেখে, প্রেসার কুকার ব্যবহার করতে শেখে এবং শেখার পরিধি বাড়াতে বাড়াতে মনিবানীকে একেবারে একান্ত নির্ভরশীল করে তোলে।

এহেন সময়ই হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে গ্রাম থেকে মা কী বাবা এসে, 'মেয়ের বে' দেব' বলে নিয়ে চলে যায়।

মনিবানী চোখে অন্ধকার দেখেন, মনে মনে গালি-গালাজ করেন এবং আবার কেঁদে ককিয়ে একটা কাজের মেয়ে যোগাড় করে নেন। হয়তো ফ্রক পরা একটা মেয়ে। তা হোক—তার ওপরই ঘরবাড়ি সমগ্র সংসারের এবং হয়তো বাচ্চারও দায়িত্ব দিয়ে রেখে স্বামী-স্ত্রী অফিসে বেরিয়ে যান।

এই হচ্ছে আজকের সমাজের কাজের মেয়ের ভূমিকা।

কিন্তু সেই অতি শহুরে হয়ে ওঠা মেয়েগুলোর আবার পানাপুকুরে গা ডোবাতে আর পান্তা খেতে গিয়ে কী অবস্থা হয়, সে ইতিহাস অজ্ঞাত।

হয়তো কেউ কেউ অজ্ঞাত অন্ধকারে চিরতরেই হারিয়ে যায়। তবে অধিকাংশই হয়তো বছর কয়েক পরে আবার পাদপ্রদীপের সামনে এসে দাঁড়ায়। হয়তো দেখা যায় ইতিমধ্যেই কয়েকটি শাবকের জননী হয়ে পড়ছে, এবং সেগুলোকে যথারীতি ঘরে কোনো বুড়ির জিম্মায় রেখে, ডেলি প্যাসেঞ্জারী করতে বেরিয়ে পড়েছে। হয়তো শুধু বাবুদের বাড়ির কাজই নয়, চাল চালানোর কারবারও রপ্ত করে

ফেলে রোজগারের ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা যোগ করে ফেলেছে। লক্ষ্মীকান্তপুর, বারুইপুর, সোনারপুর, ক্যানিং—এই সব নিয়ে তাদের কর্মক্ষেত্রের এলাকা বিস্তৃত।

তারকের মায়ের জ্ঞাতি জায়ের ওইরকম একটি বোনঝি গড়িয়া অঞ্চলে কোনো বৌদিদির গোকুলে বাড়ছে। তাকে নিয়েই চটপট স্বপ্ন দেখে ফেলে তারকের জ্যেঠি।

জীবন যার যেমনই হোক, 'স্বপ্ন' দেখার কামাই নেই কারুর। যে যার আপন পরিবেশ পরিধির মধ্যেই স্বপ্ন দেখে, কেউ বা সে পরিধি ছাড়িয়ে অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে। যাদের এখনো ভবিষ্যৎটা হাতে আছে তারা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে, যাদের সে জিনিসটা হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে গেছে, অতএব তারা সেই হারিয়ে যাওয়া অতীতের অরণ্যে আপন আস্তিত্বটির খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

পাবনার গাঙ্গুলীবাড়ির বৌ নয়নতারা চল্লিশ বছর পরেও ফিরে ফিরে সেই গাঙ্গুলীবাড়িটার এখানে সেখানে দালানে বারান্দায়, বিশাল রান্নাশালার কাছাকাছি ঘুরে ফিরে আপন অস্তিত্বটুকু খুঁজে পাওয়ার স্বপ্ন দেখে।

তা এমন স্বপ্ন একদা নয়নতারার শাশুড়ী বিন্দুবাসিনীও দেখতেন। ধ্যানব্রত উকিলের পরমাসুন্দরী পরিবার, শাঁখের মতো শাদা গায়ের রং, মুখের চাটুনি নিখুঁত। চাঁচাছোলা গড়ন। মেঘের মতো একঢাল চুল ছিল, সিঁদুর-মোছার পরোয়ানা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কেশপাশকে মুড়িয়ে ফেলে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

আর বেশবাসের মধ্যে সর্বদা একখানা ভিজে থান। যখন তখন পুকুরে নেমে নেমে একবার করে মাথাটা চুবিয়ে আসার পক্ষে ওই সাজটিই আদর্শ। তাছাড়া বিন্দুবাসিনী 'শুদ্ধবস্ত্রে'-র শুদ্ধতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। অনায়াসেই চিরাচরিত ব্যবস্থাকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলতেন, 'রিশম পশোম' আবার 'শুদ্ধ' হয় কোন গুণে? অ্যাট্টা তো 'পোকা-মাকড়ের' লালা থিক্যা, অর অ্যাট্টা পশুলোম থিক্যা? ছ্যা ছ্যা! আমি অরে শুদ্ধ কই না। সুতাই হচ্ছে আসল শুদ্ধ। গাছের ফুল থিক্যা বানায়।

তবে তার শুদ্ধতাও দীর্ঘস্থায়ী হয় না। সহজে কোনো কিছুর স্পর্শদোষ ঘটে যায়। ...ধ্যানব্রতর জীবৎকালেই তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর হাতে পায়ে হাজা, আর সর্বদা ভিজে কাপড়। তবে তখন কাপড়টা থাকতো প্রধানত লাল পাড়ের, আর ভিজে চুলের রাশি থাকতো মাথায় ঝুঁটি বাঁধা। ...স্বামীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল শুধু বকাবকির সূত্রে।

ওই সিক্তবসনা সুন্দরীকে একবার দেখতে পেলেই ধ্যানব্রত তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে বলতেন, এটিকে অখনো পাগলা গারোদে ভরতে পাঠানো হচ্ছে না ক্যানরে? যাঃ যাঃ, অখনি অরে গারদে ভরি আয়।

আর সে প্রশ্ন শুনতে পেলেই বিন্দুবাসিনীও দাঁতে দাঁত চেপে বলতেন, অই। আলেন উকিল সাহেব। ...সাহেবের গুণের মদ্যি শুদ্ কটুবাক্যি। কে অরে অন্দরে সেঁদোতে সাদে? ঠাকুরঝি অরে কয়ে দ্যাও পুরুষ ছেলেকে বৈটকখানাতেই শোবা পায়।

তা সেসব পাট চুকে গেছল আগেই।

নয়নতারার মনে পড়ে পাবনার বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার প্রস্তাবে বিন্দুবাসিনীর কী প্রতিরোধ।...

সময় হয়ে গেছে, বাইরে গাড়ি প্রস্তুত, আর বিন্দুবাসিনী নিজস্ব পেটেন্ট পোশাকে ঠাকুরঘরের দরজাটা আঁকড়ে ধরে তীব্র আপত্তি জানাচ্ছেন, তরা যা। তরা যা। তদের বয়েস আচে, বাঁচনের সাদ আচে, তরা 'ছানাপোনা' আর পেরাণ নিয়ে পালা। আমারে বাঁচনের সাদ নাই। আমার কর্তার এই ভিটাটায় পড়ে থিক্যা মরতে দে। বলি ভিটে ফেলে, মা লক্ষ্মীরে ফেলে পেরাণ বাঁচাতে চলে গ্যালে, সেহানে গিয়ে কর্তারে জবাবটা কী দেবো? অ্যাঁ?

এর সদুত্তর অবশ্য জোটেনি বিন্দুবাসিনীর। নিরুপায় হয়ে চলে আসতেই হয়েছিল। তদবধি তাঁর

কাজই ছিল, ছেলেকে ধিক্কার আর ছেলের বৌকে গালাগালি। ওই সর্বনাশী মেয়েমানুষটাই যে শাশুড়ীকে জব্দ করবার জন্যেই ভ্যাড়া বনে যাওয়া সোয়ামীকে দিয়ে এই চাল চেলেছে, তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

তিনি তাঁর ছেলেকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিঁধে বিঁধে মন্তব্য করতেন, আর আমাগো সেহানে ঢুকতি দিবে না! হুঃ। আমারে পোলাপান পাইছস্? তাই তর এই কতা পেত্যয় করবো? মগের মুলুক নাকি? দ্যাখ্‌গে খন, যে যার ঠাঁই ফিরা আইচে। শুদু তুই পরিবারের মন্তন্নায় আমারে এহানে বন্দী বানিয়ে রাখছস্। এহানে এট্টু এ্যাকটু খাঁচার মদ্যি চান! পেরাণটা হাঁপিয়ে মরে সত্য! মায়ের দুঃখটা বোঝস না হতভাগা ছাওয়াল?

আবার কখনো কখনো মিনতি করেছেন, তরে হাত ধরে কই বাপ, দুটাদিন কাচারি কামাই করে আমারে সেহেনে রাইখ্যা আয়! সেহেনে আমি বেশ থাকবো। পড়শী-প্রতিবেশী রইচে না? তারা আমারে ভালবাসে।

পড়শী প্রতিবেশীরা যে আর কেউই নেই সেখানে একথা শেষ পর্যন্ত বোঝাতে পারা যায়নি বিন্দুবাসিনী গাঙ্গুলীকে। শুধু ছেলের আলস্য, আর বৌয়ের কুপরামর্শর ফল তাঁর এই যমযন্ত্রণা। কখনো কখনো আবার চিল চেঁচানো চেঁচাতেন, বৌ অ বৌ (হ্যাঁ শুধু 'বৌ'। কদাচ বৌমা নয়।) বলি, সেই বড়বড় বগি থালগুলা কোথায় নুকিয়ে রেখ্যেছিস আঁ্যা, সত্যরে আমার ওই অ্যাত্তোটুকুন থালে ভাত দিচিস? ...বৌ! অ বৌ কানেব মদ্যে সীসা ঢালচস না কী? শুনতি পাসচাস না? বলি তামা পিতলের ঘট-কলসগুলা কোতায় বিসজ্জোন দিচিস? আঁ্যা! লোহার টবে জল! ও জলের চানে শুদ্ধ হয়?' ক্যান? বড় ভাঁড়ারের সাঙায়, বিরোদ বিরোদ সব কলস তোলা নাই? তাই পাড়চস না ক্যান? বাপের ঘরে চালান করবি বুঝি? মতলোব বুজেছি।

অনুক্ষণ অভিযোগ আর অসন্তোষ। অহরহ আক্ষেপ আর ক্রন্দন। আর গালমন্দ শাপশাপান্ত।

নয়নতারা ভাবেন, অথচ আমি মুখ বুজে সে সব সহ্য করেছি। সেই মানুষকেই খোসামোদ করে আর ভুলিয়ে ভালিয়ে খাইয়েছি। কোনোদিন বলে উঠতে পারা যায়নি, 'এতো সহ্য করা যায় না।'

না পারা যায়নি। নিশ্চিত জানতেন—সেটুকুও সত্যব্রত মেনে নিতে পারবেন না। নিশ্চয় বলবেন, মার মানসিক অবস্থাটা অনুভব করতে চেষ্টা করো।

যেন নয়নতারার মধ্যে কোনো মানসিক অবস্থার বৈপরীত্য ঘটেনি।

খুবই স্নেহশীল স্বামী। কিন্তু মায়ের সম্পর্কে এতটুকু কিছু অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করে ফেললে একদম কঠোর কঠিন।

এখনো—মায়ের মৃত্যুর এই দীর্ঘদিন পরেও, কী সাবধানেই কথা বলতে হয় নয়নতারাকে—সেই অবুঝ আধপাগল কটুভাষিণী এবং স্নেহমমতাবর্জিত মহিলাটি সম্পর্কে। মনে হয় যেন সত্যব্রতর একটি ক্ষতস্থানে আঘাত লেগে যাবে।

গুরু ইষ্ট ঈশ্বর এসবের অনেক ঊর্ধ্বে মা।

আর— নয়নতারার পুত্র?

নিঃশ্বাস ফেলে ভাবেন, ত্রুটি আমারই। আমিই পারিনি আমার সন্তানের উপর সেই প্রভাব ফেলতে। আমার সন্তান মানুষ করার পদ্ধতিতে নিশ্চয় ভুল ছিল। আবার মাঝে মাঝে একটি অদ্ভুত ধারণাও মনের মধ্যে কাজ করে। হয়তো এভাবে কেন্দ্রচ্যুত হয়ে চলে আসতে না হলে, একই ধারায় গড়ে উঠতো নয়নতারার ছেলেও। শিকড় ছিঁড়ে চলে আসার ফলেই হয়তো—

অতএব—সেই 'শিকড়ের' গোড়াটা হাতড়ে বেড়ান নয়নতারা। কল্পনা করতে থাকেন, যেখানে সেই বৃহৎ পরিবারের মধ্যে ধারাবাহিক নিয়মে গড়ে উঠছে আদিত্য। হয়ে উঠছে বাপের মতই শান্ত

ভদ্র, মাতৃভক্ত!

কল্পনার সুতো ছিঁড়ে যায়। নিঃশ্বাস ফেলে ফিরে আসেন বর্তমানের বাস্তবতায়।

তবে নিজের জন্য যতটা নয়, বেশী দুঃখ হয় সত্যব্রতর জন্যই। কী মানী মানুষটা, কীভাবে নীরবে সমস্ত অবস্থাকে মেনে নিয়ে স্থির আছেন। ভগবানও তেমনি। শরীরের একটা ছোট্ট যন্ত্রকে কমজোরি করে দিয়ে কর্মজীবনটা শেষ করে দিলেন। অনায়াসেই এখনো প্র্যাকটিস করতে পারতেন। উনসত্তর বছর বয়েস হলেও স্বাস্থ্য এখনো যথেষ্ট মজবুত। বরং ছেলে আদিত্যরই এই বয়সে নানানখানা।

মাঝেমাঝে মনে হয়, সত্যব্রতর এই বয়সেও এমন মজবুত স্বাস্থ্য, বলিষ্ঠ চেহারা, এটাও যেন সংসারের চোখে সত্যব্রতর একটা বাড়তি স্বার্থপরতা অথবা চক্ষুলজ্জাহীনতা।

তাই ওরা যেন জোর করেই বাবাকে বুড়োর পোস্টে বসিয়ে ছাড়ে।

বাবার রাতের খাবারটা, তাড়াতাড়ি তিনতলায় তুলিয়ে দেয়, এবং দিনের খাবার সময় বারবার বলে, বাবার তরকারিতে বেশী ঝাল-মশলা দেওয়া হয়নি তো?

সত্যব্রত অবশ্য নিজেই যথেষ্ট নিয়মী। এবং 'নিয়মটি' বড় সুন্দর ছন্দে আবর্তিত হতো, যতদিন পর্যন্ত কর্মজীবনে যুক্ত ছিলেন। তবে শান্তচিত্ত মানুষ। নয়নতারা যদি স্বামীর এই কর্মবিরতিতে আক্ষেপ করেন, একটু হেসে বলেন, কী আশ্চর্য! এখনো তোমার এই নিয়ে দুঃখ? ধরো যদি সরকারি চাকরি হতো? ~~কবেই~~ তো দারুব্রহ্ম জগন্নাথ হয়ে বসে থাকতে হতো।....

॥ চার ॥

টুসকি বলল, পিসিদের বাড়িটা কী ব্যাক ডেটেড দেখেছিস ছোড়দা? পয়সাকড়ি তো যথেষ্টই আছে, পিসের ভাইগুলোও নেহাৎ আজেবাজে নয়, একটা তো নাকি ইঞ্জিনীয়ারও। কিন্তু আজ পর্যন্ত বাড়িতে ফোন আনল না। কী যে মুস্কিল! একটু খবর নিতে দরকার হলে ছোটো সেই বেলেঘাটায়।

শিলাদিত্য বলল, পিসি তো বলে, কত বছর ধরে নাকি চাইছে, পাচ্ছে না।

ছাড় তো! টুসকি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'পাচ্ছে না'! পাবার ঢের কলকৌশল আছে বাবা। সেই কলকাঠিটি নাড়লেই আজ বললে কাল দেবে।

শিলাদিত্য বলল, তোকে এসব জ্ঞান কে দিচ্ছে? যুধাজিৎ বুঝি?

ভাগ। তোর যুধাজিতের তো আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই তোর পিসির বাড়ির টেলিফোন নিয়ে আলোচনা করতে বসবে। নেহাৎ দুদিন তোর সন্ধানে এসে, তোকে বাড়িতে না পেয়ে দয়া করে আমার সঙ্গে দুটো কথা কয়েছিল। তো সেইটুকুর মধ্যে কি টেলিফোন প্রসঙ্গ উঠবে?

আরে বাবা আড্ডার মেজাজের সময় যে কোন প্রসঙ্গে কোন প্রসঙ্গে এসে পড়ে! তাহলে এসব জ্ঞানট্যান পাচ্ছিস কোথায়? কোথায় কী কলকাঠি নাড়তে পারলে, কী হয় না হয় জানলি কোথা থেকে?

আহা রে ছোড়দা! আর নেকু সাজতে হবে না। এইমাত্র পৃথিবীতে পড়লাম, না? চোখকান খুলে রেখে পৃথিবীটাকে রীতিমত যাকে বলে 'অবলোকন' করা। তাই করে আসছি বুঝলি? এই তো আমার বন্ধু কাকলীর ছোট কাকা, দুদিনে একখানা টেলিফোন বাগালো!

আরেব্বাস। তোর ওই লক্কাপায়রা বন্ধুটির বাড়িতে এতোদিনে ফোন? ওকে দেখলে তো মনে হয় সিনেমার নায়িকাদের মতো সবসময় সোফায় গা গড়িয়ে লম্বা লম্বা রঙিন নোখওলা আঙুল কটি দিয়ে রিসিভারটাকে কাছে টেনে এনে, ফোন ধরে শুধু বয়ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে প্রেমালাপ করে।

মার্ভেলাস ! আমার বন্ধুকে এতো খুঁটিয়ে কখন দেখলি রে দাদা ? লক্ষণ তো ভাল নয়।

ওঃ তোর ওই ন্যাকা মার্কা বন্ধুটি সম্পর্কে যে দেখছি তোর খুব উচ্চ ধারণা ? লক্ষণ ভালো নয় ? ওকে দেখলেই আমার হাসি পায়।

হাসি পায় ? কেন ? হাসিটা কী দেখে ?

আগাগোড়াই দেখে। যেন একটা রঙচঙে ডল পুতুল। এসব মেয়েদের দিয়ে কিস্যু হয় না। কেবলমাত্র বড়লোকের বাড়ির শো কেসেই মানায়। তোর মতন একটা ঘটির সঙ্গে যে কী করে এতো ভাব হলো তাই ভাবি।

কার সঙ্গে যে কার কী করে 'ভাব' হয় তার হিসেব কষবি তুই ? তাহলে মার রাঙাদার বাড়ির সেই মেয়েটার কথা মনে ভাব ? ওই রাঙাদার দূরসম্পর্কের ভাইঝি না ভাগ্নী কে যেন ? সাদা বাংলায় আশ্রিতা। নেহাৎ গাঁইয়া মার্কা ! সাত-চড়ে রা নেই ! আমি তো বলতাম পঁটুরানী। দেখতেও এমন কিছু আহামরি নয়। ভাতের দাম উসুল করতে মামার সংসারে রাতদিন গাধার মতো খাটতো। তার সঙ্গে কিনা লটকে গেল খোদ মামীর আমেরিকা ফেরৎ হীরের টুকরো বোনপোটি। ব্যাস ! সেই পঁটুরানীর এখন আমেরিকায় বসবাস। এখন নাকি নিজের হাতে গাড়ি চালায়, শহর চষে বেড়ায়। ভেবে দ্যাখ তাহলে ? কার সঙ্গে কী করে ভাব হয়। হয়তো ভবিষ্যতে এমনও দেখতে পাবি ওই কাকলীই কোনো বোষ্টম বাড়ির ছেলের প্রেমে পড়ে স্রেফ বিশুদ্ধ হিন্দুনারী মার্কা সাজ সেজে ঠাকুরপুজোর চন্দন ঘষছে। কিংবা নয়তো—একটা হাড় গরীব বেকারের সঙ্গে লটকে পড়ে তাদের ভাঙ্গাচোরা দুখানা ঘরের বাসায় গিয়ে কোমরে আঁচল জড়িয়ে রাঁধছে, বাসন মাজছে, কাপড় কাচছে।

তার মানে, মেয়েরা বহুরূপী।

ভাগ, চাষার মতো কথা বলিস না। আমার ভাষায় মেয়েরা হচ্ছে 'শতরূপা'। যে কোনো পরিবেশে বিকশিত হয়ে তাক লাগিয়ে দিতে পারে। যাকগে। ...তবে মেয়েদের সম্পর্কে কখনো চট করে কোনো মন্তব্য করে বসিস না। আর মেয়েদের তত্ত্ব বোঝবার চেষ্টা করিস না। ব্যাপারটি হচ্ছে 'অকূল সমুদ্র'। তবে হ্যাঁ যে কথাটা হচ্ছিল, কাকলীদের বাড়িতে টেলিফোন এই নতুন নয়। ওর জন্মাবার আগে থেকেই আছে। এটি হচ্ছে ওর 'ছোটকাকা স্পেশাল'। ওই ছোটকাকা হঠাৎ তার ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে দিয়ে দারুণ লাভজনক কী একটা বিজনেসে নেমেছে, বাড়ির একখানা ঘরকে অফিস ঘর বানিয়ে ফেলে জাঁকিয়ে বসেছে। সেই অফিসের জন্যেই টেলিফোন। তো বলল, দুদিনের মধ্যে পেয়ে গেছে।

তা পেতে পারে। ঘুষের কারবারে সবই সম্ভব। তো বিজনেসটা কিসের ?

সে জানি না। তবে কাকলী বলল, ছোটকাকা তার শোবার ঘরে বিছানার মাথার কাছে একখানা লক্ষ্মীঠাকুরের ছবি টাঙিয়ে রেখেছে, কালীঘাটের পট মার্কা। সেই ছবির তলার ক্যাপসান—'বাণিজ্যে বসতিঃ লক্ষ্মী'। তো তোর বন্ধু ওই যুধাজিৎও তো সেই আদর্শে বিশ্বাসী।

শিলাদিত্য একটা নস্যাৎ করা ভঙ্গীতে কাঁধ নাচিয়ে বলে, 'বিশ্বাসী' সবাই। তবে ক্যাপাসিটি থাকা চাই আর মূলধন থাকা চাই হে।

ক্যাপাসিটি যে কার মধ্যে কী আছে, মাঠে না নামলে কী বোঝা যায় রে ছোড়দা ? চোখ বুজে একবার মাঠে নেমে পড়ে দেখতে হয়। তোর ওই যুধাজিৎ তো তোকে খুঁজতে আসে ওই পরামর্শের জন্যেই। তোকে তার বিজনেসের পার্টনার করতে চায়।

শিলাদিত্য বোকা নয়। মনে মনে একটু মুচকে হাসলো। উৎসাহটা কিসের ? আমাকে বিজনেসের পার্টনার করতে, না তোকে লাইফের পার্টনার করতে ? ঘনঘন আসার একটা ছুতো দরকার তো ?

মুখে অবশ্য তখন বলল না, বলল, আমার বাবা ওসব ঝামেলার ব্যাপারে মাথা ঘামাতে ইচ্ছে করে না। শাঁসালো একখানা চাকরি জোটাতে পারলেই দিব্যি হেসে খেলে কাটিয়ে দেওয়া যাবে।

শাঁসালো একখানা চাকরি। রঙিন স্বপ্ন! ওই স্বপ্নেই বিভোর থাক। আমার মতে তোর একটু এ নিয়ে ভাবা উচিত। দাদাটা তো হিসেবের বাইরে। ওর ওপর সংসারের কোনো প্রত্যাশা নেই। তুই যদি বেশ 'একখানা' না হতে পারিস সংসারের ভবিষ্যৎটা কী?

শিলাদিত্য একটু স্থির চোখে তাকিয়ে থেকে বলল, তোর হঠাৎ এমন সংসার চিন্তা? ব্যাপারটা কী?

ব্যাপার আবার কী! চেতনা থাকলেই চিন্তা আসে।

মনে হচ্ছে চেতনাটি যেন হঠাৎই গজিয়েছে। তা যাক! ও নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন হঠাৎ পিসির বাড়ির খবরের ধান্ধা কেন শুনি?

আর বলিস না। সাতজন্মে তো আসে না পিসি। 'সংসার' নিয়েই মত্ত। বুড়ো মা-বাপকে একবার আধবার দেখতে আসা যে কর্তব্য তাও ভাবে না। তো বৃদ্ধা মহিলাটি নাকি গতরাত্রে কী স্বপ্নটপ্ন দেখেছেন, তাই বেশ কাতর।

স্বপ্ন! কী স্বপ্ন।

কী স্বপ্ন তা কী আর বলেছে আমায়? এমনি নিজের মনেই বলছিল, 'কাল ভোররাতে টুনুরে স্বপন দেখলুম। মনটা যেন কেমন উথালপাথাল করছে।' তাই মনে হলো, ফোন থাকলেই এখুনি একটা খবর নিয়ে ফেলে ওই উথালপাথালকে সামাল দেওয়া যেতো। বেচারী বুড়ি।

শিলাদিত্য একটু অপ্রতিভভাবে বলে, আমারও একবার ওনাদের ওই ওপরতলার ঘরে যাওয়া হয়ে ওঠে না। বৃদ্ধাকে তো তবু খাওয়ার সময়টময় একটু দেখা যায়। বুড়ো ভদ্রলোককে তো—

মনে করতে পারল না শিলাদিত্য, কতদিন হয়ে গেল দাদুর সঙ্গে দেখা হয়নি। নাঃ, এক আধবার ওপরে যাওয়া দরকার।

আর এই রকম মনো দুর্বলতার বশেই বোধ হয় চট করে একটা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসল, আচ্ছা—দেখি, যদি আজ একবার বেলেঘাটায় যেতে পারি।

তারপরেই বলল, আগে পিসির বেশ কেমন কাছাকাছি ছিল। ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে পিসির বাড়ি বেড়াতে যাওয়াটা তো প্রায়ই ছিল। মনে আছে তোর?

মনে আর থাকবে না কেন? বেলেঘাটায় তো গেছে পিসিরা বড়জোর বারো তেরো বছর। তার আগের স্মৃতিটা কী ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেছে? সত্যি, বেশ তো ছিল। কী যে হলো।

শিলাদিত্য বলল, 'ছিল' তো বেশ। সেটা থাকতে পেল কই? কোথা দিয়ে যে কী হয়ে গেল। কী একখানা বাড়ি ছিল পিসিদের, মনে আছে? গেলেই মনে হতো বিয়েবাড়িতে এসেছি। সর্বদা গমগম করছে। পিসি শুনলে হেসে হেসে বলতো, এদের এই বাড়িটা রোজই বিয়েবাড়ি। যখন ইচ্ছে চলে আসিস, দেখবি—খাবার রেডি। আসিস না? কাছেই তো।

কথাটা সত্যি।

সত্যব্রত একটু চেষ্টাতেই বেশ কাছেপিঠেই মেয়ের জন্যে 'সম্বন্ধ' পেয়ে গিয়েছিলেন। যেমন তেমন 'সম্বন্ধ' নয়, একেবারে দুর্দান্ত। মেয়ের রূপের জোর ছিল বলেই অবশ্য অতো সহজে মানিকতলার মুখুয্যে বাড়িতে মেয়ে দিতে পেরেছিলেন উদ্বাস্তু হয়ে আসা সত্যব্রত। বিশাল বাড়ি, বৃহৎ পরিবার। দু'বেলায়—ফেলে ছড়ে শতখানেকের ওপর পাত পড়ে। না হবে কেন? মেয়ের শ্বশুররাই তো পাঁচ পাঁচটি ভাই একত্রে। আর তাদের প্রত্যেকের ওপরই মা ষষ্ঠীর কৃপার পরাকাষ্ঠা। বাদে বড়কর্তা। তিনি নিঃসন্তান, অকালে বিপত্নীক। বাকি চারজনের? এক একজনের গোটা সাত-আট করে।

সত্যব্রতর বেহাইটি ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। তা তাঁরও তো ছেলেমেয়ে মিশিয়ে পুরো আটটি।

ফুটপাতের ওপর। মোটা মোটা থাম বসানো, তার ওপর ভর করে মস্ত গাড়িবারান্দা। সাবেকি ধরনের গ্রীল। তিনতলার ওপর সারি সারি বড় বড় ঘর। উঁচু উঁচু জানলা, শার্সি, খড়খড়িদার।

তাকালেই বেশ সমীহ আসে। যদিও কালের প্রলেপে তখনই বাড়িতে খানিকটা জীর্ণতার ছাপ পড়েছিল। তবু কথায় বলে, মরা হাতী লাখ টাকা। এখন থেকে ধরলে চারপুরুষ আগে সেই কোন এক মুখুয্যে যুবক রংপুর থেকে কলকাতায় চলে এসেছিলেন ভাগ্য ফেরাতে, এবং ফিরিয়েও ছিলেন। তারই ফলশ্রুতি ওই মস্ত তিনতলা প্রাসাদতুল্য বাড়ি। আর তাঁর পরবর্তী জন বাড়ির সংলগ্ন জমিতে ভালোমতো একটি প্রেস বসিয়েছিলেন। সেই পরবর্তী জনই ছিলেন এদের পিসির শ্বশুর। ...রংপুরের রং-এর স্মৃতি তাঁর মনের মধ্যে ছিল না। কারণ সেখানে তাঁর কোনো দানই ছিল না। তিনপুরুষের এই বসবাসের ফলে, উত্তর কলকাতার বনেদিয়ানার কালচারটিই তাঁদের রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

বাড়িতে মেয়েপুরুষ মিলিয়ে গোটা পাঁচ-ছয় কাজের লোক (তখন অবশ্য 'কাজের লোক' বলার রেওয়াজ ছিল না)। সব খাওয়াপরা, রাতদিনের। সবকটারই এ বাড়িতে কাজ করতে করতেই চুলে পাক ধরে গেছে। কারো বা চুলে চুনকাম। এরা মনিব বাড়িকে 'আপন বাড়ি' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, মনিবের ছেলেমেয়ে নাতিপুতিদের প্রাণতুল্য দেখে। সেবাযত্ন তো করেই, শাসন করতেও ছাড়তো না। এবং বলা বাহুল্য, তাতে মনিবানীরা 'প্রেস্টিজ' হানি হলো বলে গোঁসা করতেন না। বরং পরে ছেলেমেয়েদের বলতেন, হয়েছে তো ? দুষ্টুমির ফল ফলেছে তো ? আর যার কাছেই যা হোক, ওই 'নন্দদা' আর 'বিন্দাবন'দার কাছে পার পাবে না বাবা।

নন্দ আর বৃন্দাবন দুই খুড়ো আর ভাইপো। কিন্তু ছেলেদের কাছে সম্বোধন ক্ষেত্রে দু'জনেই দাদা। তা আগের দিনে পয়সাওলা লোকেদের বাড়ির দাসদাসী, দারোয়ান মালি, এখন স্বজন-পোষণের ঢালাও কারবারই করতো।

বেশ কিছুদিন কাজ করে শেকড় বসে গেলেই দেশ থেকে একটা বালখিল্য ভাইপো ভাগ্নে এনে হাজির করতো। বলতো যে কদিন না চাকরি জুটিয়ে দিতে পারছে, এখানেই কিছু ফাইফরমাস খাটুক, দুবেলা দু থালা ভাতের বিনিময়ে। অতঃপর দেখা যেতো কেমন করে যেন সেই সংসারেই তার চাকরি পাকা হয়ে গেছে।

দাসীরাও ওই একই শর্তে এনেছে বিধবা বোনঝি। ঘরে নেয় না এমন ভাইঝি, বা মা-বাপমরা একটা পাড়াপড়শীরই মেয়ে। ঠিকই তারা সেই সংসারেই অপরিহার্য হয়ে যেতো। না যাবে কেন ? তাদের হিতাকাঙ্ক্ষিণী মাসি কি পিসি তো ভরা বয়েসের মেয়েটাকে চোখ ছাড়া করে যে-সে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিতে পারে না ? অতএব কাছেই থাক।

তা টুনির শ্বশুরবাড়িতেও তখন এরকম কেস ছিল কিছু।... আর শ্বশুরবাড়ির হালচাল ধরনধারণ ? সে তো বলাই হয়ে গেছে। স্থানীয় কালচারটি সম্পূর্ণভাবেই মজ্জাগত হয়ে গেছল। বাড়িতে অত জায়গা থাকতেও কর্তারা শীতের দিনে বাড়ির বাইরের রোয়াকে খেঁটে ধুতি অথবা গামছা পরে ডলে ডলে তেল মাখতেন, বেলা দুটোর আগে ভাতে বসতেন না এবং রাতে এগারোটার আগে নয়। খাওয়া মাখায় ছিলেন যাকে বলে রাজসই।

দেশভাগের পর চার বছরের মেয়েটাকে নিয়ে চলে এসেছিলেন সত্যব্রত, সেই মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তার পনেরো বছর বয়েসে...তখন বাজারদর এমন কিছু মাখন মাখানো বা মাটিতে লুটোনো নয়। দিনদিন উঁচুতেই উঠেছে সে দর ! কিন্তু সাবেকি ব্যবস্থাটি এতটুকুও টসকায়নি। তখনো নিত্যদিনের কাঁচাবাজার আসতো ঝাঁকামুটের মাথায় চাপিয়ে। মানিকতলা বাজারের এক বিশেষ মেছো বরাদ্দমাফিক সক্কালবেলাই একখানা দশ-বারোসেরি রুই কী কাতলা নিয়ে এসে ধড়াস করে গেরস্থর উঠোনে ফেলে নিজের আনা বঁটিতে চক্ষের নিমেষে ঘ্যাস ঘ্যাস করে কুটে মাছের খামি 'গণ্ডা' হিসেবে

গুনে একধারে থাক করে রেখে ল্যাজা মুড়ো তেল ডিম কানকো কাঁটাদের ভবিষ্যযুক্ত করে গোছ করে রেখে বিদায় নিতো। মাসিক বন্দোবস্তের ব্যাপার। সকালবেলা গেরস্থপোষা মাছটা এসে না পড়লে ইস্কুল অফিস সামাল দেওয়া যাবে কী করে ? মেছো চলে যাবার পর নিঃসন্তান আর অকালে বিপত্নীক সেই বড়কর্তা অর্থাৎ টুনির জ্যাঠশ্বশুর ধীরেসুস্থে চাকর নিয়ে বাজারে বেরোতেন অন্যান্য মাছের সন্ধানে। এক এক ভাইয়ের রুচি পছন্দ হিসেব করে দৈনিক চার-পাঁচ রকম মাছ ছিল তাঁর অবশ্য আনিতব্য।

রেলের চাকরি করতেন ভদ্রলোক, তখন রিটায়ার করেছেন, অগাধ অবসর। সেই অবসরটি বাজারদোকান ঘুরে সংসারের মনের মতো রসদসংগ্রহ করতে ব্যয় করার থেকে সময়ের সদ্ব্যয় আর বেশি কী হতে পারে ? তাছাড়া বাড়িতে যদি খানিকটা করে নিয়েই না আসা হবে, তো বাজার ভর্তি ইয়া বড় বড় বাগদা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, রুপো ঝকঝকে ইলিশ, ডিমভর্তি মস্ত মস্ত ট্যাংরা, বাটা, পার্সে, লাফাই-ঝাঁপাই কই মাছ, পুরুষ্ট ভেটকি, সরপুঁটি, চিতল এবং মৌরলা সোনাখড়কেরা বাজার আলো করে বসে আছে কেন ?...তাছাড়া শীতের সময় পেল্লায় হাত-পা-ওয়ালা রাক্ষুসে গলদা, অথবা মোটামোটা দাঁড়া কাঁকড়ারাই বা আসে কেন বাজারে ?... যে সময়ের যা, গেরস্থ তার স্বাদ পাবে না ?... ওটা গেরস্থর নিয়ম।... তবে ? নিয়ম অনুযায়ীই আমের সময় ঝোড়াঝোড়া ল্যাংড়া, বোম্বাই, হিমসাগর, আবার জনগণের জন্যে কিছু অনামী আম এসে পড়বে না বাড়িতে ? লিচুর সময় লিচুর ঝাড়, কাঁঠালের সময় কাঁঠাল ?

দিনকাল যে পাল্টাচ্ছে বাজারদর যে ক্রমেই ওপরদিকে উঠছে, এ খেয়াল আসতো না বড়দা মৃগাঙ্ক মুখুয্যের। সেটা খেয়াল করিয়ে দেবার সাহসও আসতো না অন্য ভাইদের অথবা বড় হয়ে ওঠা ভাইপোদের। সাহস যা কিছু—চিরকালের বালবিধবা পিঠোপিঠি দিদি নিরুপমা দেবীর। তা তিনিই বা আর কী বুঝ দেবেন ? তিনিও তো নিজ ক্ষেত্রে সমান অবুঝ। তাঁরও তো তখনো বাৎসরিক আমের মোরব্বা বানাতে দশ সের চিনি বরাদ্দ। এছাড়া আরো বহুবিধ আচারের পাট ছিল তাঁর। ডালাডালা তেঁতুল, ঝুড়িঝুড়ি কুল আরো কত কীই আচারে পরিণত হতো।

কিন্তু সংসারের সদস্যর সংখ্যা হিসেব করলে এসব যে খুব বেশি উপচে পড়া হতো তা তো আর বলা যায় না ? তাঁর ঠাকুরঘরে বিশেষ দিনে একটা ভোগ দিতে হলেও তো বারকোষ বোঝাই মিষ্টি চাই। মাথাপিছু একটা তো দিতেই হবে সবাইকে। বড়দের কিছু স্পেশাল। মৃগাঙ্কর হিসেবেও তাই। মাথাপিছুর হিসেব করলে একজোড়া গলদা কী এমন ? তবু—ছুঁচ আর চালুনির কাহিনীর মতই নিরুপমা বলতেন, হ্যাঁরে মৃগু, বাবার আমলের বাজারদর আর আছে ? তাই এখনো সেই স্টাইল চালিয়ে যাচ্ছিস ? হাত একটু ছোটো করতে শেখ ?

মৃগাঙ্ক অবলীলায় বলতেন, ছোটো করতে শিখব ? কী যে বলিস দিদি ? বলি সংসারের ক্রমশ ডালপালা বাড়ছে না ? সে হিসেবে তো আরো বাড়াবারই কথা। সেটাই পেরে ওঠা যাচ্ছে না বাজার খারাপ হয়ে পড়ায়। এই যে কালকের হিমসাগর আমগুলো ? দেখতেই একঝোড়া এলো, সকলের আস্ত এক একটা কী কুলোলো ? কুলোয়নি, আমার হিসেব আছে।

নিরুপমা বকে উঠে বলেন, তা ওই হাতী হাতী আম বাচ্চা ছেলেপুলেরাও গোটা গোটা খাবে ?

বাঃ। খাবে না ? আম তো ছেলেপুলেরই খাদ্য। আমরা ছেলেবেলায় কত খেয়েছি ভেবে দ্যাখ ? এক একদিন রাত্তিরে ভাতই খেতাম না, আম খেয়েই পেট ভরাতাম। মনে নেই ? তেমন দরাজ জিনিস পাচ্ছে এরা ? সবদিন সকলের একটা আস্ত জোটে না। লোকজনেদেরও কী তেমন প্রাণভরে দিতে পারা যায়, বাবা যেমন দিতেন ? এরপর আরো হাত ছোটো করতে বলিস ?

নিরুপমা বলেন, বলি কী আর সাধে ? জিনিসপত্তরের দাম দেখেই বলি।

তো তুমিই বা কী কম হে নিরুপমা দেবী! পিঠোপিঠি দিদির সঙ্গে অনেক সময় এহেন ভাষা চালাতেন মৃগাঙ্ক। বলতেন, তোমার পঞ্চভ্রাতার রাতের 'ডিনারে' রাবড়ির বাটির বরাদ্দটি প্রাণ ধরে বন্ধ করতে পেরেছ? বাবার আমলের রাবড়ির সের ছিল বারো আনা, আর এখন? তবু দৈনিক এক সের করে রাবড়ি আসছে না?

নিরুপমা রাগ দেখিয়ে বলতেন, এই, খবরদার। খুঁড়বি না। রাবড়ি আমার নাড়ুগোপালের রাতের ভোগ না?

তা জানি। ওই চালাকিটি করে রেখেছ, যাতে বরাদ্দটি কিছুতেই বন্ধ না হয়। তোমার গোপালের প্রসাদ শুধু রাত দুপুরে তোমার ভাইদের ভোগে লাগে। সংসারের আর কারো জোটে না। তাতেই মনে কেমন লাগে।

থাম তো। ছেলেপুলেরা বাটি বাটি দুধ খাচ্ছে না? তোরা তা খাস? তো সে দুঃখু তো মাঝেমধ্যে নিবারণও করিস ভাইরে।... তিন-চার টাকা সের রাবড়ি, তাও এক একদিন পাঁচ সাত সের এনে হাজির করে খাওয়াস না? তার সঙ্গে লুচি।

মৃগাঙ্ক ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলতেন, সে তো অঙ্ক কষে, মুফতে দিদি। যেদিন তোমাদের সংসারে কোনো বিশেষ পুজোটুজোর দিনে হোল ফ্যামিলির নিরিমিষ ব্যবস্থা হয়, রান্নাঘরে মাছ ঢোকে না, সেইরকম দিনেই লুচি-রাবড়ি। অনেক অঙ্ক কষে এখন সংসার চালাতে হয় দিদি।

তা সাবেকি চালের বাড়িতে মাঝেমধ্যে আসতো এমন সব আমিষবর্জিত দিন। যথা সরস্বতীপুজো, কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো, মহাষ্টমী, চৈত্র সংক্রান্তি, যার পোশাকী নাম 'মহাবিষুব সংক্রান্তি'। আরো এমন ছিল কিছু কিছু। দশহরার দিন তো রান্নাঘরে হাঁড়িই চড়তো না। সমগ্র সংসারের 'ফলারের ব্যবস্থা'। মায় দাসদাসী পর্যন্ত।

তা মৃগাঙ্ক যতই নিজের অঙ্ক কষে সংসার চালানোর বাহাদুরির কথা ঘোষণা করুন, সেই ফলারও হতো রাজকীয়। অন্য ভাইরা নিজেরা আড়ালে একটু বলাবলি করলেও, 'বড়দা তো দেখছি সমান স্টাইলেই চালিয়ে যাচ্ছেন—' তবে কেউ মুখটি তুলতে পারতেন না বড়দাদার সামনে।

মৃগাঙ্ক কী খুব রাগী মেজাজী ছিলেন? মোটেই না। সদাহাস্য লোক, ভাবভঙ্গী যাকে বলে 'কাছাখোলা'। তবু সাহসের অভাব। এ অভাব ভয়ে নয়, ভক্তিতে ভালবাসায় শ্রদ্ধায় সমীহে। ...বড়দা যে খাঁটি সোনা, সে ধারণা সকলের। এবং বড়দা যে এ সংসারের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী তাও সবাই জানে এবং মানে। অতএব 'বড়দা যা ভাল বুঝবেন। বড়দা যা করবেন।'

প্রেসের আয় হিসেবমতো সকলেরই, কাজেই 'বড়দা সংসার চালাচ্ছেন' ভেবে বিবেকের দংশনও কিছু নেই। প্রেসের আয় থেকেই সংসার চালান মৃগাঙ্ক। সে আয়-ব্যয়ের হিসেব নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতে আসে না।

মৃগাঙ্ক একবার তেমন কথা তুললে, সকলেই চোখ কপালে তুলে বলে, রক্ষে করো বাবা। ওসব আমাদের মাথায় ঢুকবে না। ও তোমার ব্যাপার।

প্রকৃতপক্ষে সংসার পরিচালনা করেন এই দুই ভাইবোন, মৃগাঙ্ক আর নিরুপমা। যাঁদের 'নিজের' বলতে কিছু নেই। হয়তো সেইজন্যেই অন্য সকলের এতো নিশ্চিন্ততা। ওই দুটি মনিষ্যির তো নিজ স্বার্থ বলে কিছু নেই? এবং দুজনেই কৃচ্ছ্রসাধনের ধারায় চলেন। নিরুপমা তো সমাজ ধর্মেই বরাবর একাহারী একবস্ত্রা। বাইরে বেরোতে একটা সেমিজ আর সিল্কের চাদর, বাড়িতে উদয়াস্ত মটকার থান। আর মৃগাঙ্ক? তিনি স্বভাবধর্মে। তিনি পাঞ্জাবির ঘাড় ছিঁড়লে, নিজে দাঁড়া দাঁড়া সেলাইয়ে রিপু করে নেন, ধুতি ছিঁড়লেও সেলাই চালাতে কসুর করেন না। গামছাখানা যতক্ষণ না টুকরো হয়ে গিয়ে জবাব দিচ্ছে, তাকে ছাড়েন না। পায়ের চটিও কাঁটা না-ফোটালে নয়।

এই নিয়ে অবশ্য সকলেই বকাবকি করে। মৃগাঙ্ক অম্লানহাস্যে বলেন, আরে বাবা, যখন আপিসে গেছি, তখন কী কম বাবুয়ানা করেছি ? সদ্য পাটভাঙা গিলে করা পাঞ্জাবি, চুনটকরা ধুতি। নিউকাট জুতো। পাঁচজনে না দেখে মুখার্জিদা ময়লা পরে এসেছেন। তো এখন আর কার ধার ধারি ?...

বলতেন আর থাবা থাবা মুড়ি মুখে পুরতেন, তেলে জবজবে মুড়ি কাঁচালঙ্কা সহযোগে। মুড়ির জন্যে কোথা থেকে যেন খাঁটি ঘানির তেল যোগাড় করতেন মৃগাঙ্ক।

অবশ্য একাই খেতেন না, মুড়িপর্ব এ বাড়িতে প্রায়শই চলতো। তা সবাই যেদিন খাবে, তার কত তরিবৎ। তেল নুন কাঁচালঙ্কা বাদেও শশা নারকেল ছোলার ঘুগনি, বেগুনী, আলুর চপ। ইচ্ছে হলে মুড়িতে টাটকা ছোলার ছাতুও মেখে নাও।... আবার শীতের দিনে কখনো শখ জাগতো—মুড়ির সঙ্গে বেগুন পোড়া। সে এক পেল্লায় ব্যাপার। একটা তোলা উনুন জ্বেলে বামুনঠাকুরের খিদমদখাটুনি অভয়ের মা বসে বসে ঢলঢলে ঢলঢলে এক ঝুড়ি বেগুনই পোড়াতো। তাদেরকে খোসা ছাড়িয়ে তেল নুন মাখতো বাড়ির কোনো মেয়ে বৌ।

নিরুপমা বলতেন, তুই আর 'ছুটির দিনে মুড়ি জলখাবার হোক' বলে র‍্যালা তুলিসনে মৃগু। তোর মুড়ির বাহারের বদলে অনেক কম খাটুনিতে আর কম খরচে লুচি আলুর দম হতে পারতো।

পারতো। মানছি। তো সেটা এমন একটা টেস্টফুল ব্যাপার হতো ?... বল !

তা সংসার সদস্যরা সবাই সেটায় স্বাক্ষর দিতো। বলতো, 'সত্যি বড়দার তরিবতের মুড়ি একখানা মুখরোচক জিনিস বটে।'

টুনি বিয়ের পর কয়েকটা বছর দেখেছে এই রমরমা। গোড়ায় গোড়ায় বাপের বাড়িতে এসে গল্প করতে করতে হেসে লুটোতো। তখন বলতো, 'ওদের বাড়ি' কোনো একসময়, সেটা 'আমাদের বাড়িতে' রূপান্তরিত হয়ে গেছল।

বলতো, ওদের বাড়ি যা হবে, তাই হিমালয় পর্বত। বুঝলে মা ? জ্যেঠুর শখ হলো শীতের দিনে সকলকে ফুলকপি কড়াইশুটির খিচুড়ি খাওয়াতে হবে। 'হবে' মানে শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাইকেই খেতে হবে। কাজ করবার লোকজন পর্যন্ত। বাদে বড় পিসিমা।... তো শখ যখন হয়েছে, তখন হতেই হবে। বড় ধামার এক ধামা কড়াইশুঁটি ছাড়ানো হলো, একঝোড়া কপি এল, মুঠো দুচার গরম মশলা, ঠোঙ্গা ভর্তি তেজপাতা, নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকী করে 'খিচুড়ি'র হাঁড়ি নামালেন। ...আর পোয-পার্বণের কথা তো বলতে বসলে ফুরোবে না। অদ্ভুত মানুষ। খুব বেশী জিনিস না হলে কিছুতেই মন ওঠে না। ছুটির সকালে ছেলেপুলেদের বাঁধাবরাদ্দ পরোটা জলখাবার না করিয়ে বলতেন, 'আমি আনাচ্ছি।' ব্যস, খাবারের দোকানে অর্ডার চলে গেল তাদেরই দোকানের লোক ঝোড়ায় করে গরম হিঙের কচুরি, আর বারকোষ ভর্তি গরম জিলিপি দিয়ে গেল। নাও, কে কত খাবে খাও। ফুরোলে আবার অর্ডার চলে যাবে।

সবাই শুনে হাসতো, চোখ বড় করতো।

সত্যব্রত বলতেন, লোকটা নিজে খায় ? না তাতে কিপটেমি করে ?

হেসে ফেলতো টুনি, নাঃ, তা করেন না। খাওয়াতেও ভালবাসেন, খেতেও ভালবাসেন। বড় জামবাটির একবাটি মাংস খেতে পারেন। হাঁসের ডিমের ডালনা হলে, অন্তত চারটি ডিমের কমে চলবে না। অন্যদেরও 'আরো নে আরো খা' করেন, তবে সবাই তো অতটা পারে না। সেজজ্যেঠুর তো দুটো হাঁসের ডিমেই পেট ছেড়ে দেয়। ...হি হি।

হ্যাঁ, হাঁসের ডিমই। নিরুপমার উপস্থিতিতে তো আর বাড়িতে মুরগির ডিম ঢুকতে পারে না ?

সত্যব্রত বলতেন, বেশ বাড়িতে বিয়ে দিয়েছি তোর। খেয়েই ফতুর হবে।... দু'বছরের বড়দাদা আদিত্য বলতো, 'গ্র্যাণ্ড বাড়ি বাবা। আমাদের যে কী বাড়ি।'

কিন্তু সেসব বোলবোলাও কতদিনই বা দেখল টুনি ? সেই মৃগাঙ্ক মুখুয্যে নামের টগবগে ছটফটে লোকটা কিনা হঠাৎ একদিন বিনা নোটিশে কথা কইতে কইতে ফস করে মারা গেল !

কে জানতো, তার হৃদয় এমন দরাজ হলেও হার্টটা ছিল 'ড্যামেজড' !

কিন্তু সে তো হলো। এদিকে তলে তলে যে তিনি কী সর্বনেশে কাণ্ড করে বসেছিলেন, সেটা তাঁর ওই বিনা নোটিশে জবাব দিয়ে বসার আগের ক্ষণ পর্যন্তও কেউ টের পায়নি।

যখন টের পেল তখন মাথায় হাত দিয়ে বসতে হলো সংসারকে। চার-চারটে কর্তা কর্তা ভাই, কারো সঙ্গে পরামর্শ মাত্র না করে, বাড়িখানি মর্টগেজ করে বসে আছেন মৃগাঙ্ক।

না না, রেস খেলেও নয়, নেশাভাঙ করেও নয়, স্রেফ সংসারের ঠাট বজায় রাখতে। বাজারদর যতই বাড়ুক, বাবার আমলের ঠাটটা সমান রাখতে চেষ্টা করে গেছেন ভদ্রলোক।... যদি এখনও 'ভদ্রলোক' বলা হয়।

যে ব্যক্তি শ্মশানে গিয়ে ভস্ম হয়ে গেছে, তাকে আর ভয় কী ? তার সম্পর্কে ন্যায্য কথা আর যে কেউ চট করে বলে না উঠুক ভাদ্রবৌয়েরা বলে উঠলেন। বললেন, তার মানে পরের ধনে লপচপানি করে গেছেন। আর আশ্চর্য বলি, বাপের সম্পত্তি তো সকলেরই, তো উনি একা বাড়ি মর্টগেজ দিলেন যে ? আইন আছে ?

তা নেই। তবে আইনের দায়ে তো ফেলা যাচ্ছে না। কাগজপত্রে নাকি অন্য ভাইদের সই রয়েছে।

কী করে ? জাল করে না কী ?

না তা ঠিক নয়, তবে তাদের সরলতা আর বিশ্বস্ততার সুযোগটি নিয়ে। কী সব কাগজপত্র ভাইদের সামনে ধরে দিয়ে বলেছিলেন বটে, তোরা একবার চোখ বুলিয়ে দেখে একটা একটা সই করে দে। এ ছাড়া তো আর উপায় নেই।

কিন্তু ভাইরা সে কাগজে চোখ বোলানো আবশ্যক মনে করেননি বলে আর কষ্ট স্বীকার করেননি। মনে করেছিলেন, সেই যে একবার কর্পোরেশনের একটা নোটিশ এসেছিল অনেক ট্যাক্স বাড়াবার জন্যে, বড়দা বলেছেন, একসঙ্গে এতোটা বেড়ে যাওয়া ? মগের মুলুক নাকি ? রোসো একটা পিটিশান ছাড়া যাক।... এটা হয়তো সেই পিটিশান বাবদই। এই ভেবেই চোখবুজে সই করেছে। সরল বিশ্বাসেই করেছে।...

সব ব্যাপারেই তো এইভাবে চোখবুজে থেকেছে ভাইয়েরা। সরল বিশ্বাস অবশ্যই, তাছাড়া বরাবরের বোজা চোখ হঠাৎ খুলতেও তো একটা লজ্জা আসে !

ছাপাখানা সম্পর্কেও তো ওই একই ব্যাপার।

কেউ কোনোদিন তাকিয়ে দেখেনি, সেটার আয়-ব্যয়ের অবস্থা কী ?... সংসার-তরণীটি চলে যাচ্ছে দিব্যি তরতরিয়ে, এই তো যথেষ্ট। এবং অন্যায্যও নয়। বাপের বিজনেস, সকলেরই সমভাগ। বাপঠাকুর্দার বাড়ির বেলাতেও তাই।

হ্যাঁ আইন একটা হয়েছে বটে, ছেলেরা এবং মেয়েরা পিতৃসম্পত্তিতে সমান ভাগ পাবে, তবে সে আইন তেমন চালু হয়েছে কই ? যো সো করেই সেটা প্রায়শ নাকচ হয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে সেকেলে প্যাটার্নের বাড়িতে।

সেকেলে তো বটেই। টুসকি যার জন্যে বলে, আসলে পয়সার অভাব নয় রে ছোড়দা, মানসিকতার অভাব। টেলিফোনটা যে সংসারজীবনে একটা অপরিহার্য অংশ, সেটা ওদের মাথাতেই আসে না।

শিলাদিত্য আজকাল হঠাৎ হঠাৎ বোনের কথায় যেন চমকে ওঠে। মনে হয় টুসকির মুখে এ রকম কথা। কবে শিখল ? ...পাকাপাকা কথা বরাবরই কয়, তবে এমন পরিণত কথা কয়

কী ?...তাছাড়া—কেমন যেন একটু বেপরোয়া বেপরোয়া ভাব !

মানিকতলার মুখুয্যেদের সেই বাড়িটাকে নাকি এখন ভেঙে সমতল করে, সেখানে 'বহুতল' বাড়ি উঠেছে।...কিনেছে এক বাজারিয়া না কে যেন !

তা পুরনো বড় বড় ইমারৎটিমারৎ আর কে কেনে ওরা ছাড়া ? এ তো যৎসামান্য একখানা গেরস্থবাড়ি মাত্র, কত কত স্মৃতিমণ্ডিত সৌধই ধূলিসাৎ হয়ে গেল। তাদের আসল বর্মাটিক-এর জানলা দরজা, মেজেয় বিছোনো মার্বেল পাথর। এসবও তো নেহাৎ কম দামে বিকোয় না।

তবে কোন বাঙালির এমন টাকা আছে যে, শুধু কোনো মহৎ স্মৃতি বাঁচাতে একখানা পুরনো বাড়ি কিনে ফেলবে ?... তা ফেলতে পারলে আজ বিদ্যাসাগরের বাড়ির এমন হাল হতো না, এমন হাল হতো না বঙ্কিমচন্দ্রের, কেশব সেনের এবং স্বামীজির বাড়ির।...

যাক সে প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। বলতে বসলে ফুরোবার নয়। বাঙালিচিত্তে ঐতিহ্য সম্পর্কে মূল্যবোধের বড় অভাব। যে হুজুগের তালে ভেসে যেতে পারে, একবার পিছন দিকে তাকিয়ে দেখতে চায় না।... তাছাড়া ঝামেলা ঝঞ্ঝাটহীন নিশ্চিন্ততাই তার একমাত্র কাম্য।

অতএব, মানিকতলার ওই মুখুয্যে বাড়িটা যদি এখন নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়ে সেখানে আকাশছোঁয়া বাড়ি উঠতে থাকে, অবাক হবার কিছু নেই।

মর্টগেজ করা বাড়িকে ছাড়িয়ে নিয়ে, আবার তাতে গুছিয়ে বসে বসবাস করার কথা আর কেউ ভাবলই না। শশাঙ্ক, অশঙ্ক, উতঙ্ক কী শুভ্রাঙ্ক কেউই না। সহজ আর নির্ঝঞ্ঝাট উপায়টাই বেছে নিল বাকি চারজনেই। বাড়িটা বেচে দিয়ে টাকাগুলো ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ করে নিয়ে যে যার আপন আপন ব্যবস্থা করে নিল।

অর্থাৎ চারজনে চারদিকে। নিজের মতো করে বাড়ি কিনে করে নিল। উতঙ্ক তো আবার বাড়িভাড়া করে থাকাই সুবিধে মনে করল।... বলল, টাকাগুলো ফিক্সড রেখে, সেই টাকায় ভাড়াটা যুগিয়ে যাই। আজকালকার দিনে বাড়ি বানানোটা বোকামি। প্রথম কথা তো—ভবিষ্যতে ছেলেবেটারা একান্নবর্তী হয়ে থাকতে চাইবে না, আর তেমন বড় বাড়ি করতেও পারবো না যে আমার তিন ছেলের সংসার ধরবে। তার মানেই বাড়ি 'বিক্রমপুরে'। তাছাড়া প্রধান কথা—বাড়িভাড়া আইনে, ভাড়াটেকে তো আর উচ্ছেদ করা যায় না। বাড়িওলাও যদি মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে দিয়ে চলে যায়, ভাড়াটে ঠিক গ্যাঁট হয়ে বসে থাকবে। তবে আর মিথ্যে কেন, হাতের টাকা খরচ করে বসা ?

উতঙ্ক ভাড়াটে বাড়িতে আছে। এবং সেই সবথেকে ভাল অবস্থায় আছে। বড় বড় তিনখানা ঘরওয়ালা মস্ত ফ্ল্যাট। জীবনযাত্রার সমস্ত সুবিধে হাতের মুঠোয়। এখন অন্য গিন্নীরা নিজ নিজ পতিদেবতাদের বুদ্ধিহীনতার দোষ দেয়। তবে শুভ্রাঙ্ককে কাঠগড়ায় দাঁড় করাবার মানুষটি নেই। সেই বাড়ি নিয়ে ডামাডোলের সময়ই শুভ্রাঙ্ক-গৃহিণী তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ সন্ধ্যাতারার হাতে সংসারটি সঁপে দিয়ে বিদায় নিয়েছেন।

বেলেঘাটার বাড়িটি তখনো তৈরি হয়নি। সেই বাড়িতে সন্ধ্যাতারা অর্থাৎ টুনিই গৃহিণী হয়ে গৃহপ্রবেশ করেছে, শ্বশুর তিন দ্যাওর আর চারখানা ননদকে নিয়ে। তা সেও তো বছর চোদ্দ আগের কথা। তারপর ননদদের বিয়ে হয়ে গেছে। শূন্যপূরণের ক্ষেত্রে এক দ্যাওরের বৌ এসেছে এই যা।

অতএব বেলেঘাটার বাড়িতে টুনির মতে এখন ছোট্ট হালকা সংসার। কিন্তু টুসকি কখনো ওখানে গেলেই বলে, বাবাঃ পিসির বাড়ি যে কত লোক। গিয়ে প্রাণ হাঁপায়।

মা বলে, বাবাঃ। তাহলে পিসির সেই আগেকার সংসারের কথা ভাব ? মানিকতলার বাড়ির ?

তখন টুসকি বলে, সে আর একরকম। তখন যেন মনে হতো ওদের বাড়ির সবাই হাওয়ায়

ভাসছে। এখন মনে হয় পাথর বইছে।

কেন এমন হয় কে জানে!

পুরনো সেই দাসদাসীরা বিদায় নিয়েছে বলে? পাঁচজনের একজনও আর কাজ করতে রাজী হলো না। সকলেই দেশে চলে যেতে চাইল। নন্দ, বৃন্দাবন, সুধীর, মনোরমা, সুখদা। এমনকী বামুনঠাকুরও বলল, আর বাড়িতে কাজ করবে না। কেটারারের অফিসে কাজ করবে।...

তাছাড়া বাড়ির কারুরই আর তেমন ক্ষমতা হলো না তাদের উপযুক্ত চাহিদা আর বদভ্যাস বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাউকে নিজ নিজ ছোট সংসারের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করতে। এখন তো দেখা যাচ্ছে বড়কর্তা আর তাঁর দিদিটি মিলে লোকজনকে কী মাথায় তুলেছিলেন। কে পারবে বাবা সেই জের টানতে। না পারলেই তো ওদের সামনে হেয় হওয়া!

নিরুপমার তাঁবে থাকা গিন্নী-মহিলারা এতোদিন খেয়াল করেননি তাঁরা কী যন্ত্রণার মধ্যে আছেন। দেখেশুনে মনে হতো—দিব্যি আছে। ...একসঙ্গে দু'তিনজন বসে গালগল্প করতে করতে কুটনো কুটেছে, খাবার করেছে, দুধ জ্বাল দিয়েছে, তাড়াহুড়োর সময় গুছিয়ে পরিবেশন করেছে, মনে হতো না কষ্ট আছে।

এখন তারা স্বামীপুত্তুরকে শোনাচ্ছে এযাবৎ প্রখরা ননদ আর খামখেয়ালি ভাসুরের চাপে কী কষ্টেই কাটিয়েছে।

তা সেই প্রখরা ননদটির কী গতি হলো?

তো তাঁর প্রতি কেউ অবিচার করেনি, বাড়ি বিক্রী এবং প্রেস বিক্রীর টাকা থেকে তাঁকে হাজার কয়েক টাকা দিয়ে তাঁর গুরুআশ্রম নবদ্বীপে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে মেছুনির 'আঁশচুপড়ি'। চিরকেলে ঘোরতর সংসারী মানুষ। তাঁর কী আর গুরু আশ্রমে পড়ে থাকা পোষায়? সত্তর বছর বয়সেও তো তিনি তাজা পোক্ত। কাজেই তিনি তখন তাঁর এক মাসতুতো বোনঝির বাড়িতে গিয়ে বসেছিলেন। তাদের লোকাভাব, আগ্রহ করে নিয়েছিল। তাছাড়া নিঃসম্বল নয়, টাকা আছে।

তো সেই বোনঝিকেই জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ পর্যন্ত দেহরক্ষা করেছেন নিরুপমা।

॥ পাঁচ ॥

টুনিদের সংসারের ভাঙনে সবথেকে মর্মাহত হয়েছিলেন নয়নতারা। জামাইবাড়ি যে নিত্যি যেতেন তা নয়, তবে গেছেন মাঝে মধ্যে, তাতেই শতাধিক পাত পড়া পরিবারটি দেখে বিগলিত হতেন নয়নতারা, বলতেন, এমন না হলে সংসার। দেখলে চোখ জুড়োয়, প্রাণ ভরে যায়।

সেই নয়নানন্দকর আর হৃদয়পূর্ণকারী অবস্থাটি যেন ভোজবাজির মতোই উপে গেল, আশ্চর্য!

তাছাড়া আবার মেয়েটা কাছে থেকে দূরে চলে গেল।

আর স্বামীর কাছে দুঃখ করে বলেছেন, টুনির শ্বশুর ঘরটা দেখে আমার পাবনার দুঃখটা কম হয়ে যেতো। সেই ঘর এমন হয়ে গেল! তো অদের তো কেউ তাড়ায় দেয় নাই, তবু অরা সাদ করে বাস্তুহারা হলো। এরেই কয় কপালের লিখন।

তা সে সব তো অনেকদিনের কথা হয়ে গেল। সময়ে সবই সয়ে যায়! ...সত্যব্রতর জীবনে যে অভিশাপটি নেমে এসে তাঁকে কর্মহীন উপার্জনহীন নিরুপায় করে তুলেছিল, তাও তো ক্রমশ সয়ে যাচ্ছে।

মানুষটাকে যে তাঁর ছেলে-বৌ আদর-যত্নের ছলে সংসারচ্যুত করে উঁচু তাকে তুলে রেখে আত্মপ্রসাদ অনুভব করে তাও তো দেখে বুঝে সহ্য করে নিতে হয়। এক এক সময় ইচ্ছে হয় টুনির

কাছে গিয়ে বসি দুদণ্ড। দেখি ওরা অদের বুড়ো বাপটাকে কেমনভাবে রেখেছে।... কিন্তু আশ্চর্য মুখ ফুটে কোনোদিন বলতে পারেন না কাউকে, আমার একটু টুনির বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয়। আর দেখতে ইচ্ছা হয়। এমনকী সত্যব্রতর কাছেও বলতে পারেন না।

টুনিও তেমনি। একবার আসে না।

নিজেকে প্রকাশ করা নয়নতারার স্বভাব নয়, তবু এদিন 'স্বপ্ন' দেখার কথাটা বলে ফেললেন। যার ফলে শিলাদিত্যর হঠাৎ প্রতিশ্রুতি দিয়ে বসা, আচ্ছা আজ না হয় একবার বেলেঘাটা ঘুরে আসবো।

কে ভেবেছিল, যাওয়াটা এমন আরামের হয়ে যাবে। শিলাদিত্য যখন বেরোবে বলে চুলে শেষ চিরুনি চালাচ্ছে, ঠিক সেই সময় তারক এসে খবর দিল, ছোড়দা আপনার সেই বন্ধুটি এসেছে।

সেই বন্ধু মানে? কোন বন্ধু?

সেই যে গাড়িবান বন্ধু। মাঝে মাঝে আসে, নিচতলার ঘরে বসে দিদির সঙ্গে গল্প করে চলে যায়।

কথার ভঙ্গিতে হাড় জ্বলে গেল। তবু কষ্টে সামলে নিয়ে বলল, আচ্ছা বসতে বলগে যা, যাচ্ছি।

যুধাজিৎ বলল, তুই বাবা সেই যে ডুমুরের ফুল নাকী যেন বলে, দেখছি তাই হয়েছিস। তবু ভালো যে আজ দেখা হলো। উঠে আয় গাড়িতে যেতে যেতে কথা হবে।

শিলাদিত্য বলল, বাঃ বাড়িতে এলি, একটু বোস। এক কাপ চা অন্তত গরীবের বাড়িতে খেয়ে যা।

খুব প্যাঁচানো কথা শিখেছিস। দেখে তো মনে হচ্ছে বেরোচ্ছিলি।

তা বেরোচ্ছিলাম। তবে দু'মিনিট দেরিতে কিছু এসে যাবে না। বোস টুসকিকে একটু চায়ের কথা বলে আসি।...

সেই নিচের ঘরেই বসিয়ে চলে যেতে যায়।

যুধাজিৎ বলে, কোথায় যাচ্ছিলি?

এমন কোথাও নয়, পিসির বাড়ি।

থ্যাঙ্কস। মাসি-পিসির সঙ্গে যোগসূত্র রাখিস তাহলে? তা সে বাড়িটা কোথায়?

বেলেঘাটায়।

মাই গড।

হঠাৎ গডকে স্মরণ কেন?

আরে আমিও তো ওইখানেই যাচ্ছি।

শিলাদিত্যর হঠাৎ মনে হলো এটা যেন যুধাজিৎ বানিয়ে বলল। কেন মনে হলো কে জানে? তবু বলল, তাহলে ভালই হলো। বাসের ভিড়ে পেষাই হয়ে যেতে হবে না। দিব্যি তোর মারুতি চড়ে পাড়ি দেওয়া যাবে। কিন্তু তার আগে চা-টা খেতেই হবে।

আসলে শিলাদিত্যর মনে হলো, বেচারী টুসকি যদি শোনে (শুনবেই তারক মারফৎ) যুধাজিৎ এসেছিল, ছোড়দা তার সঙ্গে বেরিয়ে গেছে, খুবই মনঃক্ষুণ্ণ হবে।... এই মনঃক্ষুণ্ণ হওয়াটা ন্যায্য কিনা, এবং তাতে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কিনা ততোটা খেয়াল করল না। মমতাটাই প্রধান হয়ে উঠল।

তাই বলল, বোস আসছি।

এই। কিন্তু শুধু চা। আর কিচ্ছু নয়।

আর কোথায় কি পাচ্ছি ? নেহাৎ টুসকিটা বাড়ি রয়েছে তাই, চা-টা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত।... নির্ভয়ে অফার করলাম।

ঢুকে এল বাড়ির মধ্যে। উঠে এল দোতলায়।

এই চট করে দুকাপ চা বানিয়ে ফেলতে পারবি ? ইচ্ছে করলে তিন কাপও করতে পারিস, তৃতীয়টা তোর পারিশ্রমিক স্বরূপ।

টুসকি বলল, বেরোচ্ছিলি, আবার এখন চা ? কেউ এসে হাজির হলো বুঝি ?

সেই তো !... শিলাদিত্য খুব ইনোসেন্ট মুখে বলে, সেই যুধাজিৎ। আর এক মিনিট পরে এলে আজও দেখা হতো না। দে বাবা কষ্ট করে একটু চা করে দে।

যুধাজিৎ-এর নাম উল্লেখ মাত্রই যে মেখলার মুহূর্তে মুখে হাজার বাতির আলো ফুটে উঠলো, চোখ এড়াল না শিলাদিত্যর। তবু ঢং করেই ওই 'কষ্ট করা' শব্দটি ব্যবহার করল।

মুখের আলো মুছে ফেলা যায় না, কারণ সেটা সামনে আয়না থাকা ব্যতীত নিজে অনুভব করা যায় না। তবে গলার স্বরে বেশ নিস্পৃহতা এনে বলল মেখলা, আহা চা বানানো যেন মস্ত একটা কিছু ব্যাপার। সব সময়ই করছি না ? তবে বাঁচা গেল বাবা তুই বাড়ি থাকায়। নইলে আজও আমায় ভগ্নদূতের মতো বলে উঠতে হতো, ছোড়দা তো বাড়ি নেই।

ঘরের মধ্যে থেকে হঠাৎ নীহারিকা বেরিয়ে এল। দিবানিদ্রার পরও আলস্যে গড়াচ্ছিল একটু। বলল, এসময় আবার চা চা শুনছি যে ? চারটে বাজলেই তো তারক এসে চা করবে।

তার আগে আমি বেরিয়ে যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছিস ?

ওঃ মা। তোমার এই ব্যাড্ হ্যাবিটটা কী কিছুতেই ছাড়তে পারবে না ? বেরোতে দেখলেই কোথায় যাচ্ছিস, কেন যাচ্ছিস, কখন ফিরবি—। উঃ ? যাচ্ছি পিসির বাড়ি, কখন ফিরবো জানি না।

হঠাৎ পিসির বাড়ি ? সেই বেলেঘাটায় ! কারো অসুখটসুখ নাকি ?

নীহারিকার কণ্ঠে একটু উদ্বেগ।

ওঃ মা। শুধু আপনার লোকের কাছে অসুখেই যেতে হয় ? 'সুখে' যাওয়া যায় না ? এমনিই যাচ্ছিলাম। সুবিধে হয়ে গেল একজন বন্ধু তার গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে ওদিকে, আমায় পৌঁছে দিতে পারে।

নীহারিকার মুখেও হঠাৎ একটু আলো ফোটে। বন্ধুর নিজের গাড়ি ?

তা নিজেই যখন চালাচ্ছে।

আহা রে। একটু আগে জানতে পারলে, আমি চলে যেতাম তোর সঙ্গে।

তুমি। আমার সঙ্গে। পিসির বাড়ি !

আকাশ থেকে পড়ছিস কেন বাবা ? আগে যেতাম না ? যখন কাছাকাছি ছিল।... এখন আর অতটা রাস্তা বাস ঠেঙিয়ে—

শিলাদিত্যর অবশ্য মায়ের প্রস্তাবটি আদৌ পছন্দ হলো না, তবু বলল, যেতে চাও তো চট করে একটা ফর্সা শাড়ি পরে নিয়ে চলে যেতে পারো। তবে ফেরার সময় গাড়ির গ্যারান্টি নেই।

নীহারিকা বেজার গলায় বলে, দূর, আমার কী আর অমন হুট করে বেরোনো সম্ভব ?

অসম্ভব কিসে ? তারকই তো সব করে।

ও। তাই ভাবিস তোরা। তারকই সব করে। মা খাটে বসে থাকে। হুঁঃ।

তবে আর কী করা ? এই টুসকি, আমি নিচে আছি, চা-টা হলে নিয়ে যাস।

একটা গাড়িবান বন্ধুকে শুধু চা।

নীহারিকা বলে, চায়ের সঙ্গে কী দিবি ?

কিছু না। বারণ করে দিয়েছে। বেশী হ্যাঙ্গামায় কাজ নেই। বলে নেমে যায় শিলাদিত্য।

সাবধানে দু'হাতে ভর্তি দু'পেয়ালা চা নিয়ে এসে টেবিলে নামাবার আগেই যুধাজিৎ তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে একটা ধরে নেয়। বাকিটা শিলাদিত্যর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে মেখলা অভিযোগের গলায় বলে ওঠে, তুই এমন জোর দিয়ে 'শুধু চা, আর কিছু না' বলে এলি ছোড়দা যে, ভয়ে ভয়ে সত্যিই কিছু আনলাম না। ধ্যাৎ।

যুধাজিৎ একটু হেসে বলল, 'নির্ভয়' হতে হলে তো আপনাকে চতুর্ভুজা হতে হতো।

আহা ! একটা ট্রের ওপর অনেক কিছুই বসিয়ে আনা যায় ! কাউকে শুধু চা দিতে খারাপ লাগে না বুঝি ?

শিলাদিত্য পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে বলল, তা কী করব ? এই যুধাজিৎটা এমন স্ট্রিক্টলি অর্ডার দিল—

সরি।

যুধাজিৎ বলল, সেটা যে এমন একটা 'খারাপ লাগার' ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে, তা ভাবিনি। যাক ভবিষ্যতে না হয় একদিন অপরাধের শাস্তি মাথা পেতে নিয়ে, মন ভাল করার ভূমিকাটা গ্রহণ করা যাবে। তবে একটি শর্ত। চায়ের সঙ্গে ওই 'টা' জিনিসটা বাজার-চলতি রেডিমেড কিছুতে রাজী নই। সেই 'টা'-টি তাহলে নিজে হাতে বানিয়ে সার্ভ করতে হবে।

মেখলা বলল, অতি উত্তম প্রস্তাব। তবে আমারও শর্ত। তার জন্যে একটু সময় দিতে হবে। এসেই অভ্যাসমতো 'আচ্ছা চলি' বললে চলবে না।

যুধাজিৎ শব্দ করে হেসে ওঠে, সে কী ? আধুনিকাদের আবার কোনো কিছুতে 'সময়' লাগে নাকী ? গল্পের নায়িকা-টায়িকারা তো আধ মিনিটের মধ্যে চা এবং তার সঙ্গে দারুণ দারুণ সব 'টা' বানিয়ে নিয়ে এসে টেবিলে বসিয়ে দেন।

ও গল্পের। বাদ দিন। গল্পের গরুরা তো গাছেও ওঠে। একটু হেসে বলে ওঠে মেখলা।

শিলাদিত্য তার ছোট্ট বোনের এমন চটপট স্মার্ট জবাবে মনে মনে বেশ খুশিই হয়। আসলে অনেক দিন পরে দেখা হয়ে যাওয়া ওই গাড়িবান বন্ধুর সঙ্গে বাক্যালাপ করতে গেলেই শিলাদিত্য ভিতরে ভিতরে কেমন যেন একটা হীনমন্যতার শিকার হয়ে পড়ে। অন্যদের সঙ্গে যেমন ছুরির ধারে কথা বলতে পারে, যুধাজিতের কাছে ঠিক তেমনটি হয়ে ওঠে না। কিন্তু মেখলা থাকলে যেন এই বন্ধুসঙ্গটিতে একটা নতুন মাত্রা যোগ হয়ে যায়। অতটা হীনমন্যতা আসে না।

শিলাদিত্য নিজে যেন 'কিছুই না'। অথচ সঙ্গে মেখলা থাকলে 'অনেক কিছু'। কেন এমন হয় কে জানে ! তবে হয়। তাই শিলাদিত্য দুম করে বলে বসে, এই টুসকি, তোরও কী মা'র মতো সংসারজ্বালা ?

মানে ?

মানে দেখলি না তখন ? মাকে বললাম, মুফতে একখানা গাড়ির সুযোগ পেয়ে গিয়ে পিসির বাড়ি যাচ্ছি, তুমিও যাবে তো বলো। তো মা হাজার খানেক কাজের ফিরিস্তি শুনিয়ে দিল।

ওসব মা'র মনগড়া। নিজেকে সর্বদাই খুব দরকারি মনে করতে ভালবাসে। আর সেটা সবাইকে বুঝিয়ে ছাড়তে চায়।

যুধাজিৎ হেসে ফেলে বলে, মাকে তো বেশ স্টাডি করে ফেলেছেন ?

ওই তো 'কাজ' ওটার। সব্বাইকে স্টাডি করে চলা।

সর্বনাশ। তাই না কি ? তাহলে তো সাবধান হতে হয়।

টুসকি বলল, 'সাবধান' হওয়াটা তো আরোই সন্দেহজনক। তবে ছোড়দার কথা ছাড়ুন। মোটেও ওটাই 'কাজ' নয় আমার। তো হঠাৎ আমার 'সংসার জ্বালার' কী দেখলি রে ছোড়দা?

দেখিনি। 'শুধাচ্ছি'। না থাকে তো তুইও ঘুরে আসতে পারিস।

যুধাজিৎ খুব নিরীহ গলায় বলে, শিলাদিত্যর পিসির সঙ্গে আপনারও কোনো রিলেশান আছে বুঝি?

শিলাদিত্য মনে মনে হাসে। প্রশ্নর প্যাঁচটা ধরতে পারে। তবে মেখলা অবশ্য পারে না। বড় বেশি অবাক হয়েই তাকায়। আর বলে ওঠে তার মানে? ছোড়দার পিসি আমারও পিসি না?

যুধাজিৎ আরো নিরীহ গলায় বলে, আমারও তো সেই ধারণাই ছিল। কিন্তু আপনার 'ছোড়দা' তো পিসি পিসি করে ছুটছে, অথচ আপনার সে সম্পর্কে কোনো উৎসাহই নেই। বরং ছোড়দাই যেতে সাধছে। তাই ভাবছি—ব্যাপারটা কী?

শিলাদিত্য আর একবার মনে মনে হাসে। পথে এসো মানিক। তোমায় স্টাডি আমিই বেশ ভালোভাবে করছি।

মেখলা বেচারী এইসব উল্টোপাল্টা কথায় আরো উত্তেজিত হয়ে বলে, ওঃ, এখন তো ছোড়দা বাবু সাধছেন। কত বলি, সাতজন্মে নিয়ে যেতে চায়?

নিয়ে যেতে? মাই গড়! এ যুগে আবার ওই 'নিয়ে যাবার' প্রশ্নটি ওঠে নাকি! মেয়েরা কী এখনো তার ধার ধারে?

মেখলা তার চেষ্টাকৃত স্মার্টনেস ভুলে গিয়ে বলে ওঠে, না, ধার ধারে না! জানেন না তো আমাদের বাড়িটি কী? এখনো মধ্যযুগে পড়ে আছেন সব। কেবলমাত্র কলেজে কি গানের স্কুলে ছাড়া একা কোথাও যেতে চাইলে বাড়িসুদ্ধ সকলের চোখ কপালে উঠবে।

তাই না কী?... যুধাজিৎ একটু হেসে বলে, এই শিলাদিত্য, এখনো এই অচলায়তনটি ভাঙতে পারছিস না?

চেষ্টা তো চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু 'প্রস্তরদুর্গ'। যাকগে, এখন তো আর 'একা' যাওয়ার প্রশ্ন নেই। সঙ্গে দু দুজন রক্ষী। যাবি তো চল। মাকে বলে আয় চটপট। একটুও দেরি করবি না।

যুধাজিৎ তার নিজস্ব ভঙ্গীতে বলে, কী যে বলিস শিলাদিত্য! মেয়েদেরকে এমন 'চটজলদি' বেরিয়ে পড়তে বললেই হলো? প্রসাধনের জন্যে বেশ খানিকটা সময় দিতে হয় না? বিনা প্রসাধনে বাইরে বেরনো?

প্রসাধন?

মেখলা রেগে উঠে বলে, আপনিই দেখছি 'মেয়েদের' সম্পর্কে অনেক স্টাডি করেছেন। মেয়েরা সবসময় 'প্রসাধন' করে, কেমন? এই ছোড়দা, তুই গিয়ে মাকে বলে আয় আমিও যাচ্ছি তোর সঙ্গে। আমি এখানেই বসে রইলাম। যেমন আছি তেমনিই যাব।

তা যাবি তো যাবি। মাকে বলে আসাটা অন্ততঃ—

কখখনো না। আমি এই বসে রইলাম। তুই যা। গিয়ে বলে আয়।

শিলাদিত্য আবার মনে মনে হাসে, হুঁ! নাটক জমে আসছে মনে হচ্ছে! মুখে বলে, ঠিক আছে। চলে যায়।

যুধাজিৎ কৌতুকের গলায় বলে, টুসকি দেবী, আপনি কিন্তু দেখছি দারুণ রাগী।

দেখছেন?

টুসকি ভুরু কুঁচকে বলে, তবু রাগ বাড়াবার চেষ্টা করতেও ছাড়েন না। 'টুসকি দেবী', কী অপূর্ব একখানা ডাক।... কেন, আমার ভাল নামটা কী খুব লম্বা-চওড়া? ডাকতে অসুবিধে? সেও তো

তিনটে মাত্রই অক্ষর।

চটে যাচ্ছেন ? কিন্তু আমার মতে, আপনার ওই 'ভালো নামের' থেকে ডাকনামটি অনেক সুন্দর। আর—নাঃ, বলব না। আবার চটে যাবেন।

গেলেই বা আপনার কী ক্ষতি ? চটে গিয়ে তো আপনাকে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হবে না। বলেই ফেলুন।

বলছেন ? তাহলে বলি, এই ডাকনামটি আপনার মেজাজের বেশ মানানসই। যেন একটি টুসকি লাগলেই পাকা আঙুরের মতো বা ভীষণ পেকে যাওয়া টোম্যাটোর মতো ফেটে আটখানা হয়ে যাবেন।... আরে এই শিলাদিত্য, নিজে এই ফাঁকে চুলে একটু চিরুনি বুলিয়ে এলি মনে হচ্ছে।

যাঃ। ছোড়দাটা এসে গেল। ওই 'পাকা আঙুরের' মতো অনাসৃষ্টি কথাটার একটা জুৎসই উত্তর দেওয়া গেল না।... লোকটা কী ধরনের বোঝা দায়। আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার জন্যে চেষ্টা করে এইসব আজেবাজে রসিকতা করতে চেষ্টা করছে, না কি আমাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে চায় ? উন্নাসিকরা যেমন সকলকেই ডাউন করবার তালে থাকে।

শিলাদিত্য ততক্ষণে কথার জবাব দেয়, এলামই তো। আবারও দেব। চিরুনি অলওয়েজ আমার পকেটে থাকে।

টুসকি বলল, পকেটে না বলে, অলওয়েজ হাতে থাকে বললেই ভাল হয় ছোড়দা।...জানেন, আপনার এই বন্ধুটির চুলে চিরুনি চালানো একটা মুদ্রা দোষ। কথা বলবে, আর চুলে চিরুনি চালিয়ে চলবে। দেখে বাবা এক এক সময় যা রেগে যায়।

বাবার কথা বাদ দে। বাবা কিসে না রেগে যায়। এই যে আমরা বেরোচ্ছি--অফিস থেকে ফিরে শুনেই একপালা রাগ করবে।

যুধাজিৎ অবাক হয়ে বলে, কেন ? ওনারই তো সবথেকে আপনজন বোনের বাড়ি।

তাতে কী ? রাগ করবার একটা স্কোপ তো পাওয়া যাবে।...'বেলেঘাটা জায়গাটা খারাপ, সন্ধ্যের দিকে যাবার কী দরকার ?' এইসব আর কী।

এ ধরনের নিতান্ত ঘরোয়া কথায় কোনো কথা বলা সাজে না, তাই যুধাজিৎ গাড়ি চালানোটার প্রতি বেশি মন দেবার ভান করে।

আর মেখলা একটু বিষ গলায় বলে ওঠে, আসলে বড় ছেলেটি একেবারে নাগালের বাইরে চলে যাওয়ায়, বাবার সর্বদাই আতঙ্ক।

যুধাজিৎ এ প্রসঙ্গেও কিছু বলে উঠতে পারে না। কারণ মেখলাদের 'দাদা' সম্পর্কে বেশি কিছু জানেও না।...

গাড়িটা ছাড়ার কিছুটা পরেই শিলাদিত্য বোধকরি হঠাৎ গুমোটটা কাটাতে নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে ওঠে, এই টুসকিটিকে যাবার জন্যে অফার দিয়ে নিজের ক্ষতিই ডেকে আনলাম।

টুসকি ভুরু পাকিয়ে বলে, তোর আবার কী ক্ষতি হলো এতে ?

হলো না ? এতোদিন পরে গেছি দেখে পিসির বাড়িতে 'শিলু এসেছে, শিলু এসেছে' বলে বেশ একখানা সাড়া পড়ে যেতো, তুই গিয়ে দাঁড়ালে আর কেউ আমার দিকে তাকাবে ? বাড়িসুদ্ধু সব্বাই এসে তোকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়াবে আর কথার ঝরণা বওয়াবে, আমাকে পাত্তাই দেবে না। আমি স্রেফ ফালতু বনে যাবো।

. যুধাজিৎ স্টিয়ারিংটা আলতো ধরে মুখ ফিরিয়ে বলে, এরকম ঘটনা ঘটে না কী ?

মেখলা বলে, কেন ওর বাজে কথায় কান দিচ্ছেন ?

বাজে কথা? এই টুসকি ঠিক করে বল, এইরকমই হয় কিনা? তুই গেলে বাড়ির জনা কুড়ি লোকই তোকে ঘেরাও করে ফেলে কিনা? নিজের পিসিই কাছে আসতে পায় না। সমবেত স্বরে সবাই বলে ওঠে, 'টুসকি, তুমি কত বড় হয়ে গেছ? ও বাবা! টুসকি একটি লেডি হয়ে গেছে। ওমা, টুসকি তুই কী সুন্দর হয়েছিস?' ইত্যাদি প্রভৃতি। বলে না?

সে আমি অনেকদিন পরে পরে যাই বলে। তোর কেবল বাকতাল্লা। পিসেমশাই তো তোকেই বেশি বেশি—

হ্যাঁ, ওই একজন আছেন। ভদ্রলোক যাকে বলে একেবারে পারফেক্ট 'ভদ্রলোক'। সকলের প্রতি সমদৃষ্টি।

মোটেই না। তোর প্রতি অধিক দৃষ্টি।

হ্যাঁ, তাও বলতে পারিস। ...শিলাদিত্য একটা কপট নিঃশ্বাস ফেলে বলে, আমাকে যেভাবে কবলিত করে ফেলে তাঁদের 'অতীত গৌরবগাথা' শোনাতে পারেন, সেভাবে তোকে পেরে ওঠেন না। তুই দিব্যি ক্লাস কেটে বেরিয়ে আসতে পারিস।

সে আমায় অন্যরা ডাকাডাকি করে বলে।

ওই তো। ওই কথাই তো হচ্ছে। অন্যরা তোকেই ডাকাডাকি করে। আমাকেও যে একটু ডাকাডাকি করে উদ্ধার করা প্রয়োজন, তা কেউ ভাবেই না।

ভাইবোনের এই সরব এবং সরস ঘরোয়া আলোচনাটি যে তৃতীয় ব্যক্তির উপস্থিতির পটভূমিকাতেই এতো জমজমাটি হচ্ছে তাতে সন্দেহ নেই। এরকম হয়েই থাকে। একজন তৃতীয় ব্যক্তির কাছে নিজেদেরকে বিকশিত করবার এটিই প্রায় প্রধান উপায়। এ ব্যাপার প্রায় সবক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। ...বাইরের কেউ উপস্থিত থাকলে, 'গোমড়ামুখো' দম্পতিও দু'জনে কপট কলহে পরস্পরকে দোষারোপ করে করে বলেন, 'দেখছিস তো ব্রাদার, হতভাগ্য কী অবস্থায় আছে?' ...'দেখছিস তো ভাই, কী মালটি নিয়ে এতোদিন ঘর করছি!'

কেউ কেউ বা (সাধারণতঃ প্রৌঢ় কর্তা-গিন্নী) আক্ষেপের গলায় বলেন, 'সময়ে খেয়াল হলে কবে ডিভোর্স করে বসতাম।' কিংবা 'আহা আমাদের কালে যদি ডিভোর্সটা এতোটা চালু হতো!' ...এ সবই সাজানো কথোপকথন। ...পরিবেশে সরসতা আনার উপায়। বাইরের লোকটি বিদায় নিলেই, আবার নিজমূর্তি গোমড়া মুখের অথবা উগ্রমূর্তির চাষ। ...তখনো পরস্পরকে দোষারোপই চলবে, তবে সেটা সরসও নয়, শখেরও নয়।

তবে এদের ভাইবোনের মধ্যে অবশ্য তেমন কিছু হবে না, তাহলেও এটা নিশ্চিত, শিলাদিত্যর ও টুসকির বাকবৈদগ্ধ অনেকটাই নিজেকে বিকশিত করার একটি পথ। হয়তো বা অবচেতনেরও কাজ রয়েছে কিছু।

শিলাদিত্য তার নিজের 'তুচ্ছ' ভূমিকাটিকে যেন কৌতুকছলে অধিকতর 'তুচ্ছ' দেখিয়ে, ভিতরের হীনমন্যতাটিই ঢাকতে চায়।

একটু চুপচাপ।

এক সময় আবার যুধাজিৎ বলে উঠল, এই ঠিক আসছি তো?

এখনো পর্যন্ত জলের মতো। আর খানিকটা সোজা চল।

বাঁক নেবার সময় দেখিয়ে দিবি।...

শিলাদিত্য হেসে উঠে বলে, মোড়ের মাথা থেকেই তাঁরা নিজেরাই জানান দেবেন।

তার অর্থ?

অর্থ এই, আমার পিসে-কোম্পানীর ভাইয়ে ভাইয়ে মধুরালাপই পাড়ার লোককে চমকে দেবার

মতো। উচ্চস্বরে ছাড়া কথা বলতেই জানেন না ওনারা। কাজের লোকদের ডাক দেন যেন আলমগীর হাঁক পাড়ছেন। তাস খেলতে বসলে তো কথাই নেই।

ভাইয়ে ভাইয়ে বুঝি খুব ভাব?

দারুণ।

অনেক লোক বাড়িতে?

ঈশ্বর কৃপায় জনা কুড়িকে তো বটেই, বেশিও হতে পারে।

যুধাজিৎ বলে, শুনে ভাল লাগল। আজকাল তো এমন একখানা বড় সাইজের জয়েন্ট ফ্যামিলি দেখতেই পাওয়া যায় না।

মেখলা হেসে উঠে বলে, এ আর কী? এ তো ওনাদের একদার আসল সংসারের ভগ্নাংশ মাত্র। আগে তো ওনাদের সেই আসল সংসারটি আমাদের বাড়ির প্রায় কাছাকাছিই ছিল ; হ্যাঁ বেশ কাছেই। ছেলেবেলায় সর্বদাই গেছি সেখানে, প্রত্যেক দিনই মনে হতো একটা ঘটার বিয়ে বাড়িতে এসেছি। ...বলে হেসে উঠে বলে, একই পরিবারে তিন জেনারেশনের লীলাখেলা।

যুধাজিৎ একটু ভারী গলায় বলে, অথচ হঠাৎই মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ কীরকম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এভাবে মিলেমিশে থাকার কথা এখন আর কেউ ভাবতেই পারে না।

শিলাদিত্য হেসে উঠে বলে, শুধু 'ভাবতে না পারা নয়', ভাবতে গেলে শিউরে ওঠে। সত্যি বলব, আমারই তো এই পিসির বাড়িতে বেশিক্ষণ থাকলেই হাঁফ ধরে যায়। মনে হয়, বাবাঃ, এই বাড়িতে যদি আমায় থাকতে হতো!

তার মানে আমরা ক্রমেই আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছি, অপরকে সহ্য করতে পারছি না, ভালবাসবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলছি। অথচ 'সংহতি উৎসব' করছি। পাশের প্রতিবেশীটিকে চিনতে পর্যন্ত চাইছি না, আর 'বিশ্বভ্রাতৃত্বের' বুলি আউড়াচ্ছি! ক্রমশঃই কৃত্রিমতার শিকার হয়ে চলেছি। ...কিন্তু কিছুকাল আগেও 'সরলতা' বলে একটা শব্দ ছিল আমাদের সমাজ-অভিধানে।

সে যা বলেছিস। ...শিলাদিত্য হেসে ওঠে, আগে নাকি 'গ্রাম্য সরলতা' বলে একটা পবিত্র বাক্য ছিল অভিধানে। ...এখন দেখগে যা, গ্রামের লোকই হচ্ছে একের নম্বরের ঘুঘু ঘোড়েল। হলেও নিরক্ষর তারা তোকে আমাকে এক হাটে বেচে অন্য হাটে কিনতে পারে।

মেখলা বলে ওঠে, এই ছোড়দা। এখন তত্ত্বকথা থামা, এসে গেলাম বোধহয়। ওই মসজিদটার পরের মোড়টায় না?

শিলাদিত্য সচকিত হয়।

এ মসজিদটা নয়, আর একটু এগোলে আরো একটা ছোটমতো মসজিদ আছে, তার পরেই।

মসজিদের প্রাধান্যটা এখানে একটু বেশি, তাই না?

খুবই স্বাভাবিক। যেখানে যাদের ঘনতা। বলে শিলাদিত্য বলে ওঠে, তোর গন্তব্যস্থল কোনদিকে? ছাড়িয়ে এলি না কী?...

নাঃ, আর একটু যেতে হবে। ...বলে যুধাজিৎ গাড়ির গতি একটু কমিয়ে বলে, আমার এদিকে ঘণ্টা দুই মতো কাজ আছে, তার মধ্যে বোধহয় তোদের ফেরা সম্ভব হতে পারে? নাকি শ্রীমতী টুসকি দেবীকে নিয়ে নাচানাচি তখনো মিটবে না?

আবার 'টুসকি দেবী'। তার ওপর আবার 'নাচানাচি'। লোকটা কী আসলে খুব দাম্ভিক? অন্যকে ডাউন করতে পেলে আর কিছু চায় না? মেখলা রেগে উঠে বলে, 'নাচানাচি' মানে?

যুধাজিৎ খুব অমায়িক গলায় বলে, ওই যে শিলাদিত্য বলল, আপনাকে দেখলে এককুড়ি জন ছুটে আসে সম্বর্ধনা জানাতে।

ছোড়দার যত বাড়াবাড়ি! সব্বাই আমায় ছোট্টবেলা থেকে দেখেছে, তাই ভালবাসে।

যুধাজিৎ বলে, সেই কথাই তো হচ্ছিল। তবে এখনো কিছু কিছু সেকেলে প্যাটার্নের সাবেকি লোক আছে সংসারে, যারা এখনো ভালবাসবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেনি, তাই—

তা ঠিক।

মেখলা বলে, এ বাড়িটা এখনো বেশ সেকেলে ধরনের রয়ে গেছে। ...হি হি করে হেসে বলে, জানেন, এদের ছোটবড় দু' দুটো ফ্রীজ আছে। তার একটা বিশুদ্ধ, আর একটা অতি বিশুদ্ধ। ...রান্নাটান্না করে তার মধ্যে তুলে রাখার প্রশ্নই নেই। আর মাছ কিনে ফ্রীজে রেখে দিয়ে রোজ রোজ বাজার করার হাত এড়ানোর কথা মনের কোণেও ঠাঁই দেন না। তাতে নাকি মাছ মাংসয় ফ্রেশ স্বাদ থাকে না। বুঝুন?

বুঝলাম। তবে শুনে নিজের সিদ্ধান্তে দৃঢ় হচ্ছি।

সেটা কী হলো? সিদ্ধান্তটা কী?

শুনে হাসবেন।

তা না হয় একটু হাসালেনই!...

আমার ধারণা মানুষ যত বেশি 'বিজ্ঞ' হয়ে উঠছে তত বেশি হৃদয়বর্জিত হয়ে যাচ্ছে! এখানে 'বিজ্ঞতার' কিছু অভাব আছে বলেই বাড়ির একজনের আত্মীয়কে, সকলে 'আত্মীয়' বলে গ্রহণ করতে পারেন। হৃদয়ের সেই উদারতাটি রয়ে গেছে। এ যুগের সংসারে এ 'ছবি' বিরল!

আপনি দেখছি, সমাজচিন্তায় খুব মাথা ঘামান! ...বলে মেখলা একটু হেসে কথা শেষ করে, তর্ক করতে বসলে সুখ আছে। কিন্তু এখন তো—

হ্যাঁ।

বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে গাড়ি।

সেকেলে টাইপেরই বড়সড় দোতলা বাড়ি। কেনা বাড়ি যেমন হয়।

যুধাজিৎ বলল, ঘণ্টা দুই পরে এসে খোঁজ নেব—ঘণ্টা আড়াইও হয়ে যেতে পারে। ব্যস্ত হয়ে চলে যাবি না তো?

শিলাদিত্যের মনে হলো, যুধাজিতের এই এ অঞ্চলে 'কাজ থাকাটা' সম্পূর্ণই বানানো। তাদের জন্যেই আসা এবং 'অপেক্ষা'র ভান। ...কেন মনে হলো কে জানে। ওই হঠাৎ 'গাড়িবান' হয়ে যাওয়াকে যেন ঠিক মন থেকে সহৃদয়ে নিতে পারছে না। মনে হচ্ছে ও 'অনুগ্রহ' দেখাতে চায়, তবে মোলায়েম মোড়কে পুরে। তাহলে—এই চাওয়াটার একটা উদ্দেশ্যও আবিষ্কার করতে হয়। সে উদ্দেশ্য আর কিছু নয়, 'মেখলা'। ...অতএব শিলাদিত্য 'উপকার পাচ্ছি' ভাবটা মুছে ফেলতে চেষ্টা করবে।.... ধারণা হয়ে গেছে, এমন 'উপকার' করতে যুধাজিৎ যখন তখনই এগিয়ে আসবে অন্য ছুতো দেখিয়ে, মধুর মিথ্যের মোড়ক দিয়ে। ...নিজের সুন্দরী বোনটি সম্পর্কে মনে মনে বেশ একটু গর্ব অনুভব করে শিলাদিত্য। ...বলতেই হবে 'আত্মমর্যাদা' সম্পর্কে অসচেতন শিলাদিত্য। এই চিন্তাধারাটি যে প্রশ্রয়ের উপযুক্ত নয়, সেটা শিলাদিত্যর বোধের জগতে আসে না।

তবে শিলাদিত্যর অঙ্ক কষাটা একেবারে ভুল নয়। আজকের এই সামান্য অভিযানটুকু যে যুধাজিৎ-এর 'ছলনা' দিয়ে গঠিত হলো তাতে সন্দেহ নেই। শিলাদিত্যর পিসির পাড়ায় লেশমাত্রও কাজ ছিল না যুধাজিতের। এখনো 'ঘণ্টা দুই আড়াই সময়' বিনা কাজেই, অকারণ ঘুরে ব্যয় করবে। হঠাৎই খেয়াল চেপে গেল তাই এই গল্প বানানো।

অবশ্য অস্বীকার করা যাবে না শিলাদিত্যর ওই 'বোকাটে স্মার্ট' সুন্দরী বোনটি সম্পর্কে একটু

আকর্ষণ অনুভব করতে শুরু করেছে। বলতে গেলে প্রথম দিন থেকেই।

হয়তো 'বোকাটে' বলেই মিষ্টত্ব আছে। মানে সত্যিই লাবণ্য আছে। কাছাকাছি এলে বেশ একটু ভাললাগা ভাললাগা ভাব এসে যায়।

তবে এখন, ওদের নামিয়ে দিয়ে চলে আসার পর উদ্দেশ্যহীনভাবে গাড়িটা নিয়ে এগোতে এগোতে মনটা কেমন ভারাক্রান্ত লাগছে। অজানা অচেনা একটা পরিবারের 'ভাইয়ে ভাইয়ে দারুণ সৌহার্দ্যর খবরটা মনটাকে ক্ষুব্ধ বিচলিত করে তুলল।

কেন ? কেন ? যুধাজিতের ভাগ্যেই বা একেবারে বিপরীত কেন ?

বাবার মৃত্যুর কথা মনে পড়ে গেল। যেন সিনেমার ফ্লাশব্যাকের মতোই সেই কুটিল কঠিন দিনের ছবিটা পর্দায় ফুটে উঠল।

যুধাজিতের সেই উদ্ভট পোশাক-আঁটা কাঁধ-নাচানো কাকা অনমনীয় ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে, আর বাবা অসহায়ভাবে বলছেন, টাকার তোর দরকার, তা তো বুঝছি, কিন্তু অত টাকা কোথায় পাবো বল ?

কাকা আরো অনমনীয়, তার মানে তোমার মতে সামান্য কিছু টাকার জন্যে, আমার কেরিয়ারটা নষ্ট হোক। 'ওয়াশিংটনের' ওখান থেকে অফার পাওয়া সহজ নয় দাদা!

যুধাজিতের বাবা কাতর গলায় বলেন, টাকাটা তুই 'সামান্য' বলছিস পিণ্টু ? যা বললি—সে তো প্রায় লাখ খানেকের মতো। অবুঝের মতো রাগ করিস না। একটু ভেবে দেখ।

ভেবে দেখা হয়ে গেছে আমার।

কাঁধ নাচাল কাকা, ইচ্ছে করলেই হয়ে যায়। এই বাড়িটা বেচলে দু'লাখের মতো হবে না। বরং বেশিই হবে।

বাড়িখানা বেচলে ?

বাবা, যুধাজিতের বাবা রণজিৎ সরকার দাঁড়িয়ে ছিলেন, বিছানায় বসে পড়ে হতবুদ্ধির মতো বলেন, বাড়িখানা বেচবো ? আমাদের এই বাড়িটা ? বলছিস কী, পিণ্টু ?

তা এতো অবাক হবার কী আছে ? ...কণ্ঠস্বরে ইস্পাতের কাঠিন্য...এতো আপসেট হবারই বা কী আছে ? মনে হচ্ছে 'বাড়ি গাড়ি বেচে দেওয়া' কথাটা শোনোনি কখনো। বাবার এই বাড়িটায় আমারও অবশ্য হাফ শেয়ার। বেচতে না চাও, 'ল'মাফিক দামটা যাচাই করে, অর্ধেক টাকা আমায় দিয়ে দাও। হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছি।...পায়চারি করতে করতে বিদ্রূপের হাসিতে মুখটা কুঁচকে আবার বলে ওঠে, আমি তো আর জীবনে এই পচা দেশে, এই পচা বাড়িতে বাস করতে আসব না ? তুমিই মনের সুখে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ-দখল করবে। তবে আর আমি শালা কেন বোকা হয়ে মরি ? ...তোমার সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে তুমি ধুয়ে জল খাওগে। আমার শেয়ার আমায় দিয়ে দাও, এই সাফ কথা।

যুধাজিৎ অপলকে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। মুখটায় এতোক্ষণ যে যন্ত্রণার ছাপ ফুটে উঠেছিল, সেটা মিলিয়ে গিয়ে মুখটা যেন একটা পাথরের মুখ হয়ে গিয়েছিল। সেই মুখ আস্তে বলেছিল, আচ্ছা তাই হবে, তবে কালই তো হবে না। খদ্দের পেতে কিছু সময় তো লাগবে।

কাকা বলে উঠেছিল, খদ্দের আমার ঠিক করাই আছে। তুমি ওই ছুতো দেখিয়ে টালবাহনা করবে সে তো জানাই ছিল। বেশি দেরি করলে, আমার তো 'অফারের' বারোটা বেজে যাবে।

যুধাজিৎ পরে জেনেছিল, ওসব 'অফার-টফার' ভাঁওতা, কাকা তখন পাড়ি দিতে গিয়েছিল মধ্যপ্রাচ্য। তারপর অবশ্য কায়দা-কসরতের জোরে আমেরিকারই বাসিন্দা হয়ে গেছে। এখন ওয়াশিংটনে থাকে। সেখানে কী করে সে জানে আর তার ভগবান জানে।

তবে সেদিন যুধাজিৎ জেনেছিল, কাকা নাকি তার 'ভবিষ্যৎ'টিকে সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে ফেলবার

মতো একটা সুযোগ পেতে চলেছে বলেই এমন মরীয়া হয়ে উঠেছে। তবু বাবার মুখ দেখে যুধাজিতের ভিতরটা হাহাকার করে উঠেছিল। আর ওর তখনই মনে হয়েছিল, বাবা বোধহয় আর বেশিদিন নয়। ...শুধু বাড়িটা বিক্রি করতে বাধ্য হওয়ায় নয়, নিতান্ত স্নেহের আর ভালবাসার জনের কাছ থেকে এই দারুণ আঘাত পাওয়ায়।

যুধাজিতের মনে আছে ছেলেবেলায় সে আর দাদা সব সময় অভিযোগের ভাব মনে পোষণ করতো—বাবা তাদের থেকে কাকাকেই বেশি ভালবাসেন। সত্যি বলতে বোঝা যেতো বনছায়াও যেন ভিতরে ভিতরে ছেলেদের মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। অনেক সময়ই বলে ফেলতেন... 'কাকার কথা নিয়ে বলে আর কী হবে? কাকার তো বাড়ির কর্তার কাছে সাতখুন মাপ।'

কথাটা অমূলক নয়, সত্যিই তাই ছিল। অল্পবয়েসে মা-হারা এই ভাইটির ওপর রণজিতের ছিল সাতখানা প্রাণ। তারপর তো বাপও গিয়েছিলেন। ...কথা প্রসঙ্গে হেসে হেসেই বলতেন, 'এ ব্যাটাদের তো মা আছে, বাপ আছে, খুড়ো আছে, ভাইবোন আছে, ও হতভাগাটার এই একটা 'দাদা' ছাড়া আর কে আছে বলো?'

যুক্তিটা অকাট্য।

বাবার সেই নির্মল হৃদয়ের অফুরন্ত স্নেহসমুদ্রকে নস্যাৎ করে দিয়ে কাকা বলল, 'জানতাম তুমি ওই' খদ্দের পাচ্ছি না ছুতো করে, আমার ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে দেবে। তাই খদ্দের তলে তলে ঠিক করেই রাখা হয়েছে।

অর্থাৎ খবর পাওয়া গেল, ওই 'বোকা' লোকটার মর্মচ্ছেদ করবার জন্যে ছুরিতে শান দেওয়া চলছিল তলে তলে।

অবশ্য বলতে গেলে সত্যিই একটু 'জোলো সেন্টিমেন্ট' ছাড়া বাবার দিকের পাল্লায় আর কিছুই ছিল না। বাবার পৈত্রিক বাড়িটা বিক্রি করাটা তো আর সত্যি 'পিতৃহত্যা' করা নয়। রণজিৎ সরকারের সেন্টিমেন্টে যদি সেটা তেমন অনুভূতি নিয়ে আসে, সেটা তার বোকামি ছাড়া আর কী? তবে বনছায়া সরকারও কিন্তু এক্ষেত্রে ওই একই সেন্টিমেন্টের ছত্রছায়ায় থেকে মনোকষ্ট পেয়েছেন। ...কিন্তু আশ্চর্য, দাদা কেমন করেই যেন কাকার 'সমর্থক' হয়ে গেছল। দাদা অনায়াসেই বলেছিল, 'কাকা তো ঠিক কথাই বলছে। সত্যি কাকা যখন ঠিক করেই ফেলেছে, আর এদেশে ফিরবে না, তখন কেন তার ন্যায্য ভাগটা ছাড়বে?'

মা ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, তুইও এ কথা বলছিস?

দাদা অকুতোভয়ে বলেছিল, যেটা ন্যায্য সেটাই বলছি। বলা উচিত।

হ্যাঁ, পরেও দাদা আর একসময় এরকম একটা 'ন্যায্য কথা' বলেছিল। তবে রণজিৎ সরকারকে আর সেটা শুনতে হয়নি। শুনতে হয়েছিল শুধু বনছায়া সরকারকে।

কিন্তু রণজিৎ সরকার কি সত্যিই সিনেমার 'কর্তা' নায়কদের মতো ভয়ানক একটা 'বাক্যের' আঘাতে তৎক্ষণাৎ বুকে হাত চেপে ভূলুণ্ঠিত হয়েই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন? তা অবশ্য নয়। ...বুকে হয়তো পাথর চেপেই তিনি বাড়িটার বিক্রি-ব্যবস্থা করে, তাঁর ভাইয়ের হাফ শেয়ারের পাই-পয়সাটি পর্যন্ত গুনে দিয়ে, তারও পরে গত হয়েছিলেন।

তবে বাড়িটাকে ছেড়ে চলে যাওয়া পর্যন্ত আর স্বর সয়নি। ..যুধাজিতের মনে আছে সেদিন বাবা কোনখান থেকে ফিরে হঠাৎ কেমন অস্বাভাবিক ফুর্তির গলায় ডাক দিয়ে উঠলেন। ছায়া! ছায়া! শুনে যাও, ভারী একটা সুখবর আছে।

দাদা বাড়ি ছিল না, বৌদি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল। যুধাজিৎ আর মা-ও। কিছুকাল যাবৎই তো বাড়ির বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে আছে। যেন মৃত্যুর স্তব্ধতা ঘিরে থেকেছে বাড়িটাকে। হঠাৎ 'সুখবর'

শব্দটা যেন চমকে দিল যুধাজিৎকে।

দেখল বাবা মাঝখানের ঘরে খাবার টেবিলের ধারের একটা চেয়ারে বসে পড়ে বলছেন, এ বাড়ির মালিক, এই 'মনোরমা ধাম' বাড়িটার মালিক গো, কী রকম দয়ালু জানো? 'কালই বাড়ি ছেড়ে দিন' না বলে, আরো তিন সপ্তাহ আমাদের এখানে থাকতে দিতে রাজী হয়েছে। বলেছে, 'ভালোমতো একটা আস্তানা না পেয়ে ফ্যামিলি নিয়ে যাবেনই বা কী করে? আমি এমন অমানুষ নই যে আপনার অসুবিধে বুঝছি না। আর তিন সপ্তাহ থাকুন। ...বুঝলেন? উঠে পড়ে লেগে খুঁজুন—বল? কী মহানুভবতা! তিন তিনটে সপ্তাহ মুফতে—আমি বললাম, তাহলে কিছু ভাড়া নিন, তো 'হাঁ হাঁ করে উঠল। বলল, খেপেছেন? ওসব ফ্যাচাঙে যেতে আছে? আপনার মায়ের নামের বাড়ি, আপনি না হয় ক'টা দিন এমনিই থাকলেন।' ...তাহলে ছায়া, এ-োনো তিন তিনটে সপ্তাহ তুমি এই 'মনোরমা ধাম'-এর বিছানায় শুচ্ছো, তার রান্নাঘরে রাঁধছো, তার খাবার টেবিলে খাচ্ছো! ছায়া, একটা জোর ভোজ লাগাও এর মধ্যে। অ্যাঁ? সেই বেশ হবে!

বলেই চেয়ারটা থেকে উঠতে গিয়ে, ধুতির কোঁচায় পা জড়িয়ে কেমন লটপটিয়ে টেবিলটার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

তারপর আর কী! দিন কয়েক নার্সিংহোমে, অতঃপর 'শেষ গন্তব্যস্থলে'। ...তবে তাঁর শেষকৃত্যটি, সেই তাঁর মায়ের নামের বাড়িতেই হয়েছিল। ...বাড়ির বর্তমান মালিক শ্রাদ্ধসভায় উপস্থিত হয়ে বলেছিলেন, 'ভেরি শ্যাড্। ভেরি শ্যাড্ ব্যাপার। এরকমটা যে হতে পারে সেদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।'

তারও পর? ওই যে বকুলবাগানের কাছে দেড়খানা ঘরের বাসায়, মা আর ছেলে।

বড়ছেলে? তার যে ইতাবসরে দুর্গাপুরে পোস্টিং হয়ে গেছে, তা তো জানা ছিল না। ...একদা—অনেক বড় বয়েস পর্যন্ত তো যুধাজিতের জানা ছিল না, 'দাদা' তার বাবার ছেলে বটে, তবে মায়ের ছেলে নয়। বনছায়ার গর্ভজাত নয় সুরজিৎ।

যখন শুনেছিল, অবিশ্বাস্য এই খবরটাকে বিশ্বাসের কোঠায় জমা দেয়নি। বনছায়ার নিখুঁত নির্ভেজাল মাতৃস্নেহ কোনোদিনই সুরজিৎ নামের ছেলেটাকে বুঝতে দেয়নি, সে বনছায়ার গর্ভজাত নয়।

তবু সময়কালে ঠিকই বুঝে ফেলল। কারণ ইতিমধ্যে 'গুরু বন্ধু উপদেষ্টা বুদ্ধির জোগানদার' জনের আবির্ভাব হয়ে গিয়েছিল তো।

সদ্য ন্যাড়া মাথায় খদ্দরের টুপি চাপিয়ে দাদা বৌ নিয়ে দুর্গাপুরে চলে গেল। আর দিদি তার দুটো ছেলেমেয়ে নিয়ে এই দেড়খানা ঘরের বাসায় মা-ভাইয়ের সঙ্গে একটা রাত্রি বাস করে পরদিন নিজ সংসারে ফিরে যাবার সময় মাকে আর ভাইকে যতটা সম্ভব কটুকঠোর ভাষায় দোষারোপ করে করে কাঁদতে কাঁদতে গাড়িতে গিয়ে উঠল।

দিদি অবশ্য বনছায়ারই গর্ভজাত, তবে তার অভিব্যক্তিতে তা বোঝা যায়নি সেদিন। 'সেদিন' কেন, বাড়িটা বিক্রি হওয়া ইস্তক‌ই সে যেন একটা প্রতিপক্ষ হয়ে গেছল। অবিরত মাকে দোষারোপ করেছে আর ধিক্কার দিয়েছে।

কারণ? কারণ সারা জীবন মায়ের দোহাত্তা যথেচ্ছ বাজে খরচের জন্যেই নাকি রণজিৎ নামের নিরীহ লোকটা এক পয়সা জমাতে পারেননি, যত্র আয় তত্র ব্যয় করেছেন। তাই এই দশা। মা যদি বুঝে চলতো, অনায়াসেই কাকার নাকের সামনে তার বাড়ির ভাগের টাকাটা ধরে দিয়ে বাড়িটা রক্ষা করা যেতো।...

ওই 'মনোরমা ধামেই' যে দিদির চোখ ফুটেছে, জ্ঞান ফুটেছে, ওখানেই তার খেলাঘর পাতা

ছিল, ওখানেই তার বিয়ে হয়েছে, বাসর হয়েছে, প্রথম সন্তানটি জন্মেছে, এইসব ফিরিস্তি গেয়ে গেয়ে গুনগুন করে কেঁদেছে। এবং এ সংসারের কোন কোন জিনিস তার সংসারে কাজে লাগতে পারে তা গুছিয়েছে। ...মা-ই অবশ্য বলেছে, আমার আর এতোসব কী হবে? বৌমা সুরোও বিদেশ চলে গেল! তোর যদি কিছু কাজে লাগে—দেখে বুঝে নিয়ে যা।

বাবা মারা যাবার পর আর একবার দাদা সেই 'ন্যায্য কথাটা' বলেছিল। বাড়ি বিক্রির যে অর্ধেক টাকাটা বাবার ভাগে পড়েছিল, আইনতঃ সেটা আবার চার ভাগ হয়ে যাবে। মৃতের বিধবা স্ত্রী আর তিন পুত্র-কন্যায় সেই চারটি অংশ বর্তাবে।

আইন না জেনে কিছু বলেনি দাদা। কেন না দিদিও তখন বলেছিল, 'তোদের জামাইবাবুও তো ঠিক ওই কথাই বলছিল। দাদা অন্যায্য কিছু বলেনি।'

সিনেমার পর্দায় যেন আবার প্রতিফলিত হয়ে চলেছিল ছবিটা। নচেৎ এমন সকলের প্রতিটি কথা, প্রতিটি ভঙ্গী স্পষ্ট চোখের সামনে ফুটে উঠছে কী করে?

মা সেদিন বলেছিল বটে, রিঙ্কু যে আমার পেটেই হয়েছে, এটা ভাবতে লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে আমার।

তবু যুধাজিৎ জানে, সাময়িক সে আক্ষেপের জের বেশিদিন স্থায়ী হয়নি মার। জানে, মায়ের মনে মনে একটি গভীর বেদনাবোধ জমা হয়ে আছে। আগের মতো মেয়ে-জামাই-নাতি-নাতনীকে যখন-তখন ডাকতে পারেন না, দুটো দিন থেকে যেতে বলতে পারেন না। কষ্ট আছে, আগের মতো ভারে ভারে তত্ত্ব পাঠাতেও পারেন না বলে।

যদিও মায়ের এই সব দোষের জন্যেই মাকে 'উড়নচণ্ডী বাজে খরুচে দরাজ মেজাজ' বলে নিন্দেবাদ করেছে দিদি এবং দাদাও।

যুধাজিৎ বোঝে সর্বদা দাদার জন্যেও মার প্রাণ কাঁদে। এখন ছুটিছাটাতে কলকাতায় এলে দাদা বৌদিকে নিয়ে সোজাসুজি শ্বশুরবাড়িতেই ওঠে, একদিন পতি-পত্নী উভয়ে মায়ের সঙ্গে 'সৌজন্য দর্শন' দিতে আসে। হয়তো বা মায়ের একান্ত নির্বেদে একবেলা একটু মাছভাত মুখে দিয়েও যায়। ওই পর্যন্তই। আর মা, আপন মনেই বলে, ওদের আর দোষ দেব কী? হাত-পা মেলবার একটু জায়গা নেই। একটা রাত কাটাবার কথাও বলা যায় না। ছেলে-বৌকে মুখ ফুটে বলতে পারি না, 'যা হোক করেই একটু থেকে যা না বাবা।'

হাত-পা মেলা যে কী কষ্টকর, সে তো যে মানুষ দুটো বাস করছে তারা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। সেই মস্তবড় বাড়িটার ছড়ানো ছিটোনো যত সব আসবাব, আর 'ডেয়ে ঢাকনা' জাতীয় গুলো তো এখানেই জমানো আছে। ...হ্যাঁ, বনছায়ার অনুরোধে মেয়ে কিছু কিছু হালকা আসবাব, আর বাসনপত্র নিয়ে গিয়েছিল। ...হঠাৎ লক্ষ্যগোচর হলো, ছেলে আর ছেলের বৌ বলাবলি করছে, 'মায়ের ধরন দেখে মনে হচ্ছে আমরা আর কোনোদিন কলকাতায় বসবাস করবো না, দুর্গাপুরের কোয়ার্টার্সেই চিরকাল থেকে যাবো!'

থমকে গিয়েছিলেন বনছায়া, থেমে গিয়েছিলেন। এখন অবশ্য ছেলে-বৌ যে ক'বার এসেছে, তাদের বলেছেন, বয়ে নিয়ে যাবার মতো হালকা-টালকা যদি কিছু থাকে, নিয়ে যা না বাছা। তোদেরও হয়তো কাজে লেগে যাবে, আমারও ঘরটা একটু হালকা হবে।

বড়ছেলে ক্রুদ্ধ গলায় বলেছে, তোমার ছোট পুত্তুরটি লেখাপড়ায় জলাঞ্জলি দিয়ে কী করে বেড়াচ্ছেন, তিনিই জানেন, তবে যা দেখছি—শেষ পর্যন্ত না তোমায় এই কোটরেই পড়ে পচতে হয়। ...তোমার গহনা-টহনাগুলো আছে তো? নাকি 'ব্যবসা করবো' বলে বেচে দিয়েছে?

বনছায়া বলেছেন, দিলেই হলো? গহনা কী ওর? ও তো আমার দুই বৌয়ের।

জানি না, তোমার পরবর্তী বৌটি কবে আসছেন। তবে ওরকম বাউণ্ডুলেপনা করে বেড়ালে, কোনো ভদ্রলোকে মেয়ে দেবে বলে, মনে হয় না।

দিদিও যখন আসে, যুধাজিতের বাউণ্ডুলেপনা নিয়ে আক্ষেপ করে যায়। ...বলে, বাসনা ছিল, জিতুটা মানুষ হয়ে উঠলেই—আমার ভাসুরঝির সঙ্গে 'সম্বন্ধ' করব। ...মেয়েটাও তোমার মতো নিরীহ শাশুড়ী পেয়ে বাঁচবে, আর আমারও শ্বশুরবাড়িতে মুখ থাকবে, বিনিপয়সায় ওদের কন্যেদায় উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দিলাম বলে...তো এখন আর 'ওর' জন্যে জা-ভাসুরকে বলি কী করে?

তার মানে যুধাজিতের আর বাজারদর নেই। এখন 'ওর কথা' বলতে যাওয়াই কুণ্ঠার ব্যাপার।

সব সময় সব কিছুই যে যুধাজিতের কানে আসে এমন নয়, তবে মাঝে মাঝে মায়ের আক্ষেপের বাণীর মধ্যে থেকেই কিছু কিছু বা অনেক কিছু অনুধাবন করে নেয়।

না কারো প্রতি খুব একটা বিদ্বেষ পোষণ করে না যুধাজিৎ, ও শুধু একটি অলৌকিক স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করতে করতে সকলের সব কথার 'জবাব' দিয়ে চলে। মুখের মতো জবাব। সেই 'জবাবটি' আর কিছু নয়, কেবলমাত্র খুব বড়লোক হয়ে যাওয়া। ...অনেক বড়লোক হয়ে যাওয়া।...

সেই বড়লোক হয়ে যাওয়া যুধাজিতের মেজাজটি হবে দরাজ। টাকাকে টাকা জ্ঞান করছে না, খোলামকুচি সম জ্ঞান করছে! দু'হাতে খরচা করে করে সব্বাইকে উপচে দিচ্ছে। তাদেরকে আদর অভ্যর্থনা আর ভালবাসার তোড়ে ভাসিয়ে দিয়ে ভাব দেখাচ্ছে যেন নিজেই কৃতার্থ হচ্ছে।

তা সেটাও হয়তো হবে, যদি তেমন দিনটি আসে তার। সেই স্বপ্ন যদি সফল হয়, কৃতার্থই হবে। হবে ভাগ্যের কাছে।

গাড়িটা নিয়ে ফিরে হর্ন দিল।

একবার দু'বার। তিনবারের আগেই বাইরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল এবাড়ির কেউ নয়, কাজের লোক নয়, বাড়ির কোনো ছেলেপুলে নয়, বেরিয়ে এল এ বাড়ির আজকের অতিথি মেখলা নামের মেয়েটা। তার মানে এই কলকোলাহল ঝঙ্কৃত বাড়ির মধ্যে গল্পগাছার মধ্যে ডুবে থাকলেও, তার মন-প্রাণ-কান ওই ধ্বনিটির জন্যেই অপেক্ষমান হয়ে থেকেছিল।

ঠিক হাসি নয়, যেন মুখে একটি আলো ফুটে উঠল।

কার? সত্যি বলতে হলে, দু'জনেরই।

যুধাজিৎ বলে উঠল, 'থ্যাঙ্ক ইউ'। আছেন তাহলে এখনো। ভাবছিলাম, যা দেরি হয়ে গেল, হয়তো বেজার হয়ে চলেই গেলেন।

যদিও 'যা দেরি'টা নেহাৎই বাজে কথা। ঠিক দু'ঘণ্টা পঁচিশ মিনিট পরে এসেছে। তার মেয়াদের মধ্যেই।

মেখলা বলে উঠল, 'চলে যাবো? আমাদের তো হর্ন শুনেই মনে হল, ওই যাঃ। এক্ষুণি।...এ বাড়ির ব্যাপারটি তো জানেন না। কোথা দিয়ে যে সময় কেটে যায়। কেউ ছাড়তেই চায় না। একযোগে সবাই তো ধরে পড়েছে, আমায় থেকে যেতে। বলেছে, শিলু গিয়ে খবর দিক, তোকে আমরা 'লক আপে' পুরে ফেলেছি, ছাড়িয়ে নিয়ে আসা গেল না।

বলতে বলতে হেসে গড়িয়ে পড়ে।

ততক্ষণে অবশ্য পিছনে দু'চারজন এসে গেছে, তার সঙ্গে শিলাদিত্যও।

যুধাজিৎ খোলা গলায় বলে ওঠে, তাহলে বলছেন, দু'জনকে এনে, একজনকে নিয়ে ফিরতে হবে?

শিলাদিত্য এগিয়ে আসে, বলে, ছাড় না ওকথা। রেখে গেলে বাবা আস্ত রাখবে? বাবার বোনটি সে কথা ভালই জানেন। ...কিন্তু তোকে যে একবার তোর রথ থেকে নামতে হবে। বাড়ির মধ্যে

আসতে হবে।

কী সর্বনাশ। কেন?

পিসি এবং তাঁর সম্প্রদায় ভীষণভাবে বলে রেখেছেন, একটু চা খেয়ে যেতে হবে।

আশ্চর্য! ওঁরা কী আমায় চেনেন? চোখেই তো দেখেননি।

চিনতে চান। দেখে নিতে চান।

কারণটা কী বল তো?

ভুরু কোঁচকায় যুধাজিৎ! বিয়ে হবার যোগ্য মেয়েটেয়ে আছে না কী?

হঠাৎ মেখলারও ভুরুটা কুঁচকে ওঠে কেন কে জানে!

হো হো করে হেসে ওঠে শিলাদিত্য।

বলে, এ বাড়িতে তেমন কোনো অভিসন্ধিবাজ লোকটোক নেই। 'কেস'টা হচ্ছে—এদের পারিবারিক 'ধর্মে' চিড় খাওয়া চলবে না। বাড়ির দরজা থেকে কেউ অমনি মুখে ফিরে যাবে, এ হতেই পারে না। আয় নেমে আয়।

দোহাই তোর! বলে দে আর একদিন এসে চা খেয়ে যাবো।

বলে দেবার দরকার হয় না, একটি পরমা সুন্দরী মাতৃমূর্তি গোছের মহিলা শিলাদিত্যকে পাশে ঠেলে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলেন, 'আর একদিন আসবে সে তো খুব ভালো কথা। তা বলে সেই অনিশ্চিতের আশায় তো আজ হাতে পেয়ে ছেড়ে দেওয়া যায় না বাবা! একটু চা অন্ততঃ খেয়ে যেতেই হবে। নাহলে বাড়িসুদ্ধ সবাই মনে খুব কষ্ট পাব।'

যুধাজিৎ অনুমান করে ইনিই 'পিসিমা'। যদিও চেহারায় ভাইপো ভাইঝির সঙ্গে কোনো মিল নেই। কিন্তু মুখের আলো আলো ভাবটিতে কোথায় যেন ভাইঝির সঙ্গে একটু সাদৃশ্য রয়েছে।

যুধাজিৎ সত্যি সত্যিই নেমে এল।

নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেল।

বলতে কী একটু আশ্চর্য হলো, ভাইবোন দু'জনেও। ওরা ভেবেছিল, পিসি যতই বলুক, ওর ওই গাঁইয়াপনা আতিথ্যের ডাকে যুধাজিৎ ভিজবে না।

কিন্তু ওদের এবং নিজেকেও চমকে দিয়ে যুধাজিৎ গাড়ি থেকে নেমে এল। এবং হেঁট হয়ে মহিলাকে একটা প্রণাম করে স্বচ্ছ চোখে তাকিয়ে বলে উঠল, যে বাড়িতে একটা বাইরের নেহাৎ রাস্তার লোক চা না খেয়ে ফিরে গেলে বাড়িসুদ্ধ সবাই মনে কষ্ট পায়, সেই বাড়িটি দেখা দরকার বলেই নামলাম! চলুন কোথায় আপনার চা। ...হেসে উঠে বলে, আন্দাজ করছি, তার সঙ্গে 'টায়ের' ব্যবস্থাও ঢালাও।

মেখলার দিকে তাকিয়ে বলে, আসুন। দেখছেন তো আমারও 'লক্ আপের' ব্যবস্থা।

মেখলা একটু কাষ্ঠহাসি হাসে। কেন কে জানে ওর মনটা হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়। যুধাজিৎ যে নেমে পড়ল, এটা যেন ওর পরাজয়। ...একটু আগেই বলেছে, কী যে বল পিসি। তাই কখনো আসে?...

তাছাড়াও মনে পড়ছে, চায়ের ভারপ্রাপ্ত অফিসার তো পাপিয়া। ...পিসির মেজ দ্যাওরের মেয়ে। মেখলারই কাছাকাছি বয়েস। মেখলার আরো বেশী করে মনটা খারাপ হয়ে গেল।

॥ ছয় ॥

দেখে এলাম তোমাদের প্রাণের খুকেনকে।

তিনতলায় উঠে এসে টুসকি সামনে পড়ে থাকা বেতের চেয়ারটায় ধপ করে বসে পড়ে বলে উঠলো, বহালতবিয়তেই আছেন ! ঘোরতর সংসারী তো ! তার বাইরে আর কিছুই মনে পড়ে না।

নয়নতারা উৎসুক চোখে তাকিয়ে বললেন, ওমা, কখন গিয়েছিলি পিসির বাড়ি ? কই, 'যাবি' বলে কিছু বলিস নাই তো।

টুসকি পা দোলাতে দোলাতে বলে, 'যাব' বলে নিজেই জানতাম নাকি ? ছোড়দা যাচ্ছিল, হঠাৎ পাকেচক্রে আমারও হয়ে গেল। গিয়েই খুব একচোট বকে দিলাম পিসিকে, রাতদুপুরে বুড়ো মা-কে স্বপন-টপন দিতে যাও কেন ? বুড়ি বেচারী চিন্তায় সারা হয়।

নয়নতারা অবাক হয়ে বলেন, সত্যি বলেছিস এই কথা ?

বলব না কেন ?

শোনো কথা। ও কী নিজে ইচ্ছে করে এসে স্বপ্ন দিয়েছে ?

কে জানে। ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে কী হয় আর না হয়। তোমাদের পাবনার ব্যাপারই আলাদা।

হায় কপাল। টুনি আবার ক'দিন পাবনায় থাকলো ?

নয়নতারা বলেন, সেই এইটুক বেলায় চলে আসা। আসবার সময় একটা বিড়ালছানারে নিয়ে আসার জন্যি কী ঝুলোঝুলি কাঁদাকাটি, বুঝ দিওয়া যায় না।

সেই কথা এখনো মনে আছে তোমার ?

নয়নতারা একটু হাসলেন, তা আছে। তো বল, অদের আর সব খবর কী ?

বললাম তো খবর খুব ভালো। সংসার ফেলে একবার বুড়ো মা-বাপকে দেখতে যেতে পারি না— বলে একটু দুঃখুটুঃখু করলো। তবে বলেছে একদিন আসবে।

নয়নতারার মুখের চেহারাটি একটু মলিন হলো। বললেন, হঁ। দুঃখ না কচু। ছাড় ওকথা। তরা সবাই ভালো থাকলিই ভালো। ত কবে আসবে বললো কিছু ?

কবে-টবে, তা কিছু বলেনি। বললো, 'শীগ্গির যাব একদিন।' আর বলেছে ওর এক ভাগ্নে না কাকে যেন নিয়ে আসবে।

নয়নতারা একটু শঙ্কিত হন। আবার কউকে নিয়ে আসার ফ্যাকড়া কেন ? ওপক্ষের কুটুম কাটুম এলে নয়নতারার অবস্থা বড় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। তাঁর চিরাচরিত অভ্যাসে কুটুম-কাটুমকে বিশেষতঃ মেয়ের শ্বশুরবাড়ির লোককে একটু বিশেষ বেশী যত্ন-খাতির করতে ইচ্ছে হয়, অথচ সে ক্ষেত্রে নিজে একেবারেই হাত-পা বাঁধা নিরুপায়। নীহারিকার মর্জির ওপর নির্ভর। হয়তো নীহারিকা এমন নিরুত্তাপ ঔদাসীন্য দেখাবে, নেহাৎ 'যে সে' লোকের মতো বাজার থেকে আনানো দুটো ঠাণ্ডা শুকনো সিঙাড়া আর দুটো গুলি গুলি রসগোল্লার সঙ্গে এক কাপ চা বসিয়ে দিয়ে চলে যাবে। নয়নতারা বা সত্যব্রত মরমে মরে গেলেও সে বিষয়ে কিছু বলতে পারবেন না। এখন আর বলার কথা ভাবেনও না। আগে আগে বলে ফেলতেন। পরে বলতেন, 'কুটুমবাড়ির মানুষ, আরও কিছু ভালোমতো দিলি মানটা থাকতো।'

তা তেমন কথা বলে ফেলার অপরাধে, বাড়িতে 'মান'টা কচুকাটা হতো। তখন ছেলের বৌটিই শুধু নয়, স্বয়ং ছেলেও এবং তার ছেলেমেয়েরা সুদ্ধ নয়নতারাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে যথেচ্ছ ধিক্কার দিতো, গঞ্জনা দিতো, এ তাঁদের 'পাবনার জমিদারির আমল নয়' বলে খোঁটা দিতো। এবং

'চিরকাল অতো পারা যায় না' বলে ফতোয়া জারি করতো।

সেইসঙ্গে এ ঘোষণাও করা হতো, নয়নতারার নাকি কোনো বিষয়েই কখনো কিছু পছন্দ হয় না। এবং সেই 'তাল' দিতে দিতেই নীহারিকার হাড় ভাজা ভাজা ও আদিত্য কোম্পানী জেরবার।

নয়নতারা কী তখন পাল্টা জবাবে বলে ফেলতে বসবেন, তোদের মার 'রাঙাদাদা' এলে তোরা কী করিস আর না করিস, তা ভেবে দ্যাখ! একদিকে তোদের মা লেগে যায় তার 'রাঙাদাদা'র পছন্দসই 'বাড়ির খাবার' বানাতে। অপরদিকে তোদের বাবা ছোটে তল্লাটের সেরা ময়রার দোকান থেকে সেরা সেরা মিষ্টি আনতে, ওদিকে তোরা ছুটিস হোটেলে রেস্টুরেন্টে চপ কাটলেট আনতে। দেখি না? অবশ্য সাধ্যপক্ষে আমায় সবটা দেখাতে চাস না তোরা, তবে বুঝতে সবই পারি। তাছাড়া মজা এই, তোদের ওই 'রাঙামামা' নিজেই সৌজন্যর বশে যাবার আগে আমাদের সঙ্গে দেখা করে পেন্নাম ঠুকতে এসে ফলাও করে বলে, ওঃ, যা খাওয়ান খাওয়া হলো! আবার কী কী খাওয়া হলো, তাও বলে হয়তো।

কারণ? কারণ কিছুই না। লোকটা খুব মজলিশি। আর নিজেকে জাহির করতে খুব ভালোবাসে। তাই এই আসা। আর রসিয়ে রসিয়ে মজা করে কথা বলা।

তা সে যাক। এখন নয়নতারা নিজের বর্তমানের পজিশন ভেবেই একটু শঙ্কিত হয়ে বলেন, নিয়ে আবার কাকে আসবে? নিজে একা এলে তবু দুটো কথা হয়, অন্য কেউ এলে তাকে নিয়েই রমরমা করতে হবে।

তা সে তুমি বোঝো!

টুসকি হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বলে, ভাগ্নে বিদেশ থেকে 'নাক কান গলার' বড় ডাক্তার হয়ে এসেছে, তাকে নিয়ে দাদুর কানের চিকিৎসা করাবে পিসি।

সর্বনাশ।

নয়নতারা আরো শঙ্কিত হন। এসব ব্যাপার ঘটলে তো অতঃপর তাঁদের দুই মানুষের নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে। ছেলে নির্ঘাৎ বলবে, 'আমার দ্বারা কিছু হলো না' বলে, তোমরা তাহলে মেয়ের কাছে আর্জি জানিয়েছ' বলবেই। এই রকম প্যাচোয়া বুদ্ধি হয়েছে আজকাল ছেলেটার।

মনের গভীর গোপনে নিঃশ্বাস ফেলেন নিঃশব্দে, বলেন, একেই হয়তো বলে 'সঙ্গদোষ'! সঙ্গদোষেই শতগুণ নাশে। আগে ওই আদিত্যই কত খোলামেলা, কত উদার ছিল। বোনের শ্বশুরবাড়ির সবাইকে কত আপন ভাবতো। শুধু তাই কেন, 'আত্মীয়' বলতে যেখানে যে ছিল সবাইকেই ভালোবাসতো, আপন ভাবতো।

কিন্তু এখন?

পৃথিবীতে ওর কোনো 'আত্মীয়' নেই, 'আপনজন' নেই, বাদে ওই 'রাঙাদাদা'। তবে তাকেই কী আর সত্যি ভালোবাসে? ওটা ভয়-ভক্তি। হায়। 'ভালোবাসা' শব্দটাই যেন এ সংসার থেকে ক্রমশঃ মুছে যাচ্ছে। অথচ কারণ কিছুই থাকার কথা নয়।

আপাততঃ নয়নতারা সমস্যায় বাঁধ দেবার চেষ্টা করেন। বলেন, হুঃ। ভারী অ্যাক মাতব্বর হইচে টুনির ভাগনা। ছাড় তো। ক্যান তোর দাদুর চিকিচ্ছের অভাব হইচে?

টুসকি হাত উল্টে বলে, কী হইচে আর কী হইচে না তোমরাই জানো। তোমার কথা-টথাগুলি তো দেখি বেশ শুনতে পায় বুড়ো! হি হি হি।

এ কথা বলে সবাই হাসে। তা হাসুক। তবু তো বাতাস একটু হালকা হয়। সর্বদা ভারী বাতাসের চাপে প্রাণ যে হাঁপিয়েই থাকে।

নয়নতারা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় সত্যব্রত বেরিয়ে এলেন বাথরুম থেকে। রাত্রে শোবার আগে একবার স্নান করা তাঁর চিরকালের অভ্যাস। প্রথম জীবনে বলতেন, 'যত সব পাপীতাপী কূটকচালে লোকের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে শরীর মন বেজার হয়ে ওঠে। একবার স্নান করে না নিলে ঘুম আসে না।'

তখন সত্যব্রতর মা বলতেন, চানের কথা তো তুই ছেলেবেলায় মাঠ থেকে ফুটবল খেলে এসেও কইতিস। গায়ে যতো সব ধূলা। চান না করলে ঘুম হব না।

তা সে অভ্যাস সত্যব্রতর এখনো রয়ে গেছে।

সত্যব্রতর পরনে এখন একটা ধুতি পাট করে পরা। কাঁধে একখানা ভিজে তোয়ালে। দীর্ঘ উন্নত সুগৌর শরীরটিকে দেখলে কে বলবে লোকটার এতো বয়েস হয়েছে! অথচ ভাগ্যের বিড়ম্বনায় লোকটা 'হাড়বুড়ো'র খাতায়।

টুসকিকে দেখে বলে ওঠেন সত্যব্রত, আরে নাতনী যে। সূর্যঠাকুর কোনদিকে উঠেছে আজ?

আহা, চেঁচিয়ে ওঠে টুসকি। খুব ঠাট্টা হচ্ছে। ওঃ দাদু! এখনো তোমার কী রং গো! দেখে হিংসে হচ্ছে।

কোনো 'সায়েন্টিফিক' উপায়ে তুলে নিয়ে নিজের গায়ে বসিয়ে নিতে পারিস তো আপত্তি নেই।

বাঃ। এখন তো বেশ শুনতে পেলে।

এটা শুনতে পান না সত্যব্রত, তাই শুধু একটু হাসেন।

নয়নতারা পদ্ধতি অনুসারে স্বামীর কাছাকাছি গিয়ে বলেন, ওরা টুনির বাড়ি গেছল।

তাই না কী? সবাই ভালো আছে?

আছে। কয়েচে অ্যাকদিন আসবে।

ভালো! সুমতি!

টুসকি হি হি করে বলে, মা যে বলে 'সাপের হাঁচি বেদেয় চেনে', দেখছি কারেক্ট। কর্তা-গিন্নীর প্রেমালাপের কোনো ঘাটতি ঘটে না।

নয়নতারা হেসে ওঠেন, থাম তো ফাজিল কন্যে!

তবু মনটা খুশী খুশী হয়। তাঁর এখানে হাসির হাওয়া বড় দুর্লভ। কে বা কখন আসে। যে আসে, হয়তো একটা কেজো কথা নিয়ে, বা অভিযোগের বাঁকা কথা নিয়ে।

বেঁচে থাকলেই জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন, সবটাই ওদের ওপর নির্ভরতা। অথচ সামান্যতম প্রয়োজনের কথা বললেই ওদের মনে হয় যেন বাড়তি বাহুল্য, যেন সংসারের হাল অবস্থা কেয়ার না করে তাঁরা কর্তা-গিন্নী রাজকীয়ভাবে থাকতে চান। তাই ওদের সব কথার মধ্যেই যেন ঈষৎ ব্যঙ্গের আর অভিযোগের সুর।

'ওদের' বলতে কে? কারা?

আর কেউই না, নয়নতারারই আপন সন্তান, আপন সংসার। অথচ কোন অলক্ষ্য অস্ত্রোপচারে কখন মাঝখানে একটা বিদারণ রেখা পড়ে গেছে। নয়নতারা আর সত্যব্রত তাঁদের নিজেদের হাতে গড়া সংসারের মধ্যেই অন্যজন। যেন বা বহিরাগত।

আশ্চর্য! কবে থেকে এমনটা হলো?

কবে থেকে হঠাৎ নয়নতারার 'সংসারটা'ই নয়নতারাকে প্রতিপক্ষ ভাবতে শুরু করলো?

কিন্তু ক'দিনই বা সংসারটা 'নয়নতারার' বলে অনুভব করবার সুযোগ হয়েছে? যতো দিন সত্যব্রতর মা বেঁচেছিলেন, বদ্ধ পাগলই হন আর যাই হন, নয়নতারা জানতেন সংসারটা শাশুড়ীরই। তাঁরই ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনী, নাতবৌ-নাতজামাই। তিনি গত হবার পর নয়নতারার মনে হয়েছে,

অতঃপর 'এরা আমার'।

কিন্তু হঠাৎ কখন কোন মন্ত্রে কী ঘটে গেল।

নয়নতারা দেখলেন 'আমার' বলতে শুধু স্বামীটি। তাঁকে নিয়েই একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা।

নয়নতারা কী নীচে নামেন না?

সংসারের ভালোমন্দ সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে কথা বলেন না? অভ্যাসের বশে বলে ফেলেন বৈকি। কিন্তু বলে ফেলেই বোঝেন কাজটা ভুল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই নীহারিকা বলে, 'কাল থেকে তাহলে আপনিই সব দেখাশোনা করবেন।' আর ছেলে বলে ওঠে, 'আচ্ছা মা, সব কথায় মাথা দেওয়ার তোমার দরকারটা কী?'

সংসারে একদিকে টানাকষা, অপরদিকে অপচয়ের বন্যা। সংসারের চিরাচরিত নিয়মকানুন আচার বিচারসমূহ অন্তর্হিত!...আহ্লাদী কাজের মেয়ে কাজল, চাকর তারকের সঙ্গে হি হি করছে, মনিব-মনিবানীর গা ঘেঁষে বসে টি ভি. দেখছে, নয়নতারা একটা কাজ বললেই ঝঙ্কার দিয়ে বলে উঠছে, 'ঠাকমার কেবল ফরমাশ!' এ সবই সয়ে যেতে হবে। উপায় নেই। কারণ নয়নতারাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই।...

হায়। যদি 'দেশের বাড়ি' নামক জায়গাটা থাকতো! অনায়াসেই তো তাঁরা 'দেশের মায়া' 'ভিটের টান'-এর ছুতো করে সেখানে গিয়ে থাকতে পারতেন। হয়তো যারা তাই থাকতে যায় তাদের মধ্যে অন্তর্নিহিত এইরকমই কিছু থাকে। অথবা—তীর্থবাস। ...সেও একটা মুক্তির পথ। কিন্তু ভগবান সত্যব্রতকে 'অকেজো' করে ফেলে কী জব্দই করেছেন নয়নতারাকে। আসলে—ভাগ্যকেই দোষ দিতে হয়।

তবু মনের মধ্যে একটা ব্যর্থ অভিমান। কিচ্ছু না থাক, ভালোবাসা জিনিসটা এমনভাবে মুছে যাবে?

শিলাদিত্য উঠে এলো, এই টুসকি। তুই যে বুড়োবুড়ির কাছে এসে জমে গেলি? বলেছিস সে কথা?

কোন কথা?

বাঃ! সেই যে পিসিব কে এসে দাদুর কান সারিয়ে দেবে! হা হা হা! দাদু আবার তাহলে প্র্যাকটিসে নামছো? বাবা, মেয়ে বলে কথা! তার যত চিন্তা, তেমন কি আর এইসব ফালতুদের হবে? যাক, এতোদিনে দাদুর একটা গতি হচ্ছে তাহলে।

হয়তো ঠাট্টাই করে। তবু নয়নতারার চোখ ফেটে জল এসে যায়।

আর তখনই হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে যায়, সেই নিষ্ঠুর, নির্মায়িক ছেলেটার উপর। বাড়ির মধ্যে সকলের থেকে যার মনটি ছিল মমতায় ভরা। কারো কোনো কষ্ট কী অসুবিধে দেখলেই তার টনক নড়তো, আর যথাসাধ্য চেষ্টা করতো সেটা কমাতে।

ছোট্টবেলা থেকেই নরম মন, মায়ার মন। তাই না রোগা হ্যাংলা ছেলেমানুষ তারকটাকে যখন তার মা 'বাবুদের ঘরে থাক' বলে বালক ভৃত্যের পোস্টে বসিয়ে দিয়ে নিজে পাঁচ বাড়ি কাজ করে বেড়াতে থাকলো, তখন সেই মায়াদয়াভরা ছেলেটাই না নয়নতারার সঙ্গে জোর তলবে ঝগড়া করতে এসেছিল, 'ওইটুকু একটা রোগা ছোট্ট ছেলেকে খাটাতে তোমাদের লজ্জা করে না?'

সেই বাপ্পা। আজ বোধকরি সবথেকে নির্মায়িক হয়ে গেছে। অন্ততঃ পারিবারিক জীবনে। সে নাকি যে মহাব্রত নিয়েছে, সেই ব্রতের মন্ত্র হচ্ছে মমতাশূন্য হওয়া। ঈশ্বর জানেন কী সেই ব্রত, তবে তার কথাবার্তা শুনে মনে হতো, হঠাৎ বুঝি কেউ তাকে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের চাবিকাঠিটি হাতে

ধরিয়ে দিয়েছে। এখন সেই বন্ধ তালাটি খুলে ফেলতে পারার ওয়াস্তা।

তখন নাকি পৃথিবীটা আর এমন কাদাখোঁচা থাকবে না, সেটাই 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে যাবে। সে রাজ্যে মানুষে মানুষে অসাম্য থাকবে না, কেউ গরীব-দুঃখী থাকবে না, সবাই সমানভাবে খেতে-পরতে পাবে, সমানভাবে শিক্ষা পাবে, পাবে রোগে চিকিৎসা, পাবে 'মানুষের অধিকার'।

আরো অনেক রঙিন স্বপ্ন ছিল তার চোখে। আর আরো কতো প্রতিশ্রুতি ছিল তার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কথায়। তর্ক বেধে যেতো দাদু আর নাতিতে।

কিন্তু সে কবে ?

তখনো সত্যব্রত নামের মানুষটা 'মানুষে'র দরে ছিলেন। কোর্টে যেতেন এবং নাতির 'পার্টি'তে মোটা মোটা চাঁদা দিতেন। না, পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নয়, নাতির প্রতি ভালোবাসায়। বরং তর্কই হতো—কিশোর নাতি আর প্রৌঢ় পিতামহে।

কারণ তখনো সেই কিশোরের মধ্যে 'ভালোবাসা' নামের 'পরমবস্তু'টি ছিল। কখন কোন ফাঁকে যেই বস্তুটি নিষ্কাশিত হয়ে গেল তার হৃদয় থেকে, কখন তার মন থেকে 'আপনজন' শব্দের অনুভূতিটি হারিয়ে গেল, ধোলাই হয়ে গেল তার ভিতরের মায়া-মমতা ভালোবাসা-টাসা। ওগুলো তার কাছে ক্রমেই হাস্যকর আর লজ্জাজনক হয়ে উঠলো। ক্রমশঃ আর তর্ক করবার মতো মূল্যও দিতো না। তর্ক করতে চাইলে একটু অনুকম্পার হাসি হাসতো।

ক্রমশঃ তার দর্শনটাই দুর্লভ হয়ে উঠলো।

সেই ছেলেটা! নয়নতারা মনে মনে ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, সেই ছেলেটাই এ সংসারে হৃদয়হীনতার ভালোবাসাহীনতার চারা পুঁতে দিয়েছে।

তা নইলে আগে—সেই অনেক আগে, যখন ওরা দুই ভাই বালকমাত্র ছিল, ওদের মা তখনো 'বধূ', ওদের বাবা তখনো মা-বাপের স্নেহলালিত 'ছেলে' মাত্র। কী সুখেরই দিন ছিল সেই দিনগুলো।

হঠাৎই যেন কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল।

'বাপ্পা' নামের সেই সদাহাস্য সদা-উৎফুল্ল, আর মায়া-মমতা দরদভরা প্রাণ ছেলেটা কোন মতবাদের পাল্লায় পড়ে একদম নিতান্ত তরুণ বয়সেই আকাশ পাতাল বদলে গেল। ওদের অভিধানে নাকি 'মায়া-মমতা দরদ-ভালোবাসা' এগুলো হচ্ছে একটা বাজে 'সেন্টিমেন্ট'; যা নাকি মানুষকে 'বোকা' আর 'পঙ্গু' করে রাখে। ওদের অভিধানে যেন হাসিখুশি হওয়াটাও মানা। অন্ততঃ বাপ্পার স্বভাবের বদল দেখে তাই মনে হয়।

ওদের নাকি এখন 'সংগ্রামের' দিন। ভয়ঙ্কর সর্বনাশা একটা বিপ্লব, একটা মরণ বাঁচন সংগ্রামের জন্যে নাকি প্রস্তুত হচ্ছে ওরা।

কিন্তু 'দেশ' তো আর 'পরাধীন' নেই। সে তো ভয়ঙ্কর একটা মূল্যের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছে। তবে আবার তোদের কিসের সংগ্রাম ?

তোরা কী অনুভব করতে পারিস, কী সেই 'ভয়ঙ্কর মূল্য' যার বিনিময়ে স্বাধীনতা। কী করে অনুভব করবি ? তোদের তো হৃৎপিণ্ডের আধখানা ছিঁড়ে রেখে দিয়ে রক্তাক্ত বাকি আধখানা নিয়ে 'ভিন্ন রাজ্যে' চলে আসতে হয়নি, 'অবাঞ্ছিতের' মূর্তিতে প্রার্থীর ভূমিকায়।... তবে তোদের মধ্যে আবার কিসের এই দুর্দম প্রেরণা ? কোন মহান প্রাপ্তির আশায় ? কোন 'স্বর্গরাজ্য' গড়ে তোলার স্বপ্ন তোদের চোখে ?

একদা তো একজন 'রামরাজ্য' গড়ে তোলার মায়াকাজল চোখে এঁকে রাজ্যবাসীকে শিকড়ছেঁড়া 'ঐতিহ্যহীন পরিচয়হীন' নিঃস্ব করে দিয়ে বিদায় নিলেন। তোরা কী এবার 'স্বর্গরাজ্যের মায়াকাজল চোখে এঁকে হৃদয় থেকে নিষ্কাশিত করে ফেলবি যা কিছু শুভ, যা কিছু কল্যাণকর, মানবিকতার

যা কিছু শর্ত, আর মানবিক গুণ সমুদয়! প্রেমশূন্য একটা যন্ত্রমানবে পরিণত হয়ে ভোগ করবি সেই স্বর্গরাজ্য?

নয়নতারা জানেন, সবাই তাঁকে বোকা গবেট মূর্খ বলে কোনো ব্যাপারে ধর্তব্যই করে না। নয়নতারার এইসব উত্তাল প্রশ্ন শোনাতে গেলে ওরা মুখ টিপে হাসবে। কিন্তু প্রশ্ন করলে কী ওদের কাছে উত্তর আছে? না, উত্তর নেই।

একদিন সত্যব্রতই এই প্রশ্ন করে বসেছিলেন সেই ছেলেটাকে, একদিন কাছে পেয়ে, সে উত্তর দিয়েছিল, 'যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না।'

এটা অবশ্যই উত্তর নয়।

তাহলে এখন?

এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে, কইরে তোদের সেই 'সর্বনাশা সংগ্রামটা' কোথায় গেল? যে সংগ্রামে তোরা 'বড়লোকের গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে গরীবের জুতো বানাবার' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলি? যে সংগ্রামের ফলে মালিক শ্রমিক এক প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবার কথা, সে সংগ্রামের ফলে দেশের বুর্জোয়া সমাজটা কচুকাটা হবার কথা!... এখন তো দেখা যাচ্ছে সেই বুর্জোয়াদেরই বাড়-বৃদ্ধি। তোদের সর্বহারাদের নেতারা এখন দামী গাড়ি চেপে 'ভেঁপু' বাজিয়ে রাস্তা চলেন, 'হেলিকপ্টার' ছাড়া রাজ্য পরিদর্শনের কথা ভাবতেই পারেন না, আর একটু সর্দিজ্বর হলেই চিকিৎসা করাতে বিদেশে ছোটেন। সেই 'সর্বহারা'দের চালচলন এখন নবাব-বাদশাদেরও হার মানায়। এ তো সবাই দেখছে, ঢেকে রাখবার ব্যাপার তো নয়। তবে? তবে তোরা কেন এখনো চোখে সেই মায়াকাজল পরে বসে আছিস?

এও তাহলে একরকম 'ধর্মান্ধতাই'। যার জন্যে তোরা মৌলবাদীদের নিন্দামন্দ করিস।

কিন্তু প্রশ্নটা করতে যাবে কে? কে দেবে সাপের ল্যাজে পা?

নয়নতারা জানেন, তাঁর ছোট নাতি ও নাতনীটি 'দাদার' মতাবলম্বী নয়, তবু এ ধরনের প্রশ্ন হলে তারাও সেই ধর্মান্ধদের মতোই দাদার পক্ষ সমর্থন করে তর্ক জুড়বে। নয়নতারাকে নস্যাৎ করবে, হ্যানস্থা করবে, এবং শেষ পর্যন্ত বলবে, যা বোঝো না তা নিয়ে বোকার মতো তর্ক করতে এসো না।

গোলমেলে তর্কে জিতে যাওয়ার এটাই হচ্ছে সহজ পথ। প্রতিপক্ষকে ব্যঙ্গ করে 'বোকা' আখ্যা দিয়ে নস্যাৎ করে ফেলা।

তোর বন্ধুটা একটা রাবিশ হোঁদা। বলে টুসকি মুখটা বাঁকালো।

শিলাদিত্য প্রশ্নসূচক দৃষ্টি হেনে ভুরু কোঁচকালো অর্থাৎ এ কথার কারণ?

টুসকি বললো, কী রকম হ্যাংলার মতো পিসির বাড়ি গিয়ে একদম জমে গেল! চেয়ে চেয়ে তিলের নাড়ু, না কী একটা খেলো। আর কী মোহিত মোহিত ভাব দেখালো। পিসির শ্বশুর তো সার্টিফিকেট দিয়ে বললো, 'আহা। কী ছেলে! আজকাল আর এমন দেখা যায় না।' কই, তোর ব্যাপারে কোনোদিন বলেছে এ কথা?

আমার ব্যাপারে? আমায় নতুন দেখলো না কী?

নাই বা নতুন দেখলো, দেখছে তো।

শিলাদিত্য একটু হেসে বললো, তোকে তো ধন্য ধন্য করে।

থাম! আমি বলছি তোর বন্ধুটা নির্ঘাৎ ওই পাপিয়াটার প্রেমে পড়ে বসে রোজ রোজ যেতে শুরু করবে।

শিলাদিত্য এখন মনে মনে হাসে। আসল কথায় এসো চাঁদু। পাপিয়ার সঙ্গে কথা কওয়া দেখেই তোমার জেলাসি শুরু হয়েছে। ...আরে বাবা, বন্ধু তো বন্ধু। একদা সহপাঠী। এখন ওর কী মতিগতি আমি জানি? হ্যাণ্ডসাম চেহারা, তায় আবার গাড়িবান, প্রেম করে বেড়ানোই ওর পেশা কিনা তাই বা কে জানে।

তবে মুখে অগ্রাহ্য দেখিয়ে বললো, তাই যদি যায়, তাতে তোরই বা কী, আমারই বা কী!

টুসকি ভারী মুখে বললো, কারুর কিছুই না, তবে এ রকম হ্যাংলামার্কা লোক দেখলে আমার গা জ্বলে যায়।

শিলাদিত্য হঠাৎ প্রসঙ্গটাকে আকাশ পাতাল বদলে বলে উঠলো হ্যাঁরে, টুসকি, দাদার সঙ্গে তোর কতদিন দেখা হয়নি বল তো?

দাদা! হুঁঃ। কতটুকু সময় বাড়িতে থাকে যে তুচ্ছ বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা হবার স্কোপ পাওয়া যাবে?

বাড়িতে খায়? নাকি খায় না?

মাঝে মাঝে তো দেখি খাচ্ছে। আসলে আমাদের মা জননীটিও যে জ্যেষ্ঠ পুত্তুরটির দোষ ঢাকবার জন্যে রাতদিন মিথ্যের জাল বুনে চলেন। প্রকৃত অবস্থা ধরা যায় না। হয়তো বানিয়ে বানিয়ে বলবে, 'এই তো একটু আগে এসে খেয়েদেয়েই বেরিয়ে গেল।' কিংবা বলবে, 'আজ বলে গেছে ফিরতে দেরি হবে।' না তো সাপ ব্যাঙ যা হোক কিছু বানিয়ে বাবার রাগ থেকে ছেলেটিকে সামলাবেন।

শিলাদিত্য একটু গম্ভীর স্বরে বলে, আগে দাদা আমার সঙ্গে কত আলোচনা করতো, কত গল্প করতো। এখন মনে হয়, হঠাৎ রাস্তায় দেখলে চিনতে পারবে কী না।

আচ্ছা কী এতো কাজ রে ওদের?

ওরাই জানে। তবে শুনি নাকি এখন পঞ্চায়েতের কাজে গ্রামে গ্রামে ঘোরাঘুরি করে বেড়ায়! জমিটমির ফয়সালা করার কাজ। আসল কথা জিগ্যেস করলেও মন খুলে বলতে চায় না।

টুসকি হঠাৎ হি হি করে হেসে উঠে বলে, ইস। দাদাটা যদি একখানা প্রেমট্রেমে পড়ে বসতো, তাহলে বোধহয় একটু ধাতে আসতো।

তোর মাথায় বুঝি এখন শুধু ওই জিনিসটিই ঘুরছে? বলে টুসকির মাথায় একটা টোকা দিয়ে চলে যায়।

তবে মনে মনে ভাবে, প্রেমে পড়লে, হয়তো ওদের পার্টিরই কোনো মেয়ে জুটবে। তা থেকে কী আর ধাতে আসতে পারবে?

যদিও শিলাদিত্য দাদার ব্যাপারে খুবই শ্রদ্ধাশীল এবং স্থির জানে, দাদার মতো এমন অনেস্ট কর্মী ওদের পার্টিতে আর দুটো আছে কিনা সন্দেহ, তবু মনে মনে নয়নতারার মতোই বলে, তোর সবকিছুই বৃথা হয়ে যাচ্ছেরে দাদা। তোদের নেতারা দিব্যি আখের গোছাচ্ছে—বাবুয়ানা করছে, কোটিপতিদের সঙ্গে ওঠাবসা খাওয়াদাওয়া করছে, তলে তলে তাদের সঙ্গে আঁতাতের কারবার চালাচ্ছে, আর তুই—এখনো তাদের পুজো করে চলেছিস? তোদের কী মোহভঙ্গ হবার মতো চেতনাটুকুও নেইরে?

কিন্তু এসব কথা বলবার মতো সময় বা সুযোগ কোথায়? দাদা আর শিলাদিত্য দুজনে এখন ভিন্ন গ্রহের জীব। শিলাদিত্যরও তাই মাঝে মাঝে তার গইয়া ঠাকুমার মতেই মনে হয় 'আগে বেশ ছিলাম'। যদিও দাদা তাকে কোনোদিনই তেমন গণ্য করতো না, তবু ভালোবাসতো খুব। কিন্তু এখন বোধহয় 'ভালোবাসা' নামক জিনিসটাকে বিলাসিতার মতো শৌখিন জিনিস বলে মনে করে। শৌখিন, অতএব ত্যাজ্য। কারণ ওরা এখনো 'সর্বহারার' তালিকায় নাম লিখিয়ে রেখে 'বিপ্লবের'

পদধ্বনির আশায় কান পেতে আছে।

মেঘলা দুপুর, ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া অন্ধকার। বইটা পড়তে পড়তে মুড়ে রেখে বনছায়া চোখটা একটু বুজলেন। ঘুমের জন্যে নয়, দুপুরে ঘুমের অভ্যাস তাঁর নেই বড় একটা। চোখ বুজে ভাবতে থাকেন তাঁর ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। 'জীবন' জিনিসটা কী বিচিত্র। কত রকম তার পট পরিবর্তন, কত অভাবিত তার গতি!

পিছোতে পিছোতে চলে যান সেই কুমারীবেলায়! বাপ নেই, বিধবা মা দ্যাওর ভাসুরদের হেফাজতে মেয়েটাকে নিয়ে থাকেন। কাকা যখন একটি 'দোজবরে' পাত্র খুঁজে আনলেন, তখন মায়েব সামান্যতম আপত্তিটুকুতেই সংসারে যেন আগুন জ্বলে উঠলো। রাগ-ধিক্কার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ঝড়। সব দিকে ভালো, সুকান্তি স্বাস্থ্যবান একটা ছেলে, অল্পবয়সে বিয়ে হয়েছিল, সেই বৌ প্রথম সন্তান প্রসবকালে মারা গেছে। তাকে কী আর 'দ্বিতীয় পক্ষ' বলে?

তাছাড়া—মেয়ের যখন রং ময়লা, এবং বয়েসও বেশ খানিকটা হয়ে গেছে, তদুপরি বাপ নেই যে, অগাধ খরচা করবে, তখন ওটুকু মেনে না নিলে? কোন রাজপুত্তুর তোমার মেয়েকে বিনা পণে বিয়ে করতে ছুটে আসবে? ...এমন কি বনছায়ার ঠাকুমা পর্যন্ত ছিছিক্কার করে বলে উঠেছিলেন, পাত্তর 'দোজবরে' বলে কোন মুখে তুমি নাক কোঁচকালে সেজ বৌমা? বুনির কি বাপ আছে? না বাপ ঝাঁকা ঝাঁকা টাকা রেখে গেছে? কাকা মরে-পিটে একটা সম্বন্ধ খুঁজে বার করেছে, এই না ঢের। এই তো শুনছি—ছেলের অবস্থা ভালো, মস্তবড় বাড়ি, রান্নার লোক আছে। আর 'বাচ্চা'টাকে নাকি পিসি না কে কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাশোনা করছেন। ...তবে?

তা করছেন। তবে শোনা গেছে পিসি নাকি তখন একে নিজের গোটা তিনেক নিয়েই বিব্রত, আবার চতুর্থবার হাসপাতালে যাবার জন্যে রেডি হচ্ছেন। বৌ মরা ভাই, আর একটা 'বৌ' ঘরে নিয়ে এলেই তিনি ভাইয়ের ছেলেকে ভাইয়ের হাতে সঁপে দিয়ে বাঁচবেন।

বনছায়ার মনে পড়লো, সেই কুমারী মেয়েটা লাজলজ্জার মাথা খেয়ে ঠাকুমার কাছে গিয়ে বললো, 'মার কথা ছাড়োতো ঠাকমা। ওই যেখানে সম্বন্ধ নাকি হচ্ছে, সেখানেই কথা দিয়ে দাও!'

কিন্তু পরে কী মনে হয়েছিল, মেয়েটা খুব ভুল করেছিল?

মোটেই না। কী স্নেহময়ই ছিলেন স্বামী। আর কী কৃতজ্ঞ কৃতজ্ঞ ভাব! যেন বনছায়া তাঁর সংসারে এসে সংসারটাকে এবং তাঁর মাতৃহীন শিশুপুত্রটাকে আপন করে নেওয়ায় একদম কৃতকৃতার্থ।

বনছায়াও তো সত্যিই সেই শিশুটিকে 'আপন' করেই নিয়েছিলেন। তারপর নিজের তো দুটি হয়েছে, মেয়ে রিঙ্কু, ছেলে ঋত্বিক। কিন্তু বনছায়ার কী তিনজনের মধ্যে কোনো পার্থক্যবোধ ছিল? ...কারুরই ছিল না। কিন্তু কী আশ্চর্য, স্বামীর মৃত্যুর পর হঠাৎ দেখলেন, সেই 'বড়ছেলে'টা যেন বনছায়ার 'প্রতিপক্ষ' হয়ে উঠলো। স্বামীর মৃত্যুর পরেই বা বলা যায় কী করে? তিনি বেঁচে থাকতেই তার স্বভাবটা কী অদ্ভুতভাবে বদলে গেছল! এখন তো আরোই। অথচ বনছায়া কোনোদিনই ভাবতে পারেন না, তাঁর দুটি ছেলে মেয়ে। বরাবর ভেবে থাকেন আমার 'তিনটি'।

কিন্তু সেই 'বড় ছেলে' কেন এমন দূরত্ব রচনা করে ফেললো বনছায়ার সঙ্গে? কেন তার এমন 'বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন' ভাব?

বনছায়া খেয়াল করলেন না, এ বিচ্ছিন্নতা একটি স্বাভাবিক জাগতিক নিয়মের অধীন। পুরুষ জাতটা নিজে যতই বলদর্পিত হোক, বা নিজের শক্তিমত্তায় অবহিত থাকুক, একটি নারীর হৃদয়ের কাছে আশ্রয় তার দরকার। ...সে আশ্রয় তো তার জন্মগত সূত্রেই জোটে মার কাছে। কিন্তু যেই অপর এক 'নারী' এসে তার জীবনআকাশে উদিত হয় তার যৌবনের মোহময়ী আকর্ষণ নিয়ে, সেই

সে পুরুষের 'আশ্রয়গৃহে'র বদল ঘটে যায়।

অতঃপর আর কী?

সেই নবাগতাই তার জীবনের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে ওঠে। সেই সর্বময়ীর চোখেই সে সর্বসংসারকে দেখতে শুরু করে। অতএব সপত্নী-পুত্র বলেই নয়, আপন পুত্রের ক্ষেত্রেও ওই একই ঘটনা ঘটে। হয়তো ভবিষ্যতে ঘটবেও তাই বনছায়ার জীবনে। জাগতিক নিয়মেই।

তবে বনছায়ার 'বড় ছেলে' সুরজিতের ক্ষেত্রে তার বৌয়ের পক্ষে প্রভাব বিস্তারটি আরো সহজ হয়েছে, ওই 'সপত্নী-পুত্র' শব্দটিকে হাতিয়ার করে। সুরজিৎ ধরে নিয়েছে এ যাবৎ মা যা কিছু স্নেহ-মমতা করেছে তাকে, সবই নিশ্চয় লোক দেখিয়ে এবং বাবার মন জয় করতে। ...এখন আর কিসের কী?

কিন্তু বোকা মেয়ে বনছায়া আপন স্বভাবধর্মে ভাবতে থাকেন ছেলেটাকেই বা দোষ দেব কী? আমিই কী আর মায়ের কর্তব্য কিছু করে উঠতে পারছি? এই যে ছেলেটা ছুটিছাটায় আসে, বৌ-ছেলে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে উঠতে বাধ্য হয়। আমি বলতে পারি না 'আমার কাছে থাক না দুদিন?' এই দেড়খানা ঘরের মধ্যে কোথায় থাকতে বলব।

বনছায়ার মনে পড়ে না, বনছায়াও যে এই দেড়খানা ঘরের বাসিন্দা হতে বাধ্য হয়েছেন, সেও অনেকটা ওই বড় ছেলেরই কারসাজিতে। ...নিজের ত্রুটির দিকটাই দেখেন বনছায়া।

আবার বনছায়া জগৎ-সংসারের দিকে তাকিয়ে এ কথাটিও ভাবতে জানেন না, প্রবাসী পুত্র ছুটিতে 'স্ববাসে' এলে তার চিরকালের জায়গায় 'অগাধ জায়গা' থাকলেও শ্বশুরবাড়িতেই গিয়ে উঠতে আর থাকতে বাধ্য হয়। সে বাধ্যতা তার সর্বময়ী কর্ত্রীর অঙ্গুলি হেলনের বশে। দিকে দিকে একই দৃশ্য। তবু বনছায়া হিসেব করতে বসে, নিজের পাল্লায় ত্রুটির ভার চাপিয়ে দুঃখ পান।

মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে ঘুমই এসে যাচ্ছিল। হঠাৎ দুমদাম করে ঢুকে এলো যুধাজিৎ, মা, এ কী? তোমার এ কী অধঃপতন? দিবানিদ্রা? কখনো তো দেখি না দুপুরে নাক ডাকাচ্ছো

ধড়মড় করে উঠে বসেন বনছায়া। রাগের ভান দেখিয়ে বলেন, হ্যাঁ, নাক ডাকাচ্ছি। যা মুখে আসে বললেই হলো। কবে আবার আমি নাক ডাকাই রে?

আহা। সে কী তুমি নিজে টের পাও গো?

যুধাজিৎ হো হো করে হেসে উঠে বলে, 'বাঘ'ও কখনো স্বীকার করবে না তার নাসিকা 'গর্জন' করে।...

আচ্ছা ঢের হয়েছে। হঠাৎ এমন অসময়ে যে?

আমার আবার সময় অসময় কী? আমি কী কারো গোলাম? যাক—আসল কথায় আসি, বলো তো তোমার বাড়ির নামটি কী হবে?

বনছায়া আকাশ থেকে পড়েন।

বাড়ি! বাড়ির নাম! তার মানে?

যুধাজিৎ গড়িয়ে খাটের ওপর শুয়ে পড়ে মার কোলে মাথা রেখে বলে, বাঃ, বাড়ির একটা নাম হবে না? তুমিই ঠিক করবে সেটা।

কার বাড়ি, কোথায় বাড়ি, আমি নাম ঠিক করতে বসবো? তোর কী রোদে জলে ঘুরে ঘুরে মাথাটা খারাপ হয়ে গেল না কী?

যুধাজিৎ উঠে বসে বলে, মাথা খারাপ মানে? দস্তুরমতো তোমার নিজের একখানা বাড়ি হচ্ছে তা জানো? পুরো কমপ্লিট হয়নি এখনো, হয়ে যাবে কয়েক দিনের মধ্যেই। তবে নামটা ঠিক হয়ে গেলে এখনি তার ব্যবস্থা করে ফেলতে পারি।

বনছায়া হতাশ গলায় বলেন, আমায় যে তুই সত্যিই ভাবনায় ফেললি রে জিতু! বাড়ির স্বপ্ন দেখতে দেখতে মাথাটা বিগড়ে গেল না কী?

যুধাজিৎ এখন গভীর গলায় বলে, স্বপ্নটাকে সত্যে এনে পৌঁছেছি মা! সত্যিই তোমার একখানা বাড়ি হয়ে এসেছে।

বনছায়া ভাবেন ছেলের এই গভীরতাও একটু দুষ্টুমি। তাই বলেন, কোথায় হলো? 'মায়াকাননে' বোধহয়?

মায়াকানন! ও, ঠাট্টা! সত্যিই একটা বাড়ি করে তুলেছি মা তোমার জন্যে দমদমের কাছে। তোমাকে আর এভাবে উদ্বাস্তুর জীবনে দেখতে পারছিলাম না মা, তাই উঠে পড়ে লেগে—

উঠে পড়ে লাগলেই কী সব হয় জিতু?

বনছায়া একটু গম্ভীর হন, টাকা লাগে না?

ও বাবা, তা আবার লাগে না? তোমার এই সুন্দর ছেলেটিকে দেখে কেউ যে একটা দশ নয়াও কম নিয়েছে, এমন ভেবো না।

তাহলে! টাকা তুই পেলি কোথায়?

বাঃ, কোথায় আবার? দস্তুরমতো উপার্জন করে।

বনছায়া আরো গম্ভীর হন! কোথায় কী ভাবে? উপার্জনের পথটা কী?

আশ্বস্ত থাকো জননী, ব্যাঙ্ক ডাকাতি বা চুরি-ছিনতাইয়ের ব্যাপার নয়। সত্যিকারেরই উপার্জন। রাতদিন যে ঘুরে বেড়াই তার একটা কারণ তো আছে?

এই ঘুরে বেড়ানোর সূত্রে তুই এরই মধ্যে একখানা বাড়ি তৈরি করে ফেললি, এই কথা বিশ্বাস করবো আমি?

তাহলে কী বিশ্বাস করবে? তোমার ছেলেটা চুরি-ডাকাতি ধরেছে?

যুধাজিতের কণ্ঠস্বর আহত।

বনছায়া তাড়াতাড়ি বলেন, সে কথা হচ্ছে না, তবে ভয় হচ্ছে কোনো অসৎ লোকের পাল্লায় পড়ে ভুল পথে পা বাড়িয়ে বসিসনি তো বাবা। সৎপথের রোজগারে কী এতো সহজে একখানা বাড়ি তৈরি করে ফেলা যায়?

যুধাজিৎ বলে, 'সৎপথ' বলতে তুমি কী বোঝো মা? চাকরী? কেরানীগিরি? এই মাত্র?

আহা, শুধু কেরানীগিরিই বা কেন? বড় চাকরী হয় না বুঝি?

তোমার বড় ছেলের মতো?

বনছায়া অপ্রতিভভাবে বলেন, তা মোটামুটি ভালো চাকরীই তো করে সুরো।

ওইটুকুই জানো, কেমন? কিন্তু জানো কী দাদা যে স্টাইলে চলে, তাতে তার মাইনের টাকায় মাসের দশটা দিনও চলে না।

চলে না! তাহলে?

তাহলে আর কী? তোমার হিসেবে ওই সৎপথের আগে একটি 'অ' জুড়ে দিতে হয়। সৎপথ! 'সৎপথ' বলে আর কোনো শব্দ এ যুগের অভিধানে নেই মা। সবাই শুধু 'পথ' খুঁজে চলেছে। 'বেঁচে থাকার পথ', আরাম আয়েসের পথ, লোকের চোখ-ধাঁধানোর পথ, অন্যের মাথায় পা দিয়ে হাঁটার পথ, অন্যকে করুণার দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার পথ, পথ চলতে জলপথ স্থলপথ ছেড়ে, সর্বদা আকাশপথে ঘোরাঘুরির পথ! এই সব। যে যখনি হুশ করে তোমার মাথার ওপর উঠে গিয়ে ওড়াউড়ি করতে শুরু করে, তখনি তুমি তাকে মান্যগণ্য না করে পারবে না মা, তাই সেটাই হচ্ছে প্রকৃষ্ট পথ।

তোর কথাগুলো যেন হেঁয়ালি ঠেকছে জিতু।

হেঁয়ালি ? বলো কী ? এ তো স্রেফ সাদা বাংলা বলছি।...লোকে দেখেশুনে বুঝে ফেলেছে 'সৎপথ' বলে সত্যিই এখন আর কোনো পথ নেই। আগে লোকে স্কুলমাস্টারদের বা শিক্ষকশ্রেণীকে খুব মান্যভক্তি করতো, কারণ জানতো এরা হচ্ছে আদর্শবাদী !...হঠাৎ এদের চোখ খুলে গেল। দেখলো আদর্শ ধুয়ে জল খেয়ে এ যুগের সঙ্গে তাল দেওয়া যাচ্ছে না। তারা পথ বদলালো। এখন দেখবে, সব থেকে দুর্নীতি ওই শ্রেণীর মধ্যে। ...আগে তোমরা জানতে—চিকিৎসা শুধু পেশাই নয়, একটা মহান ব্রত। ডাক্তার মানে দেবতা। এখন ডাক্তারদের মধ্যে দেবত্ব খুঁজতে যাও। শতকরা নব্বই জায়গায় হতাশ হবে। ...সকলের কথা আলাদা করে বলতে গেলে একটা জীবনে ফুরোবে না। তবে জেনে রেখো—হিমালয়ের চুড়ো থেকে মাটির তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত এক সুরে বাঁধা। সে সুরের নাম সুবিধেবাদ ! ...আচ্ছা এতো কথা থাক, বলো তো ব্যবসা-বাণিজ্য তো মানুষের চিরকালীন ব্যাপার। তো ব্যবসাটাকে কী তুমি 'অসৎপথ' বলে ধরো ?

বাঃ। তা কেন ? সৎপথে ব্যবসা হয় না ?

কী করে হবে ? ব্যবসায় লাভ করতে হলেই তো তোমায় ন্যায্যর অতিরিক্ত কিছু পেতে হবে ? দু'টাকার জিনিসটা পাঁচ টাকায় বেচতে পারলে তবে না লাভ ? তাহলে বলছো ব্যবসা একটা অসৎপথ ?

বনছায়া কোণঠাসা গলায় বলেন, আহা, তা বলবো কেন ? তবে দু টাকারটা পাঁচ টাকায় করলে যে গলায় ছুরি। একটু কমটম করে--

তার মানে তুমি বলছো, এক-আধটা খুন করলে তেমন দোষ নেই, অনেকগুলো খুন করলেই দোষ।

ওরে দুষ্টু ছেলে। এর মধ্যে আবার খুনোখুনির কথা কেন ?

ওটা একটা উদাহরণ। আসল কথা হচ্ছে ন্যায্যের অতিরিক্ত নেওয়া মানেই কিছুটা অসততা। তা, সেটা না হলে তো আর দোকানদারী ব্যবসাদারী হয় না। তোমাদের বুনো রামনাথের যুগ শেষ হয়ে গেছে মা। তাঁকে আর এখন কেউ সম্ভ্রমের চোখে দেখে না, বরং 'বোকা' বলে। আমার মতে—অন্যের অনিষ্ট না করে বা অপরকে পীড়ন না করেও যদি কিছু লাভ করা যায় তালে তুমি কিছুতেই অসৎপথ বলতে পারো না। সেটাই হচ্ছে আমার পথ

হঠাৎ মাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে আবেগের গলায় বলে ওঠে সুধাজিৎ, আমি অনেক টাকা করতে চাই মা, অনেক টাকা।

কী হবে রে জিতু অনেক টাকায় ? অনেক টাকাতেই কী অনেক সুখ ?

সুধাজিৎ বলে, তা জানি না। তবে কম টাকায় যে 'অনেক দুঃখ' তা হাড়ে হাড়ে জানছি। আচ্ছা মা, তোমার ইচ্ছে করে না তোমার একখানা বাড়ি হোক ? সুন্দর সাজানো গোছানো। অনেকগুলো ঘরওলা বড়সড় বাড়ি। যেখানে তুমি আবার আগের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সংসার করতে পারবে। যেখানে তোমার মেয়ের জন্যে জায়গা থাকবে, তোমার বড় ছেলের সংসারের জন্যে জায়গা থাকবে, এবং হতভাগা ছোট ছেলেটারও একটু ঠাঁই জুটবে। আবার তুমি আগের মতো আত্মীয়-স্বজনকে বাড়িতে ডাকতে পারবে, তোমার নিজস্ব একখানা গাড়ি থাকবে, ইচ্ছেমতো বেড়াবে। এসব সাধ হয় না ?

বনছায়ার বুকটা থরথর করে, গলাটা কাঁপে। বলেন, 'গাড়ি টাড়ি'র সাধ করি না জিতু, তবে সবাইকে কুলোবার মতো একখানা বাড়ি হলে--

সেটা চাও তো ? বলো। বলে ফেলো। বলো, চাও কিনা ?

বনছায়া হেসে ফেলে বলেন, তা অবিশ্যি চাই।

তবে ? তেমন একখানা বাড়ি তোমার হচ্ছে, এ খবর শুনে কোথায় আহ্লাদে নাচবে, তা নয়।

যতো সব কূটকচালে কথা !

বনছায়ার বুক আরো থরথর করে ওঠে। বলেন, তেমন একখানা বাড়ি তুই বানিয়েছিস ! এই কথা বলছিস ?

আমার আন্দাজ আর সাধ্যমতো। ঠিক যেরকম একখানা বাড়ি তোমার ছিল, তিনতলা ! প্রতি তলায় চারখানা করে ঘর। ...তবে হ্যাঁ, প্ল্যানটা অবশ্য একটু আধুনিক ঘেঁষা। ঠিক তোমার হারানো বাড়িখানার মতো নয়। একটু এদিক ওদিক—

জিতু !

বনছায়া প্রায় ডুকরে ওঠেন, তুই কী আমার সঙ্গে ঠাট্টা চালিয়ে যাচ্ছিস ?

না। ঠাট্টা নয়। সত্যি। সত্যি সত্যি। এই তিন সত্যি। বলো তো 'মা কালীর দিব্যি' দিই।

থাম তো। ফাজিল ছেলে।

বনছায়া গাঢ় গলায় বললেন, কী করে এমন অসম্ভব সম্ভব হলো রে জিতু।

অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে এই চেষ্টায়।

তা এতোদিন তো কই ঘুণাক্ষরেও বলিসনি।

বাঃ। আগে থেকে বলে পুরনো করে ফেলবো কেন ? সারপ্রাইজ ভিজিট দেব বলে ঠিক করেছি। তবে এখন বলে ফেলতে হলো, ওই নামকরণের জন্যে। বাড়ির একটা নাম থাকা দরকার তো। বলো। আচ্ছা ভাবো। আজ রাত্তিরের মধ্যে ঠিক করলেও চলবে।

বনছায়া একটু ছেলেমানুষের মতো হেসে ফেলে বলেন, ওর আর ভাবাভাবি কী ? মনে মনে তো ভাবাই আছে। মনে মনে তো স্বপ্ন দেখতে পয়সা লাগে না ? কাজেই খাটতে-খুটতেও হয় না। তাই ভাবি—যদি কখনো ভগবানের দয়ায় ছেলেদের বাড়ি হয়, নাম রাখতে বলবো—

'ছেলেদের' মানে ? বলো যদি তোমার নিজের বাড়ি হয়। এ বাড়ি হচ্ছে তোমার নিজের বাড়ি। কক্ষণো ছেলেদের বাড়ি বলবে না।

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা ! তাহলে বলেই ফেলি—ভাবি যে—সে বাড়ির নামও হবে—

কী হলো ? থেমে গেলে যে ?

বনছায়া কুণ্ঠিত হেসে বলেন, থাক, পরে বলবো।

বাঃ এই বলছো ভাবা আছে, ঠিক করা আছে। তবে ?

বনছায়া বলে ওঠেন, বেশ বাবা, বলেই ফেলছি। ভেবে রেখেছি সেই বাড়ির নামও তোদের ঠাকুমার নামেই থাকবে, 'মনোরমা ধাম'।

মাই গড্ ! বলো কী ? সেই পুরনো নামই ? যে শাশুড়ীকে চোখেও দেখোনি, তাঁর ওপর এত ভক্তি ?

যুধাজিৎ ভাবছিল মা হয়তো যুধাজিতের বাবার নামের সঙ্গে কিছুটা সম্পর্ক রেখে 'দেবনিবাস' কী 'দেবালয়' গোছের কিছু বলবে, তাই এতো কুণ্ঠাভাব। এ কী ! সেই 'মনোরমা ধাম'।

বনছায়া গাঢ় গভীর গলায় আস্তে বলেন, শাশুড়ীকে দেখিনি ! তাঁর ছেলেকে তো দেখেছি। দেখেছি তাঁর কতদিন আগে 'চলে যাওয়া মায়ের ওপর' কী গভীর ভালোবাসা !

॥ সাত ॥

বেশী মাইনের লোভে পুরনো মনিববাড়ি ছেড়ে এক বড়মানুষের বাড়িতে কাজে ঢুকে তারকের মা বেশ একটু মুস্কিলে পড়ে গেছে। এ বাড়ির ভারী কড়াকড়ি। বাজার দোকান দুধ র‍্যাশন ইত্যাদির জন্যে আলাদা লোক আছে এদের। অতএব রাঁধুনীর পথে বেরোতে পাবার কোনো যুক্তি নেই, অথচ পাড়াবেড়ানি স্বভাবের তারকের মার চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দীদশায় থাকতে প্রাণ আইঢাই করে।

তারকের সঙ্গেও তাই দেখাসাক্ষাৎ প্রায় দুর্লভ হয়ে গেছে। ছেলেকেই বলে রেখেছে বটে, আমার তো এখন পর্দানসীন অবস্থা ঘটেছে রে তারক, একটু বেরোতে চাইলেই, 'ক্যানো কী বিত্তান্ত, কোতায় যাবে, কখোন আসবে' এই সব সাত সতেরো হুজ্জুতি জেরা। আবার গিন্নীর থেকে গিন্নীর বেধবা বুনঝিটি বেশী দড়। সে বলে, 'তো তুমিই বা ছেলেকে দেখতে হুটহুট যাবে কেন গো? জোয়ান ছেলে—সে আসতে পারে না মাকে দেখতে? তার মনিববাড়ি থেকে বুঝি অবসর পায় না? তো তুইই যাস বাবা এক একবার। বেশীদিন না দেকলে প্রাণ ক্যামন করে।

কিন্তু ছেলে সভয়ে মাথা নাড়ে, না বাবা, আমাকেও ওদের দেউড়িতে মাথা গলাতে হলে নানান কৈফেৎ দিতে হয়। কতবার দেখেছে, তবু বলবে—'কে তোমার মা? নাম কী? কতদিন এখেনে কাজ করছে?' এই সব। তার ওপর আবার গেটে লেখা— 'কুকুর হইতে সাবধান।' ওরেব্বাস! তাপর? ঢুকতে গেলে তেড়ে এসে ঘ্যাঁক করে একখান কামড় বসিয়ে দিক, আর কী!

সে কথায় তারকের মা হি হি করে হেসে বলেছিল, ওই 'নেকাই' আচে। কুকুর কোতা? বলে, স্বয়ং বাড়ির গিন্নীর কুকুরে যা ভয়! যে বাড়িতে কুকুর পোষা আচে, সে বাড়িতে নাকি বেড়াতে যায় না। এখেনে কুকুর নাই।

তারক চোখ কুঁচকে বলে, বললেই হলো? বাইরে থেকে আকাশ ফাটানো 'ঘেউ ঘেউ' শোনা যায়।

হি হি, সেও ফক্কিকারি রে তারক। কুকুরের খাঁকখাঁকানি 'টেপ' না কী যেন করে 'কেসেটে' ভরে রেকে দেচে, মদ্যে মদ্যে সেটাকে চালিয়ে দ্যায়।

কী আশ্চয্যি! এর কারণ?

কারণ? শুদিয়েছিলুম ঘরমুচুনি মেয়েটা হেমলতাকে, বলে কি বাড়িতে কুকুর থাকাটা নাকি বড়নোকী কেসান। না থাকলি মান থাকেনি। তাই এই কৌশল। বলে, গেটে ওই যে 'সাবধানের' কতা নিকে রেকেচে, ওতে মান-মর্যাদা রক্ষে হয়েচে।

মনিববাড়ির মান রক্ষার এই 'মান' দেখে সেদিন মায়ে ছেলেয় খুব হেসেছিল। তবু তারক আসতে তেমন গা করে না। বলে, এলেই বা কী? সেই তো বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বলে চলে যাওয়া। তোর আগের মনিব-বাড়ির মতন কী? যে গিন্নী বলবে 'ও তারকের মা, ছেলে এয়েছে, একটু চা পানি খাইয়ে দাও। ঘরে কী আছে না আছে দ্যাখো না!' 'দিদমা' বলে নমস্কার করলে 'থাক থাক' বলে কতো কথা শুধোতো। কতোদিন নিজেই হাতে করে এটা ওটা খেতে দিয়েছে। তোর সঙ্গে বসে দু'ঘণ্টা গপপো করলেও কিছু বলেনি।

তারকের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তা সত্যি, গিন্নীর মনটি খুব ভালো ছেলো। নজরও উঁচু। বলতো, 'আহা, 'ছেলে' বলে কতা। তোমার কাজটা বরং একটু পরেই হবে।' তা বাদ খাওয়া দাওয়ায় নিজেদের সঙ্গে কোনো তফাৎ করতোনি। নিজেরাও কিচু নিত্যদিন পোলোয়া কালিয়া খাচ্ছে না, যা হতো তা সবারই এক। আবার যেদিন জামাই কুটুম আসবে বলে ভালোমন্দ কিছু হতো, আমারেও

তা দিতো। এখানে অন্য বেবোস্তা। একগাদা নোকজন, তাদের জন্যে মোটা বেবোস্তা!

সে বাড়ির কাজটা ছেড়ে ঠিক করিসনি মা।

তারকের মা দুঃখের গলায় বলে, ত্যাখোন ঠিক বুজতে পারি নাই রে। ওখেনে জুতো সেলাই থেক চণ্ডীপাঠ সকল কাজের দায়িত্বো, আর মাইনা মোটে একশোটি ট্যাকা! আর এখেনে, তো শুধু রান্নাই। রান্না বিনে আর বিশেষ কিচু না। অছতো মাইনা দুশোর ওপর আরো দশ! বলেচে পুজোর পরে আরো বাড়িয়ে দেবে। ওই নোবে পড়েই। দেশে তোর নেগে এট্টু জমি-জিরেত করতে মন, নগদ ট্যাকাটার তো দরকার।

দেশের জমি-জিরেত! হবেটা কী শুনি? কে থাকতে যাবে সেখানে?

আহা! ভবিষ্যতে যাবি না?

তারকের মা স্বপ্নভরা গলায় বলে, চেরটাকাল পরের বাড়ি নকরগিরি করবি? বে থা করে আপন দেশে সোমসার পেতে দশের অ্যাকজন হবি না? আমি নাতিপুতি নে আদর-গোবর করব না? তুইও ট্যাকা জমা, আমিও ট্যাকা জমাই, উভয়ের চেষ্টায় হবেই এসব।

তারক মায়ের স্বপ্নসৌধটিকে এক ফুঁয়ে উড়িয়ে দিয়ে বলে, ওই অহ্লাদেই থাক। তোর তারক বে-ই করবে না।

ষাট! ষাট! শোনো কতা! বে' করবিনি কী? তোর বাপের তুই অ্যাক সন্তান না? তা মানুষটা তো অকালে চলে গ্যাচে, তো তার নামখানা মুচে যাবে? বনশো থাকবেনি?

কী একখান রাজা-মহারাজার বংশো রে? তাই সে বংশ থাকা না থাকার চিন্তা! আমি বাবা বে-টে করে পায়ে বেড়ি পরছিনে। বড়দাবাবু বলে, 'মহা আহাম্মুকেরাই বে করে।'

তারকের মা ছিটকে ওঠে, তোর ওই বড়দাবাবুটিই তোর মাতাটা খেয়েচে, নিজে যেমন বাউণ্ডলেপনা করে বেড়ায়, ইচ্ছে সবাই তাই হোক। তো ওবাড়ির কর্তার তো আরো ছেলে রয়েচে, বড় না করুক, ছোটো ছেলে বে-থা করে সোমসারি হবে। আমার কী হবে তাই ক?

তারক হেসে হেসে বলে, তো তোমারই বা মোটে একটা ক্যানো? জেঠির মতো সাতটা নয় ক্যানো?

তারকের মা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে, এতোদিনে এই কতা কইলি? সাতটা ক্যানো নাই জানিস না। তোরে ছ মাসেরটি নে বেধবা হই নাই?

হাসি-তামাসা হঠাৎ স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আসাতেই তারক তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ওই হলো চোখে অমনি নোনাপানি। এতে তোকে মানায় না মা। খাণ্ডারণী মূর্তিটাই তোর বেশ জুৎসই!

মা হেসে ফেলে বলে, বটে না কি রে? পরে ভবিষ্যতে আবার বলবি তো, 'মা কী খাণ্ডারণী! আমার বৌটারে কী টাইশে রাকে।'

ওই তো। ওই ভয়েই তো বে করায় মন নেই। মায়ে-ছেলেয় বেশ আছি। আবার মাঝখানে একটা পাথর এনে বসিয়ে সুখটা কী?

মা বিগলিত হাস্যে বলে, সুখটা কী সেটা পরে বুঝবি।

আমার বুঝে কাজ নাই। এ দিব্যি আচি।

তারকের মা যে ছেলের এই ঘোষণায় মনে মনে বেশ পুলকিত না হয় তা নয়, তবে সংসারবাসনাও যে বড় প্রবল বাসনা। তাই বলে, তা বললি তো হবেনি! সারা, জেবনটা তো ব্রিথাই গেল, তোর মায়ের শেষ জেবনে একটু মানষের মতন হবোনি? আর মায়েছেলেয় বেশ আছি আর কই? তুই একখানে দাসত্বো করচিস, আমি একখানে দাসত্বো করচি। মাসে দুদিন দ্যাকা হয় কি না হয়।

তারক একটু গম্ভীর হাসি হেসে বলে, দাসত্বো আর এ জগতে কে না করছে মা? হাইকোর্টের

জজও করছে, পুলিশের বড়কত্তাও করছে, মন্ত্রীরাও করছে। লোকের দোরে ধর্না পেড়ে পেড়ে ভোট ভিক্ষে করে মরছে। আবার মন্ত্রী হয়েও সদাই ভয় কখন না জানি এই সুখের গদিটি থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।

'ভোট' শুনেই তারকের মা বলে ওঠে, ওরে তারক, আমাদের এবাড়ির কর্তাও বোধায় এবার ভোট সাধতে নামছে।

তারক চমকে ওঠে, কে বলল ?

তারকের মা ঝুনো হাসি হাসে, বাঁদীবান্দাদের কী আর কেউ ধরে করে কিছু বলে রে বাপ ? কতা হাওয়ায় ওড়ে, বাতাসে ভাসে, ধরে ফেলতি হয়। যদিও গুজুর গুজুর ফুসুর ফুসুর, কতাবাত্রা, তবে দেকতে তো পাওয়া যাচ্চে বৈঠকখানাঘরে রাতদিন নানান লোকের আসা যাওয়া, আর কর্তার শালা সমুন্দি ভায়রাভাইয়ের হরঘড়ি এসে খানাপিনা, রাতদুকুর অবদি আলোচনা। খাওয়ার টেবিলে বসে য্যাতো শলা-পরামর্শ। আমরা সামনে এসে গেলেই, কতা কয় ঠারেঠোরে, ইনজিরিতে। তৎসত্ত্বেও ধরি ফেলতি পারা যায়।

তারক গলা নামিয়ে বলে, 'ভোটে' নামার পরামর্শ তা বুঝলি কী করে ? বিজনেসের বেপার হতে পারে।

তারকের মা নিশ্চিন্ত গলায় বলে, না রে বাপু না। ও আমি হাওয়ায় হাওয়ায় ধরি ফেলিচি। দুদিন গেলেই দেকতে পাবি।

তারকের আরো গলা নামে, 'ছি পি এম', না অন্য কিছু ? তা কিছু ধরতে পেরেছিস ?

সেটা বুজিনি।

তারক এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলে, ঠিক আচে। আমায় যা বললি বললি আর কাউকে বলিস না মা।

আবার কাকে বলতে যাব ? আর আমার আছেটা কে ?

না, মানে দেশে-টেশে তো যাস ?

আর দেশ।

তারকের মা একটি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, বড়মানুষের বাড়ি কাজে ঢুকেও সে পথেও কাঁটা পড়েচে রে তারক। আগের মতন, যখন তখন হুটহাট 'দেশে' চলে যাবার উপায় নাই। একদম কড়াকড়ি। মাসে একবেলার জন্যি। সকালে গিয়ে রাতে ফেরা। তো সেও বুদ্ধি কৌশলে আদায়।

তা বুদ্ধি কৌশলই বৈকি। কাজে নিয়োগের কালে মনিব গিন্নীর নানাবিধ জেরার সময় এ প্রশ্নটিও ছিলো, 'দেশে' যাওয়া-টাওয়ার বালাই নেই তো ? বলছো তো একটা মাত্তর ছেলে, তাও এই কলকাতাতেই থাকে।

তখন তারকের মা তৎক্ষণাৎ তার এককুড়ি বছর আগে মরে যাওয়া মাকে চিতাশয্যা থেকে তুলে এনে রোগশয্যায় শুইয়ে বলে উঠেছিল, মাস পয়লা একটিবারের জন্যি তো যেতিই হবে মাসিমা। বুড়ো মা-টা আজ পাঁচ-সাত বচর বেছনায় পড়ে, আমার মুক চেয়েই আচে। তার জন্যিই আরো পরের দোরে খাটা। মাইনাটা পেলিই তারে দে আসতি যেতি হবে।

ফি মাসে ? মনিব-গিন্নী শিউরে উঠে বলেন, বল কী গো ?

কী করবো মাসিমা ? আমার পত চেয়ে পড়ে থাকে। ওই ট্যাকা কটাই ভরসা।

কেন ? তোমার ভাইটাই নেই ?

তারকের মা উদাস দার্শনিক গলায় বলেছিল, 'নাই' বলে অকল্যেণ করবোনি মাসিমা, তবে কতা হচ্চে— 'আচে গরু না বয় হাল, তার দুঃখু চেরকাল'।

এই আপ্ত বাক্যটুকু থেকেই অনেক ইতিহাস প্রচারিত হয়।

তত্রাচ গৃহিণী জেরা করে জেনে নিয়েছিলেন, দেশে যেতে আসতে কতোটি সময় লাগে, একদিনের মধ্যে গিয়ে ফিরে আসা যায় কিনা।

তা সে প্রশ্নের সখেদ উত্তর, তা যাবে না কেন ? গ্রামের এতো বৌ-ঝি নিত্যদিন ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে শহরে এসে তিন-চার বাড়ি কাজ সামলে আবার সন্ধ্যের মধ্যে ঘরে ফিরছে না ? তবে কিনা—শয্যোশায়ী। মায়ের কাছে গিয়ে, তক্ষুণি উল্টোপাক খেয়ে চলে আসায় মায়ের প্রাণটি কেমন করবে, সেই চিন্তা। একটা রাত অন্তত্তো না থাকলে—

কিন্তু সে চিন্তাকে আমল দেননি গিন্নী। বলেছিলেন, 'তা আর কী হবে বাপু। মাকে এটুকু বুঝতে হবে। প্রতিমাসেই যখন যেতে হচ্ছে--। না না, রাতে থাকা-টাকা চলবে না। ভোরের সময়টি সামলাবে কে ? আমি তোমায় পয়লা তারিখেই মাইনে দিয়ে দেব, তুমি দোসরা সকালে ভোরের সময়ের চা—জলখাবারটি সামাল দিয়ে বেরিয়ে পড়বে, সন্ধ্যের মধ্যে ফিরে আসবে। নেহাৎ মায়ের কথা বললে তাই। নইলে--আগের লোককে তো ওই দেশে গিয়ে দেরী করার জন্যেই বাদ দিতে হলো।'

তাহলে বলতে হবে কিনা তারকের মার কৌশলের ফলশ্রুতি ওই 'মাসে একবার' দেশে যাবার ছাড়পত্র। মাতৃভক্তির পুরস্কারই বলা যায়।

ওই একদিনের সফর। তবে এতে দেশে মান-মর্যাদা বেড়ে গেছে। ভাবো—তারকের মা এমন জব্বর বড়মানুষের বাড়িতে ঢুকেছে যাদের পান থেকে চুন খসাবার জো নেই, অথচ সেই হেন বাড়িতেও 'তারকের মা বিহনে ভুবন অন্ধকার'। তার মানে—মানুষটা এখন মস্ত দামী হয়ে উঠেছে।

দেশের নাম অবশ্য 'তারকের মা' নয়, নাম পরাণের বৌ। বহুকাল মৃত পরাণ মণ্ডলের পরিচয়বাহী এই নামটিই দেশে এখনো চালু। কিন্তু তার নিজস্ব কোনো নাম নেই ? আছে হয়তো, কে তার খোঁজ করছে ? পরিচয়টাই তো আসল।

তা এদের বাড়ি কাজে ঢোকার পর থেকে সাজ-সজ্জাতেও বেশ একটু দামী দামী ভাব এসে গেছে তারকের মার। এরা চায় 'সর্বদা ভব্যিযুক্ত' হয়ে থাকুক কাজের লোকজন। বিশেষ করে রান্নার লোক। বাইরের অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে বেরোতে হবে যাকে। কারণ চায়ের ভারটিও রান্নার লোকেরই।

অতএব এখন 'পরাণের বৌ' যখন দেশে যায়, তার পরনে ধবধবে শাড়ি ব্লাউজ, পরিচ্ছন্ন চাদর, ছিমছাম চটি, আর রঙিন চটের থলির (আগে যেটাকেই শৌখিন ভাবতো তারকের মা) বদলে, কাঁধে ঝোলানো ঈষৎ পুরনো হলেও শ্রীনিকেতনী ঝোলা। অতএব সম্ভ্রম সমীহ খাতির তো অধিক জুটবেই।

'পরাণের বৌ' এসেছে শুনলেই ভাসুর নড়েচড়ে বসে, জমিজমার হিসেবপত্র গুলো দেখে নেয়। আর বড়জা তাড়াতাড়ি এসে বলে, আমার কাচেই দুটো ভাত খাবি—বুঝলি ?

যদিও পরাণের বৌ বলে, সকালের 'ব্রেকফাস্টটি' এতোই ভারিভুরি হয়ে গেছে যে এবেলা না খেলেও চলবে। তবু ওই জায়ের কাছেই খায়।

ছেলের কাছে তারকের মা হেসে হেসে তার 'দু' পাঁচ বছর বিছানায় পড়ে থাকা' মা'কে দেখতে আসার আর মাইনের সব টাকাটি মাতৃসেবায় ব্যয় করার গপ্পোটি করে বলে, এতে কিন্তু আমি মিচে কতা কওয়ার দোষ নিই না। যার সঙ্গে যেমন। গরীব বলে, তোমার ঘরে খাটতে এয়েচে বটে, তা বলে সে মাজে মদ্যে ছুটি পাবে না ? বাবুরা আপিসে ছুটি পায় না ? তো—ওই অ্যাকবেলার সময়ের মদ্যেই তোর জোটার সঙ্গে শলা পরামর্শো। কী জানি কেন তোর জোটিও আজকাল বেশ সদয়।

সেই জোটির অন্তর্নিহিত স্বপ্নটুকু এখনো জানা নেই বলেই তারকের মা ওই সদয়তাকে 'হৃদয়বত্তাই'

ভাবে !

তারক হেসে বলে, 'মরা মায়ের' নাম ভাঙিয়ে খাচ্ছো ! দিদমা একদিন ভূত হয়ে এসে তোমার ঘাড়ে চাপবে।

তারকের মা উত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ বাড়ির মধ্যে থেকে আর এক কাজকরুনী প্রায় ছুটে বেরিয়ে এসে গালে হাত দিয়ে বলে ওঠে, ওমা ! তুমি অ্যাখনো এখেনে ? দুলো তো ঠিক বলেছে ! এদিকে মাসিমা তোমারে হন্যে হয়ে খুঁজছে। এক গুচ্ছির লোক এসেছে, চায়ের জল চাপাতে হবে। এসো ঝাঁ করে। নইলে রক্ষে থাকবে না।

চলে যায় তেমনি ছুটে।

তারকের মাও সে তৎপরতা দেখায়। তবে যাবার আগে একবার মুখটা বেজার করে বলে, এই অ্যাক বাড়ি বাবা। সর্বোদা গাদাগুষ্ঠির নোক। আচ্ছা তারক--চলি রে—। আবার তাড়াতাড়ি আসিস বাবা।

তারক মার ব্যস্ত প্রস্থানের ভঙ্গীটির দিকে তাকিয়ে একটু আশ্চর্য হয়। লোকে তো বলে, 'স্বভাব যায় না মলে,' তো মায়ের স্বভাবটা এমন বদলালো কী করে ? মা তো কখনো এমন মনিবভয়ে ভীত ছিল না ? এক কথার বদলে দশ কথা শুনিয়ে দেওয়াই তো মায়ের চিরকেলে স্বভাব।

তারক কী করে বুঝবে, তার মাও সেই একটি 'স্বপ্নের পিছনে এগোবার বাসনায় দাঁতে দাঁত চেপে স্বভাবকে দমন করে চলেছে।

ছেলে উঠে চলে যাবার পরও বনছায়া কেমন নিথর হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। ছেলে যে খবরটি পরিবেশন করে গেল, সেটি ঠিক পরিপাক করে উঠতে পারছেন না। দুটো প্রবল অনুভূতি যেন পরস্পরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখছে বনছায়াকে যাচাই করবার জন্যে।

টাকা চাই। অনেক টাকা। তা তার আসবার পথটি যেমনই হোক। ছেলের এই মতবাদকে কিছুতেই নিশ্চিন্তে গ্রহণ করা যাচ্ছে না, আবার দুর্বার একটি লোভ ভাঁদির হাতছানিও দুর্বল করে ফেলছে।

বনছায়ার আবার নিজস্ব একখানা বাড়ি হবে। ভালো বাড়ি। সত্যিকার মর্যাদাসম্পন্ন বাড়ি। সেই বাড়ির নামকরণের অধিকারও থাকছে বনছায়ার। এই সংকীর্ণ গর্তটুকুর মধ্যে থেকে বেরিয়ে পড়ে আবার বনছায়া তাঁর আগের জীবনের গৌরবময় পরিবেশে ফিরে যেতে পারেন ? বনছায়া আবার একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে সংসার করবেন। হারিয়ে যাওয়া জীবনটাকে আবার ফিরে পাবেন। এই অবিশ্বাস্য সত্য হয়ে উঠে বনছায়াকে ডাক দিচ্ছে। এ কী কম লোভ ? এই লোভের ডাক একটা প্রবল শক্তিতে বনছায়ার মূল পর্যন্ত ঝাঁকিয়ে নাড়িয়ে উপড়ে ফেলে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। কী মোহময় মনোরম সেই ভেসে যাওয়া ! কিন্তু সেই যাওয়াটার হাতে কী নিজেকে ছেড়ে দেওয়া সম্ভব ?

আরও একটা বিপরীত শক্তিও যে ভিতর থেকে জোরালো গলায় বলে উঠছে, 'না না। এ ঠিক নয়। এ শুভকারী নয়। এ অন্যায়। এ পথ ভ্রান্ত পথ। সন্তানকে ভ্রান্ত পথ থেকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাই তো মাতৃধর্ম !

দুটো বিপরীত অনুভূতি যেন পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'বনছায়া' নামের মানুষটাকে যাচাই করতে চাইছে।

বনছায়া ! তুমি কী লোভের হাতে আত্মসমর্পণ করবে ? না কী তুমি তোমার সন্তানকে ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করবে ? ...ফেরানো যাবে না ? সে শিশু নয়, বালক নয়, একটা পরিণত

মানুষ। সেও এখন প্রচণ্ড এক লোভের তাড়নায় দুরন্ত গতিতে ছুটতে চাইছে। তাকে নিবৃত্ত করা সহজ নয়। সহজ নয়? তাহলে বনছায়া! কঠিন পথই ধরো। কঠিন হও। তুমি তাকে বলো 'তোর ওই ভুল পথে ফলানো ফসল আমি আমার গোলায় তুলতে রাজী নই। অন্যায় পথে আসা লক্ষ্মী তো শুভ নয়, সত্যকার লক্ষ্মী নয়, সে অশুভ সে অলক্ষ্মীরই নামান্তর। ...'বনছায়া! তুমি যদি শক্ত হয়ে প্রতিরোধ করতে পারো তাহলেই ছোটা বন্ধ করে থেমে যাবে তোমার ছেলে।

বনছায়ার মধ্যে দু'জন কথা বলে চলেছে। ...কিন্তু ছেলেটা তো কেবলমাত্র তার মায়ের সুখশান্তি চায়। আর সেই চাওয়ার পিছনেই ছুটবে। ছুটছে তার মায়ের হৃদয়বেদনার লাঘব করতে, তার তো আপাতত এ ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য নেই। তুমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিলে, 'তোর দেওয়া ওই অশুভ সুখে আমার দরকার নেই' বলে মুখ ফেরালে সে যে বড্ড বেশী আহত হবে। ভেঙে পড়বে! ছেলেটা যে দারুণ অভিমানীও। কাকা অকারণ শাস্তি দিয়েছে, বাবা ভাইয়ের কথা বেদবাক্য মনে করে ছেলেকে তিরস্কার করেছে, কখনো প্রতিবাদে ফেটে পড়েনি, অথবা আত্মপক্ষও সমর্থন করতে চেষ্টা করেনি। শুধু লাল লাল মুখ করে নিথর হয়ে বসে থেকেছে। সেই অভিমানী ছেলেকে যদি আমি—

বনছায়া! তুমি জানো না, তুমি তোমার ওই ভাবপ্রবণতাকে সামলাতে না পারলে, তোমার সন্তানের ক্ষতিই হবে। 'টাকা' বড় ভয়ানক জিনিস বনছায়া! একবার ওর স্বাদ পেলে আর নিবৃত্তি ঘটে না।

...কিন্তু এও তো সত্যি, পুরুষ জাতটার ওই টাকার পিছনে ছোটার মূলে কেবলমাত্র আপন ভোগবাসনা চরিতার্থতার স্পৃহাই কাজ করে না, নেহাৎই কিছু দুরাচারী দুশ্চরিত্র ভোগবাসনামত্ত বিলাসীজন ব্যতীত। পুরুষহৃদয়ের পূজা আর নৈবেদ্যর উপচার সাজানো তো নারী জাতটাকেই ঘিরে। সে নারীর উপস্থিতি তার কাছে নানা রূপে নানা রঙে। হতে পারে সে নারী জায়া প্রিয়া জননী—ভগিনী কন্যা প্রণয়িনী যে কোনো কেউ। অথবা নিঃসম্পর্কীয়ই কেউ, তবু তার সন্তুষ্টিসাধনই থাকে সেই পুরুষচিত্তের ধ্যানজ্ঞান লক্ষ্য।

অথবা হয়তো শুধু সন্তুষ্টিবিধানই নয়, প্রেরণার উৎস চমক দেওয়াও। নিজেকে বিকশিত করা, নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে তোলা।

দুর্বোধ্য নারীহৃদয় কিসে সুখী হয়, সে রহস্যটি জানা নেই বলেই পুরুষ আপ্রাণ চেষ্টায় উপচার সাজিয়ে সাজিয়ে তার মন জয় করতে চেষ্টা করে।

অপর পক্ষে আবার নারীর অন্তহীন চাহিদাও পুরুষ জাতটাকে ছুটিয়ে মারে বৈ কি। নারীহৃদয়ে বস্তুর মোহ বড় সর্বনেশে মোহ, সর্বনেশে মোহ প্রতিষ্ঠার। অতএব আরো চাই, আরো—আরো।

কশাহত পশুর মতোই তখন সেই চাহিদাতাড়িত পুরুষ দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটতে থাকে। মুছে যায় তার নীতি দুর্নীতির আদর্শ, তার নিজস্ব মনোভঙ্গী। তার নিজস্ব জীবনচর্যার ছক। ...শেষ সত্য একটিই পুরুষের প্রেরণার উৎসে একটি নারীর উপস্থিতি থাকেই।

অতএব।

অতএব সেই নারীজাতটা যদি লোভের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বলে উঠতে পারতো, 'এতোয় আমার দরকার নেই।' ...যদি বলে উঠতে পারতো, 'যে ঐশ্বর্য অসততার পথে নীতিবিসর্জনকারী অশুভর পথে আসতে চায়, সে ঐশ্বর্য আমি চাই না' তাহলে যে জগতের অনেক দুর্নীতির ভার কমে যেতো, তাতে সন্দেহ নাস্তি।

কোনো একজন প্রিয় নারীর প্রসন্ন দৃষ্টির আলোয় উদ্ভাসিত হতে না পারলে পুরুষের সব 'অর্থই' তো অর্থহীন।

কিন্তু কোথায় সেই শক্তিময়ী নারী ? যে আপন হৃদয়ের চাহিদার ভারেই ভারাক্রান্ত নয় ? কোথায় সেই শুভবুদ্ধির আলোয় আলোকিত নারীহৃদয়, যে হৃদয় পুরুষহৃদয়ের অর্ঘ প্রত্যাখ্যান করে বলে উঠতে পারে 'যে ন্যহম অমৃতস্যামি—'

নারীচিত্ত আপনার বাসনার জালেই বন্দী। সীতারাই রামচন্দ্রদের সোনার হরিণের পিছনে ছোটায়! যদি বা তেমন নাও হয়, তবু তার অসহায় বন্দীত্ব মমতার কাছে। প্রিয়জনকে আহত করার ক্ষমতা তার নেই।

পুরুষ নারীর অভিমান ভাঙাতে 'দেহি পদপল্লব মুদারম্' বলেই কাজ হাসিল করে ফেলে। আর নারী তার আপন সত্তাটাকেই ভেঙে টুকরো করে বসে পুরুষের অভিমান ভাঙাতে।

শক্ত হবার শক্তি কোথায় ?

জায়া প্রিয়া জননী ভগিনী কন্যা যে রূপেই হোক আপন দুর্বলতার কাছেই সে অসহায়।

এই যে বনছায়া।

যখন যুধাজিৎ মার সব ভয় ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়ে বলে গেল, 'ফালতু চিন্তাটিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে, তোমার গৃহপ্রবেশে কাকে কাকে ডাকবে, তার লিস্টটা বানাতে থাকো তো বসে বসে, শেষে আবার না কাউকে ভুলে গিয়ে আপশোস হয়--' তখন তো কিছুতেই তেমন করে সেই ফালতু' চিন্তাটি মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না। ...তিনি তো ভাবতে থাকলে, না না। কিছুতেই আমি ওভাবে গা ভাসিয়ে দেব না। আমায় ভালো করে জানতে হবে, বুঝতে হবে যুধাজিতের এই হঠাৎ বড়লোক হয়ে ওঠার মূল উৎসটি কী ?

বলে গেল বটে, 'একটা বিষয় নিশ্চিন্ত থাকো মা, তোমার ছেলে অন্ততঃ জালজালিয়াতি, চুরিডাকাতি, চোরাকারবার, মেয়েপাচার, অন্যের অনিষ্টসাধন, অপরকে পীড়ন—এই সব করে বেড়াচ্ছে না। তার মধ্যে 'আদর্শবাদের' পরাকাষ্ঠা না থাকুক নীচতা নোংরামি নেই।' তবু বনছায়া ভেবেছেন, তা হোক, আমায় শক্ত হতে হবে। যদি দেখি ওর কোনো কুপরামর্শদাতা জুটে ওকে ভুল পথে ঠেলে দিচ্ছে, আমায় বলতেই হবে, 'তোর বাড়ি নিয়ে তুই থাকগে যা বাবা, আমি এই এখানেই বেশ আছি। বেশ থাকবো, আমার আর 'নূতন গৃহপ্রবেশে' দরকার নেই।'

তথাপি কখন কোন ফাঁকে, কোন অসতর্কতার পথ বেয়ে বনছায়া আচ্ছন্নের মতো এসে দাঁড়িয়ে পড়েছেন একটি কলকল্লোলে মুখরিত আনন্দোজ্জ্বল উৎসব মঞ্চে।

বনছায়ার চিরপরিচিত প্রিয় প্রিয় সব মুখেরা উল্লসিত হাস্যে বনছায়ার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। বনছায়া তাদের স্নেহে আদরে ভালোবাসায় অভ্যর্থনা করে ডেকে নিয়ে আসছেন চাকচিক্যময় এক নতুন পরিবেশের মধ্যে। নতুন বাড়ি, নতুন রঙের গন্ধে 'ম ম', তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হচ্ছে ফুল আর ধূপের গন্ধ। ...সেই নতুন বাড়ির প্রবেশপথে আলপনা, কলাগাছের চারা, মঙ্গল কলস, আম্রপল্লবের সার।

চোখের আড়ালে কোথায় যেন বৃহৎ যজ্ঞের উপযুক্ত রান্নাবান্না হচ্ছে, বাতাসে ভেসে আসছে তার মনমাতানো সুগন্ধ-ভার।... কোনো একখানে পুজোর আয়োজন। আর বনছায়া এই সবকিছুর মধ্যমণি হয়ে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন, উচ্ছ্বাসহীন প্রসন্নতায়।...

আর সকলের বিস্ময়মিশ্রিত কৌতূহল প্রশ্নের উত্তরে অলৌকিক এক আলোয় ভরা মুখে উত্তর দিচ্ছেন, 'হ্যাঁ, ওই পুরনো নামই রাখা হয়েছে নতুন বাড়ির। তাতে কী ? আমিও তো পুরনো।'

এই উৎসব মঞ্চের মাঝখানে এসে পড়ে কী আর ফিরে যাওয়া যাচ্ছে ?... অজস্র ছবির টুকরো পরপর ভেসে ভেসে উঠছে।...

'কী আশ্চর্য! তোমার জিতু কী করে এতোখানি হয়ে উঠলো ?... না বাবা, তাক লাগিয়ে দিলো

বটে !... কে জানতো ওর মাথায় এমন একখানা প্ল্যান ঘুরছিল ?'

কই কারো মুখে তো ধিক্কারের ছায়া দেখা যাচ্ছে না।

ঈর্ষা ? তা হয়তো কোথাও কোথাও ছায়া ফেলেছে। কারণ সেই ফেলাটা খুব বেশী স্বাভাবিক। তবে সে ছায়া গোপনে রাখতে হয়, তাই বনছায়া তাদের বহিরঙ্গের আলোর আভামাখা মুখই দেখতে পাচ্ছেন। তাই বনছায়া তাদের মধ্যেই কাউকে কাউকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বাড়িটা দেখাতে দেখতে বলে চলেছেন, এই তিনতলাটা পুরোটাই তোদের জন্যে। যখন মাঝে মাঝে ছুটিতে আসবি তখন তো থাকবিই. তবে রিটায়ার করে যখন পাকাপাকি কলকাতায় এসে বসবি সেই বুঝে সব রকম ব্যবস্থাই করা আছে।... কী বললি ? 'খোলামেলা তিনতলাটা সবটা তোদের কেন ?' কী বলছিস রে পাগল ছেলে ? জানিস না 'জ্যেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ ভাগ !... অগ্রজের অগ্রাধিকার।' আর ও পাগলটা তো বলেছে, 'পুরো একতলাটা ওর কব্জায় থাকবে। ও ওর অফিসঘর বুকে করে সেখানেই পড়ে থাকবে।'

আবার আর একজনকে বলছেন, 'এই দোতলাটা তোর আর আমার বুঝলি ? তো আমার আর কতটুকু কী দরকার বাছা, কোণের দিকের ওই ঘরটায় শোবো থাকবো, আর তার লাগোয়া ছোট বক্সরুমটাকে ঠাকুরঘর করে নেব। তো পুজোয় তো কতই মন, পাঁচ মিনিটেই ছটফট। হি হি, তোরাই আমার ঠাকুর দেবতা !... বাঃ, তা বললে চলছে না। এখন আর অতো সংসারের দোহাই পাড়া শুনবো না। জামাইকে বলে রাখছি—জায়গার অভাবে এতোদিন তোদের একটা রাত থাকতে বলতে পারিনি, ভগবান যদি মুখ তুলে চেয়েছেন।'

আপাত আচ্ছন্নের ভঙ্গী কিন্তু অদেখা একটা কোথায় যেন ঝলসে বেড়াচ্ছেন বনছায়া সেই একদার বনছায়ার মতো। ...এই বনছায়া একখানা অদৃশ্য কাগজে অদৃশ্য কালিতে লিখে চলেছেন লম্বা একখানা চিঠি... 'আচ্ছা মশাই, আপন দেশটাকে এতো ভুলে বসে আছো কী করে বলো তো ? একবারও দেখতে ইচ্ছে করে না ? আমি তো তোমাদের দেখবার জন্য হেদিয়ে মরি। চিঠিপত্রও দাও না খবরও জানি না। কদাচ কোনো বিদেশ প্রত্যাগতর মুখে ভাসা ভাসা কিছু খবর জোটে, সেটা ঠিক না বেঠিক কে জানে। সত্যি একবার এসো না ভাই ? তোমার ভাইপো আবার একখানা 'মনোরমা ধাম' বানিয়েছে তা জানো ? অন্ততঃ এই নামের অনারেও একবার আসা উচিত। নয় কী ?'

কাগজের ওপর তো কালির দাগ পড়ছে না, তাই দ্বিতীয়বার চোখ বুলোনোর প্রশ্ন নেই।... শুধু লিখে চলা।

এই বনছায়া স্বামীর মৃত্যু, পারিবারিক বিপর্যয়, ছোট্ট একটু মাথা গুঁজে পড়ে থাকা আশ্রয়ের মধ্যে কোনোমতে দিন কাটাতে বাধ্য হওয়া ইত্যাদি আঘাতে আঘাতে যেন বরফের মতো জমাট হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ কোথা থেকে এক ঝলক সূর্যকিরণ এসে পড়ে বরফ গলাতে শুরু করছে।... 'বাড়ি' মানে 'জীবন' !

কিন্তু জিনিসটা কী সকলের কাছেই সত্যি এতোখানি ? নাকি মনের গড়ন হিসেবে ?

হয়তো তাই। বনছায়া অনেককে নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন, অনেকের মধ্যে নিজেকে বিকশিত করে তুলেই যেন 'নিজেকে' খুঁজে পান। তাই হয়তো বনছায়ার কাছে বাড়িটাই 'জীবন'। সেটা হারিয়ে ফেলে মৃতকল্প হয়ে পড়েছিলেন, আবার ফিরে পাওয়ার আশ্বাসে জীবনের স্বাদ অনুভব করছেন।

কিন্তু এ তো অসতর্ক আচ্ছন্ন বনছায়া।

সজাগ সতর্ক বনছায়া মনে মনে ঠিক করছেন, ছেলের সঙ্গে একবার মোকাবিলার দরকার। বলবেন গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নর লিস্ট করতে বসতে আমার দায় পড়েছে। আগে ভালো করে শুনি গৃহটা জুটছে

কি ভাবে ?

চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠলো।

অবশ্য নয়নতারার মনের মধ্যে যে এ তুফানের আশঙ্কা একেবারেই ছিল না তা নয়, তবে এতোটা আশঙ্কা করেননি।

টুনু চলে যাবার পর নয়নতারা ছেলের বৌয়ের মুখের দিকে তাকালেন, সেখানে তাপ উত্তাপ কিছু ধরতে পারলেন না। সব সময় যা করেন তাই করলেন, নিজের মান খুইয়ে, পোজিশান খুইয়ে বলে উঠলেন, খুকেনের ভাগনাটি বড় খাসা ছেলে! দেখে নাতজামাই করতে মন লাগছে। তাই না বৌমা ? তুমি কী বলো ?

বৌ একবার স্থির চোখে তাকিয়ে বরফঠাণ্ডা গলায় বললো, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার মন আপনার হতে পারে, আমার হয় না।

অ মা। বামন আবার কী ? ক্যানো আমার নাতনী ? কী ফ্যালনা না কি ? খুকেনের ঘরের লোক। আমি তো মন করিছ চুপিচাপি অ্যাকবার বলে দেখবো।

বৌ আরো ঠাণ্ডা গলায় বললো, গাল বাড়িয়ে চড় খেতে সাধ হয় দেখবেন তাই। তবে কনে ওর ঠিক হয়ে আছে অনেক আগে থেকে।

কনে ঠিক হয়ে আছে, এবং অনেকদিন আগে থেকে। আর সেটি নয়নতারার নাতনীর মায়ের জানা হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়াটা' ইতিপূর্বে হয়ে গেছে একজনের। দমে গেলেন একটু। টুনির ভাগনাকে বেশ একটু সমারোহময় আপ্যায়ন করা দেখে মনটি বেশ হৃষ্ট ছিল। অপ্রতিভ হয়ে গেলেন। আর কথা না চালিয়ে চলে এলেন স্বামীর কাছে।... তবে তাঁর সঙ্গে মৃদু গুঞ্জনে আলাপচারিতার তো উপায় নেই এইটার যা দুঃখ। এ নিয়ে এখন কিছু কথা চালানো যাবে না। তবে আশা দিয়ে গেছে ছেলেটা, এই যা ভরসা।

একটু মজাদার কথাবার্তাও আছে ছেলেটার। বলে গেল, আর কোনো প্রবলেম থাকবে না দিদিমা। দাদু কানে যন্তরটি লাগিয়ে আয়েস করে বসে থাকবেন, আপনার 'ফিসফাস' কথাটিও কান থেকে প্রাণে ভরে নিতে পারবেন।

মামীর মা, অতএব দিদিমা।

মামী চাপা গলায় বললো, এই ফাজিল ছেলে, বাবা রয়েছেন না ?

ছেলেটা মচকি হেসে বললো, এখনো তো কানে 'মন্তর' বসেনি। পরে সাবধান হওয়া যাবে।

নয়নতারা তিনতলায় উঠে এসে দেখলেন, সত্যব্রত ছাদের বাগানে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। ছাদ ভর্তি হরেক ফুল ফুটিয়েছেন নয়নতারা টবে মাটি ভরে ভরে। এমনকি সংসারের বাতিল বালতি ডেকচি হাঁড়িকড়াতেও মাটি ফেলে ফেলে। গাঁদাফুলে একটা কোণ সোনায় রাঙা হয়ে উঠেছে। আর একদিকে টগর দোপাটি নয়নতারার ঝাড়।

রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে ছিলেন সত্যব্রত, নয়নতারাকে দেখে একটু হেসে বলে উঠলেন, আমার যে দেখছি ঘরেও 'নয়নতারা', বাইরেও 'নয়নতারা'।

কথাটা অনুধাবন করতে একটু সময় লাগলো, তারপর হেসে ফেলে, এ মানুষটা দেখছি কোনোকালে বুড়া হবে না।

সত্যব্রত একটু হাসলেন, তুমি তো পাল্লা ঠিক রাখছো। তাহলেই হবে।

নয়নতারা একটু নিঃশ্বাস ফেললেন, মেয়েলোকের বুড়া না হইলেও 'বুড়া' সাজতে হয়। বয়েস হইছে আর বুড়া হইছে না এটা সংসারজন ভালো চোক্ষে দেখে না।

সত্যব্রত একটু গভীর গলায় বললেন, তা জানি। কিন্তু কেন যে—

কথা শেষ হলো না হঠাৎ আদিত্য এসে সামনে দাঁড়ালো! ঘরে দেখতে না পেয়েই ছাতে বেরিয়ে এসেছে। তিনতলায় উঠে আসা আদিত্যর পক্ষে দৈবাতের ঘটনা, আজকের আসার পিছনে অবশ্যই আজকের ঘটনার ইতিহাস বিদ্যমান। কী জানি, ছেলে ঘটনাটাকে কোন আলোয় নিয়েছে।

বেশীক্ষণ ভাবতে হলো না।

আদিত্য দাঁড়িয়ে পড়েই একটু শ্লেষের গলায় বললো ওঃ। দুজনে বাগানে বেড়ানো হচ্ছে। দেখে তো মনে হচ্ছে না, খুব অসুবিধের অবস্থা!

এখন আকাশে অন্ধকার নেমে এসেছে। এক কোণ থেকে রাস্তার আলো পড়ায় মোটামুটি দেখা যাচ্ছে। সে আলোয় মুখের চেহারা ঠিক বোঝা যায় না। তাই শব্দজগৎহীন সত্যব্রত শুধু চুপ করে চেয়ে থাকলেন। নয়নতারা তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন, অ মা! অসুবিধার আবার কী আছে! তরা কী আমাদের কোনো অসুবিদা রাখছস। ত' আজ তর অ্যাতো দেরী? টুনিটা এয়েছিলো, 'দাদার সাথে দেখা হলো না' কয়ে আফশোস করে চলে গ্যালো। এট্টাদিন থাকার তো জো নাই! আজই না কী শ্বশুরঠাকুরের হাপানি বৃদ্ধি।

ছেলের সামনে একসঙ্গে এতোগুলো কথা বলা স্বভাব নয় নয়নতারার, এখন যে বললেন সেটা বোধহয় নার্ভাসনেস সামলাতে।

পুত্র স্থিরভাবে শেষ পর্যন্ত সবটি শুনে একটু তিক্ত হাসি হেসে শ্লেষের গলায় বললো, 'দাদার সঙ্গে দেখা না হওয়ায় আফশোসটা কিসের? সরাসরি হাতে করে দাদার গালে চড়টা বসিয়ে দেওয়া হলো না বলে?

নয়নতারা থতমত খেয়ে বললেন, কী বলছস?

যা বলছি, খুবই বুঝতে পেরেছো। তবে তোমার বড়লোক মেয়েটি কি ভেবেছেন, পয়সা থাকলেই অন্যকে অপমান করবার রাইট্ জন্মায়?

অপমান? কে কারে অপমান করলো খোকা। বুঝছি না তো।

না, বুঝছি না? নিজেকে যতো বোকা-হাবা দেখাও, ততো বোকা তো নও তুমি!

এ কথাটা মোক্ষম সত্যি বৈকি। সকলের সব মনস্তত্ত্ব পড়ে ফেলেও অবোধের ভূমিকাতেই তো থাকেন নয়নতারা। তবু এখন আন্তরিক ব্যাকুলভাবেই বলেন, তর মা চিরকেলে বোকা-হাবাই রে খোকা। শুধো এই মানুষটারে। সত্যিই বুঝছি না, কিসে কার অপমান হইছে।

কার অপমান বুঝতে পারছো না? তোমার খুকেন আমার মুখের ওপর একখানি থাপ্পড় কষিয়ে যায়নি?

আ ছি ছি। এ তুই কী বলছস্ বাবা? তোর বোনটা কী তেমন মেয়ে? 'দাদা' বলে কতো ভক্তি ভালোবাসা।

রাখো। আগে তাই ভাবতাম। ক্রমেই বুঝছি সবই দ্যাখানো।

বোকা হাবা অবোধ নয়নতারা মনে মনে বলেন, তা বুঝবি বৈকি। ক্রমেই 'সদগুরুর' কৃপায় দিব্যদৃষ্টিটা খুলছে যে। তবু আবার নয়নতারা সত্যিই সরলও। তাই বলে ওঠেন, তো আমিও ভেবেছিলুম, তর সঙ্গে পরামর্শ না করে হুট করে ভাগনাটিকে আনা ওর ঠিক হয় নাই। কিন্তু—

থামো থামো।

গর্জে ওঠে আদিত্য, আমার সঙ্গে পরামর্শ! মায়েমেয়ের তলে তলে পরামর্শ চলেছে বুঝি না কিছু?

সত্যব্রত এগিয়ে এসে বলেন, হলোটা কী?

কিছু না। তুমি ঘরে যাও তো—

তাঁকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দিয়েই নয়নতারা বলেন, আমার সাথে আবার কিসের পরামর্শ? আমার সাথে ওর দ্যাকাটা হয় কখন?

ওঃ। দেখা না হলে হয় না, কেমন? তোমরা নিরক্ষর? বলি, আমার সংসারে নাক গলাতে আসে ও কোন সাহসে?

এখন নয়নতারা আস্তে বলেন, তোর সংসারে নাক গলাতে আসবে কেন খোকা? বাপের অসুবিদার অবস্থার চিন্তাতেই—

ওঃ। খুব দুরবস্থায় আছো তোমরা কেমন? সব ঠিকঠাক থাকে? বয়েস হলে লোকের চোখে ছানি পড়ে না? বাতে ধরে না? নানানখানা রোগে ধরে না? কানে খাটো হয় না? বাবার তো তবু হেলথ্‌টি যথেষ্ট ভালো। ওই সামান্য একটু অসুবিধের জন্যে তোমার মেয়ে একেবারে দরদে গলে গিয়ে প্রতিকার করতে ছুটে এসেছেন? ওঃ। দাদাকে টেক্কা দেওয়া। শুনতে চাই কোন সাহসে ও বাবার ওই 'কানের যন্তর'টা নিজে কিনে দেবে বলেছে? এতো আসপদ্দা কিসের?

স্বর উত্তরোত্তর চড়তে থাকে, এই হতভাগা আদিত্য গাঙ্গুলীর যদি চার-পাঁচ হাজার টাকা খরচ করতে সামর্থ্যে না কুলোয়, স্ত্রীর গহনা বিক্রী করেও দেবে। কুটুমবাড়ির টাকায় বাপের চিকিৎসা করাবে কিসের জন্যে?

স্ত্রীর গহনা বিক্রী। এসব অপয়া অলক্ষণা কথা তুই বলছস কী করে খোকা? নয়নতারা একটু স্থির গলাতেই বলেন এখন, এমোন উল্টাপাল্টা ভাবনা করছস ক্যানো? মানুষটা কী উয়ারও বাপ না? ও সন্তান না? এটুকু করতে ইচ্ছা হতে পারে না?

ইচ্ছে। রাখো। এ হচ্ছে স্রেফ টেক্কা দেওয়া। 'দ্যাখো তোমার বাবার জন্যে কিছু করলে না, আমি করছি।' তার মানে কুটুমবাড়ির লোকের সামনে আদিত্য গাঙ্গুলীর মুখে চুনকালি। তবে আমিও আদিত্য গাঙ্গুলী! পরের টাকায় বাপের চিকিৎসা করাতে দেব না।

নয়নতারা একটু উত্তেজিত হন, খালি খালি পরের টাকা পরের টাকা কইছিস ক্যান? খুকেন তোদের কাছে যদি পর হয়, তার মা-বাপের কাছে ত না। ওর মা-বাপের জন্যি ও কিছু খরচা করতে পারে না? ও কুটুম্ব?

উপার্জনটা ওর নয় মা। সেটা কুটুম্বরই।

নয়নতারার স্বর গাঢ় হয়, মেয়েছেলে আবার কে কবে উপার্জন করেছে খোকা? এখোনই নয় তার চল হয়েছে। তাই বা কয়জনা করছে? স্বামীর উপার্জনের টাকাই তার নিজস্ব—

ওঃ। তাই বুঝি তুমি এখন ঠিক করছো ছেলের ভাত আর খাবে না, আবার স্বামীকে উপার্জনে লাগিয়ে দেবে?...

আদিত্যর কণ্ঠস্বরে শ্লেষ আর তিক্ততা ঝরে পড়ে।

এসব কী কথা! তর কী আজ মাথা খারাপ হইছে বাপ?

আকাশ থেকে পড়ছ যে? ক্যানো তোমার মেয়ের মস্ত ডাক্তার ভাগনেটি বলে যায়নি, ওনার থেকে অনেক সিনিয়ররাও এখনো কোর্টে প্র্যাকটিশ করছে। আর উনি কানে সেই একখান্ 'হিয়ার এড্' লাগিয়েই আবার কাজে নেমে পড়তে পারেন। বলেনি—'দাদুর এমন হেলথ্ সামান্য একটু গ্রাহ্যের অভাবে বাড়ি বসে গেছেন!' বলেনি?

নয়নতারা অবাক হলো। বলেছিল সত্যি, কিন্তু যখন বলেছিল তখন তো সেখানে আর কেউ ছিল না। তবে—'একথা আবার কখন বললো?' বলে অস্বীকার তো করতে পারেন না! তাই বললেন, বলেছে বলেই যেন তিনি এখন আবার কোর্টে ছুটতে যাচ্ছেন।

যাচ্ছেন কী না যাচ্ছেন, তোমরাই জানো। তবে তোমার মেয়েটিকে সাফ বলে দিও, আমায় যেন টাকা দেখাতে না আসে।

পরিমণ্ডল বেশ উত্তপ্তই হয়ে উঠছিল, হঠাৎ একটি হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে পড়লো। সিঁড়ির সামনে থেকে বরফে শান দেওয়া একটি ধারালো ছুরির মতো স্বর উচ্চকিত হলো, এতো সাফ কথার কী আছে ? তোমারই বা এতে মানের হানি কিসের ? মা-বাপ তোমার একার ? ওর নয় ?

এ আবার কী !

হঠাৎ ভূতের মুখে রামনাম ! যেন ধাঁধা লাগার মতো।

শ্রোতা দুজনের কেউই এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না।

একজন ভাবলো, এর মানে ? এরকমটার তো কথা ছিলনা না।... অপরজন ভাবলো, কী হলো। যা ভাবছিলাম তা তো ঠিক নয়। মনে তো হচ্ছিল, 'নির্দেশনামা' নিয়ে এসে সেটাই আওড়ানো হচ্ছিল। সেই রকমই তো হয় বেশীর ভাগ। এটা কেমন উল্টোপাল্টা লাগছে। তবু তিনি প্রায় বিগলিত আর একটু তোয়াজ গলাতেই বলে ওঠেন, তাই কও তো বৌমা। তুমি বুঝমান মেয়ে, তাই নেয্য কথাটা বুঝছো। আমি ত এই একবগগাটারে সেই কথাটাই বুঝাতে চাইছি—ত মানছে না। তুমি অরে বুঝাও তো এট্টু—

ততক্ষণে নেয্য বুদ্ধিসম্পন্না ঘরের মধ্যে এসে পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে দেখে একটি অগ্রাহ্যের মুখভঙ্গী করেন।

অতঃপর সেই ভঙ্গীর সঙ্গে একটু শ্লেষ মিশিয়ে বলে ওঠেন, আমি ? আমরা বোঝাবো ওই লোককে ? যা একখানি পুত্তুর তৈরী করে রেখেছেন। আমার ঠাকুর্দা এলেও পারবে না। তবে আমারও এই কথা, বাপের বিষয়-সম্পত্তির বেলায় যদি ছেলে আর মেয়ের মধ্যে সমান সমান চুলচেরা ভাগ তো—দায়-দায়িত্বের বেলাতেই বা তা হয় না কেন ?

আর একবার চমক !

এটা তো ঠিক ধাঁধার মতো নয়। স্রেফ ছুরির মতই।

দু'জনেই প্রায় বিভ্রান্ত। আদিত্য এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না। বাড়ি ঢুকে টুনিঘটিত ঘটনাটি সাড়ম্বর ভাষ্যে শোনামাত্রই তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠেছিল। মনে হয়েছিল টুনির এই সর্দারি করতে আসা আদিত্যর পক্ষে রীতিমত অপমান।... আর নয়নতারা ? তিনিও কথার মোড় এদিকে ঘুরে যাবে একমুহূর্ত আগেও ঠিক বুঝতে পারেননি। বরং ভেবেছিলেন, বৌ তাহলে একটা হক্ কথাই কইতে এসেছে।

আদিত্য চমকটা একটু সামলে নিয়ে ভাসা ভাসা গলায় বলে, এর মধ্যে আবার এসব কথা কেন ?

বৌ তিক্ত গলায় বলে, বলিয়ে ছাড়লে, বলতেই হয়।... বোন যদি জন্মজীবনে বাপের জন্যে একটু কিছু করেই, তোমার এতো লজ্জা পাবার কী আছে ? তুমি বারো মাস মা-বাপের সমগ্র ভারটি বইছো না ? আইন যখন বলছে 'মেয়ে আর ছেলে সমান' তখন দায়িত্ব-কর্তব্যও সমান হওয়া উচিত। আমার বুদ্ধি তো এই কথাই বলে। তাছাড়া—মেয়ে যদি ভেবে থাকে, তার মা-বাপের উচিতমত যত্ন-আত্তি হচ্ছে না, তাতে তার প্রাণ কাঁদতে পারে। সুব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হতে পারে। তোমার বাধা দেবার কী রাইট্ আছে ?

সত্যব্রত মা-ছেলের কথার মধ্যে দু-একবার 'কী নিয়ে কথা হচ্ছে ?' বলে জানবার জন্যে ঈষৎ ব্যাকুল হচ্ছিলেন, কেউ তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা না করায় আস্তে আস্তে নিজের ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিলেন। এখন শুধু ত্রিমুখী ধারা !

আদিত্য ভেবে পাচ্ছে না, এখন তার কী বলা মানায়। অথচ কিছু বলাও দরকার। তাই হঠাৎ

বলে ওঠে, আমার একটা মানসম্মান আছে। টুনি হঠাৎ ওপর-পড়া হয়ে এসে এভাবে—

হ্যাঁ, 'হঠাৎই' আশ্চর্য। সাতজন্মে তো একবার মা-বাপকে দেখতে আসতেও দেখা যায় না। হঠাৎই বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়তে দেখা যাচ্ছে।

নয়নতারা একবার নিথর নয়নে তাকিয়ে দেখেন।

পরক্ষণেই তাঁর পক্ষে একটি অসমসাহসিক কাণ্ড করে বসেন নয়নতারা। অসমসাহসিকই, কারণ সংসারের শান্তি বজায় রাখার চেষ্টায় চেষ্টায় নিজেকে সব সময় গুটিয়ে রাখতে রাখতে আর 'অবোধ' সেজে থাকতে থাকতে নয়নতারা মধ্যে 'সাহসের' প্রকাশ কোনো সময়ই দেখা যায় না। শুধু এখনই বা কেন, বলতে গেলে চিরকালই। পাবনার সেই বধূ নয়নতারা গাঙ্গুলী কি কখনো সাহস করে কারো মুখের ওপর কোনো 'স্পষ্ট' কথা বলে উঠতে পারতেন ? অশান্তি আর সংঘর্ষকে বড় ভয় নয়নতারার। তাই আধপাগল শাশুড়ীর পাগল জনোচিত নির্দেশও মেনে চলতেন, পাছে গোলমাল চেঁচামেচি হয়। সর্বোপরি—পাছে সত্যব্রত আহত হন।

আর এখন কার সংসারে ? সে তো সর্বদাই একটি অদ্ভুত ভূমিকায় থাকেন। মান-অভিমান রাগ-বিরক্তি কোনো কিছুই প্রকাশ পায় না তাঁর মধ্যে থেকে, কারণ তিনি বোকাসোকা, কে কী বললো তার মানে ধরে ফেলতে পারেন না। ভূমিকাটি এক হিসেবে মোটামুটি নিরাপদ।

কিন্তু নয়নতারা আজ এখন হঠাৎ সেই ভূমিকা থেকে বেরিয়ে এসে বলে উঠলেন, দাঁড়াও বৌমা, শুনে যাও।

কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তা।

নীহারিকা থমকালো।

নয়নতারা শান্ত কঠিন গলায় বললেন, 'আইনকানুন চুলচেরা ভাগের' কথা যখন তুলছোই বৌমা, ত কয়ে রাখছি—ওই উকিল মনিমিটি অনেক আগেই তার ব্যবস্থা করে রাখছে। বসতবাটিতে 'ভেন্নগোত্তর' এসে ভাগীদার হয়ে বসবে, এটা তাঁর বরাবরের না পছন্দ, তাই পাকাপাকি লেখাপড়া করে এই বাড়ি পুত্র-পুত্রবধূর নামে উইল করে রাখছে। সে উইলে সাক্ষীনামায় সই করিয়ে রাখছে 'খুকেন' আর জামাইকে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ তোমাদের কিছু দূষতে না পারে। কথাটা এখন থেকে প্রচার করার কথা না, তবু এক্ষেত্রে বলাটা দরকার ভেবে বললাম। ঠাকুরের দয়ায় খুকেনের কোনো অভাব নাই, এ বাড়ির 'ভাগ' নিয়ে দাবিদার হতে আসবে না সে। নিশ্চিন্তে থাকো তোমরা।

দু'জোড়া নিথর পাথর চোখের সামনে থেকে সরে গিয়ে দালান থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে যান নয়নতারা।

তার মানে আদিত্যর কিছু হোক না হোক, 'মুখের ওপর একখানা থাপ্পড়' আজ আদিত্যর বৌয়ের কপালেই ছিল।

॥ আট ॥

অথচ হয়তো পরিস্থিতি একদম অন্য চেহারা নিতো যদি টুনির ওই চকচকে ঝকঝকে ভাগ্নেটির অনেকদিন আগে থেকেই বিয়ের ঠিক হয়ে না থাকতো। আর এই 'ঠিক'টি তো কাঁচা ব্যাপার নয় যে ভেঙে যাবার আশা থাকলেও থাকতে পারে। এ একেবারে পাকা দলিল ! দেশ থেকেই সহপাঠিনী, বিদেশ গমনও একত্রে। তবে কিনা কন্যেটির পাঠ্যবিষয় আলাদা, তাই তার সেই পাঠপর্ব চুকিয়ে আসতে আরো কিছু সময় লাগবে। ফিরে এসে 'শুভকাজ'।

টুনি বলেছিল, 'তারপর আবার আরো উন্নতির আশায় সেখানে ছুটবে কিনা কে জানে। এমন

তো অনেকেই বলে, দেশেই থাকবো, দেশের জনেরই সেবা করতে শিখে-আসা বিদ্যেটা কাজে লাগাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এখানে মনের মতন চাকরি-টাকরি না পেয়ে ফের চলে যায়। দেখলাম তো আমার আর এক ননদের ভাসুরের ছেলেই তো আমেরিকায় গিয়ে বাড়িটাড়ি কিনে ফেলে, সেখানের পাকাপোক্ত বাসিন্দে হয়ে গেছে। বৌ এখানেরই, তবু তার সাত-আট বছরের ছেলেটা বাংলা কথা বলতে শেখেনি। মা-বাপ চেষ্টা করেও না।'

সন্ধ্যাতারা বা টুনি কী নিজস্ব স্বভাবে গড়গড়িয়ে এতো কথা বলে ফেলেছিল ? নাকি ইচ্ছে করেই একটু বেশী বলেছিল ?

সে কি আন্দাজ করেছিল, তার এই অতীব সুপাত্র ভাগ্নেটিকে দেখে কোথাও কোনো স্বপ্নসৌধ নির্মিত হতে পারে ? তাই সে সৌধের ভিৎ গাঁথা হয়ে যাবার আগেই যত তাড়াতাড়ি আগবাড়িয়ে ভাগ্নের পছন্দকে 'বলিহারী' দিয়ে প্রসঙ্গটির অবতারণা !

তা তার পছন্দকে অবশ্য বলিহারী দিতেই হয়। কারণ সে মেয়ে একে অব্রাহ্মণ, তায় কালো রোগা এবং পাত্রের সঙ্গে মাথায় মাথায় একবয়সী। দেখলে মনে হয়, হয়তো বা বয়েসে বড়ই। কারণ ভাগ্নেটির যে রাজপুত্রতুল্য চেহারা ?

এ হেন খবরটি জানা হয়ে না গেলে হয়তো নীহারিকা আপন স্বপ্নটির সঙ্গে শাশুড়ীর ইচ্ছেটির মিল দেখে তাঁর সঙ্গে একটু হৃদ্যতা স্থাপন করে বসতো। আর শাশুড়ীর মেয়েটিকে তোয়াজি ভাষায় সখীর পর্যায়ে দাঁড় করিয়ে ফেলে তাকে বুঝিয়ে দিতো, 'তোমায় আর বলবার কী আছে ভাই ? তুমি তো ঘরের লোক, নিজে থেকেই তোমার ভাইঝিটিকে একটি দামী ছেলের সঙ্গে গেঁথে দিতে চেষ্টা করবে। পাত্রটিও যখন তোমার 'ঘরের লোক'।'

এই সবই হতে পারতো, যদি মাঝখানে একটা রোগা কালো 'আধবুড়ি' মেয়ে এসে না দাঁড়াতো '.... ইস্। তাও যদি যোগ্য পাত্রী হতো, মনে এতো জ্বালা ধরতো না।

টুসকি অবশ্য ওই 'অতিথি ডাক্তারটি' সম্পর্কে মায়ের সমীহ ভাব দেখে ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'ই. এন. টি. স্পেশালিস্ট। তাতেই তুমি একেবারে 'হীরের টুকরো' 'সোনার টুকরো' বলে বিগলিত হচ্ছো ! ওকে আবার ডাক্তার বলে না কী ? আমি তো বলি না। দর। বিদেশে গিয়ে স্পেশালিস্ট হবার জন্যে আর কোনো সাবজেক্ট খুঁজে পেল না ?'... তবু নীহারিকাব তো চোখ এড়ায়নি—ওই সুদর্শন সুকান্ত স্মার্ট সপ্রতিভ ঝকঝকে তরুণটির দিকে মেয়ের ঘনঘন মুগ্ধ চাহনি। এ জিনিস কি আর মায়ের চোখ এড়ায় ? নাকি তরুণীকন্যার 'বিপরীত' ভাষণ শুনলেই তাতে বিশ্বাসস্থাপন করে না ?

কিন্তু এই মৃদুমধুর পরিবেশের ওপর টুনি একখানা থান ইট বসিয়ে বসলো।.. ফলশ্রুতি এই—ছেলেটা বাড়ি ফেরার সময় যখন 'মামীমাকে প্রণাম করে যাই' বলে খুঁজলো, তখন মামীমা রান্নাঘরে এতো ব্যস্ত যে, দরজা থেকে মুখটা একবার বাড়িয়ে 'ঠিক আছে, থাক থাক', বলে আবার সে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঘোরতর কাজে আটকে গেল। ননদের সঙ্গে সেটুকু সৌজন্যও করে উঠতে পারেনি নীহারিকা। পরবর্তী ফলশ্রুতি—আদিত্য ফেরামাত্রই সালঙ্কারে টুনিঘটিত ইতিহাসটি ব্যক্ত করে বসা। অবশ্যই তিক্ততা এবং তীব্রতা মিশিয়ে।

এবং তার ফলশ্রুতিতে আদিত্যর তৎক্ষণাৎ মাতৃ-সন্নিধানে যাত্রা। এমনিতেই তো টুনির 'সর্দারির' খবরে রাগে দপ করে মাথায় চড়ে গিয়েছিল, তার ওপর আবার নীহারিকার তীক্ষ্ণ তিক্ত শ্লেষ বাক্য :... 'বোনটিকে যত বোকাসোকা সাদাসিধে সরল বলে ভাবো, জেনো ঠিক তা নয়। বললেই মন্দ হওয়া, তাই চুপচাপ থাকি। বড়মানুষ ভাগ্নের গাড়ি চড়ে এলেন, মটমটানি দেখালেন, শুধু শুধু বাবা এতোদিন এতো অসুবিধে ভোগ করছেন বলে আক্ষেপ করলেন, নিজেই বাবার অসুবিধা ঘোচাবেন বলে ঘোষণা

করে, আবার মটমটিয়ে গাড়ি চড়ে চলে গেলেন! বাড়িতে যে আর কেউ আছে চোখেও পড়লো না যেন।'

অতএব অগ্নিমূর্তি হয়েই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল আদিত্য নামের বদমেজাজি লোকটা মাকে ভালো করে সমঝে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু এখন?

নয়নতারার ওই দুঃসাহসিক ঘোষণার পর?

দুজনেই যেন ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। একদিকে—ঘোষণাটি তো পরম স্বস্তিবাহী। কিন্তু তার সঙ্গে যে মিশে রয়েছে অপমানের জ্বালা। হয়তো অপমানের জ্বালাটা বেশী দাহকারী হয়, যদি তার অন্তরালে কোথাও উঁকি মারে স্বাপন ত্রুটির অনুভূতিটি। এই জ্বালাটার ফয়সালা হবে কী করে?

এখনি গিয়ে বাপকে বলে দেবে, 'তোমার এতো মহানুভবতার দরকার কী? এখন যখন ছেলে মেয়ে দুজনেই বাপের সম্পত্তির সমান ভাগীদার হওয়া আইন—

পাগল না কী? বললেই হলো? রাগের মাথায় বলে বসে শেষে পস্তাই আর কী? বলে বরাবরই তো ওই চিন্তাটা মনের মধ্যে কাঁটা গেঁথে বসে আছে। এই তো বাড়ি, এর অর্ধেকটায় যদি টুনির দাবি জন্মায়? হয়তো এখানে এসে থাকতে চাইবে না, তবে বাড়িটা বেচে ফেলে টাকাটা ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাব তুলে চাপ দিতে পারে। চারিদিকেই তো দেখা যাচ্ছে এমন! অবশ্যই এ বাড়ির যা পোজিশান, দাম ভালোই হতে পারে এখন। কিন্তু সেই ভালোর অর্ধাংশটুকু নিয়ে এ বাজারে কতটুকু কী করে উঠতে পারবে আদিত্য?...

লোকে ছেলেরা 'বড় হয়ে ওঠায়' ভরসা করে কিন্তু আদিত্যর সেদিকেও তো শূন্যতা। বড়ছেলেটি তো হিসেবের বাইরে, ছোটছেলেটির মধ্যে তেমন কোনো উজ্জ্বল সম্ভাবনার ছায়ামাত্রও দেখা যাচ্ছে না। অথচ মেয়েটি বিয়ের যোগ্য হয়ে উঠেছে। যতই 'প্রগতি' দেখাও আর মেয়েকে যতই বিদূষী গুণবতী বানাও, 'কন্যাদায়' শব্দটির কোনো হেরফের ঘটেনি। সেই 'সর্বস্বান্ত হওয়া'। সেই ভিটেমাটি চাটি হওয়া। সেই অধমর্ণের ভূমিকায় উত্তমর্ণের দরজায় হাঁটাহাঁটি। সবই বজায় আছে। অন্তত আদিত্যদের মতো মধ্যবিত্ত সাধারণ ঘরে আছেই। অতি আলোকপ্রাপ্তদের কথা হয়তো অন্য। তাই বা কী? প্রেম করে বিয়ে করা মেয়ের বাবাও তো সেই একই পদ্ধতিতে 'কনের বাপের' ভূমিকায় বসে দানসামগ্রী সাজাতে বসেন!

নাঃ, রাগের মাথায় ঝোঁকের বশে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারবে, এমন বোকা আদিত্য-দম্পতি নয়। অপমানের জ্বালা মনের মধ্যেই পাক খাইয়ে খাইয়ে থিতিয়ে ফেলার চেষ্টা চলে।

মনিব গিন্নী আহ্লাদে উথলে উঠে খুব কাছে ঘেঁষে এসে আহ্লাদচাপা গলায় বলেন, তাই না কী তারকের মা? এমন জাগ্রত ঠাকুর তোমাদের গাঁয়ে আছে?

না থাকলে কী আর বলচি বৌদিদি? 'জাগ্রতো' বলে? ডেকে কতা কন! একেবারে অব্যার্থো! যে যা 'মান্‌সিক' করবে তা সফল হবেই হবে।

মনিবানী চাপা ব্যগ্র গলায় বলেন, তো, কী কী করতে হয়?

তারকের মা উদার আশ্বাসের গলায় বসে, সে তো আপনাকে গোড়াতেই বলিচি বৌদিদি! 'আর্জি চাপানোর' সময় শুদুমাত্তর পাঁচটি সুপুরি পাঁচটি কড়ি আর পাঁচ সিকে পয়সা। মায়ের থানে সেটি গচিয়ে দিয়ে মনে মনে বলতে হবে সফল হলে সাদ্যোমতো পুজো দেবো! তো যার যেমন সাদ্যো।... শনি মঙ্গলের ভরদুপুরে মায়ের পুষ্কর্ণিতে তিনটি ডুব দে এসে ভিজে কাপড়ে 'আর্জিটি গচিয়েই'

একেবারে উল্টোমুকো ঘুরে ফিরে আসতে হবে। আর সন্দের ছ্যাঁকে একবার কোনো গাচতলায় মায়ের নামে ধুনো পোড়াতে হবে। তো বেলগাচ হলে অতি উত্তম, তবে বট অশ্বোথ পাকুড় হলেও চলে। ব্যস ! গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো। মানসিক পূর্ণো হলে পুজো দিয়ে এসো।

তারকের মার মুখে চোখে একটি অভয় আশ্বাসের অলৌকিক দীপ্তি !

মনিবানী মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই অলৌকিক দীপ্তির দিকে তাকিয়ে বিগলিত অথচ ভয় ভয় গলায় বলেন, হ্যাঁগো, তা ওসব কী যে মানত করবে তাকেই করতে হবে ?

এই দ্যাখো বৌদিদি, সে কতা আবার কখন বললুম ? আর্জি গচিয়ে আসা যে কেউ করে আসতে পারে। মনে মনে তার ওপর ভার দিয়ে দিতে হয়। তবে পুজো দেবার কালে নিজে গেলেই ভালো হয়। অসমর্থে তার নিহাৎ নিকটজন।

মনিবানী মনে মনে ভাবেন, মানসিক পূর্ণ হলে 'নিজে যাওয়া' কোনো ব্যাপারই নয়। কতো দিকে কতো মানত কতো পুজো চড়ানো চলছে। সবকিছুতে 'ডোণ্টো কেয়ার' কর্তা ওই সবেতেই রাজী হচ্ছেন। অবশ্য মুখে বলছেন, 'দেখো এইসব ঠাকুর—দেবতা—তোমার করতে ইচ্ছে হয় করো, আমাকে ওর মধ্যে জড়িও না—' তবে গিন্নীকে সে সব করবার সুযোগ সহায়তাটি করে দিতে অরাজী হচ্ছেন না। 'নিহাৎ নিকটজন'। স্ত্রীর থেকে 'নিকট' আর কে আছে ইহ পৃথিবীতে ? বীণাপাণি যদি তখন ধরে বসেন, আমার মানত আমিই উদযাপন করতে যাচ্ছি, তুমি ধরো আমায় সঙ্গে করে নিয়ে গেলে। তাতে কি আর অরাজী হবেন মানুষটা ? তা নিশ্চয় নয়। ভোটে জিতলে মনমেজাজ আলাদা হয়ে যাবে। তাছাড়া তাঁরা তো আর তারকের মার মতো রেলগাড়িতে ঘষটাতে ঘষটাতে যাবেন না ? গাড়ি করেই যাবেন। একটু আউটিঙের মতোই হবে। পাঁচ কান করছি না বাবা। শুধু তুষুটাকে বলবো। 'জামাইবাবু' বলে মরে। জামাইবাবুটিরও তো ওই ছোটশালীটি চক্ষের মণি।...

মনে মনে একবার সেই মনোরম অভিযানটি কল্পনা করে নেন বীণাপাণি। তারপর বলেন, তাহলে তুমি কালই বেরিয়ে পড়ো তারকের মা। পরশুই যখন মঙ্গলবার পাওয়া যাচ্ছে। তো তোমার যাতায়াতের খরচা কী লাগবে ?

তারকের মা বিনয়ে গলে গিয়ে বলে, ওমা, সেটা আবার আপনি দিতে যাবে কেন ? মাসে একখেপ করে তো যাই-ই আমি—

না না, তা কেন ? আমার কাজে যাচ্ছো যখন, খরচা আমার কাছেই পাবে। তাছাড়া ওই যে সুপুরি কড়ি পাঁচ সিকে পয়সা--

তারকের মার চোখে আহ্লাদের ঝিলিক। তার মানে গোটা তিনেক দিন ছুটি মিলে গেল। অতঃপর বলে, হ্যাঁ, সেটি দিতে হবে, তার সঙ্গে ওই যে বলেচি—একখান তেপত্তর বিল্বিপত্তরে লাল কালি দে' মানুত্তির নাম-গোত্তরটি লিখে দেবেন। সবটি একটু লাল চেলির টুকরোয় বেঁধে মায়ের থানে চড়িয়ে দেওয়ার ওয়াস্তা। তবে ওই নামগোত্তরটি মানুতিকে নিজে হাতে নিকে দিতে হবে। তাতেই মায়ের সঙ্গে 'মনে মনে' আপোস হয়ে গেল।

বীণাপাণি একবার ভেবে নেন। ঠিক আছে। ও করিয়ে নেওয়া যাবে। ঠাকুরদেবতার নাম তো আর লিখতে হবে না, নিজের নাম-গোত্তর। ও হয়ে যাবে।

নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন, হ্যাঁ, তারকের মা, মূর্তিটি কী কালী ?

ওমা। মূত্তি আবার কোতা ? মূত্তি বলে কিসু নাই। শুদু একখান কালো পাতরের চাঁই। তো তেল-সিঁদুরে তেল-সিঁদুরে কালোর চেন্নো আর নাই, লাল টকটকে। শুনতে পাই, আদিকালে শুদু গাচতলাতেই পড়ে থাকতেন মা চণ্ডী, পরে ভক্তরা চারদিক ঘিরে মাথায় ছাউনি দে, 'থান' বাঁদিয়ে দিয়েচে। তো শনি মঙ্গলে যে কী ভীড় কী ভীড় ! পাঁচ-সাতখানা গেরাম থেকে ওই ঘোড়াই চণ্ডীতলায়

লোক আসে।...

তোমাদের গ্রামে ?

গেরামে বললে গেরামে, অরণ্যে বললে অরণ্যে। গেরামের সীমানাটা পার করে জঙ্গলের মধ্যে !

কিন্তু এসব কী তারকের মায়ের বানানো ?

তা মোটেই নয়। সবই যথাযথ। যা বলেছে সবই ঠিক। স্থানীয় জনেরা অব্যর্থ বলে মানেও। যদি 'ব্যর্থ' হয় তো বলে, নিয্যস কোনো অপরাধ ঘটেছিল !

ঘোরতর নিরীশ্বরবাদী বিপুল ঘোষালের গিন্নী বীণাপাণি তারকের মা বর্ণিত এই 'অব্যর্থর' আশায় স্পন্দিত হতে থাকেন।

তারকের মাও মনে মনে ডাক পাড়ে, 'হে মা ঘোড়াই চণ্ডী, মুক রেকো মা। শুদু তারকের মায়ের মুকটাই নয়, তোমারও মুকটি রক্ষে করা দরকার।... তো মনে হয় বাবু জিতবে। যা ঘটাঘটি করচে। মানুষের আসার বিরাম নেই, সদাই ছুটোছুটি। তাপর গে এখানে সেখানে নেকচার '

গিন্নীর সঙ্গে দেখা নেই। গেরস্থালী কথা কওয়ার অবকাশের প্রশ্নই ওঠে না... বেশীর ভাগ দিনই বৈঠকখানা ঘরেই রাতটা কাটিয়ে দেন বিপুল ঘোষাল। 'রাতটা' মানে বলতে হয় শেষ রাতটা। মধ্যরাত পর্যন্তই তো শলাপরামর্শ চলে বিশ্বাসভাজনদের সঙ্গে। তার মধ্যে সর্বপ্রধান বিশ্বাসভাজন শালীর বর পরিমল। শ্যাকলও আছেন। আর আছে কর্মীবৃন্দ। যারা রাতদুপুরে ঘুরে ঘুরে পোস্টার মেরে বেড়াবে। রাত ছাড়া তো শহরের রাস্তারা নিঃঝুম মারে না।

সময় নেই, তবু বীণাপাণি আজ কর্তাকে বলে-কয়ে ডাকিয়ে এনেছেন।...

বিপুল বিছানায় বসে পড়ে একটু আরামের 'আঃ' শব্দ করে বলেন, কী হলো ? হঠাৎ জরুরি তলব ?

বীণাপাণির এই পঞ্চাশ বছর বয়েসেও শরীরে বাঁধুনি আছে ভালো। চোখে কটাক্ষও খেলে। সেটা খেলিয়ে বলেন, ভয় হচ্ছিল, আমায় তালাক দিয়ে বসছো না তো ?

বিপুল অবশ্য এতে একটু কাৎ হলেন। বললেন, আর বলো না। সবাই মিলে দরিয়ায় নামিয়ে দিল। এখন হাবুডুবু খেয়ে মরছি। এখন চিন্তা, শেষমেষ পুরোপুরি ডুববো কিনা।

বীণাপাণি সতেজে বলেন, ডুবলেই হলো ? আমার প্রার্থনার জোর নেই ? দেখি কে ডোবায় !

কথার ভঙ্গীতে মনে হলো যেন সত্যবানের মাথা কোলে নিয়ে বসা সাবিত্রীর উক্তি।

বিপুল বড় প্রীত হলেন। বীণাপাণিকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বললেন, মনে হচ্ছে জিতলে তোমার জোরেই জিতবো ! তুমি তো চিরকেলে পয়মন্ত।

বীণাপাণি যেদিন প্রথম শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করেছিলেন, সেইদিনই বিপুলের বি.এ-র রেজাল্ট বেরিয়েছিল। বলা বাহুল্য, রেজাল্ট বিশেষ ভালো ছিল। তদবধি বীণাপাণির 'পয়মন্ত' বলে একটু নামডাক আছে।

বাতাস অনুকূল দেখে বীণাপাণি দুম করে কথাটি পেড়ে বসলেন।

বিপুল অবাক হয়ে বললেন, এই বেলপাতাটার ওপর লাল কালি দিয়ে নিজের নাম ঠিকানা লিখতে হবে ? মানে ?

বাঃ, ঠিকানা লিখতে হবে কে বলেছে ? বললাম না নাম-গোত্র।

গোত্র ! 'গোত্র' মানে ?

কী কাণ্ড ! 'গোত্র' মানে জানো না ? মানে তোমাদের বংশগত ইয়েটি। মানে পরিচয়। আহা, বিয়েটিয়ের সময় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে সেই যে বলে না, অমুক গোত্রায়—

ওঃ, তা হঠাৎ এতে সেটা লিখতে যাবো কেন ? বলে একটু সরস হাসি হেসে বলেন, বুড়ো বয়েসে 'বশীকরণ-টরন' করতে চেষ্টা না কী ?

বীণাপাণি গা এলিয়ে হেসে বলেন, আর বশীকরণ ! সতীনের হাতে তো সমর্পণ করেই দিয়েছি !

সতীন।

বিপুল মনে মনে একটু কেঁপে ওঠেন, তুষুর কথা বলছে না তো ? ধ্যেৎ ! তুষুর সঙ্গে আমার বয়সের বিশ-বাইশ বছর ফারাক। তাই বলেন, হঠাৎ সতীনের স্বপ্ন দেখছো যে ? সেটি আবার কোথা থেকে এলো ?

কোথা থেকে এলো তুমিই জানো। তবে এসেছে তো। তাকে নিয়েই সর্বদা বিভোর ! এমন জানলে কে তোমায় 'ভোটে' দাঁড়াতে দিতো ' বলে আবেগে আরো কাছে সরে আসেন বীণাপাণি।

বিপুল নিশ্চিন্ত হয়ে বলেন, তবু ভালো। ভয় লাগিয়ে দিয়েছিলে। তো এটা কী হবে বললে না ?

বলবো। পরে। এখন লেখো তো। আমার দরকার।

কী মুস্কিল। নামটা তো হলো, গোত্রটা কী ?

বীণাপাণি বলেন, ওমা। 'ভরদ্বাজ', তাও জানো না ?

জানার দরকার বোধ করি না। একটা অর্থহীন ব্যাপার।

তবু বীণাপাণি সেই অর্থহীন ব্যাপারঘটিত একটি কাজ করিয়ে নেন। নিরীশ্বরবাদী সর্ব কুসংস্কারমুক্ত বিপুল ঘোষালকে দিয়ে বেলপাতার ওপর লাল কালিতে যথাযথ লিখিয়ে নেন।

এখন আর কোনো কিছুতেই জোরালো আপত্তি দেখাতে সাহস করছেন না বিপুল। এই তো সেদিন তুষু কোথা থেকে যেন কী ঠাকুরের প্রসাদ বলে একটা সন্দেশ খাইয়ে দিল। আপত্তি করতে পারলেন কী ?

বীণাপাণি সেই পরম মূল্যবান বেলপাতাখানি একটু মাথায় ঠেকিয়ে, উঠে গিয়ে আলমারি খুলে যেখানে লাল চেলির টুকরো বাঁধা কড়ি সুপুরি রাখা আছে, তার সঙ্গে রেখে দেন। কাল সকালেই দিয়ে দিতে হবে তারকের মাকে। ও যে ভাবে স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে বলছে—

বীণাপাণি মনে মনে ভাবলেন, সুফল ফলতেই পারে। জগতে কতো 'অলৌকিক' আর 'দৈব'টৈবর ব্যাপার আছে, আমরা তার কতোটুকু জানি। সবকিছু উড়িয়ে দিলেই হয় না। গরিব লোকটোকেরা রোগে ব্যাধিতে কতো তোমাদের নামী-দামী ডাক্তার দেখাতে পারছে ? ওদের বেঁচে থাকার মূল শক্তিটিই তো ওইসব—নামটা কী যেন বললো ? ....একটু থমকালেন। ও ' মনে পড়েছে। আবার ভুলে যাবার ভয়ে হিসেবের খাতার শেষ পৃষ্ঠায় একটি কোণে লিখে রাখলেন, 'ঘোড়াই চণ্ডী'।

কর্তা 'ইলেকশানে' নামবার আগে পর্যন্ত বীণাপাণিও এ ধরনের নাম শুনলে নির্ঘাৎ একটু হেসে নাক কোঁচকাতেন। কিন্তু এখন ঘটনা আলাদা। এখন লৌকিক অলৌকিক রক্তমাংসের এবং সোনা রুপো পেতল অষ্টধাতু কাঠ পাথর মাটির পোড়ামাটি—কতো দেবদেবীকে ভজতে হচ্ছে ! ক্রমশঃই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের এই বহু প্রাচীন বিচক্ষণ সভ্যতা কেন তেত্রিশ কোটি দেবতার ভাব-ভাবনা করে রেখেছে। যেমন 'যতো মত ততো পথ' তেমনি যতো 'সমস্যা' ততো 'নমস্য-নমস্যা'।

শিলাদিত্য বাড়ি ঢুকেই বললো, কী ব্যাপার ? বাড়িটা এমন ভিজে তোয়ালের মতো নেতিয়ে পড়ে রয়েছে কেন ? এই টুসকি, তোদের ব্যাপার কী ? মায়ে মেয়েই ঝগড়া নেই-কর্তা—গিন্নীতে উচ্চরবে মধুরালাপ নেই, এমন কী কাজলে-তারকে 'খুন্তি-হাতা' যুদ্ধ নেই—

টুসকি মাত্র শেষ কথাটার উত্তর দেয়। আত্মস্থ গলায় বলে, তারক দু-তিন দিনের ছুটি নেয়ে

দেশে গেছে।

তারক ছুটি নিয়ে দেশে গেছে ! তাজ্জব। এটা আবার কী ব্যাপার ? তারকের একটা দেশও ছিল না কী ?

টুসকি উত্তর দেবার আগেই হঠাৎ কাজল রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে খরখরিয়ে বলে ওঠে, তা তো বলবেনই ছোড়দা। গরিবের যে আবার দেশ ঘর আত্মজন বলে কিছু থাকতে পারে, এ খেয়াল আপনাদের থাকে না।

আগে কাজল ছোড়দাদাবাবু বলতো, ইদানীং হঠাৎ টুসকির মতো শুধু 'ছোড়দা' বলতে শুরু করেছে। বোধহয় যবে থেকে তার কোমরছাড়ানো লম্বা চুলের গোছাটার আগো ছেঁটে কোমরের ওপর তুলেছে এবং পায়ে আলতা পরাটা ছেড়েছে। যখন তখন আলতা পরাটা একটা শখ ছিল কাজলের। নখে রং দিলেও। নখে রং দিতে শিখেছে অবশ্য অনেকদিনই !

কাজল অবশ্য বরাবরই খরখরানি। কথাবর্তা ধারালো। তবে এতোকাল কথার ধরনে এব ধরনের ধার ছিল না। আজকাল মাঝে মাঝেই দেখা যাচ্ছে।

টুসকি বলে ওঠে, বাবা ! হঠাৎ তারকের জন্যে এতো চেতনা জেগে উঠলো যে ? এদিকে তো আদায় কাঁচকলায়, সাপে নেউলে।

কাজল তার পিঠে ঝাঁপিয়ে থাকা খাটো চুলের গোছাটাকে ঝাপটে ঝামরে রান্নাঘরে যেতে যেতে বলে যায়, ন্যায্য কথা অতি বড় শত্তুরের জন্যেও বলা যায়।

নীহারিকার দালানে পাতা জীর্ণ বিবর্ণ 'ডিভ্যান'টায় গা ঢেলে পড়েছিল। সর্বদার দৃশ্য হাতে উলের গোলা আর একজোড়া বোনার কাঁটা এখন অনুপস্থিত। টুনির দুঃসহ স্পর্ধায় তার শরীর-মন দুই-ই বিবশ। দুপুরবেলা টুনি আবার তার সেই 'মহাপুরুষ' ভাগ্নের সঙ্গে এসে বাবাকে একখানি 'শ্রবণযন্ত্র' উপহার দিয়ে প্রাণভরে গল্প করে গেছে বাপের সঙ্গে। আর হাস্যোদ্ভাসিত মুখ বাপ বলেছেন, মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেলাম।

এবং ! এবং আরো অপমানের দাহ, সেই ভাগ্নে নাকি বলে গেছে, উপায় হাতে থাকতে মিছিমিছি এতোদিন যে কেন এতো অসুবিধে ভোগ করলেন দাদু, তা তো ভেবেই পাচ্ছি না।

সমস্তটাই বিষের ঝাপট মেরেছে নীহারিকাকে। সব থেকে রাগ হয়, আদিত্য দিব্যি গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বাড়ির বাইরে কাটাতে পায়। 'অফিস যাওয়াটা' নীহারিকার মতে গায়ে হাওয়া লাগানো। আদিত্য বাড়ি থাকলে, সেই অহঙ্কারী ছোঁড়ার মুখের ওপর মুখের মতো জবাব তো একটা দিতে পারতো। যতো ঝঞ্ঝাট নীহারিকার।

শিলাদিত্য বাথরুমে যাবার প্রস্তুতিতে তোয়ালেটা হাতে নিয়ে লোফালুফি করতে করতে আলগা গলায় বললো, তা তারকবাবুর হঠাৎ 'দেশে' যাবার কারণ ?

নীহারিকার বেজার গলার উত্তর, কে জানে ? বললো তো দেশে কী সব জমিজমা আছে, যায় না বলে বেহাত হতে বসেছে। মা ঘ্যান ঘ্যান করে—এখন না কী পচা গ্রামের জমিরও দামটাম খুব বেড়ে গেছে।

ও বাবা ! ওর বাবার জমিজমাও আছে।

নীহারিকার স্বর আরো বেজার, সকলেরই সব আছে। তোদেরই শুধু কোনোখানে কিছু নেই।

কেন ? আমাদের 'পাবনা নেই' ? একবার ওপরতলার দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গাত্মক এই মন্তব্যটি উচ্চারণ করে হো হো করে হেসে বাথরুমে চলে যায়।

দেখলি তো কেমন টোপটি ফেলেছি ?

ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে আপন বুদ্ধির অহঙ্কারে ঝলমলিয়ে তারকের মা বলে, তিন-চার দিনের ছুটি, যাতায়াতের খরচা, তার ওপর আবার এই কদিনের খাইখরচ। ..... হি হি হি, গিন্নী এখন একেবারে দয়ার অবতার। বলে কিনা, আহা, দেশে তো তোমার থাকার মধ্যে এক শয্যেশায়ী মা। কে দেখবে ? কদিন খরচ আছে তো ? পঞ্চাশ—পঞ্চাশটা টাকা হাতে গুঁজে দিল।

আঁ্যা, বলিস কী মা ? হাত দিয়ে যে জল গলে না বলিস ?

তবে আর বলছি কী ? এখন ভোটে নেমে কর্তা-গিন্নী উভয়েই দাতা কর্ণ।

তা ওরা এইসব দেবদেবী চণ্ডী মনসা মানে ?

এতোকাল তো জানতুম মানে না। গিন্নী অবিশ্যি কর্তাকে লুকিয়ে চুরিয়ে ষষ্ঠি মনসা 'সন্তোষী মা' করতো, কর্তা তো কাঠগোঁয়ার কালাপাহাড় ছেলো। তো এখন সবই মানছে। তো এই সুযোগে তোকে যে জন্যে আসতে বলা—

আচ্ছা আচ্ছা, পরে হবে। এখন ঘরে চলতো। রাস্তায় পরামর্শর কথা কইতে নেই।

তারকের মা একটু চুপ করে কয়েক পা এগিয়েই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ও তারক। এখেনেও যে আমাদের বাড়ির বাবুর 'চেন্নো'। গাছেপালায় ইস্কুলবাড়ির দেয়ালে, দোকানের চালায়—ঠিক ওখেনের মতই ! বাবু কী সর্বোত্রেই ভোট সাধবে ?

তারক একটু হেসে বলে, চিহ্নটা তোর বাবুর নিজস্ব নয় মা, পার্টির চিহ্ন। সমস্ত রাজ্যটা জুড়েই ওই একই চিহ্ন। তা সে যে যেখানেই দাঁড়াক।

তাই বুঝি ? ওখানে গিন্নী আমায় জ্ঞান দিয়েছিল রাস্তায় বেরিয়ে দেখেছো তারকের মা ? তোমার এ বাবুর চেন্নোয় চেন্নোয় ছয়লাপ !........

ওই হলো আর কী ! একই।

ও। এয়েছিস যদি তো তুই একবার মায়ের থানে যাবিনে ?

আমি ? কেন বাবা ? না না, আমাকে আবার ওসবে টানা কেন ?

তোরে টানবো না তো কী ওই পচাইয়ের ছেলেটারে টানতে যাবো তারক ? তুই ভেন্ন আমার আছে কে ? আঁ্যা, তোরে নিয়েই আমার য্যতো সপ্নো দ্যাকা।

সপ্নো। তারক হঠাৎ অবাক হয়। মায়ের মধ্যেও সপ্নো দেখাদেখি আছে না কী।

একটু তাকিয়ে বলে, হুঁ। তো কী স্বপ্ন দেখিস ? তোর তারক মন্ত্রী হয়েছে, রাজার অধিক সুখে আছে—সকল লোক তার দোরে ধর্না দিচ্ছে ?

আহা ! মনত্ ভাবতে যাবো কেন বাবা ? তোরে বলি না, 'রাজার জন্যে রানী, আর কানার জন্যে কানী'। আমার সপ্নো আমার মতন সপ্নো দেকি, তুই তোর বাপের ভাগের জমিজিরেত জ্যাটার হাত থে উদ্দার করে আলাদা ভাগে চাষআবাদ দিচ্চিস, বে-থা করে সোন্সারী হয়েচিস, আমি পরের দোরের দাসত্ব ছেড়ে সোন্সারের খাটাখাটনি ছেড়ে, নাত্নিনাতনী নে আমোদ-আহ্লাদ করচি। আর—

'আর'টা না শুনেই তারক হো হো করে হেসে উঠে বলে, থাম মা ! এই তারককে দিয়ে তোর ওসব স্বপ্নসাধ মিটবে না।

ক্যানো শুনি ? তুইও চিরটাকাল নোকের বাড়ি ভাত রাঁধবি আর আমিও—

আরে বাবা, তোর ওই এক দোষ মা। ফীহাত চোখের জল। চিরটাকাল 'ভাত রাঁধবো' কিনা জানিনে, তবে বে-থা করে সংসারী হওয়া বোধহয় আমার দ্বারা হবে না।

ক্যানো ? ক্যানো শুনি ? সবাইয়ের দ্বারা হয়, তোর দ্বারা হবে না ! তুই এমন কী তালেবর ?

কী, তা জানিনে। তবে বড়দাবাবুর মতোন জীবনটাই আমার পছন্দ। নিজের জীবনটা নিজের। স্বাধীন, হালকা।

এ তো মহাস্বার্থোপরের মতোন কতা হলো তারক! মনিষ্যি কী পশুপক্ষী যে, নিজেই নিজের জেবনটার মালিক! আর কারুর জন্যি দায়দায়িত্বো নাই! মনিষ্যির অনেক দায়দায়িত্বো থাকে। তা নইলে আর ভগমান 'মনিষ্যি' করে পাইটেচে কেন?

তারক মাথাটা নেড়ে বলে, হুঁ। তো ওকথা বড়দাবাবুও বলে। বলে, পৃথিবীর সমস্তো মানুষের জন্যেই ওদের দায়িত্ব। ওরা চায়, সবাই সমান হোক। কেউ অধিক বড়মানুষ থাকবে না, কেউ অতি গরিব থাকবে না। পৃথিবীর সব ধান চাল জল বাতাস সব মানুষের জন্যে। বড়মানুষরা তার অনেকখানিটা করে নিজের ঘরে আটকে রাখে। গরিবকে শুষে খেয়ে আরো বড়মানুষ হয়, গরিবরা ধুঁকে ধুঁকে মরে, এইসব অন্যায্য অবস্থার অবসান করতেই ওরা...

তারকের মা কথার মাঝখানে হঠাৎ বলে ওঠে, বললি তাই মনে পড়লো, বড়খোকারে আজকাল আমাদের ওখেনে আসতে দেকি।

তারক চমকে বলে, 'বড়খোকা'? বড়দাবাবু? কোথায় আসতে দেখিস?

বললুম তো। আমাদের কর্তাবাবুর কাচে। তো কর্তাবাবুও তো বড়মানুষ। তেনার ঘরে আনাগোনা ক্যানো?

তারক এ খবরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। মায়ের ওই মনিববাড়িটি তার দু চক্ষের বিষ। মনে হয় ওরা নাকউঁচু, ওরা মনিষ্যিকে মনিষ্যিজ্ঞান করে না, তারক শ্রেণীদের মনে মনে 'ছোটলোক' ভাবে। বড়দাবাবু সেইখানে গিয়ে ভিড়েছে? এ যেন 'আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায় আমারি আঙিনা দিয়া'।

মনের খেদে তারক একটা বোকার মতো কথা বলে বসে, তা তুই বললি না, বড়খোকা, তুমি এখানে?

ওমা। শোনো কতা! আমি কোতায় আর তিনি কোতায়। আমি 'কে' আর তিনি 'কে'? আমি কোন সাহোসে তেনার সাতে কতা কইতে যাবো? আমার পরিচয়টা কী? অ্যাকোদা ওনাদের বাড়ির বাসনমাজুনি ছিলুম। আর অ্যাখোন আমার ছেলে ওনাদের বাড়ির রাঁদুনী। এই পরিচয়ের গৌরব নিয়ে আমি কতার বোটকখানা ঘরে গে বলবো, 'অ বড়খোকা, তুমি হেতা?' তুই একখান পাগল তারক। .....য্যাতোই ওরা বলুক 'সব মানুষ সমান। সবাইকে ওরা সমান করবে' ...হয় না রে বাপ। তা হয় না। পায়ে মাতায় কখনো সমান হয় না। বড়মানুষরা চেরকাল গরিবকে নীচু চোকে দেকবেই। নিহাৎ অ্যাখোন ভোটের ঝ্যালা হয়েচে, তাই বাবুরা গাঁয়ে-গঞ্জে এসে গরিবের পিঠ চাপড়ে 'আত্মোতা' ভাব দেকায়। দেকে দেকে সব বুজে ফেলেচি রে তারক। ...এই যে আমাদের জাগ্রতো মা ঘোড়াই চণ্ডীর কতাটি অ্যাখোন গিন্নীর কানে তুললুম ক্যানো? জানি অ্যাখোন 'মানসিক' করবার তালে কানে নেবে। আগে হলে নিতো? ...অ্যাখোন আমার কতো খাতির, পয়সার অভাবে অসুবিদেয় পড়বে তারকের মা, সঙ্গে কিচু থাকা ভালো। রাকো। হি হি হি।

তারকের কানে মায়ের এসব কথা ঢুকছে না। তারক বলে, ওখানে বড়দাবাবু কী করে দেখেছিস?

করবে আবার কী? আরো কতোজনার সাতে তো। কী সব কাগজপত্তর নে বাবুর সাতে কতাবাত্রা হিসেব-নিকেশ, বোধায় জনে জনেকে কাজের ভার দেয়। চা খাবার দিতে গে যা এক-আদটু শুনি। তো বড়দা আমায় দেকেও অচেনার ভান করলো, না দেকেই না তা বুজতে পারলুনি।

তারক আর কোনো কথা বলে না।

তারকের মনের মধ্যে যেন হঠাৎ একটা ছুঁচ ফুটে বসে থাকে। ওই অহঙ্কারী লোকটার সঙ্গে বড়দার আঁতাত?

কিন্তু হলে কি হবে! ওই অহঙ্কারী লোকটার বাড়িতে কাজ করে বলে এবার গ্রামেও তারকের মার খাতির বেশী। বড়জা বলে, বলিস কী? তোর মনিব ভোটে নেবেচে? তাহলে তো জিতলে তোর কপালে অনেক বখশিস জুটবে।

তারকের মা অবশ্য দেশে কোনোদিনই ফাঁস করে না সে মনিববাড়িতে কী কাজ করে। আগে যখন পাঁচ বাড়ি বাসন মেজে বেড়াতো, তখন কদাচ দেশে এলে বলতো, 'নোকেদের বাচ্চা দেকাশোনার কাজ করি।' ...এখন বলে, 'এক বড়মানুষের গিন্নীর কাচে সব্বোদা থেকে তেনার দ্যাকাশোনা করতে হয়।'

রুগ্ন বুঝি?

না না। সাতটা বাঘে খেতে পারে না অ্যামোন গতর। তবে সব্বোদা হাতের কাচে অ্যাকটা লোক মোতায়েন থাকবে, এটাই হচ্চে বড়মানষি। তবে মাজে মদ্যে চা-টা করতে হয় অবিশ্যি!

এইভাবেই দেশে ঘরে মান রাখা।

তা এ কী আর একা তারকের মারই স্বভাব?

ভাসুর বলে, তারক এয়েচে, ও যদি তার বাপের জমিজমার ভাগটুকু ভেন্ন করে নিতে চায় নিক। আমিও দায়িত্ব থেকে রেহাই পাই।

তারক হাঁ হাঁ করে ওঠে, কী যে বলো জ্যাটা? আমি চাষ-আবাদের কী বুঝি? তুমি এযাবৎ আগলে রেখেছো, তাই আছে। ও তুমিই দেখোশুনো। আমার কী আর এখানে পড়ে থাকলে চলবে?

অবিশ্যি চলবেই বা কী করে? তারকও এক 'বড়মানুষের' বাড়ির 'ম্যানেজার' নয়? তারক ব্যতীত তাদের সব অচল নয়?

তারকের জ্যাটা ভাইপোর এই মহানুভব কথায় পুলকিত হলেও, সে পুলক গোপন করে হতাশ গলায় বলে, আমি আর ক'দিন বাপ? এরপর চক্ষু বুজলেই তো সব ছত্তরখান, আমার তো আর ছেলে নাই। থাকার মদ্যে দুটো মেয়ে। তো তারা তো পরের ঘরে। জামাই ব্যাটারা উঁকিও মারে না। তুই দেশে এসে বসলে আমার প্রাণটা ঠাণ্ডা হয়।

নিরক্ষর বলে যে 'মুখ্যু' তা তো নয়? আর অক্ষরের মালা সাজিয়ে সাজিয়ে কথার কারবারেও কম যায় না এরা। তারকের মা-ই কী কম? গাঁয়ের নিরক্ষর চাষীবাসী জনও শহুরে বিদ্বানদের এক হাটে বেচে, আর এক হাটে কিনতে পারে।

ছেলের কাঠকবুল কথায় তারকের মা বড় হতাশ হয়।

রাতে শুয়ে ছেলের গায়ে একটা হাত ঠেকিয়ে বলে, তারকরে দেশে ঘরে থাকবিনে, সোন্সারী হবিনে, তোর মায়ের তালে জেবনে কোনোদিন মানষের পরিচয়টা আর জুটবেনি? পরঘরি পরদোরি রাঁদুনী বাসনমাজুনির পরিচয়টা নিয়েই পিথিমি থেকে বিদেয় নিতে হবে?

অন্ধকার মেটে দেওয়াল চালাঘরখানার মধ্যে একটা গাঢ় গভীর হতাশার স্বর ছড়িয়ে পড়ে।

পরিচয়।

এইটাই বোধহয় মানুষের জীবনের প্রধান প্রার্থনা! এবং জীবজগতের সঙ্গে মূল প্রভেদ এইখানেই। জীবজগতে কেউ 'পরিচয়' নিয়ে স্বপ্ন দেখে না। মানুষের ওটাই আসল স্বপ্ন। তাই মানুষ তার বংশধারার মধ্যে 'পরিচয়ের' টিকিট সেঁটে রাখতে চায়। চায় তার 'আমি'টাকে প্রতিষ্ঠা করতে। তাই

জীবজগতে প্রাণপাত করে শুধু প্রাণটা রক্ষা করতে পারাটাই তার শেষ কথা নয়, তার সঙ্গে চাই 'মান'টা রক্ষা করার আপ্রাণ প্রয়াস। তা সে যেমন ক্ষেত্রেই থাকুক। ...'মান'টাই তো পরিচয়ের বাহক।

কিন্তু এই বৃহৎ পৃথিবীতে কতোজনারই বা সে চেষ্টা সফল হয়! পৃথিবীর অধিকাংশই তো নামহীন পরিচয়হীনতার অতল অন্ধকারে তলিয়ে থাকে। সেই তলিয়ে থাকার মধ্যেই চলে জন্মমৃত্যুর অনাহত লীলা। ...হয়তো—সেই লীলার অন্তরালেই চলে শত শত স্বপ্নেরও জন্ম আর মৃত্যু।

কিন্তু তেমনভাবে স্বপ্ন দেখবার ক্ষমতাই কী সকলের থাকে?

কে জানে!

ওই পরিচয়হীনেদের হৃদয়ের দরজায় কে কান পাততে যাচ্ছে?

পৃথিবী শক্তিমানেদের।

বসুন্ধরা বীরভোগ্যা।

ওই অন্ধকারের অতলে তলিয়ে থাকা পরিচয়হীনেরা সেই বসুন্ধরাকে 'ভোগ্য'র যোগ্য করে রাখে তাদের শ্রম দিয়ে শক্তি দিয়ে। যেমন পৃথিবীর মাটি শক্ত রাখে আভিজাত্যহীন নামহীন তৃণদলেরা।

তোর হাতে ও কীরে জিতু? নেমন্তন্নপত্তর? কিসেব নেমন্তন্নপত্তর? অ্যাঁ, কী বললি? গৃহপ্রবেশের? ধ্যাৎ। কাদের গৃহ? কে প্রবেশ করবে?

রিঙ্কু দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভাইকে ডেকে ঘর এনে বসাবার আগেই কৌতূহলে ছটফট। কারণ দরজাটা সে নিজেই খুলে দিয়েছে, কাজের মেয়েটা বাড়ি নেই। খুলেই দেখে ভাইয়ের হাতে একখানি বড়সড় সুদৃশ্য রঙিন খাম। অতএব তৎক্ষণাৎ জেরা।

যুধাজিৎ বললো, আপাতত এখন আমি তোর এই গৃহটিতে প্রবেশ করতে চাই দিদি। পরে বিশদ জানাচ্ছি।

দিদি দরজা ছেড়ে সরে আসতে আসতে বলে, কই দেখি চিঠিটা।

হচ্ছে বাবা হচ্ছে। জামাইবাবু বাড়ি নেই? একেবারে একসঙ্গে দু'জনার করকমলে অর্পণ করতাম।

দিদি শুভশ্রী ডাকনাম 'রিঙ্কু'তেই যে পরিচিত, সে একগাল হেসে বলে, তাই বলো। বিয়ের চিঠি। তা নয়, উল্টোপাল্টা বলে ধোঁকা দেওয়া। আয়, বোস। খুব ছেলে বাবা। তলে তলে এই কাণ্ডটি করে—কেন বাবা, আগে জানালে তোর বিয়েতে ভাঙচি দিতে যেতাম? না কী কনেটাকে আগে একবার দেখালে কেড়ে নিতাম? দিদির বাড়ির ছায়া মাড়াতেই তো ভুলে গেছিস। দে দেখি কোথায় কার সঙ্গে লটকে গেছিস। ন্যায্য বিয়ে হলে মা কী আর আমাকে না জানিয়ে থাকতো?

দিদিরে। এখনো তুই সেই ছেলেবেলার মতো কল্পনাশ্রয়ী আছিস। সেই যে ছেলেবেলায় ঘরকন্না খেলা করতিস, মিথ্যে রান্নাবান্না মিথ্যে দাসদাসী অদৃশ্য সব আসবাবপত্র অথচ গিন্নীগিরির হাঁকডাক ষোলো আনা।

তার মানে?

মানে, হঠাৎ এই নিরামিষ চিঠিখানা দেখে তুই এই হতভাগা জিতেটাকে একেবারে টোপর পরিয়ে বসছিস। এই নে দ্যাখ।

প্রায় ছোঁ মেরেই চিঠিটা নিয়ে নেয় রিঙ্কু। আর তাতে চোখ বুলিয়েই হতভম্বভাবে বলে, মা বাড়ি বানিয়েছে, গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন করে পাঠিয়েছে।

আর বাবা, বাড়িটা কী আর মা বানিয়েছে? তবে বানানো যখন হয়েছে একখানা, তার মালিক তো অবশ্যই মা। এই বনছায়া সরকার! অতএব তিনিই গৃহপ্রবেশ অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করার

অধিকারিণী।

রিঙ্কুর হাসি হাসি মুখটা আস্তে আস্তে কঠিন হয়ে আসে, ছায়াচ্ছন্ন হয়ে যায়। তলে তলে এতোদূর করেছে মা, অথচ রিঙ্কুকে বিন্দুবিসর্গ জানায়নি।... আস্ত একটা বাড়ি নিশ্চয় রাতারাতি হয়ে ওঠে না। অনেকদিন ধরেই চলেছে ব্যাপার। এখনো রিঙ্কু মনে মনে সেই কথাটাই বলে, কেন, একটু জানালে কী আমি কেড়ে নিতাম? ছোটছেলেটিই মায়ের আপন আর কেউ না। 'দাদা' না হয় সতীনপো, আমি তো আর সতীন-ঝি নয়?

চিঠিখানায় আবার চোখ বুলোয় রিঙ্কু, বলে, দমদমের কাছে? হঠাৎ ওখানে বাড়ি বানাবার শখ হলো যে মার? তো টাকাকড়ি তাহলে হাতে ছিল?

যুধাজিৎ এখন শান্ত গলায় বলে, ভুল করছিস দিদি। বাড়ির ব্যাপারে মাও তোরই মতন আকাশ থেকে পড়েছিল। মার হাতে টাকা ছিল? কী বলছিস তুই? কেন তোর কী কোনো কিছুই অজানা? বাবার বাড়ি বিক্রীর টাকাটাকে কীভাবে ভাগ-টাগ করা হয়েছিল মনে নেই? মা বেচারী এই এতোদিন যাবৎ একখানা ঘরে গুদামজাত হয়ে পড়ে থেকে রাতদিন দুঃখে ভেসেছে, তার ছেলে বৌ মেয়ে জামাই নাতিনাতনী কাউকে কাছে আনতে পায় না বলে। দেখে দেখে মরীয়া হয়েই একটা বাড়ি করে ফেলা গেল। এইবার যদি মার আক্ষেপ ঘোচে।

রিঙ্কু যে ভাইয়ের এই কথাটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করলো, এমন মনে হয় না। ভাবলো, জিতু এমন কী তালেবর হয়ে উঠেছে যে একখানা বাড়ি বানিয়ে ফেলতে পারলো? ফ্ল্যাট নয়। দেখা যাচ্ছে বাড়িই। কোথায় পেল এতো? নিশ্চয় কোথাও আলাদা করে রাখা টাকা মা এখন বার করে ছোটছেলের জন্যে বাড়ি বানাতে দিয়েছে। তা বাড়ি বেচার টাকা না হলেও অন্য টাকা থাকতে পারে। চিরদিন তো বাবা আমাদের মা-টিকে ইষ্টদেবী হেন পূজ্যি করে এসেছেন। হয়তো যখন তখন সে মন্দিরে পুজো চড়িয়েছেন। সে সব টাকায় হাত পড়েনি।

তবু বলে উঠলো রিঙ্কু, তুই তাহলে এখন মোটা রোজগার করছিস?

আরে দূর। মোটা গ্যাঁটা কিছু নয়, তবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি কিছু! এ দুনিয়ায় টাকা ছাড়া আর কোনো 'উপাস্য' নেই।

হুঁ। ছিলি তো আলাভোলা, গানপাগলা হঠাৎ এমন টাকা চিনতে শিখলি কবে থেকে?

যুধাজিৎ একটু হেসে বলে, যবে থেকে 'মানুষ'কে চিনতে পারতে শিখলাম।

ওঃ।

রিঙ্কু একটু ঢোক গিললো। যুধাজিতের ওই কথাটা তার গায়ে পেতে নেবার কথা নয়, তবু মনে মনে সেটা নিয়ে বসলো। এবং ভাবলো জিতু ইচ্ছে করে তাকে ঠেস দিয়ে কথা বললো।

অদ্ভুত একটা মনোভঙ্গী রিঙ্কুর। মাকে ও চিরদিন যেন প্রতিপক্ষ ভাবে। যদিও বললো, আমি তো আর 'সতীন-ঝি' নই! তবু তার নিজের মানসিকতাটি অনেকটা তার কাছঘেঁষা। ছোট থেকে দাদা আর কাকার কাছাকাছি বেশী থাকার দরুন অবিরতই মা সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য শুনে শুনেই হয়তো মনের মধ্যে বিরোধিতার বীজ রোপিত হয়েছে। ছেলেবেলা থেকে সর্বদাই তো কানে এসেছে, 'মা উড়নচণ্ডী, মার দিলদরিয়া নজর, মা অগোছালো, আর বাবাকে মা কেনা গোলাম বানিয়ে রেখেছে। মার কথায় বাবা ওঠে বসে।' ইত্যাদি ইত্যাদি। এ থেকে শুধু বিরোধী মানসিকতাই সৃষ্টি হয়েছিল তা নয়, যেন এক ধরনের ঈর্ষারও সৃষ্টি হয়েছিল। যেন বাবার ভালোবাসার সবটাই মা গ্রাস করে ফেলেছে।

অথচ বনছায়ার 'মেয়ে' বলে সাতখানা প্রাণ। তা 'বড়ছেলে' বলেও তো কম নয়। আসলে ভালোবাসাপ্রবণ হৃদয়। কিন্তু এমন হৃদয়কে সবাই বুঝতে পারে না। নিজের গর্ভজাত সন্তানও ভুল

বুঝে কোনো ক্ষেত্রে 'বাড়াবাড়ি' আদিখ্যেতো বলে ঠোঁট ওল্টায়, কখনো বা ভালোবাসাটার খাঁটিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হয়। এবং বহুক্ষেত্রেই ওই সন্দেহ নামক বিষধরটি ছোবল মারে। মা এই সামান্য কিছুদিনের মধ্যে একখানা বাড়ি বানিয়ে ফেললো, কেবলমাত্র তার ছোটছেলের ক্যাপাসিটিতে ? যে ছেলে এই সেদিনও বেকার হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এটা কী বিশ্বাসযোগ্য কথা ? মনের মধ্যে সন্দেহের কাঁটা 'ছিল কোথাও আলাদা করা' !

কিন্তু বাইরে ঠাটটা বজায় রাখতে হয়, বললে, কী রকম বাড়ি হলো ?

গেলেই 'তা দেখতে পাবি। আগে থেকে বলে পুরনো করে দেবো কেন ? তবে সত্যি বলতে, মার হারানো বাড়িখানার কিছু আদল রাখবার চেষ্টা করেছি। আর সেইজন্যেই সেই দমদমের কাছ পর্যন্ত পৌঁছানো। কোথাও জমি নেই।

রিঙ্কু আবারও চিঠিখানায় চোখ ফেলে, তা গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নর চিঠিরও তো বাহার কম নয়। বিয়ের চিঠির তুল্য।

তা হবে হিসেবে, তুল্যই দিদি। বিয়েও তো একটা নতুন খোঁয়াড়ে প্রবেশ। ভক্তি করে 'নবজীবনে প্রবেশ' বলে মান্য দেওয়া হয়।

খোঁয়াড়। চিরকাল তোর কথার ছিরি একইরকম রয়ে গেল।

ভদ্রলোকের তাই থাকে দিদি।

থাম। আমরা সব খোঁয়াড়ে বাস করছি ?

আহা, তুই কেন ? তুই তো ও শ্রেণীতে পড়িস না। সেটা বাস করছেন পূজনীয় জামাইবাবু।

অতো আর নয়। বলে রিঙ্কু আবার চিঠিটা নাড়াচড়া করতে করতে বলে, আরে বাড়ির নামটা কী রাখা হয়েছে ?

লেখাই তো রয়েছে।

রয়েছে বলেই দেখলাম। 'মনোরমা ভবন'। সেই পচা পুরনো অপয়া নামটা।

সর্বনাশ ! ছি ছি, বলছিস কী ? 'পচা পুরনো অপয়া !' ' নামটা আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় স্বর্গবাসিনী পিতামহীর না।

রিঙ্কু এতে দমে না। বলে, 'পিতামহীর' মানেই তো পচা পুরনো। আর 'অপয়া', সেটা কী তুই অস্বীকার করবি ? যে বাড়ি বিক্রী হয়ে যায়, তাকে অপয়া বলা হবে না তো কী খুব পয়মন্ত বলা হবে ?

যুধাজিৎ গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, 'বিক্রী' হয়ে যায় কথাটার কোনো অর্থ হয় না দিদি। যাকগে সে কথা। আমাদের মাতৃদেবীর কাছে যে ওই 'শাশুড়ী' ঠাকুরানীর নামটি পরম পুণ্যময় বলে মনে হয়। অগত্যা তিনিই আবার নতুন বাড়ির মাথায় বাসা বাঁধুন। তিনতলার মাথার কাছে একেবারে গাঁথনি করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে তেনার নামটি।

তিনতলা বাড়ি হয়েছে ?

রিঙ্কু আর একবার চমকায়। মনে করছিল যা হোক একটু বাড়ি হয়েছে।

যুধাজিৎ বললো, ওই তো বললাম, মার হারানো বাড়িখানার ধাঁচে করতে চেয়েছি—তো দিদি ! এইসব আলতু-ফালতু কথায় আমার চায়ের ব্যাপারটা হাপিস করে ফেলতে চাইছিস না কী ? তোর মতিগতি তো ভালো ঠেকছে না। অন্যদিন হলে এতোক্ষণ ছোটভাইটার গলা ভেজাতে হৈচৈ করে চা বানাতে বসতিস।

কথাটা ভুল নয়। তবে আজকের ব্যাপারটা এই, প্রথম নম্বর, ওই আকস্মিক সংবাদের ধাক্কায় একটু অবশ হয়ে যাওয়া। দ্বিতীয়, কাজের মেয়েটার অনুপস্থিতি। ওদিকে রান্নাঘরে রান্নার গ্যাস

আজই জবাব দিয়ে বসেছে। পূর্ণিমা আজই 'একটু মাসির বাড়ি যাচ্ছি' বলে ছুটি নিয়ে যাওয়ায় খুবই রাগ হয়েছিল রিঙ্কুর, বলেও ফেলেছিল, আজ যাচ্ছিস ? গ্যাস নেই। যদি কেউ আসে-টাসে, জনতা জ্বেলে চা বানাতে হবে।

পূর্ণিমা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, মাসির কাছে কী আমি অনন্তকাল থাকবো ? ঘন্টা দুই বাদই তো ফিরে আসবো। এইটুকুর মধ্যে আবার কে এসে চা খেতে বসবে।

অথচ তাই এসে গেল।

রিঙ্কু ঘড়িটা দেখে মনে মনে হিসেব করলো, দু'ঘন্টা হতে আর কতোটুকু ? যদি টাইমমাফিক আসে আর মিনিট দশেক পরেই এসে যাবে। কিন্তু ওর ওই ভাবনাচিন্তার মধ্যে যুধাজিৎ আবার বলে ওঠে, না কী ঠিক করেছিস সেই জামাইবাবু ফিরলে তবে তার অনারে চাপানো চা থেকে হতভাগাটাকে একটু দিবি ? এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে।

বড্ড ফাজিল হয়েছিস জিতু। তো জামাইবাবু আসা পর্যন্ত থাকছিস না কী ?

থাকতেই হবে। মাদারের তো চিরকালীন ধারণা এই ব্যাটা জিতে সমাজ সামাজিকতা জানে না, সৌজন্যবোধ নেই, তাই বলে দিয়েছে 'চিঠিখানা' দিদির কাছে ফেলে দিয়েই চলে আসবি না। জামাইবাবুর সঙ্গে দেখা করে ভালো করে গুছিয়ে বলে আসবি। ছেলেমেয়েদের নিয়ে সবাই যাবে, আর 'তিন রাত্তির থাকা' না কী সেটাও করবে।

তিন রাত্তির থাকা ?

মা তো বললো ওটাই নিয়ম। দাদাকেও তাই বলে পাঠানো হয়েছে।...

দাদাও আসছে ?

কী আশ্চর্য। বনছায়া দেবীর বাড়ি হলো, আর তাঁর আসল প্রাণের পুতুলরা আসবে না ?

ওঃ। আমরাই আসল প্রাণের পুতুল আর ছোট পুত্তুরটি ?

তার সঙ্গে তো সদাই লড়ালড়ি আড়াআড়ি। তো সে যাক। সয়ে গেছে। তবে ভেবে কিন্তু বেজায় ভালো লাগছে দিদি। অনেকদিন পরে আবার সবাই মিলে একসঙ্গে হয়ে 'নরক গুলজার' করা যাবে।...

হঠাৎ টেলিফোনটা বেজে ওঠে।

রিঙ্কু ধরে। এবং তীক্ষ্ণ গলায় বলে ওঠে, চমৎকার। আজই তোমার অফিসে বিশেষ কাজ পড়ে গেল ? আসতে দেরি হবে ?...আজ নতুন কী হলো ? এই তো জিতু এসে বসে আছে নেমন্তন্নপত্তর নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবে বলে।...নাঃ। বিয়েটিয়ে নয়। অন্য ব্যাপার। এসে শুনো। তাহলে এখন আর ফিরছো না ?...আচ্ছা দাঁড়াও একটু ধরো। জিতু তোমার সঙ্গে কথা বলবে ! এই জিতু, আয়, ধর। তোর সামাজিকতাটিকতা যা করবার ফোনেই সেরে নে।

যুধাজিৎ লাফিয়ে ফোনের কাছে সরে আসে। রিসিভারটা চেপে ধরে বলে ওঠে, হ্যালো জামাইবাবু। জিতু বলছি—

॥ নয় ॥

টাইটা খুলতে খুলতেই অরিন্দম বলে উঠলো, 'ব্রাদার' বেশ চালু হয়ে গেছেন মনে হচ্ছে।

রিঙ্কু এতোক্ষণ কেমন গুম হয়ে বসেছিল। যুধাজিৎ যেন ওকে একটা থাপ্পড় বসিয়ে গেছে। ভাই বাড়ি করছে, বাড়ি হারিয়ে উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া মায়ের আবার বাস্তুভিটে হচ্ছে, এটা তো আহ্লাদেরই কথা।...কিন্তু অনাহ্লাদের কারণ মা, ভাই দুজনায় যেন রিঙ্কুকে বহিরাগতজনের কোঠায় ফেলে নেমন্তন্নে ডাকছে। এটা অবমাননার।

ভিতপুজো থেকে প্ল্যান বানানোটি পর্যন্ত সব-এর মধ্যেই তো রিঙ্কুর উপস্থিতির অধিকার থাকবার কথা। এটা কী হলো? বরের কাছে মুখ থাকলো, না মান থাকলো? থাকলো না। তাই রিঙ্কুকেই বরের শিবিরেই চলে যেতে হলো। তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলে উঠতে হলো, তাই দেখছি। হঠাৎ ছাপ্পর ফুঁড়ে একখানা বাড়ি নেমে এলো বাবুর হাতে। শুধু বাড়ি নয়, তার সঙ্গে গাড়িও।

অরিন্দমের প্রথম বাক্যটিতেই শ্লেষ ছিল। এখন আবার তাতে ঝাঁজ যুক্ত হলো। বললো, বোঝা যাচ্ছে 'বাঁ-হাতের' কারবারটি ভালোই চলছে।

ওর আবার ডান বাঁ কী?...রিঙ্কুর কণ্ঠেও ঝাঁজ। ও কী চাকরি করে? বলে বলো যে 'দু'হাতে লুঠছে'।

তা তাই মনে হলো। গলার স্বরই পাল্টে গেছে যেন, বাবুর ফোনেই বোঝা গেল দিব্যি চাম্‌শ গলা! উড়ছেন ভালোই।

আশ্চর্য! আজকেই তোমার অফিসে যতো কাজ পড়লো। তুমি থাকলে ঠিক ধরে ফেলতে কোন সূত্রে এমন রাতারাতি বড়লোক হয়ে উঠলো তোমার শালা।

অরিন্দম ধড়াচূড়া ছেড়ে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে গুছিয়ে বেতের সোফাটায় বসে পড়ে বললো, এর আবার সূত্র। এ যুগে এখন এ শহরের হাওয়ায় বাতাসে টাকা ওড়াউড়ি করছে, বাগিয়ে ধরে ফেলতে পারলেই হলো।

রিঙ্কু এখন আবার অন্য শিবিরে, অথবা নিজস্ব একক শিবিরে চলে এলো। বললো, তা এতোই যদি জানো তো, সেই ওড়াউড়ির দিকে তাক করছো না কেন? সেই মাসমাইনের ভরসাটিকেই আঁকড়ে বসে থেকে জাবর কেটে চলেছো কেন?

অরিন্দম বললো, এ হাড়ে আর কিছু হবে না। অফিসে যদি কোন পার্টি এক প্যাকেট সিগারেট উপহার দিতে আসে, রিফিউজ করতে হয়, বুঝলে?

রিঙ্কু তার বরের এই মহিমা ভালোই জানে। তবে রিঙ্কু একে 'মহত্ত্ব' বলে গণ্য করে না। বলে 'ভীরুতা'। 'কাপুরুষতা'। 'সাহসের অভাব'। তাই রেগে রেগে বলে উঠলো, তোমার আবার বেশী বেশী! এক প্যাকেট সিগারেট উপহার নেওয়াও কী ঘুষ খাওয়া।

অফিসশাস্ত্রে তাই বলে! কে বলতে পারে ওই সিগারেটের প্যাকেটটি 'জালপাতা যন্ত্র' কিনা। ওই থেকেই অফিসারদের অনেস্টির পরীক্ষা হয়ে থাকে কিনা। ও রিস্‌কের মধ্যে যেতে আছে?

রাতদিন মৌখিক ঝগড়া চালালেও—পতিপ্রেমে অন্ধ রিঙ্কু অর্থাৎ শুভশ্রী বলে উঠতে পারলো না, 'ও। তাহলে 'রিস্‌কের' ভয়েই তোমাদের 'অনেস্টি'? সত্যিকার সততাবোধে নয়।'.... বলতে পারতো, বলবার স্কোপ ছিল। কিন্তু অন্য সকলের ব্যাপারে শুভশ্রী যতোই কেননা চড়াৎ করে মুখের মতো জবাব দিয়ে বসতে পারে, বরের ব্যাপারে ততোটা নয়। বরের ব্যাপারে সত্যিই একটু অন্ধপ্রেম আছে তার! যা সচরাচর ঘরসংসারী মহিলাকুলের মধ্যে দেখা যায় না। বরের কাছে মা-ভাইয়ের সমালোচনাতেও তৎপর শুভশ্রী।

তবে এক্ষেত্রে 'যুগলমিলন' বা দু'জনার মধ্যে আঁতাতের আর একটি কার্যকারণ সম্পর্কও আছে। অরিন্দম ও তার নিজের পরিবার অর্থাৎ দাদা-বৌদি, ভাই-ভাইবৌদের সম্পর্কে আদৌ স্পর্শকাতর নয়। শুভশ্রী যখন তাদের কথা উঠলে, তাদেরকে কচুকাটা করে ছাড়ে, অরিন্দম গায়ে মাখে না। কখনো বা বলে, দুনিয়াটা দেখা যাও মিসেস! মাথা গরম করে নেয়, কৌতুকের চক্ষে!

তো এখনও সে তার শালার নৈতিক অধঃপতনের প্রমাণ পেয়েও তেমন ঘৃণা বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখলো না তাকে, বেশ মেজাজি কৌতুকের দৃষ্টিতেই দেখলো। অর্থাৎ আসলে সে ওই নীতি দুর্নীতি সম্পর্কে খুব বেশী সিরিয়াস নয়। যে যা করছে করুকগে। আমার কী? আমি বাবা কোনো রিস্‌ক-

টিক্‌স নিতে চাই না। গা বাঁচিয়ে চলে স্বস্তিতে থাকতে চাই। ব্যস।

অতএব চা খেতে খেতে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গলা খুলে গল্প শুরু করে দিল। এইবার তাহলে তোমরা মায়ের সঙ্গে মার্কেটিঙে বেরিয়ে পড়ো, নেমন্তন্ন যাবার পোশাক কিনতে। হুঁ-হুঁ বাবা, নতুন বাড়িতে নতুন পোশাক চাই। নইলে 'ছোটমামা' হয়তো ঢুকতেই দেবে না।

বিলটু আর মিলটু একযোগে বলে ওঠে, যাঃ।

জিগ্যেস কর তোদের মাকে! মা এখনি মনে মনে সকলের নতুন পোশাকের রং গড়ন কায়দাকরণ আর বাজেটের হিসেব কষতে বসে গেছে কিনা।

মেয়ে পল্লবিনী অপভ্রংশে পলি, ভাইদের থেকে বড়, বর্তমানে ক্লাস নাইনের ছাত্রী, বলে ওঠে, আচ্ছা বাপী, সবসময় তুমি মাকে এতো ঠাট্টা কারো কেন বলো তো?

বাপী দরাজ গলায় হেসে ওঠে, ঠাট্টার সম্পর্ক বলে।

বাঃ। মা'র সঙ্গে তোমার ঠাট্টার সম্পর্ক?

নয়? ভেবে দ্যাখ জগতের সেরা ঠাট্টার সম্পর্কটি কী? শালা, সম্বন্ধী, বড়কুটুম্ব, ব্রাদার-ইন-ল। আরো কতো আদরের নাম তার। তো তারই বোন তো? তবে?

শুভশ্রী নিজের চা-টা হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকে এসে বলে, কী নিয়ে এতো হাসাহাসি?

অরিন্দম মেয়ের সঙ্গে চোখে চোখে ইশারায় নিরীহ ভাব ফুটিয়ে বলে, তেমন কিছু না। বলছিলাম তোদের ছোটমামার হঠাৎ একখানা লম্বা ল্যাজ গজিয়ে গেছে। হা হা হা!

দরাজ হাসি, তবু কোথায় যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে ঈষৎ ঈর্ষার হুল।

তা যুধাজিতের বন্ধুর মনের মধ্যেও কী তেমন একটু ঈর্ষা ঈর্ষা ভাব প্রচ্ছন্ন নেই? যখন করজোড়ে বিনীত আবেদনে শিলাদিত্যর বাড়িতে এসে তাদের 'বাড়িসুদ্ধ সকলকে' যুধাজিতের গরীবের কুঁড়েয় প্রথম প্রবেশের শরিক হবার জন্যে নেমন্তন্ন করতে এলো!

এই তো সেদিন, কদিনেরই বা কথা, লোকটা কেবল কতকগুলো রংচটা ছালওঠা ভাঙা ঝড়ঝড়ে গাড়ি নিয়ে কারবার চালাচ্ছিল। হঠাৎ এমন অবস্থা ফিরে গেল যে, নতুন পাড়ায় তিনতলা বাড়ি। এবং সে বাড়ির গৃহপ্রবেশ উৎসবে ঢালাও নেমন্তন্ন করে বেড়ানো!

বললো, কী হে! কী ব্যাপার! আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ-ট্রদীপ পেয়ে গেলে না কী?

যুধাজিৎ বললো, বাজে বকিস না। সে জিনিস পেলে কী আর মাটিতে পা দিয়ে হাঁটতাম? দেখতিস শূন্যে ভাসছি। তারপর বললো, মাসিমাকে কিন্তু নিজে বলে যেতে চাই। বাড়ির মধ্যে একটু প্রবেশাধিকার পেতে পারি?

শিলাদিত্য বললো, কথায় খুব চালু হয়েছিস দেখছি। আয়।

নীহারিকা ছেলেটিকে দেখে এবং তার বিনয় বচনে যথেষ্টই মুগ্ধ হলো। আর তারপর তার রাতারাতি সাফল্যের ইতিহাস শুনে ও আরো মোহিত। কিন্তু কী জ্বালা! পদবী কিনা সরকার! দুস!....নীহারিকা অবশ্য অত সব মানামানির ধার ধারে না কিন্তু মাথায় ওপর যে কর্তারের ঝাঁক! বরটি তো আছেনই, তাঁর মা-বাপটিকেও তো এসব ক্ষেত্রে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে যদি মেয়ে ভাব-ভালোবাসা করে বসে তো আলাদা কথা!

আচ্ছা, এই ছেলেটা শিলুকে খুঁজতে মাঝে মাঝে আসে না? সেরকম কিছু আঁচ কি মাঝে মধ্যে পাওয়া যায়? কি জানি। লক্ষ্য রাখতে হবে। এই তো যাচ্ছিই তো ওদের ওখানে, অবিশ্যিই টুসকিকে নিয়ে যেতে হবে; তখন ভাবভঙ্গি দেখতে হবে।

যুধাজিৎ বললো, আচ্ছা মাসিমা, শিলাদিত্যর দাদু-দিদা আছেন না?

নীহারিকা শঙ্কিত হয়। এই সেরেছে আবার তাঁদের কাছে গিয়েও নেমন্তন্ন জানাবে না কী? তাড়াতাড়ি বললো, হ্যাঁ, আছেন! তিনতলায় থাকেন! মানে খুব বুড়ো তো! সিঁড়ি ওঠানামা করতে পারেন না। ওখানেই ওনাদের সব ব্যবস্থা করা আছে।

খুব বুড়ো হয়ে গেছেন?

তা আর বলতে।

ওঃ। তাহলে আর—

এই সময় মেখলা ট্রের ওপর চা দিয়ে এলো। সঙ্গে এক প্লেট বড়া ভাজা।

নীহারিকা বললো, এ মা, এটা কী এনেছিস?

মেখলা বললো, তোমার রান্নাঘরে ঢুকে দেখলাম এইমাত্র একথালা ভেজে রেখে এসেছো। কিছু হাতিয়ে আনলাম। চায়ের সঙ্গে 'টা' হিসেবে।

মা মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখলো। যা আশা করছিলাম, তার পূর্বাভাস না কী? হঠাৎ এতো ফ্রী! তবু বলে উঠলো, আচ্ছা, এই বাজে জিনিসটা কী বলে নিয়ে এলি? স্রেফ্ ডালের বড়া।

ততক্ষণে যুধাজিৎ সেই বাজে জিনিসের দুটো মুখে ফেলে, আবেশের ভান করে বলে ওঠে, মাসিমা, আপনার রান্নাঘরে সর্বদা এরকম সব বাজে জিনিস মজুত থাকে? তাহলে হয়তো হঠাৎ হঠাৎ সেখানে বর্গির হাঙ্গামা ঘটতে পারে। আঃ, মার্ভেলাস! এই শিলাদিত্য, এইবেলা নিয়ে নে দুটো। এক্ষুনি প্লেট ফর্সা হয়ে যাবে।

শিলাদিত্য বললো, শুনলি তো 'একথালা' থেকে যৎসামান্য হাতানো হয়েছে।

ওঃ। তাহলে নির্ভয়ে সব কটি ফিনিশ করে ফেলতে পারি? টুসকি দেবী, আপনার হাতানো বিদ্যার জন্য ধন্যবাদ।

নীহারিকা একবার মেয়ের, একবার ছেলের আর একবার ছেলের বন্ধুর দিকে তাকায়। মনে মনে বলে, ব্যাপার তো অনেকখানি এগিয়েই গেছে বলে মনে হচ্ছে। কবে হলো?...আচ্ছা তবে কেন সেদিন টুনির ভাগ্নেটাকে দেখে মেয়ে অমন উথলোনো উথলোনো চোখে তাকাচ্ছিল। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। না কী, আসলে ভেতরে কিছুই না, বয়েসের কারসাজি! একটা এ বয়েসের ছেলে দেখলেই একটা উথলোনো ভাব আসে।....অবশ্য দেখতে শুনতে একটু ভালো হলেই। তা টুনির ভাগ্নের মতো রূপের কান্তি না হলেও, এ ছেলেটার চেহারাও ফ্যালনা হয়।....লম্বা ছাঁদ মুখচোখ তো কুঁদেকাটা, রংটাই যা একটু—তা বেটাছেলের আবার রং।

মনে মনে মুহূর্তেই বোম্বে মেল চলে।.....

আবার মনটা দমে যায়। যদি সত্যি তেমন কিছু হয়ও। সেটা হয়তো সমস্যাই ঘটাবে। আশ্চর্য। ছেলেটা ছাই সরকার হতে গেল কেন? ব্যানার্জি মুখার্জি চ্যাটার্জি, এসবের একটা হতে পারলো না!

আর একটু বাক্যব্যয় করে যুধাজিৎ উঠলো। যাবার সময় আবার বললো, মেসোমশাইও যেন নিশ্চয় যান। দাদু-দিদার তাহলে যাওয়া সম্ভব নয়?

শিলাদিত্য বললো, দূর। অসম্ভব। তা তুই এমনভাবে আকুলতা করছিস, যেন তোর বিয়ের ঘটার নেমন্তন্ন!

যুধাজিৎ হেসে উঠলো। বিয়ের ঘটা? বলির পাঁঠা কী নিজে নেমন্তন্ন করে বেড়ায়?.....আচ্ছা চলি। শিলাদিত্য, কোথাও বেরোবার আছে না কী? থাকে তো চলে আয়, আমার সঙ্গে।

শিলাদিত্য বললো, থাকলেও দু'জনের পথ এক নাও হতে পারে।

ওটা কোনো ব্যাপার নয়। যে কোনো পথকেই নিজের পথ করে নেওয়া যায়।

ত বটে, তেল যখন অফুরন্ত।

যুধাজিৎ হেসে উঠে বলে, নজর দিসনে ভাই, নজর দিসনে। বহুকষ্টে সবে একটু তৈলাক্ত হচ্ছি। আসলে কী জানিস ? চিত্ত তো সেই চিরদিনের মধ্যবিত্ত ! একা একখানা গাড়ি নিয়ে চলেছি, এটা যেন বড় গায়ে লাগে। মনে হয় অপচয়। বাজে খরচ।

বুঝলাম। তাহলে আর অস্বস্তির কিছু নেই। তুমি বরাবর ওইরকম 'মধ্যবিত্তই' থাকো মানিক। উঠে পড়ে গাড়িতে।

কদিন ধরে তোরজোড় চলে। মা এবং মেয়েতে।

কী ধরনের সাজ করে যাওয়া উচিত ! বিয়েবাড়ি নয়, খুব জমকালো কিছু মানাবে না, তাছাড়া সকালবেলার ব্যাপার। সাদামাঠার মধ্যে বেশ রুচিসম্পন্ন কিছু পরা দরকার ! শাড়ি, গহনা সবকিছুই। মেয়ের সঙ্গে এক্ষেত্রে যেন সখীত্ব !

তবু নীহারিকা মাঝে মাঝেই মেয়ের দিকে তাকায় আর ভাবে, লাটাইয়ের সুতো ছাড়া উচিত, না এখন থেকেই টাইট দেওয়া উচিত ! ও ছেলে পাত্র হিসেবে নীহারিকাদের কাছে যথেষ্ট, কিন্তু সেই জাতপাত। তিনতলার বুড়োবুড়ির কথা ধর্তব্য না করলেও, এই দোতলাতেই যে অকালবৃদ্ধটি রয়েছেন, তাঁর শরীরেও যে সেই পাবনার জমিদারবাড়িরই রক্ত। অকারণ 'অহমিকা'।

প্রথম দিন শুনেই আদিত্য বলে উঠেছিল, 'বাড়িসুদ্ধ সবাই যাবেন' বলেছে বলেই হ্যাংলার মতো সত্যি সবাইকে যেতে হবে ? মাথা খারাপ। যার বন্ধু সে যাক। ব্যস !

কী আশ্চর্য। অতো করে বলে গেল। তুমি না যাও আমি যাবো। 'মাসিমা মাসিমা' করে কীভাবে বললো যদি শুনতে।

'মাসিমা মাসিমা'। তবে আর কী, তুমি অমনি গলে গেলে। প্রেস্টিজ জ্ঞান বলে যদি কিছু থাকে ! ঠিক আছে, তুমিও যেও তাহলে ছেলের সঙ্গে নতুন গজানো বোনপোর বাড়ি।

ঠিক এইরকম ক্ষেত্রে ঝগড়া বিদ্রোহের ক্ষমতা আসে না। এখানে নিজের দিকের বাটখারাটা নেহাৎই হালকা। তাই নীহারিকা মেয়ের নাম মুখে না এনে বলে ওঠে, তোমারই বা গেলে কী হয় ? রবিবার পড়ছে তো।

আমার ? আমি যাবো ? মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেল না কী ? বাজে বোকো না।

এই মহামুহূর্তে নীহারিকা কিছুতেই আর টুসকির কথা তুলতে সাহস পায় না। ভাবে, দেখা যাক কীভাবে ম্যানেজ করা যায়। আসলে বেশীর ভাগ সময়ই তো লোকটাকে 'থো' করে নীহারিকা জিতে যায়। কিন্তু এক একটা জায়গায় যেন তার অস্ত্রশস্ত্র হারিয়ে যায়। সেটা যায়, যখন লোকটার মধ্যে সেই পাবনার জমিদারবংশের রক্তধারার প্রবাহধ্বনি শুনতে পায় নীহারিকা।

কিন্তু শুধু নিজে ছেলের সঙ্গে যাবো কোন মুখে ? টুসকিটাকেই যদি সঙ্গে না নিতে পারলাম। ভাবতে থাকে। এক কাজ করলে হয়, শিলাদিত্যকে দিয়ে যদি বাপের কাছে আর্জি করানো যায়। যদি বলানো যায় সবাই না গেলে বড্ড বেশী আহত হবে। এমন কী 'দাদু-দিদা'র পর্যন্ত খোঁজ করেছে ! নিদেনপক্ষে টুসকিটাও চলুক মা'র সঙ্গে।

শুনে শিলাদিত্য বললো, সেরেছে। আমায় বাঘের খাঁচার মধ্যে ভরে দিতে চাও ?

আহা ! বড় তো ভয় করিস !

সেটা তুমিও করো না জননী। কিন্তু এক এক জায়গায়—ও বাবা ! যেখানে তুমি পশ্চাদপসরণ করছো, সেখানে আমি ? অভিযানে বোঝাই যাচ্ছে টুসকি বাদ।

মা বিমনাভাবে বলে, মেয়েটা কদিন ধরে আহ্লাদ করছে। বলছে, 'গৃহপ্রবেশের' উৎসবটা যে কী জিনিস, দেখিনি বাবা কখনো। বেশ দেখা হবে।

এর বেশী আর কী বলা যায়?

যেটা বলা হলো না, সেটা অবশ্য বুঝে ফেলে ছেলে। বলে, বুঝলাম তো—কিন্তু—

কিন্তু ভাগ্যবানের বোঝা বোধহয় এ যাত্রা ভগবানই বইলেন!

একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটলো। ঠিক সামনের ওই রবিবারটায় আদিত্যরও হঠাৎ একটা নেমন্তন্ন জুটে গেল। অফিসের এক সহকর্মীর ছেলের পৈতে, যেতেই হবে। ভদ্রলোক অফিসসুদ্ধ সক্কলকে ডেকেছেন এবং যাতায়াতের সুবিধার জন্য একখানা প্রাইভেট বাসকে ভাড়া করে মজুত রাখছেন।.....

পরপর তিন মেয়ের কোলে এই ছেলে। তাই তার পৈতেয় রীতিমতো সমারোহর ব্যবস্থা।

যেতে হবে কোথায়? না চন্দননগরে। তার মানে সারাদিনের মতো।

অতএব বাড়ির কর্তা আর টের পাচ্ছেননা, সংসার সদস্যদের মধ্যে কে কে ওই গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নয় গেল। এরাই তো আগে ফিরবে। আদিত্য অবশ্যই পরে।

মনের মধ্যে হাঁফফেলা ভাব। তবু নীহারিকা কথা বাড়িয়ে ব্যাপারটা আরো সহজ করতে চেষ্টা করে। বলে, সব্বাইয়েরই কোনো না কোনো কারণে বাড়িতে সমারোহর আয়োজন হয়। এই একটি বাড়িতেই শুধু তার ব্যতিক্রম।

আদিত্য বলে, ছেলেদের পৈতে দেবার অধিকার থাকলে পাবনার সত্যব্রত গাঙ্গুলী কি সে ব্যবস্থা না করে ছাড়তেন? এখন ছেলেমেয়ের বিয়ে ছাড়া—

হুঁ, বিয়ে। প্রথম নম্বরেরটিই তো চোখে সর্ষেফুল দেখাচ্ছেন। দু নম্বরেরটি তো এখনো পড়ুয়া। আর মেয়ের বিয়ে। সে কবে হবে তা জানি না। মেয়েকে খাঁচায় পুরে রাখবার ইচ্ছেটি ছাড়া আর কোনো ইচ্ছে তো দেখি না।

আদিত্য ব্যঙ্গের গলায় বলে, তোমার মেয়ে খাঁচায় পোরা আছে? বাঃ! বেড়ে!

নেই সে তুমি সেভাবে পোরে ওঠোনি বলে। তবে আজকালকার মেয়েরা যে কী করে বেড়ায় আর না বেড়ায় তা তোমার ধারণাও নেই।

আদিত্য আর কথা বাড়ায় না। উঠে যায়। শুধু বলে যায়, তোমার তো আছে, তাতেই তোমার মেয়ের কাজ চলে যাবে।

আশ্চর্য। এ সংসারে প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের প্রতিপক্ষ। কিন্তু তিনতলার বাসিন্দা ওই বড়োকর্তারা? গোছানো কথায় বলতে গেলে বলা যায়, যেন 'একে অপরের পরিপূরক'। কিসে কী হয়!

যাক, এখনকার মতো যবনিকা।

অতঃপর সেই 'সামনের রবিবার' দিন আদিত্য সকালবেলাই বেরিয়ে পড়ে। কারণ বেলা আটটার সময়, বন্ধুর সেই ভাড়াচরা বাসটি অফিসের সামনে অপেক্ষা করবে। ওখান থেকেই সবাই একযোগে যাত্রা।

আদিত্য বেরিয়ে যেতেই নীহারিকা ছেলের দিকে তাকিয়ে একটু বিজয়গৌরবের হাসি হেসে বলে, শিলু, দেখলি?

কী দেখলাম?

যা দেখলি, তা আর বলে বোঝাতে হবে কেন? চোখেই তো তা দেখলি। এ হচ্ছে আমার ইচ্ছাশক্তির জোর, বুঝলে বাপ! ভাগ্যক্রমে এই সময় 'বড়দাবাবু মেদিনীপুরে গ্যাছে' বলে নিজে কদিন ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, তাই নিশ্চিন্দি। নইলে—ওটা যা ধুরন্ধর। ওর চোখে ধুলো দেওয়া খুব শক্ত। 'তিনতলা ওস্তাদের' তবু যা হোক কিছু করে বোঝানো যায়।

শ্বশুর-শাশুড়ী সম্পর্কে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে তিনতলা ওলারাই বলে। বরের সামনে সামলে চলে।

শিলাদিত্য বললো, দাদা মেদিনীপুরে গেছে কবে?

এই তো পরশু।

আশ্চর্য! বাড়ির মধ্যে থেকে জানতেই পারি না।

ও কী আর 'বাড়ির ছেলে' থাকছে রে? ক্রমেই পার্টির ছেলে হয়ে যাচ্ছে। আমার কপাল! তা এ দুঃখু আর বুঝছে কে?

বলে তিনতলায় উঠে যায়।

নয়নতারা বার্তাবৃত্তান্ত শুনে বলনে, ত খোকা তো ঠিকই কইছে। বয়েসের মেয়্যা। অনাত্মীয় বাড়ি যাওনে কাম কী?.....অরে আমাগোর এখেনে থুয়ে যাও। অ্যাখোন তো অর দাদুর কানের তালাচাবি খুলে গ্যাছে। কানে কলকব্জা বসেছে। দাদা-নাতনীতে গপ্পো আড্ডা হবে।

নীহারিকা 'ইনোসেন্ট' গলায় বলে, আমিও তো তাই ভেবে রেখেছিলুম, তো মেয়ে যে এদিকে নাকি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছে কলেজের কোন বন্ধুর বাড়ি গিয়ে একসঙ্গে পড়াশুনো করবে। সামনে পরীক্ষা আসছে তো?

অ মা। তাই বুঝি? ত সে বন্দুর বাড়ি কনে? দূর না কী?

না না। কাছেই। আমরা যাবার সময় নামিয়ে দিয়ে চলে যাবো, ফেরার সময় নিয়ে আসবো। পথেই পড়বে।

অ! ত মেয়ের খাওন-দাওন? কাজলরে কয়ে দ্যাও যেন দ্যাখভাল করে খাওয়ায়।

মাকড়সা আপন লালা থেকে সুতো ছাড়ে, আর ছাড়তে ছাড়তে জাল রচনা করে চলে।

তক্ষণে অনেকখানি সুতো তৈরী হয়ে গেছে। সেও আবার এক ফ্যাচাং। বন্ধু নাকি খুব করে বলে রেখেছে, দু'জনে একসঙ্গে খাবে। নেমন্তন্ন বলে কিছু না, নিজেরা যা ডালভাত খাবে তাই।...তো যাক। আপনারা কিন্তু ঠিক সময় খেয়ে নেবেন। তারকটা তো নেই। কাজলকে বলে যাচ্ছি ভালো করে।

সত্যব্রত এসে দাঁড়ান, বলেন, তাহলে দেখছি বৌমা তোমাদের তিন যাত্রায় তিন ব্যবস্থা। আদিত্যর উপনয়নের নেমন্তন্ন, তোমার আর শিলুর গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্ন, আর তোমার মেয়ের পড়াশুনো করবার নেমন্তন্ন। তো আমাদের নেমন্তন্নটা তাহলে কাজলের কাছে? হাসেন একটু।

কথা শুনতে পাওয়ার উপায় হওয়া পর্যন্ত সত্যব্রত একটু ফ্রী হয়ে সকলের সঙ্গে কথা বলতে এগিয়ে আসেন।

নীহারিকা বলে, খুব ইচ্ছে ছিল, আপনাদের জন্যে নিজে হাতে একটু রেঁধে রেখে যাবো। কিন্তু এমন তাড়াহুড়ো হয়ে গেল!

কিসের 'তাড়াহুড়ো' সে প্রশ্ন আর কে করছে? করে না বলেই হয়তো এরকম অনর্গল কথা বানাতে পারে নীহারিকা।.....টুসকি বলে, 'কথাশিল্পী'। বলে তুমি যে কেন লেখিকা হলে না মা? দেদার গল্প উপন্যাস লিখে ফেলতে পারতে।

মা বলে, তোদের এই সংসারে এসে আমার যে সবই হলো! গানের গলাও তো ছিল। কিছু না। স্রেফ গোয়ালে বসে জাবর কাটা।

নীহারিকার কথা মানেই অভিযোগ।

তো আপাতত, সে আজ আপন ইচ্ছাশক্তির মহিমায় ডগমগ করতে করতেই সাজাগোজা করে নেয়। যে গল্পটি শাশুড়ীকে বলে এলো, কাজলকেও সেইটিই বলে। দিদি বন্ধুর বাড়ি থাকবে, ওখানেই

যাবে।

কাজল বললো, তো বন্ধুর জন্মোদিন বুঝি? তাই এতো সাজ?

নীহারিকা তৎক্ষণাৎ তার শিল্পকর্মটি ফলায়। বলে, বাব্বাঃ। ধরতেও বা পারিস। তবে বন্ধুর জন্মদিন নয়, সেটা বলে বসলে ভবিষ্যতে আবার কোনদিন কী হিসেবের গোলমাল হয়ে যায়। হয়তো বলে বসবে, 'ওমা এই যে সেদিনকে বন্ধুর জন্মোদিন হলো।' অবশ্য 'বন্ধু' টুসকির যে মাত্র একটা তা নয়। তবু সাবধানের মার নেই। তাই বলে, বন্ধুর বোনের জন্মদিন। অনেকে আসবে-টাসবে।

সাজগোজ? সাজগোজের এখন আছে কী? গহনাবর্জিত জগৎ।

ওদের যাত্রাকালে নয়নতারা নেমে এসে বলেন, অ বৌমা, যজ্ঞিবাড়ি যাচ্ছো ত গায়ে তেমন গহনা নাই ক্যান? তোলা গহনা তো দু-অ্যাক খানও পরবে?

সে খেদ যে নীহারিকারও নেই তা নয়। তাই চির প্রতিপক্ষ শাশুড়ীর কাছেই আক্ষেপ জানিয়ে বসে, পরা যাবে আর কী করে? সবই তো ব্যাঙ্কের ভল্টে রাখা আছে। আজ আবার রবিবার, ব্যাঙ্ক বন্ধ।

নয়নতারা বেজায় গলায় বলেন, এই অ্যাখোন এক ফেসান হয়েছে। গহনাগুলান ব্যাঙ্কে ভরে রেখে আসবে। ব্যাঙ্কে টাকাই রাখে লোকে, গহনা রাখা অগ্রে কখনো শুনি নাই।....যজ্ঞিবাড়ি যাবে ন্যাড়া-বুঁচা। আজ নয় রবিবার, দুদিন আগে এনে রাখতে হয় তো?

নীহারিকা তেতো গলায় বলে, সেকথা বলবেন আপনার ছেলেকে। সদাই ভয় বাড়িতে ডাকাত পড়বে। তাই একটুকরো সোনা ঘরে রাখার জো নেই। এই নেহাৎ গায়ে যেটুকু আছে—

নয়নতারা ক্ষুণ্ণস্বরে বলেন, পাবনার গাঙ্গুলীবাড়ির বৌ যজ্ঞিবাড়ি যাচ্ছে, ন্যাড়া-বুঁচা।

তা উপায় কী।

নয়নতারা নিজের যা কিছু সোনাদানা আনতে পেরেছিলেন তা দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন, বৌ-মুখ দেখেছিলেন। এখন তিনি মনে মনে ভাবেন, আহা, আমার সেই দশ-বারো ভরির শঙ্খমালা হারটা যদি থাকতো, বৌমারে কইতুম, বৌমা গলায় পরে নাও।

তা যাক. এ যুগে নকলেও কাজ চলে। আগের সেই উন্নাসিক যুগ আর নেই, যে 'গিল্টি', 'নকল', 'ঝুটো' ছিঃ বলে লোকে নাক কোঁচকাবে।

টুসকি একটা নকল মুক্তোর সেট পরলো। সরু একহালি একটা মালা, কানে দুটো ঝুমকো, আর অনামিকায় একটা মুক্তো বসানো আংটি। আংটির সোনাটা অবশ্যই 'গিল্টি' করা। তা দেখতে ভারী সুন্দর ছিমছাম।

অনেক আয়োজন অনেক উত্তেজনা, অনেক উৎকণ্ঠা, অনেক মিথ্যার জাল বোনাবুনি। তবু কী রোমাঞ্চ! টুসকির মনে হতে থাকে, যেন তার জীবনে কী এক পরম লগ্নের আভাস দেখা দিয়েছে।.... কে ভেবেছিল এই উচ্ছ্বাসের পরিসমাপ্তি এমন হবে!

প্রথম দিকটি তো শুরু হয়েছিল গানের সুরের মতো, কবিতার ছন্দের মতো। সেই যজ্ঞিবাড়ি থেকে গাড়ি এসে দরজায় দাঁড়িয়েছিল নিচেতে। আর সঙ্গে যুধাজিতের দুলাইন চিঠি— 'মাসিমা, নিজে যেতে পারলাম না, সেজন্য দুঃখিত। অনুগ্রহ করে এর সঙ্গে সকলে চলে আসবেন। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে।'

গাড়িটা অবশ্য যুধাজিতের নয়, এবং এ ব্যবস্থাটিও কেবলমাত্র 'মাসিমা স্পেশাল' নয়। অচেনা রাস্তা, আনকোরা নতুন পাড়া, ঠিকানারও 'মা-বাপ নেই', পাছে নিমন্ত্রিতদের শুধু ঠিকানা দেখে রাস্তা

চিনতে অসুবিধে হয়, তাই যুধাজিৎ গাড়ি-সারাইয়ের গ্যারাজ থেকে খানতিনেক গাড়িকে ভাড়া করে এইভাবে নিজে হাতে চিঠি দিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এ বাড়িতে দিয়েছে, দিয়েছে তার নিজের দিদির বাড়িতে এবং দাদার শ্বশুরবাড়িতে (তারা তো দুদিন আগে দুর্গাপুর থেকে এসে সেখানেই উঠে রয়েছে।).... তা ছাড়াও এক দূরসম্পর্কের পিসি এবং মাসিও আছে যুধাজিতের এবং আরো কেউ কেউ শহরের চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।....সকলের জন্যেই সুব্যবস্থা।

যুধাজিতের আপ্রাণ চেষ্টা মায়ের ইচ্ছাপূরণ। তার নিমন্ত্রণ তালিকায় মায়ের নিজস্ব সংযোজনও আছে বেশ কিছু।.....তা এসব নীহারিকার আন্দাজে নেই। তাই ভারী উৎফুল্ল, এই গাড়ি পাঠানোটা 'মাসিমা স্পেশাল' ভেবে। এবং তার সঙ্গে একটি অন্তর্নিহিত কার্য-কারণের যোগ কল্পনা করে।

গাড়িতে ওঠার আগে ছেলের দিকে তাকিয়ে আস্তে বলে নীহারিকা, সত্যিকার ভদ্রছেলে বটে একখানা। ভেবে দ্যাখ তো, তোর বাবার হুকুম মেনে যদি শুধু দুই যেতিস নেমন্তন্ন রক্ষে করতে! কেমন দেখাতো? ভাবা যায় না।

তা চলমান গাড়ির মধ্যে সেই ভাবা যায় নার রেশ তো চলছিল, গিয়ে বাড়ির সামনে নেমে পড়েও মনে হলো, বাবা! এ যে ভাবা যায় না!

বিয়েবাড়ির মতো করেই উৎসব বাড়ি সাজিয়েছে যুধাজিৎ। সামনে ডেকরেটারদের তৈরী বিচিত্র সুন্দর তোরণ, লাল শালুক ওপর সাদা ফুল দিয়ে লেখা 'সুস্বাগতম'।....তোরণের দুপাশে মঙ্গল কলস। ভিতরে ঢুকে সামনের চত্বরে আলপনা আঁকা।

বিভোর হয়ে এগোতে থাকে টুসকি।....বাড়ির গায়ে একধারে মস্ত প্যান্ডেল। তার মধ্য থেকে রান্নার সৌরভ ভেসে আসছে। আহারের আয়োজন বোধহয় সেখানেই।.... নতুন পাড়া, ধারেকাছে খোলা জমি পেয়েছে অনেকটা।

প্যান্ডেলের সামনে এখানে ওখানে খানকয়েক খানকয়েক করে চেয়ার পাতা, তাতে কিছু সুসজ্জিত নারী-পুরুষের সমাবেশ।

দরজার সামনে একটি মেয়ে সকলের গায়ে গোলাপজল 'স্প্রে' করছে আর একটা করে গোলাপের 'বোকে' হাতে ধরিয়ে দিচ্ছে। অবশ্য কোনোটাই নতুন নয়, অজানাও নয়। এমন দেখা আছে ঢের, তবে সেসব তো ঘটাপটার বিয়েবাড়িতে হতে দেখেছে টুসকি। এরকম অনুষ্ঠানেও এতো?

তবে সবই অপরিচিত মুখ। উৎসুক দৃষ্টি একটি পরিচিত মুখ খুঁজতে থাকে। কিন্তু চট করে পায় না। এগিয়ে আসে আর একটি অপরিচিত মুখ। তবু দেখেই মনে হয় যেন পরিচিত। যেন কোথায় দেখা, কোথায় দেখা।....

সাদা ধবধবে গরদের ব্লাউজ আর সাদা ধবধবে সরু ভোমরাপাড় দুধে গরদ পরা যে হালকা গড়নের শান্তশ্রীমণ্ডিত মহিলাটি কাছে এসে দাঁড়ালেন, দেখামাত্রই বুঝতে অসুবিধে হলো না তিনিই যুধাজিতের মা। মুখের ছাঁচে আদল আছে।

মহিলা শিলাদিত্যর দিকে এগিয়ে এসে বলে ওঠেন, খুব যদি ভুল না করে থাকি, তুমি নিশ্চয় শিলাদিত্য। আগে দেখেছি। সেই স্কুল-কলেজে পড়ার সময়। তাই না? আর ইনি নিশ্চয় মা আর বোন। ঠিক তো? কই তোমার বাবা এলেন না?

শিলাদিত্য নিচু হয়ে প্রণাম করে বলে, না। মুস্কিল হয়েছে বাবারও আবার আজ চন্দননগরে একটা নেমন্তন্নয় যেতে হয়েছে।

আঃ। বাবার এই ঘটনাটা তাদের বাঁচিয়ে দিয়েছে। নচেৎ তাকেও এখন মায়ের মতো কথা বানাতে হতো।

· তাই বুঝি? এসো। কী নাম তোমার গো? মেখলা না? শুনেছি জিতুর মুখে। জিতুটা কোথায়

দেখি।....আচ্ছা এসো, ভেতরে চলে এসো, আসুন ভাই। আপনার নামটি কিন্তু জানি না।

টুসকির মনে হয়, কী মার্জিত ! কী ভদ্র ! কী সুন্দর কথাবার্তা ! এমন সৌজন্যশীলা মা, তাই ছেলের মধ্যেও অতো সৌজন্যবোধ।

এগিয়ে যায় পায়ে পায়ে।

ওই যে—

মহিলা অদূরবর্তী একটি গ্রুপের দিকে তাকিয়ে বলে ওঠেন, ওই যে জিতু। আপনাদেরই কে যেন আত্মীয় হন, ওঁদের সঙ্গে কথা বলছে। জিতুকে ভীষণ ভালোবাসেন। ওঁরা আগেই এসে গেছেন।

সেই 'ওঁরা'র দিকে তাকিয়ে বিদ্যুতাহতের মতো শক্ত হয়ে যায় মেখলা। পিসি, পিসির জা, আর তার মেয়ে 'পাপিয়া'। তার সঙ্গেই হেসে হেসে কথা বলছে যুধাজিৎ। ওদের হাতে এক এক পাত্র আইসক্রীম। হয়তো সেইটা নিয়েই বাক্যজাল।

ট্রের ওপর বেশ কিছু আইসক্রীমের পাত্র বসিয়ে কেটারারের নামাঙ্কিত উর্দিপরা লোক এসে দাঁড়ায় শিলাদিত্যদের কাছে। তিনজনের হাতে তুলে দেয় তিন পাত্র। তার মানে, এটাই আসামাত্রই অভ্যর্থনার আয়োজন। কিন্তু তিনজনের একজন নিজেই তো আইসক্রীম বনে গেছে।..... পিসির ওই দ্যাওরঝিটাকে এখানে দেখবে, দুঃস্বপ্নেও ভেবেছে টুসকি ?

অথচ ওরা সদলবলে এসেছে। আগে এসে হাজির হয়েছে। বেলেঘাটা থেকে দূরত্ব কিছুটা কম বলে কী ?..... কিন্তু পথের দূরত্ব তো একটা পরিমাপ নয়। কখন কোন ফাঁকে ওরা দূরত্ব ঘুচিয়ে যুধাজিৎ নামের একান্তই টুসকির সম্পত্তিটিকে বাগিয়ে ধরে ফেলেছে !

পা থেকে মাথা পর্যন্ত যে একটা আগুনের শিখা দাপাদাপি করতে থাকে মেখলার মধ্যে। কী বিশ্বাসঘাতকতা ! কী বিশ্বাসঘাতকতা !....ওই লোকটাকে খুব ভদ্র আর মার্জিত ভাবছিল টুসকি।.... ছোটোলোক। একের নম্বরের ছোটোলোক।

টুসকির সমস্ত চেতনা জুড়ে ওই দুটো শব্দই ধ্বনিত হতে থাকে, 'বিশ্বাসঘাতক ! ছোটোলোক।'

তা নীহারিকাও যে হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তার ননদের বাড়ির গুষ্টিকে এখানে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হয়েছে, তা অবশ্যই নয়।.....কী আশ্চর্য ! ওরা কেন ? ওরা কে ? ওদের সঙ্গে এতো ভাব হলো কখন ? আমাদের মূল্যের পারাটা যে অনেক নেমে যাচ্ছে !

শিলাদিত্যও তাই-ই ভাবছিল। তবে তার ভাবনাটা সোচ্চার। কী পিসি, কী ব্যাপার ? তুমি ? এদের সঙ্গে এতো চেনাজানা হলো কবে ? তাজ্জব বনে যাচ্ছি যে। কী 'পাপিয়া' ! কতক্ষণ এসেছো ?

পাপিয়া কিছু বলার আগে পিসি বলে ওঠে, আর বলিস না। সকালবেলাই গাড়ি গিয়ে হাজির ! সঙ্গে চিঠি..... 'পিসিমা, কষ্ট করে একটু আগে আগে চলে আসুন। গাড়িটা আবার দিকবিদিকে ছুটবে।'..... কী সোনার চাঁদ ছেলে বাবা তোর বন্ধু। একদিনে সবাইকে আপন করে নিতে পারে।

যুধাজিৎ আড়ে আড়ে টুসকির দিকে তাকিয়ে চোখোচোখি হবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে পিসির দিকেই তাকিয়ে বলে, সে বিদ্যেটি আপনাদের থেকে বেশী আর কারো আছে না কী ?

তারপর ?

মা ছেলে মেয়ে তিনজনের কেউই ওদের এই অনধিকার প্রবেশকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি। এ যেন অন্যায়ভাবে তাদের জিনিস ছিনিয়ে নেওয়া।.... তবে—তিনজনের মধ্যে মাত্রাভেদ ছিল অবশ্যই।

টুসকি যে কীভাবে অতোক্ষণ বসেছিল, তা সে নিজেই বুঝতে পারছে না। খেতে অবশ্য আদৌ পারেনি। দারুণ 'মাথা ধরলে' কী করে খাবে ?....বসেছিল এই ঢের।

যুধাজিৎ দু'চারবারই চেষ্টা করেছে, হঠাৎ আপনার কী হলো ? এরকম 'মাথা ধরার' অভ্যাস আছে

না কী? কী ওষুধ খান? বলে বলে কিন্তু কাজ হলো না। টুসকি নিজেই বুঝতে পারছে না, তার সমস্ত মন এতোটা বিজাতীয় বিরাগে বিস্বাদ হয়ে উঠলো কেন?

'বিশ্বাসঘাতকতা' বলে ভাবছি কেন?....নিজের প্রশ্নের উত্তর নিজেই দিতে পারে না টুসকি। মনকেও আয়ত্ত করতে পারে না। কষ্টে সময়টা কাটিয়ে কোনোমতে বোদা বিস্বাদ মন নিয়ে বাড়ি ফেরে।

নীহারিকারও মুখ কালিবর্ণ! শিলাদিত্য অবশ্য বেগতিক দেখে পরিস্থিতি সামাল দিতে হাসিঠাট্টা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু এতো বড় কর্মযজ্ঞের নায়কের তো তাদের নিয়েই বসে থাকা সম্ভব হচ্ছিল না। কাজেই ছেঁড়া তার আর জোড়া দেওয়া গেল না।

কিন্তু কাল্পনিক এক বিশ্বাসঘাতকতাতেই এতো শিথিল হয়ে গিয়েছিল যারা, তারা কী স্বপ্নেও ভেবেছিল সত্যিকার এক অবিশ্বাস্য বিশ্বাসঘাতকতার নমুনা তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

বাড়ি ফিরে দরজায় কড়ানাড়া দিল শিলাদিত্যই। হ্যাঁ, এ বাড়িতে, শুধু এ বাড়িতেই বা কেন, এ পাড়ার অনেক বাড়িতেই এখনো সাবেকি চালে সদর দরজায় কড়ানাড়া দিয়ে জানান দিতে হয় কেউ এসেছে।

দরজা খুলে দিলেন নয়নতারা।

শিলাদিত্য অবাক হয়ে বলল, কী ব্যাপার। তুমি?

নয়নতারা বললেন, কী জানি দাদা, তদের কাজলেরে তো সেই কখোন থেকে দেখছি না। ডাকেও সাড়া নেই।

ছিটকে বলে আসে নীহারিকা, 'কখোন' থেকে মানে? কখোন থেকে?

এই তো তমরাও বার হলে, আর আমাগোর তাড়া লাগাতে ধরলো, দাদু খেয়ে ন্যাও, ঠাকমা খেয়ে ন্যাও। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাবে!...ত খাওয়ালো তোয়াজ যত্ন করে। তারপরে যে কনে গ্যালো! সাড়াশব্দ কিছু নাই।

শিলাদিত্য চড়া গলায় বলে, 'কনে' আর যাবেন? নিজেও গরম ভাত সেঁটে ঘুম মারছেন কোথাও। বেওয়ারিশ বাড়িটি পেয়েছেন।

কিন্তু কোথায় ঘুম মারবে?

রক্তমুখী হয়ে তল্লাশ করে নীহারিকা। টুসকিও বিদ্যুতাহত ভাব ত্যাগ করে তদন্তে লেগে যায়। এবং চটপটই আবিষ্কার হয়, শুধু যে কাজলই নেই তা নয়। কাজলের জামাকাপড়, পাউডার, স্নো, আয়না, চিরুনি ইত্যাদি যাবতীয় সম্পত্তিরাও নেই। এবং মহাজনের পথ অনুসরণ করতেই বোধহয় টুসকির ঘরের আলনায় যে সব সুন্দর শৌখিন শাড়ি-ব্লাউসগুলি দোদুল্যমান ছিল—তারাও উধাও।

টুসকির রুদ্ধ কণ্ঠ থেকে এখন মুহুর্মুহু ধ্বনিত হতে থাকে, মা! আমার লাল চটিজোড়াটাও নেই। মা! 'স্বয়ম্ভর' থেকে কেনা আমার নতুন সাইড ব্যাগটাও নেই! মা!.... আমার আস্ত বোবোলীনটাও নেই!.... আমার নেলপালিশটাও—

তার মানে একখানা অখণ্ড অবসরের সুযোগ পেয়ে কাজল তার বেশ কিছুদিনের জীবনযাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে!

শিলাদিত্য হাঁক পাড়ে, আলমারিগুলো খুলে দেখেছিস? সেসবও ফর্সা হয়ে গেছে কিনা।

না। আলমারি অটুটই আছে। চাবি কোথা পাবে? সে তো নীহারিকার সঙ্গে হাতব্যাগে ছিল।

তা ভাঙতেও পারতো! মনে হচ্ছে পেছনে গ্যাং আছে।

অতঃপর চলতে থাকলো আরো কী কী করতে পারতো কাজল, এবং আরো কী কীধ করেছে,

তার তল্লাশ!

কী অবিশ্বাস্য! কী অবিশ্বাস্য! কাজল এই কাজ করলো!.... কিন্তু ব্যাপারটা তো এইখানে থেমে থাকছে না। আদিত্য নামের রগচটা লোকটি যখন এসে প্রশ্ন করবে, বাড়িটা এমন 'বেওয়ারিশ' হলো কী করে? টুসকি কোথায় ছিল?

নীহারিকা হঠাৎ তিনতলার 'ওনাদের' আক্রমণ করে বসে। আপনাদেরও বলিহারী যাই। দিনদুপুরে জলজ্যান্ত একটা মানুষ এতো কাণ্ড করে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল, আর আপনারা টেরটি মাত্র পেলেন না? আশ্চর্য!

নয়নতারা আত্মপক্ষ সমর্থনের কাতর চেষ্টা করেন. বলেন, আমি ক্যামোন কইর‍্যে জানবো বৌমা? আমার মনের মধ্যে ছন্দঅংশে সন্দেহ থাকলি তো নজর রাখবো? কাজল আজ কত বছর আছে। তমাগোর মেয়্যার মতো, আলমারি বাক্স খুলে গোছায়, তমাগোর ভাঁড়ার নাড়ে, তারে করবো সন্দেহ?....

কিন্তু গেল কোথা দিয়ে? বাইরের দরজাটা তো ভিতর থেকে খিল-ছিটকিনি সবই লাগানো রয়েছে দেখা গেল।

অনুসন্ধানে ধরা পড়লো পাশের গলির দিকের জমাদার আসার ছোট দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তবে মনিবের সঙ্গে নেমকহারামি করেনি। রাত্রে রান্নাঘরে লাগাবার পটপটে তালাটা সেই দরজায় লাগিয়ে দিয়ে গেছে।... বাইরের চোর-ছ্যাঁচোড় যাতে চট করে ঢুকে পড়তে না পারে।

শিলাদিত্য কিছুক্ষণ গোয়েন্দার স্টাইলে আরো তদন্ত করতে করতে হঠাৎ গলা নামিয়ে বলে উঠলো, তারকবাবুর হঠাৎ ছুটিতে 'দেশে' যাওয়ার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তো?

তারকের সঙ্গে সম্পর্ক?

নীহারিকা বলে ওঠে, কী যে বলিস! দুটোতে তো সাপ নেউলে।

শিলাদিত্য একটু রহস্যময় দৃষ্টিতে বোনের দিকে তাকায়। যার অর্থ, ওইটাই চালাকি। অপরকে বোকা বানাবার আবরণ। নির্ঘাৎ ওই তারকটার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে—দ্যাখো এখন তারকবাবুর ঘরে তাঁর সম্পত্তির কী আছে আর কী নেই। এবং এ বাড়ির কিছু হাতিয়ে নিয়ে গেছেন কিনা।

দেখা গেল তারকের সর্বস্বই রয়েছে। খুব সম্ভব শুধু সবথেকে ভালো শার্ট প্যান্ট দুটো নিয়ে চলে গেছে।

টুসকি গলা নামিয়ে বললো। ছোড়দা। এটাও চালাকি নয় তো? বোকা বানাবার জন্যে আর একটা ধাপ্পা। ভারী তো সম্পত্তি ওর। জামাকাপড় আছে বটে অনেকগুলো, তো তার বদলে কারো কিছু হাতিয়েছে কিনা কে জানে! দাদার সর্বস্বই তো ওই তারকের হাতে!.... সে জায়গায় তারকের একটা টিনমোড়া আর্শি, দুটো চিরুনি, একখানা ময়লা গামছা—দুখানা তোয়ালে। আর বাবুর পরম শখের প্রাণতুল্য ট্র্যানজিস্টারটা।

দুই ভাইবোনের গোপন বৈঠকে প্রায় ঠিকই হয়ে গেল, তারকের হঠাৎ দেশে যাওয়াটার সঙ্গে কাজলের অন্তর্ধানের সম্পর্ক গভীর। নিবিড়।

নিজস্ব হিসেবে দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেললেও, আদিত্যর সামনে সে সন্দেহের কথা ব্যক্ত করতে পারে না। আদিত্যর সামনে সেই নিচু কথাটা মুখ দিয়ে বার করবে কী করে?

এ খবরে আদিত্য প্রথমটা প্রচণ্ড চেঁচামেচি করে উঠলো। তার আজ সারাটা দিন ভারী আহ্লাদে কেটেছে। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে সুখের স্বাদই আলাদা। তাছাড়া নিমন্ত্রণকর্তা বন্ধু আর একটি আকর্ষণীয় প্রমোদ ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, একটা পুকুর ঠিক করে রেখেছিলেন মাছ ধরবার জন্যে।

এ একটা লোভনীয় ব্যাপার।

সারাদিনের বেশ একটু ভালো লাগার আমেজ (যা নাকি এখনকার জীবনে প্রায় দুর্লভ) নিয়ে বাড়ি ফিরে কিনা এই দুঃসংবাদ। এ তো আর সংসারের একটা করিৎকর্মা 'কাজের মেয়ের' হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যাওয়া নয়! এ যে মাথায় বাজ হানা।

ওর বাপ যখন এসে জিগ্যেস করবে, বাবু, আপনাদের হেফাজত থেকে আমার জোয়ান বয়সী মেয়েটা হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে গেল কী করে, তার জবাব দিন। কী জবাব দেবে আদিত্য গাঙ্গুলী নামের অহঙ্কারী মানুষটা!

তারপর মনে পড়লো, ওর বাপের তো আসার খুব ঠিক নেই। মেয়ের মাইনেটা হাতিয়ে নিয়ে যেতে মাসে একবার আসে বটে তবে খুব নির্দিষ্ট কোনো তারিখে নয়। মনে হচ্ছে এই কিছুদিন আগে যেন একবার এসেছিল।

অতঃপর থানা পুলিশের গাড্ডায় পড়তেই হবে।

উৎকণ্ঠা সকলেরই।

সত্যব্রতও আজ ছেলে ফেরার পর নিচে নেমে এসেছেন। বললেন, শিলুকে সঙ্গে নিয়ে একটা ডায়েরি করে এসো। ওটা তাড়াতাড়ি না করলে আবার আইনের অনেক প্যাঁচে পড়ে যেতে হয়।

শিলাদিত্য দারুণ অস্বস্তির সঙ্গে তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, একজন গেলে হয় না?

সত্যব্রত বলেন, 'হয় না' তা নয়। বাড়িতে যদি দু'জন না থাকে। তবে তুমি একটা ইয়াং ছেলে, এ ধরনের কেস-স তোমায় এটা পেলে বেশী হ্যারাস করবে। সেটাই তো স্বভাব ওদের।

শিলাদিত্য চমকে ওঠে, আমায় একা পেলে? আমি একা যাবো? মাই গড্। বলছি শুধু বাবা গেলে হয় না?

সত্যব্রত একটু গম্ভীর হাসি হাসেন, তাই বা না হবে কেন? তবে গোলমেলে কাজে সাবালক হয়ে ওঠা ছেলেদের তো বাপের সঙ্গে যাওয়াই উচিত।....আমার যাওয়াটা যদি তোমরা অ্যালাউ করো তো আমিও যেতে পারি। তবে তাতে আবার ট্যাক্সীভাড়া লেগে যাবে। অনেকদিন বাসে-ট্রামে চড়িনি, একটু ভীতি এসে গেছে।

আদিত্য বেজার গলায় বললো, আপনাকে কে যেতে বলছে? আমি একাই যাবো।.... টুসকি, তোর মার কাছ থেকে ভালো করে জেনে আয় তো তোদের ওই কাজলের দেশের বাড়ির ঠিকানা কী, বাপের নাম কী, বাপ কী করে।

টুসকিকে আর জিগেস করতে হলো না। তার আগেই আকাশ থেকে পড়লো নীহারিকা।

আমি? আমি ওসবের কী জানি? গ্রামের নামটা 'পৈলেনহাট' না কী যেন অদ্ভুত একটা বলতো। আর বাপ চাষবাস করে এইটুকু জানি।

বাপের নাম? সেটুকুও জানো না? এই এতোদিন আছে এখানে।

আশ্চর্য! আমারই যেন যতো দায়। 'বাপ' না বাপ! কেলে কুচ্ছিৎ ভোঁদড়ের মতো একটা লোক আসতো এক আধবার দেখেছি। কাজলবালা তদব্যস্ত হয়ে বাপকে চা খাবার খাওয়াতে যেতো, দেখে হেসেছি, এর বেশী কে জানতে গেছে?

আদিত্য আবার চেঁচায়। বলে, জানা উচিত ছিল। এগুলো বাড়ির গিন্নীর জানার কথা।

নীহারিকা স্থান-কাল-পাত্র বিস্মরণ হয়। নীহারিকা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, 'বাড়ির গিন্নী।' ওঃ। গিন্নীই বটে। বলি গিন্নীর পোস্টটা পেল কখন এই নীহারিকা গাঙ্গুলী? বরং বলো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। আমি বলবো, এসব বাড়ির পুরুষদের জেনে রাখা উচিত।....তো সে উচিতজ্ঞান কার আছে? সাধের পানসিখানি, ঠিকই ঠিক সময় বৈতরণী পার হয়ে যাচ্ছে।.... এতেই নিশ্চিন্দি।

আদিত্য আর একটা ক্ষিপ্ত উত্তর দেয়। তার পিঠে নীহারিকা আবার !...পরিস্থিতি ভুলে গিয়ে দু'জনে যেন সম্মুখ সমরে নেমে পড়ে।

সত্যব্রত আর কথা বলেন না। নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যান।

সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করে দু'জনে চালাতেই থাকে। আর টুসকি সেই অবকাশে ভাবে, যাক বাবা, গোলেমালে বাবা যে সেই মোক্ষম প্রশ্নটি করে বসেনি, সেটাই রক্ষে।

টুসকি কোথায় ছিল ?

টুসকি ?

বন্ধুর বাড়ি ?

কোন বন্ধু ? কোথায় থাকে সে ? আজই হঠাৎ বন্ধুর বাড়ি যাওয়াটা এতো কী জরুরি ছিল ?

আজ টুসকির বড় দুঃখের দিন।

তারপর—যেই ভাবছে—সকালে উঠে দেখা যাবে তারক নেই, কাজল নেই, তখন ? কী চেহারা হবে সংসারের ? এবং মায়ের ?

টুসকির বুকের ওপর একখানা পাথরের চাঁই চেপে বসে। তারপর আস্তে আস্তে ভাবতে থাকে—

আচ্ছা, ছোড়দা যা সন্দেহ করছে, সেটাই কী সত্যি সম্ভব ?...ভগবান জানে।....অসম্ভব বলে কিছু নেই জগতে। দেখছি তো। না হলে, আহ্লাদে ভাসতে ভাসতে যুধাজিতের বাড়িতে গিয়ে দেখতে হয় সেখানে পিসির গুষ্টিবর্গ। পাপিয়ার সঙ্গে হেসে হেসে আইসক্রীম খাচ্ছে।

কিছুক্ষণ উষ্ণ বাক্য বিনিময়ের পর আদিত্য কর্তব্যকর্মের তাগিদে বাধ্য হয়ে বেরিয়ে যায়।....জীবনে কখনো জানেনি, থানায় গিয়ে 'ডায়েরি' করে আসাটা কী ব্যাপার ? কাকে বলতে হয় ? কীভাবে কথা পাড়তে হয় ?... বাড়িতে চোর পড়ে চুরিচামারি করে গেলে পাড়ার লোককে ডেকে ডেকে বলা যায়, পরামর্শ করা যায়, কিন্তু এ যে এক অতি অস্বস্তিকর ব্যাপার।... শোনামাত্রই সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার মনের মধ্যে সন্দেহের কুয়াশা জমে উঠবে।....

হঠাৎ মান খুইয়ে টুসকিকে ডেকে বললো, যা দাদুকে জিগ্যেস করে আয়। বাড়ির চাকরটা হঠাৎ দু'তিন দিন আগে দেশে যাবো বলে চলে গেছে, এটা কী থানায় জানাবো ?

খানিক পরে যখন বেরিয়ে পড়েছে আদিত্য নামের রগচটা অথচ ভেতরে ভীতু লোকটা, দেখলো ছেলে আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

॥ দশ ॥

থানার বড়বাবু চোখটি টেরিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, এই এক ছ্যাঁচড়া কেস-এর বাড়বৃদ্ধি হয়েছে আজকাল ! যতো সব ইয়াং চাকরানীদের—ইয়ে 'কাজের মেয়ে' নিয়ে কেলেঙ্কারী। যাচ্ছেতাই রকমের সব ব্যাপারও আছে। আমি বলবো, এর জন্যে আপনারাই দায়ী।

ঘণ্টাখানেক ধরে অকারণ বসিয়ে রেখে, অবশেষে তাচ্ছিল্যভরে, এই যে আপনাদের কেসটা কী ? বলার পর, বৃত্তান্ত শুনে এই মন্তব্য।

শিলাদিত্য ভিতরে ফস করে জ্বলে উঠলেও কষ্টে সে আগুনকে নিভিয়ে বলে, 'আমরাই দায়ী' ! মানেটা ঠিক বুঝলাম না তো !

বাড়ি থেকে প্রায় অগত্যাই বেরিয়ে পড়লেও ভেবে এসেছিল শিলাদিত্য কেবলমাত্র বাবার দেহগত সঙ্গী হওয়া ভিন্ন আর কোনো ভূমিকায় সে নামবে না। স্রেফ চুপচাপ থাকবে, যা বলবার বাবাই বলবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ঠিক তার উল্টোটাই হতে দেখা গেল।

বড়বাবু যখন ইচ্ছাকৃত অবহেলার ভঙ্গীতে, যেন এই জলজ্যান্ত লোক দুটোকে দেখতেই পাচ্ছেন না এইভাবে অহেতুক ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রেখে টেবিলে পড়ে থাকা সকালেই পড়ে-ফেলা খবরের কাগজখানায় চোখ বুলোচ্ছিলেন, এবং মাঝে মাঝে নস্যি নিয়ে হাত ঝেড়ে ঘরের মধ্যে নস্যির রেণু ওড়াচ্ছিলেন তখন শিলাদিত্য বাবাকে অসহায়ভাবে মাথা নীচু করে বসে থাকতে দেখে বার দুই জানান দিয়েছিল, স্যার। আমরা অনেকক্ষণ থেকে... স্যার 'কাইণ্ডলী' আমাদের কেসটা—

অতঃপর যখন বড়বাবু অলস গলায় বললেন, 'ও হ্যাঁ। বলুন!' আর তাই শুনে বাবা আরো অসহায়ভাবে ছেলের মুখের দিকে তাকাল, তখন শিল্যাদিত্যকেই নৌকোর হালটা হাতে নিতে হলো। যতটা সম্ভব সংক্ষিপ্তভাবেই বলবার চেষ্টা করছিল।...তো শোনার সময় সারাক্ষণই বড়বাবু দেশলাই কাঠি দিয়ে কান চুলকে চলেছিলেন, একটি বিশেষ আরামের আবেশময় ভঙ্গীতে।...শোনার পর এই মন্তব্য।

শিলাদিত্যের ঈষদুষ্ণ প্রশ্নের উত্তরে, চোখটাকে আরো টেরিয়ে বললেন, 'মানে' বোঝাতে লাগবার তো হেতু দেখছি না। একটা করে 'ছুঁড়ি' ইয়ে ইয়াং মেয়েকে বাড়িতে এনে ভরে ফেলে, তার ওপর সমগ্র সংসার চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকা, আর যখন তখন তাকে বিলকুল একা রেখে বাড়িসুদ্ধ সকলে হাওয়া হয়ে যাওয়ার অভ্যাসেই ওরা এ ধরনের কাজ করে বসবার সুযোগ পায়। বেশীর ভাগই 'প্রণয়'ঘটিত ব্যাপার থাকে। মানে সিম্পল 'কেস'-এর ব্যাপারেই বলছি। মারাত্মক কেসও থাকে ঢের। তো আপনাদের ওই মেয়েটার বয়েস কী রকম?

বয়েস।

বাপ-ছেলে দুজনেই মুখ চাওয়াচায়ি করে। কাজলের বয়েস কী হতে পারে এ সম্বন্ধে কোনো ধারণা দুজনেরই নেই। এখনকার দিনে 'সাজাগোজা'র 'রঙিন প্যাটার্নে' মেয়েদের বয়েস বোঝবার সুবিধেই নেই। 'ঠাকুমা' হয়ে যাওয়া মহিলাও নাতনীর সঙ্গে এক সাজে সাজেন। তো এ তো কাজের মেয়ে।

আদিত্য এখন কথা বললো, বয়েস! মানে প্রায় ছ-সাত বছর তো কাজ করছে।

বড়বাবু একটু ধমকের সুরে বলেন, 'ছ-সাত বছর কাজ করেছে' এটা একটা উত্তর নয়। যখন কাজে ঢুকেছিল, তখন শাড়ি পরতো না ফ্রক পরতো?

আদিত্য আবার ছেলের মুখের দিকে তাকালো। তারপর ঝাপসা গলায় বললো, যখন এসেছিল, বোধহয় ফ্রকট্রকই পরতো, তারপর বাড়ি থেকে শাড়িটাড়ি দেওয়া হয় বোধহয়।

হুঁ। দুটো 'বোধহয়'। খুব সম্ভব এখন বয়েস বাইশ-চব্বিশ!...পাড়ার চাকরবাকর বা পানের দোকানের কী লন্ড্রীর, কিংবা ওইরকম কারো সঙ্গে 'আসনাই' দেখেছেন?

শিলাদিত্য উত্তপ্ত মুখকে শান্ত করে বলে, সবসময় বাড়ির মধ্যেই তো থাকতো।

অ। তা বাইরের কাজটাজ? মানে দোকানপাট র‍্যাশন আনা লন্ড্রীতে কাপড় দিতে যাওয়া, এসব কাজ আপনারা নিজেরাই করে নেন?

শিলাদিত্য সাবধানে বলে, না, এসব কাজের জন্যে একটা ছেলেলোক আছে। রান্নাটান্নাও বেশীর ভাগ সে-ই করে।

মাই গড্। ছেলেলোক।

বড়বাবু টেবিলে একটা থাপ্পড় মেরে বলেন, বাড়ির মধ্যেই সুব্যবস্থা রয়েছে। এ কথা আগে বলবেন

তো ! তো সেই 'ছেলেলোকটি' কতো দিন আছেন ?'

'ছেলেলোক' শব্দটি আদৌ একটা ভাষা কিনা সন্দেহ। অন্তত এ শব্দ শিলাদিত্যর ভাষায় থাকার কথা নয়। তবু এরকম একটা অনভ্যস্ত শব্দই এখন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়লো। আসলে মানুষ যদি বা যখন একটা বিরক্তিকর বেপোট অবস্থায় পড়ে, তখন যেন কথাও হারিয়ে যায়। যথাযোগ্য শব্দটি মেনে আসে না।

বড়বাবুর ওই 'ছেলেলোক' শব্দটির ওপর একটি ব্যঙ্গাত্মক সুর শুনে শিলাদিত্যর রাগ আর অপমানের জ্বালাটা আরো প্রবল হয়ে উঠলো। উঃ। কাজলটাকে যদি এখন সামনে পাই তো কেটে কুচিকুচি করি। তার জন্যেই না হোক এই অপমান।

তা মনে মনে অনেকেই অনেককে 'কেটে কুচিকুচি করে', শিলাদিত্যও করলো। তবু কষ্টে নিজেকে শান্ত রেখে ভেবে নিল, কতোদিন আছে তারক তাদের বাড়িতে।

মনে পড়ে গেল তারক তার দাদার থেকে যেন কিছু ছোটো। শিলাদিত্যরই কাছাকাছি বয়েস ! তবু সেই 'আদিকালে' নেহাৎই রোগা হ্যাংলা চেহারার ছিল বলে, 'ছোড়দাবাবুর ছোটো হয়ে যাওয়া পুরনো জামাগুলোই তার কাজে লাগতো। তাও গায়ে ঢলঢলই করতো।....সেই গায়ে বড় জামা-পরা রোগা কালো দাঁত উঁচু ছেলেটাকে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল শিলাদিত্য।.....দাদার ঘুঁড়ি ওড়ানোয় 'ধরতা' দিচ্ছে, দাদার নানাবিধ খিদমদগারি খাটছে, 'বড়দাবাবু' বলে বিগলিত হচ্ছে (যা এখনো হয়)। সেই ছবিটাকে চোখে রেখে মনে মনে একটা হিসেব কষে নিয়ে বললো শিলাদিত্য, সে অনেক দিন। সতেরো আঠারো বছর তো হবেই।

বড়বাবুর চোখের তারাটা একটু সোজা হলো। বললেন, 'সতেরো-আঠারো' ! অ। বয়স্ক লোক। ম্যারেড্ম্যান ! ছেলেপুলেওলা সংসারী ! তা—

কথার মাঝখানে আদিত্য হঠাৎ ফস করে বলে উঠলো, না না। মোটেই তা নয় ! ম্যারেড ফ্যারেড্ নয়। একের নম্বরের মস্তান মার্কা। ওস্তাদের রাজা ! কাজে লেগেছিল সেই অ্যাত্তোটুকু বয়েসে। ওর মা আমাদের বাড়িতে বাসন মাজতো, তার সঙ্গে সঙ্গে আসতো। সেই অবধি—মৌরসিপাট্টা।

তারক আদিত্যর দু'চক্ষের বিষ। তারকের ভাবভঙ্গী আচার-আচরণ এবং সাজসজ্জা সবই আদিত্যর গাত্রদাহকারী। আর সবথেকে হাড়জ্বালানো ব্যাপার হচ্ছে নীহারিকার 'হা তারক ! জো তারক' ভাব। দু'দণ্ডও তারক বিহনে যেন চক্ষে অন্ধকার দেখে নীহারিকা। একটা মস্তানমার্কাকে এতো প্রাধান্য দেওয়া দেখে দেখে বিষ ওঠে আদিত্যর। এখন সেই বিষটাই খানিক উথলে উঠলো স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হয়ে।

শিলাদিত্য চায়নি, তারক সম্পর্কে বেশী কথা ওঠে, কিন্তু আদিত্য সেটি ওঠালো।

বড়বাবু আবার নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, তাই না কী ! তা বয়েসের যা আন্দাজ পাচ্ছি—তাতে তো—মানে ছুঁড়িটার সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা থাকাই সম্ভব। ছিল না তো ?

আদিত্য ভয়ে ভয়ে ছেলের দিকে তাকায়। সে মুখ বাবার প্রতি বিরক্তিতে আরো থমথমে হয়ে উঠেছে। আদিত্য অতএব সামাল দেয়, না না, সে সব কিছু না। মানে সে ধরনের ছেলে নয়।

কে যে কী ধরনের, তা বোঝা মুশকিল মশাই। তো তাকে তো একবার জেরা করতে হয়।....কাল তাকে নিয়ে চলে আসবেন।

তাকে ! মানে—তাকে তো এখন পাওয়া মুশকিল !

কেন ? মুশকিল কেন ? কী হলো ?

বাবা আবার কী বলে বসে ভেবে শিলাদিত্য বলে, সে আবার দিন দুই হলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে।

অ্যাঁ। কী বললেন ? দিন দুই হলো ছুটি নিয়ে দেশে গেছে ? হা হা হা ! 'দুই আর দুইয়ে চার-এর' এই সহজ হিসেবটি হাতে পেয়েও, তা ছেড়ে আপনারা মাথায় হাত দিয়ে বসেছেন। এ তো বোঝাই যাচ্ছে, ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা। আপনার ওই ছেলেলোক দেশেটেশে যায়নি। স্রেফ ঘাপটি মেরে ছিল কোথাও, আজ সুযোগ পেয়ে পাখিটিকে নিয়ে ভেগে পড়েছে।

এ সন্দেহ শিলাদিত্যরেও। তবু বড়বাবুর কথা বলার ভঙ্গীটা এমন বিশ্রী লাগে ! তাই বলে ওঠে, তা ঠিক মনে হয় না।

মনে হয় না ! অতি উত্তম কথা। তিনি 'দেশে' থেকে ফিরবেন বলেই বিশ্বাস আপনাদের ?

বলে তো গেছে।

রাখুন মশাই ! ওদের আবার বলাবলি। দেশটি কোথায় ?

শিলাদিত্য বাপের দিকে তাকায়।

আদিত্য বলে, ওর মা তো বলতো, 'লক্ষ্মীকান্তপুর' না কী ?

অ। তাতেও না কী ? আপনারা মশাই মহাপুরুষ বেক্তি। একটা লোক সতেরো-আঠারো বছর কাজ করছে আপনার বাড়িতে অথচ তার দেশঘর কোথায় তা সঠিক জানেন না। আশ্চর্য। সাধে বলছি—এই আপনাদের মতো কাছাখোলা লোকেরাই এইসব চাকরবাকর ক্লাশের লোকদের 'অপরাধ' করবার প্রবণতার জন্মদাতা।.....বহু সময় পুলিশ থেকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়, 'লোকজন রাখবার সময়, তার নাম-ঠিকানা লিখে রাখবেন। তার ফটো রাখবেন। একদম নিরক্ষর হলে তার 'টিপছাপ' রাখবেন। কেউ তাতে কোনো গা করে ? করে না। অথচ যখন সে লোক এইরকম সব বিপদ ঘটায় অথবা বাড়ির মেয়েদের একা পেয়ে কুপিয়ে কেটে আলমারি বাক্সর চাবি হাতিয়ে যথাসর্বস্ব নিয়ে ভেগে পড়ে, তখন চিল্লাচিল্লি শুরু করেন, 'পুলিশ কিছু করতে পারলো না'।

শিলাদিত্যর ইচ্ছে হয় লোকটার ওই পান খাওয়া কেলে কেলে দাঁতগুলোর ওপর প্রচণ্ড একটা ঘুষি বসিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে।....এঁরা ভাবেন, যেহেতু তাঁরা পাবলিকের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, তাই, সুযোগ পেলেই, তাদের একহাত অপমান করে নেবার রাইট আছে। কাজ তো কত্তোই হবে। ইচ্ছে করে 'হ্যারাস্' করবে। তবু নিয়মরক্ষার্থেই থানায় ডায়েরি করতে আসা।

শিলাদিত্য একটু ইশারাসূচক ডাক দেয় বাবা।

অর্থাৎ এবার ওঠা যাক।

আদিত্যও বলে, তাহলে—একটু লিখে নিচ্ছেন তো ?

হুঁ ! সে তো আমাদের নিতেই হবে। তবে আমি অ্যাম সিওর ওই আপনার মস্তানটিই ছুঁড়িকে নিয়ে ভেগেছে। তা মন্দের ভালো। বাড়ির মধ্যেই যে কোনো কেলেঙ্কার করেনি, এই ঢের। তেমনও তো ঘটে। বললুম তো—আজকাল এই 'কাজের মেয়ে'ঘটিত কেলেঙ্কারের কেস আমাদের ফাইলে গাদা গাদা ! খুন করে গুম করে ফেলে, 'নিখোঁজ হয়েছে' বলে ডায়েরি করতে আসার কেসও আছে মশাই। ভদ্দর চেহারার আড়ালে যে কত রকম চীজই থাকে !

বড়বাবু সেই কান-চুলকোনো দেশলাই কাঠিটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে দাঁত খুঁটতে থাকেন।

ওঃ। কী অসহ্য ! কী অপমানকর উক্তি।

শিলাদিত্য বলে, বাবা, চলো। আচ্ছা নমস্কার ! রাগে জ্বলতে জ্বলতে বেরিয়ে আসে।

আর বেরিয়ে এসেই কিনা আদিত্য বলে ওঠে, ঠিক হয়েছে, ভালো হয়েছে। এইবার তোদের মার 'হা তারক, জো তারক' করা বেরিয়ে যাবে। হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারবে তারকটি কী চীজ।

শিলাদিত্য নির্বাক হয়ে যায়।

যেন আচ্ছন্নের মতোই একটা অটোকে থামায়, বাবার পাশাপাশি বসে পড়ে। আর তেমনি

আচ্ছন্নভাবেই ভাবতে ভাবতে যায়। দুটো মানুষ এইরকম প্রতিপক্ষের মনোভাব নিয়ে বছরের পর বছর, তাই বা কেন—আমৃত্যুই কাটিয়ে চলে !...কী অদ্ভুত ! কী আশ্চর্য !

রোদের তাপে লাল, ঘামে দরবিগলিত তারকের মা, জঙ্গুলে জায়গাটা থেকে বেরিয়ে এসে ছেলের মুখের দিকে হাস্যোদভাসিত মুখে তাকিয়ে বলে ওঠে, তারক, দেখলি ?

তারকও ঘর্মাক্ত, বিরক্ত। বললো, কী দেখলাম !

দেখলি না ? বাবুর নামে ছুঁড়ে দেওয়া ফুলটি মা ঘোড়াইচণ্ডী 'নিলেন'।

'নিলেন' মানে ? তোমার ঘোড়াইচণ্ডীর কী দু-চারখানা হাত আছে যে, নিলেন ?

দুগগা ! দুগগা ! মায়ের নামে অমন ছেদ্দাহীনভাবে কথা বলিসনে রা তারু ! অবরাদ হয়। মায়ের হাত নাই, বুকটি তো আছে ? বুক পেতেই নেছে !

অবিশ্বাসী তারক মাথা নেড়ে বলে, তো শুয়ে পড়ে থাকা পাথরের চাঁইয়ের ওপর ফুল ফেললে আর সেটা যাবে কোথায় ?

মা মনে মনে 'অপরাধ ভঞ্জন' মন্তর আউড়ে কাতর গলায় বলে, অমন কতা বলিসনে তারু। মা বড়ো জাগ্রতো দেবীরে। এতোটুকু অবোজ্ঞা ভাব দেখালেই তার প্রিতিশোদ ন্যান। সাবাস।

ঠাকুরও প্রতিশোধ নেন ?....তারক হেসে ওঠে। বড়দাবাবুর মন্ত্রশিষ্য তারক এইরকম সব কথা অনায়াসেই বলতে সাহস পায়।

মা রেগে বলে, তোরে সাতে নি আসাই আমার ঝকমারি হয়েচে। পুরুত ঠাকুরমশাইয়ের গ্যাড়া ভাইপোটা তো বলেছেলো, পথ চিনিয়ে নে আসবে। অনেকদিন আসি নাই, জঙ্গুলে 'থান' তাই একা আসতে ভরসা পাই নাই। সে ছেলেটা বললো, শনি-মঙ্গলে দুপুর থেকে ভিড় জমে। হাটের দিন তো। তাই তোরে খোসামোদ করে নে এলাম। তো তোর দেকচি শহুরে বড়মানষের বাড়ির ভাত খেয়ে খেয়ে ধর্মকর্মোয় মতিগতির বালাই গ্যাচে। মায়ের থানে দাঁইড়ে, অ্যামোন অবিশ্বেসের কতা কইতে নাইরে তারক। মনে মনে নাক-কান মলে নে।

মনে মনে কেন ?....এই দেখিয়ে দেখিয়েই মলছি—বলে হো হো করে হেসে উঠে তারক সজোরে নাক-কান মলতে থাকে।....

হয়েছে ? ক'বার মা ? সাত বার ? না কি বিশ বার।

থাম তো। এতো ফাজিলও হয়েছিস।

বলে হনহনিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দাঁড়িয়ে পড়ে তারকের মা। বলে, দাঁড়া। এই ফুলটা তোর মাতায় ঠেকানো হয়নি। এটা তোর নামে দেছলুম।....অবিশ্বাসী ছেলে সম্পর্কে মনে মনে ঠাকুরের কাছে মার্জনা চেয়ে নেয় বোধহয়। তারপর বলে, বাবু নিয্যস ভোটে জিতবেরে তারক। আমার মন বলতেচে।

তারক হাসতে হাসতে বলে, তা তো বলবেই। জিতলে তোর অনেক বখশিস মিলবে তো। কিপটে গিন্নী এখোন খুব দিলদরিয়া হয়ে গেছে, তাই না ?

মা কৌতুক হাস্যে বলে, তা হয়েচে। ভাবখানা যেন, কেউ না মনে মনে গালমন্দ শাপমুনি করে। সবাই পেসন্ন থাকে ! তো হ্যাঁরে তারু ! তোর বড়দাবাবু যে আমাদের বাবুর কাচে আসে, সে কতা বলেছিলুম তোরে ?

তারক বিমনাভাবে বলে, হ্যাঁ। বলেছিলে বটে সিদিনকে। তো আমার তো মনে নিয়েছিল, তুই কাকে দেখতে কাকে দেখেছিলি।

দূর পাগলা। কী যে বলিস। তোর মায়ের চোকে কী ছানি পড়েচে ?

তাহলে গেছলো।....কাজে পড়ে কতো জায়গায় যেতে হয়। তবে তোর মনিব ওই বিপুল ঘোষাল

লোকটাকে বড়দা তেমন সুনজরে দেখে না। বলে, লোকটা অনেস্ট নয়।

মা থমকায়। কী নয়?

মানে, ইয়ে, খাঁটি লোক নয় আর কী!

তারকের মা হঠাৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একখানি গভীর দার্শনিক উক্তি করে, খাঁটি মনিষ্যি আর এই দুনিয়ায় ক'টা আচেরে তারক! সবই ভেজালের কারবার!

কয়েক পা এগোতে এগোতে আবার বলে, বললে, পেত্যয় করবি, আমাদের উই 'ষষ্ঠিতলার' সেবায়েৎ ঠাকুর কালো ভটচায্যি? গতকাল সকালোয় ও বুড়োর বাড়ির উটোন থেকে দুটো গ্যাঁদালপাতা তুলতে গেছনু, তো দেকি কী বুড়ো পুজো করতে বেরোবার আগে সেই সাতসকালে নুন-নঙ্কা দে' এককাঁসি পান্তো সাঁটচে! ভাবতে পারিস? বুড়ো বামনা! জন্মকাল থেকে ঠাকুরস্যাবা করচিস্, তুই কিনা পুজোপাটের আগে পেটভরে পান্তো গিলচিস।....অ্যাঁ! তো চোখের সামনে দেকে ফেলেচি, অস্বীকার তো করতি পারে না। যাকে বলে হাতেনাতে ধরা পড়া। তাই ভটচায-গিন্নী এসে আমার কাচে হাতজোড়, দোহাই দিদি, কারে বলে দিওনি। বুড়োমানুষ, পিত্তির ব্যামো। সকালোয় পেটে দু'টো ভিজে ভাত না পড়লে পিত্তি ওটে। এইসব হ্যানোত্যানো। তো বললুম 'মায়ের কাচে অপরাদ লাগবে না? তো বুড়ো বলে কী, মা কী আর তে'মার মতন আমার বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরতে এয়েচে? নুইকে খেলে শুইকে যায়।.....তারপর কী তোয়াজ, গাচে লাউ ধরেচে, অ্যাকটা নে যাও। আমি বলি, ওই ঢাউশ একখান লাউ নে আমি কী করবো? নিজে কী রাঁদিবাড়ি?....তো অতো মিনোতি করলো বলে গাঁয়ের আর কাউকে বলি নাই, এই তোরেই বললুম। পাঁচজনকে বলে দিয়ে আর লোকটাকে হেয় করলুম না।

তারক হেসে উঠে বলে, মা! তুই এতো বুদ্ধি ধরিস, তবু এক একদিকে হাড়বোকা। বলি গাঁয়ের পাঁচজন এ খবর রাখে না ভাবছিস? সবাই জানে।

সবাই জানে?

তারকের মা উত্তেজিত হয়।

নিশ্চিত জানে। জেনেবুঝে না জানার ভান করে।

তুই বলিস কী তারক। জেনেবুঝে সবাই ওই 'অনাচারে' বুড়োকে দিয়ে ষষ্ঠিতলার পুজোপাট চালায়?

কী করবে? ওই বুড়ো ভিন্ন তো গতি নেই।

ক্যানো? বলি গাঁয়ে আর কোনো বামুন নাই?

সে কথা তুই-ই জানিস। গাঁয়ের খবর আমি কী জানি? তবে অনুমানেই বুঝে নিয়েছি। থাকলেও—জেনো ঠগ বাছতে গাঁ ওজোড়।

ওরা ফিরতেই তারকের জ্যেঠি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলে, আহা। রোদে ঘামে মা-ব্যাটার মুক-চোক বসে গ্যাচে। সকালে তো তারকসুদ্ধু গলায় অ্যাকফোঁটা জলও দে যায়নি। বেটাছেলের আবার এতো বিচার। সবাই তো বলে, চা খেলে দোষ নাই। তাতে 'উপুস' নষ্ট হয় না। যাকগে, তাড়াতাড়ি হাতে-মুকে একটু জল দে আয় বাবা। নেবুর শরবৎ করে রেকেচি, এসে খা! ছোটবৌ, তুইও চল একটু জল মুকে দিবি।

তারক অবাক না হয়ে পারে না। এতো ভালোবাসা! এই অতিভক্তিটা চোরের লক্ষণ নয় তো?

তা এক হিসেবে তারকের সন্দেহ অমূলক হলো না। জ্যেঠি হাঁক পাড়লো, তেলকা, শরবৎটুকু এনে তারকদাকে দে। আয় ছোটবৌ, তোর তরেও কুলভিজের শরবৎ বানিয়ে রেকেচি। তুই ভালোবাসিস।....বলে ছোটবৌকে প্রায় টেনেই নিয়ে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে যায়।

আর একটা অ্যালুমিনিয়ামের গেলাস হাতে নিয়ে 'তেলকা' অর্থাৎ তিলকা এসে 'তারকদার' সামনে দাঁড়ায়।

তারক একটু অপ্রতিভ হয়। জ্যেঠি-জ্যাঠার যে এতো বড়ো একটা মেয়ে আছে, তা তো জানতো না। ধারণা ছিল যেন ওদের ছেলেপুলে হয়নি।

তবে এ মেয়ে যে গ্রামে বাস করে এমন তো মনে হচ্ছে না। সাজেসজ্জায় যে কাজলের ছাঁচে ঢালাই। কোথায় থাকে ? না কী এখন গাঁয়ে এসব হাওয়া এসে ঢুকেছে। পেট-বার করা জামা পরা, টাইট ফিট করে রংবাহারি কাপড় পরা। চোখে কাজল, চুলে ফুল।

সাবধানে বললো, তুমিই বুঝি বড় ?

তিলকা অবলীলায় বললো. বড় মানে ? কিসের বড় ?

মানে জ্যাঠার প্রথম সন্তান কিনা তাই বলছি।

তিলকা অতি সপ্রতিভভাবে বলে ওঠে, এ মা। আমি আবার আপনার জ্যাঠা-জ্যেঠির সন্তান হতে গেলুম কখোন ? আপনার জ্যেঠি তো আমার মাসি। তো হক কথা বলতে হবে. মা-মরা বোনঝিটাকে সন্তানতুল্য করে মানুষ করেছে মাসি।

ও।

শরবৎটা খেয়ে গেলাস নামিয়ে রাখে তারক।

তিলকা সেটা তুলে নিয়ে, ফালতুই একটা হাই তুলে বলে, আমি এখেনে থাকি না। কলকেতায় থাকি। মাসি বলে-কয়ে. দুদিনের জন্যে এসে থাকতে বলেছিল ! কাল ভোরে চলে যাবো।

শরীরে একটি মোচড় খাইয়ে চলে যায় তিলকা।

জ্যেঠির অতিভক্তির কারণটি অনুমান করে ফেলে মনে মনে হাসে তারক ! সে গুড়ে বালি জ্যেঠি। তারক তোমাদের মতলবের ফাঁদে পা দিচ্ছে না। মেয়েছেলের ওই গা মোচড় দেওয়া, বানিয়ে বানিয়ে হাই তোলা. আর ঢঙিনী সাজগুজ দেখলে তারকের বিষ ওঠে।

তবু সেই তিলকাই মাসির পায়ে পায়ে ঘুরে তারককে ভাতের থালা এগিয়ে দিল, খাওয়ার পর পানের খিলি এগিয়ে দিল। মাঝে মাঝে কাজলপরা চোখ তুলে একটু তাকাবারও চেষ্টা করলো, তবে তেমন সুবিধে করতে পারলো না।

অথচ মাসির ইচ্ছের আভাস পেয়ে বেশ পুলকিত হয়েছে তিলকা।....পাত্র হিসেবে এখন তারকের বাজারদর ভালো। তারকের মা বড়মানুষের বাড়িতে কাজ করতে ঢুকে মানুষ গৎরে গেছে ! তারকের মায়ের মনিব এবার ভোটে নেমেছে।

তাই কী যে সে পার্টি ? যে চিহ্ন দিয়ে সারা রাজ্যখানাকে মুড়ে ফেলেছে, তারকের মায়ের মনিবের সেই 'চেহ্ন'। সবাই জানে এরাই জিতবে। অতএব তারকের মায়ের মর্যাদা আরো এককাঠি বেড়ে গেছে। কাজেই তার ছেলে একখানা দামী পাত্তরই হবে।

ছেলের সাজসজ্জেও তো একদম বড়লোক বাবুদের ঘরের ছেলেদের মতো। অবশ্য এখন আর সবসময় সাজসজ্জে দেখে অবস্থা বোঝার উপায় তেমন নেই। লাঙল-ঠ্যালা চাষীর ছেলেটারও পরনে শার্ট-পেন্টুল, হাতে ঘড়ি, গলায় 'ট্র্যানজিস্টো' ঝোলানো। বৌ-ঝি'রও পরনে রঙিন ব্লাউস, ছাপা শাড়ি। তবু ওর মধ্যেই তারতম্য থাকে।

রাতে মা এ-কথা সে-কথার মাঝখানে বলে উঠলো, জ্যেঠির বুনঝিকে দেকলি ?

আসলে 'এ কথা, সে-কথাটা' ছল। এই প্রশ্নটির জন্যেই উসখুস করছিল 'মা'।

তারক অবোধের গলায় বলে, দেখবো না কেন ? সারাক্ষণই তো ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

হ্যাঁ, খুব কাজের মেয়ে। দেখতে শুনতেও মন্দ নয়। তো জ্যেঠির অবিসন্দিটা বুজলি ?

তারক আরো অবোধ। কিসের অভিসন্ধি?

তোরে যে জামাই করতে বাসনারে। আমায় কতো মিনোতি করে বলছিল—

তারক হেসে ওঠে, তাই বলো। এতোক্ষণ জ্যেঠির এতো তোয়াজের কারবারের মানে বো গেল। 'ছোটবৌ রোদে গরমে এসেছিস, শরবৎ খা।' হা হা হা।

মা রেগে বলে, তো ঘরে বে-র যুগ্যি মেয়ে থাকলি, নোকে অমন করেই থাকে। তো অ্যাকেবারে কাটকবুল পণ, 'বে করবো না'।

তারক একটু সান্ত্বনার গলায় বলে, আরে বাবা, শেষমেষ তো বলেচি, এখোন করবো না। ত বে করতে হলে, ওই শহুরে ছোপ লাগানো মেয়ে চলবে না মা। একদম নিপাট গাঁয়ের মেয়ে চা

মা একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, সে জিনিস কী আর তিভুবনে আচে বাপ! গাঁ-ঘরের সব মেয়ে-বৌই রোজগারের ধান্ধায় শহরে ছুটতেচে। কেউ ঝি খাটতেচে, কেউ চাল-চালানের বে করতেচে, আবার গরমেন্ট অ্যাখোন কতো দিকে কতো কারবার খুলে দেচে, তাতেও নেগে পড়তেচে সবার গায়েই শহুরে ছাপ নেগে যাচ্ছে।

তবে আর তোর তারকের 'বে' করা হবে না। ওই রংচঙে শাড়িপরা ঢঙি মেয়েগুলোকে দেক আমার হাড় জ্বলে যায়।

তারকের মা রেগে বলে, ওটা তোর ছুতো।

তবে তাই।.....এখোন ঘুমো তো। রাত কাবারেই ছুটতে হবে তা মনে আছে?

মনে অবিশ্যি আছে তারকের মার। যার জন্যে গিন্নী সেধে ছুটি দিয়ে পয়সাকড়ি দিয়ে পাঠি দিয়েছে।....সেই 'মা চণ্ডীর' পেসাদি ফুলটি টাটকাটাটকি নিয়ে বাবুর বালিশের তলায় রাখতে হ না? গিন্নী কতোখানি আশা উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে আছে।

তারকও উৎকণ্ঠিত। বড়দাবাবু মেদনীপুর থেকে ফিরলো কিনা কে জানে! যা আলাভোলা মানু তারক না থাকলে তেমন করে কে বুঝে নিয়ে দেখবে? তাছাড়া নেয়ও না তো আর কা সেবাযত্ন।....মা একটু যত্ন করতে এলে, 'সরো সরো যাও যাও', 'আমার কিছু দরকার নেই' ব ভাগিয়ে দেয়। বোনটাকে একটু ইয়ে করতো, তাও দিনদিন কমে যাচ্ছে। ক্রেমশঃই যেন সং থেকে আলগা হয়ে খসে পড়ছে।

সেই বড়দাবাবু। কতো হাসিখুশি ছিল। কতোরকম 'শখ' ছিল। খেলাধূলোয় মন ছিল। ঘুচে গেছে। ভগবান জানে, কী পাবার জন্যে এমন সব্বস্ব ত্যাগ!......সাধুসন্নিসী হয়ে, তার ম আছে। তারা সংসার-বৈরিগী হয়ে আত্মজন ত্যাগ করে ভবগান পেতে ছোটে। কিন্তু এরা?

তারক সেটা ভেবে পায় না। তাই অহরহ এই চিন্তা।

অবশ্য চিন্তার মূল সেই 'বড়দাবাবু'।

তবে একটা মন খারাপ-করা চিন্তা, মায়ের মনিব ওই বিপুল ঘোষালের সঙ্গে যোগাযোগ বড়দাবাবুর? লোকটা তো এক নম্বরের 'ভেজাল' আর 'ঘুঘু'! বড়দাবাবু তা জানেও। তবে কে

বীণাপাণি ঘরবার করছিলেন! তারকের মা ফেরামাত্রই তাকে চটপট সরিয়ে আনতে হবে। ঠাকুরের ফুলটুলের কথাটি যেন কাকে-পক্ষীতে টের না পায়। তাই তার ফেরার সময়টায় অস্থিরত

তা সে বাড়ি এসে ঢোকামাত্রই তাড়াতাড়ি আগবাড়িয়ে এসে বলে ওঠেন বীণাপাণি, কী তারকের মা, 'মা' কেমন আছে? 'মায়ের অসুখ বেশী' বলে আমার এই ডামাডোলের সময়ও নিয়ে ছুটে চলে গেলে—তো একটু সামলেছে মা?

মানে একা নীহারিকাই নয়, গল্প বানাবার ক্ষমতা অনেক গিন্নীই ধরেন।

তা তারক মাকে 'বোকা' বললেও এখানে তারকের মা বোকা বনে না। গলাটা একটু ভার ক

রে বলে ওঠে, 'যায় যায়' আবস্থাই হয়েছিল বৌদিদি। কোতা দিয়ে দিনরাত কেটেচে কে জানে! াবিনি যে মায়ের রেকে আবার ফিরতে পারবো। তো ভগবানের দয়ায় একটু সুরাহা হলো। তাই দকেই চলে এলুম। জানচি তো এখেনে 'আতান্তর'! তো এবারে সেই যারে মায়ের কাচে রেকে াসি, তারে কয়ে এয়েচি, একটুক 'বাড়াবাড়ি' হলিই অমন খপর দিওনি বাপু। একটা মান্যিমান ায়গায় কাজ করি, এমন যখন তখন হুটহাট চলে এলে চলে?

শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি। বীণাপাণি বুঝে নেন, তারকের মা তাঁর কায়দাটা ধরে ফেলেছে। নে মনে তারিফ করেন তাকে।

আর তারকের মা? সে মনে মনে তারিফ করে নিজেকেই, ওরে তারকের মা, দ্যাখ। তুই কী স্তাদ। মনিব-গিন্নী ভাবছেন, তিনি কতো বুদ্ধিমান।. ইদিকে তারকের মা যে, যে গাছ আদৌ নই, সে গাছের ফল খাওয়াচ্চে।

গিন্নী বলেন, এই তিন দিন ধরে রুগী নিয়ে জেরবার হয়েছো তারকের মা, নাও হাতমুখ ধুয়ে কটু চা খেয়ে নাও।

তারকের মা মনে মনে হাসে। এ-ও তোয়াজ।

তা তিন দিন অনুপস্থিত তারকের মায়ের তো ফেরামাত্রই মনিববাড়িতে তোয়াজ জুটলো। কিন্তু ারকের?

কেউ আশা করেনি, ওই থানায় ডায়েরি করতে যাওয়ার পরদিনই তারক ফিরবে, অথবা ফিরতে ারে। তাই দরজা খুলে যেই তাকে দেখলো যেন ভূত দেখলো সবাই। প্রথম দেখলো আদিত্য। ারণ আদিত্য তখন অফিস যাবে বলে, নীচের তলায় নেমে এসেছে।.....কড়ানাড়া শুনেই 'এসময় াবার কে এলো। বড়বাবু ফিরলেন বুঝি'। এই স্বগতোক্তিটি করে দরজা খুলতে এলো।

'বড়বাবু' অর্থে অবশ্য বাপ্পাদিত্য। ক'দিনের জন্যে মেদিনীপুরে যেতে হচ্ছে বলে চলে গেছে। িশ্চিত করে বা কখন ফিরবে জানা নেই। তাই কড়ানাড়ার শব্দ পেলেই সকলেরই মনে হয়, ওই লো বোধহয়

কিন্তু দরজা খুলে তারককে দেখে। সত্যিই ভূত দেখার মতো অভিব্যক্তি ফুটে উঠলো আদিত্যের খে। অস্ফুটে বোধহয় একটু আওয়াজ হলো, তুমি।

তারক বাবুকে একবারে যাকে বলে জরিপ করে নিয়ে বলে ওঠে, কী হলো মেসোমশাই। তারককে নতে পারছেন না কী? ভূত দেখার মতো চমকে উঠলেন যে?

এই। এইজন্যই তারককে দু'চক্ষের বিষ দেখেন। কথা বলার সময় জ্ঞান থাকে না মনিবের সঙ্গে থা বলছি। এ হাওয়া এনেছে বর্তমানের রাজনীতি। পায়ে মাথায় এক করতে শিখিয়েছে এরা। চ্চনীচ ভেদ রাখার নীতি ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলেছে। এসব ভাবলো আদিত্য এক মুহূর্তেই। ামার পুত্তুরটিও এই জোয়ারে ভেসে গেছেন। আগেকার দিনে কেউ ভাবতে পারতো, ভৃত্যজন ইভাবে কর্তার সঙ্গে কথা বলছে।....ভাববে কী করে? তখন যে 'বাবু' বলাটা রপ্ত ছিল। ওই ডাকের ঙ্গেই সমীহটা এসে যেতো। এখন সব মেসোমশাই। সাতপুরুষের 'শালীপো' সব।

তারকের কথাটার কোনো উত্তর না দিয়ে আদিত্য 'পত্রপাঠ' উল্টোমুখো হয়ে, পাশের বসবার রে চলে এলো। যে ঘরে আগে সত্যব্রত মক্কেলদের নিয়ে বসতেন। আর এখন বাপ্পা বেশী রাত রে ফিরলে বাড়ির কাউকে ডিস্টার্ব না করে চুপিচুপি শুয়ে পড়ে তারকের তত্ত্বাবধানে।

জনে জনে ভিন্ন অভ্যর্থনা।

নীহারিকা বলে উঠলো, এলি? বাঁচলাম বাবা। তবু ভালো যে দেশে গিয়ে আরো দশ দিন কাটিয়ে াসার ইচ্ছে হয়নি।

নয়নতারা সিঁড়ির ওপর থেকে ডাক দেন, টুসকি। অ টুসকি। বৌমা। কে যেন কড়ানাড়া দিল। বড়খোকা এলো না কী ?...বড়খোকা না ? তারক ? অমা ! হয়ে গেল দেশ বেড়ানো ? তা ভালো।

টুসকি ঘর থেকে বেরোল না। কিন্তু হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বসলো শিলাদিত্য। তাকে দেখতে পেয়েই তারক জিগ্যেস করে উঠেছিল, বড়দাবাবু ফেরে নাই ?

শিলাদিত্য জ্বলন্ত গলায় বলে উঠলো, 'ফেরে নাই' সে তো দেখতেই পাচ্ছো ? তো তুমি ভালোমানুষ সেজে কাজলকে কোথায় পাচার করে এসে ফিরলে শুনি ?

কী ? কী বললেন ? তারক চমকে উঠে বলে, কাকে পাচার করে ?

ওর ওই ফস করে জ্বলে-ওঠা মূর্তিটি দেখেই শিলাদিত্যর ভয় জন্মে যায়। ঐটা অপরাধীর চেহারা নয়। যতোই ঘোড়েল হোক, দোষ করে মিথ্যে চমকে ঠিক এভাবে জ্বলে উঠবে না।

তবু শিলাদিত্য সাহসে ভর করে বলে, কেন, কাজল তো হাওয়া হয়ে গেছে। কোথায় গেছে, তুই জানিস না ?

তারক জ্বলন্ত গলায় বলে ওঠে, মনিব হয়েছেন বলে মাথা কেনেন নাই ছোড়দাবাবু। একটু বুঝে সমঝে কথা বলতে শিখতে হয়।

বাঃ। চমৎকার !...বলে সরে পড়ে শিলাদিত্য। না বাবা ! আর ঘাঁটিয়ে কাজ নেই। বোঝাই যাচ্ছে এ হতভাগা কাজলের অন্তর্ধান রহস্যের শরিক নয়। এখন যা বলা হয়েছে, তাতেই না তেজ করে কাজ ছেড়ে দিয়ে চলে যায়। তাহলেই তো হয়েছে। গতকাল থেকে মা 'লোকশূন্য' রান্নাঘরের দিকে তাকিয়ে হা-হুতাশ করছে, এখন ছেলের দোষে কাজের লোক ছেড়ে গেলে হার্ট অ্যাটাক না হয়ে বসে। তা ছাড়া—দাদার ব্যাপারটাও ভাববার। বলতে গেলে দাদাটা তো তারকের হেফাজতেই থাকে। বড়দাবাবুর পরন-পরিচ্ছদের হিসেব রাখার দায়িত্ব তারকের। কাচে শুকোয় ইস্ত্রী করে রাখে। মানে একমাত্র তারকের সাহায্যটাই দাদা নেয় মান খুইয়ে। সমস্যা অনেক।

আর ঘাঁটালো না।

কিন্তু ওইটুকুই তো তারকের মর্যাদাহানি করার পক্ষে যথেষ্ট। তক্ষুণি তো তেজ করে বেরিয়ে যেতে পারতো, 'এই রইলো আপনাদের চাকরি' বলে।

সন্দেহটি যা প্রকাশ করে বসেছে শিলাদিত্য সেটি তো ছোটখাটো নয়। কিন্তু তারক মুখ্যু হতে পারে—নির্বোধ নয়। হঠাৎ রাগের মাথায় একবার তেমন ইচ্ছে হলেও, বুঝে ফেললো, সে কাজটা তারকের প্রতিকূলেই চলে যাবে। তখন অনায়াসেই সবাই বলতে পারবে, এর সবই পরিকল্পিত। মেয়েটাকে কোথাও পাচার করে এসে, লোক দেখিয়ে একবার নির্দোষ ভালোমানুষ সেজে দেখা দিতে এলো। জানে একটা কোনো বচসা হতেই পারে, তখন তেজ দেখিয়ে চলে গিয়ে—

হঠাৎ নাকটা কোঁচকালো তারক। ওই কাজলটাকে আমি—রাম বলো। হ্যাঁ, যদি কখনো বে করতে হয় তো—পিসিমার বাড়ির সেই পাপিয়া দিদিমণির মতো মেয়েকে। তো—তারকের ভাগ্যে তো তেমন জুটবে না।

যাক সে কথা। আপাততঃ তারক বিবেচনার বশে ওভাবে মেজাজ দেখানো থেকে বিরত থেকে নীহারিকার কাছে অন্যভাবে মেজাজ দেখালো।.....বলিহারি দিই মাসিমা আপনাদের 'সন্দ'কে। ওই কাজলটাকে আমি কখনো মনিষ্যির মধ্যে গণ্য করেছি দেখেছেন ? দুপুর হলেই পান খাওয়ার ছুতোয় ওই পানের দোকানে গিয়ে বসে আড্ডা মারতো, হলদে বাড়ির চাকরটা এসে জুটতো, দেখে আমার গা 'রি রি' করতো। কিছু বলতে গেলে বলতো, তুই কী জন্যে বলতে আসিসরে ? তুই আমার গার্জেন ?.....ওই ওদের কোনো বদমাশের সঙ্গে ভেগেছে। তো এমন বাড়ি খালি করে বেরোনো যে, বস্তা বোঝাই করে মালপত্তর নিয়ে সটকালো !....এখন ধর ব্যাটা তারককে। তো চলুন, কে

আমাকে থানায় নিয়ে যাবেন চলুন। দেখে আসি আপনাদের সেই 'বড়বাবু' না মেজবাবুকে। ক'বছর ঘানি টানাতে পারে তারককে।

হাতে চাঁদ-পাওয়া নীহারিকা বিগলিত হয়, থাম তো। আর মাথা গরম করতে হবে না। থানার সেই বড়বাবু বুড়ো বলেছিল বলেই, তোর ছোড়দাবাবু ঠাট্টা করলো, বুঝতে পারছিস না?....বুড়ো বলে কিনা, 'একই সঙ্গে দুটো ঘটনা—একজন দেশে গেল, একজন পালালো, এ তো জলের মতো সোজা।' পুলিশের লোকের তো সব্বাইকে সন্দেহ করাই পেশা।

টুসকিও এখন লজ্জা ঝেড়ে ফেলে তারকের সঙ্গেই কাজলের 'নেমকহারামির বিষয় নিয়ে গল্প করে।.....আসলে তারকের নামটা এ সংসারের সদস্য তালিকাতেই উঠে বসে আছে।....ওকে কেউ বাড়ির লোক ছাড়া ভাবে না।

নয়নতারাও যথেষ্টই স্নেহ করেন। তারক কাপড়চোপড় শুকোতে দিতে ছাদে উঠলে, তার সঙ্গে 'পাবনার' গল্প জোড়েন। তার মায়ের খবর নেন।

সত্যব্রতও জানেন, ওই কাঠখোট্টা চেহারার উদ্ধত কথাবার্তাওয়ালা ছেলেটা আসলে কিন্তু সৎ, খাঁটি।

উদ্ধত সত্যিই। আর কথাবার্তায় মাত্রা রাখার ধার ধারে না।

কিছু পরে তো দেখা গেল টুসকিকে বলছে—ছোড়দাবাবু যে কথাটা আমায় বলেছিল, তাতে তক্ষুণি আপনাদের চাকরিকে থোড়াই কেয়ার করে চলে যাবার কথা। দুশো টাকার চাকরি কি আর জুটতো না একটা তারকের? কিন্তু তাতে আপনারা হয়তো হাসাহাসি করে বলতেন, 'এইবার ওই কাজলের সঙ্গে ঘর করতে গেল।' গলায় দিতে দড়ি জুটতো না তারকের, তাই ওই আহ্লাদী ঢঙিনীটাকে নিয়ে ভাগতে যাবে।

তারপরই আবার একটু গভীর আক্ষেপের সুরে বললো, খেটে খাওয়া লোকদের আপনারা মানুষ বলে গণ্য করেন না দিদি, এটাই দুঃখ।

আগে বলতো 'টুসকিদি'। বলতো 'তুমি'। কিন্তু কোনো একসময় আপনি করে বলতে শুরু করেছে, 'দিদি' বলতে ধরেছে। নিজের বোধবুদ্ধিতেই করেছে। যদিও অ্যাতোটুকু একটা বাচ্চা মেয়ে থেকেই তো দেখছে। ঔদ্ধত্য আছে, সভ্যতাও আছে ছেলেটার।

টুসকিও তারক সম্পর্কে সন্দেহ দূর হওয়ায় দিব্যি আপনজনের সুরে আক্ষেপ জানাচ্ছে, শুনলে বিশ্বাস করতে পারবি না তারকদা। কাজল পাজীটা আমার কতোগুলো শাড়ি-জামা হাতিয়ে নিয়ে গেছে। মনে হচ্ছে তলে তলে দু-একটা করে সরিয়ে রেখে রেখে—আলনায় তো অতো ছিল না। এখন দেখছি এটা নেই, ওটা নেই, সেটা নেই।

ওই ধিঙ্গীকে যতো ইচ্ছে আসকারা দিয়ে দিয়েই মাথায় তুলেছিলেন। 'কাজল, তোর জন্যে চুড়ি আনলাম। এই নে।' 'কাজল, তোর জন্যে মালা আনলাম, এই নে!' 'কাজল, তোর জন্যে রিবন আনলাম, নে।'....ফল ফললো তো।

টুসকি একটু হতাশার গলায় বলে, মানুষকে ভালোবাসা স্নেহমমতা করা কী দোষের রে তারক? কে ভেবেছিল ও এইরকম করতে পারে!

তারক হঠাৎ বলে বসে, মানুষের অসাধ্য কাজ নাই। হয়তো এই তারকই কোনোদিন বেইমানী করে—

হঠাৎ চমকে উঠে বলে, কড়া নড়লো না?

হ্যাঁ, নাড়ছিল কড়া।

প্রতিমুহূর্তে যার প্রতীক্ষা করা হচ্ছে তার আগমনবার্তাই ঘোষিত হয়েছিল, সেই কড়ানাড়ায়।

দোতলা থেকে তারকের কেমন একটা বিকৃত কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেছলো, বড়দাবাবু !

যারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল, তারা গলা নামিয়ে বলেছিল, এমন কিছু না। পড়ে গিয়ে মাথায় একটু চোট লেগেছে। হসপিটাল থেকে সেলাই করিয়ে ব্যাণ্ডেজ করিয়ে আনা হয়েছে।....ভয়ের কিছু নেই।

তারাই ট্যাক্সি থেকে সাবধানে নামিয়ে বাড়ির মধ্যে এনে দিয়ে গেছলো।

সারা বাড়ির লোকই ছুটে নেমে এসে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বাদে আদিত্য। আদিত্য অফিসে। হয়তো সেটা শাপে বর হয়েছিল। আদিত্য কী পরিস্থিতিটাকে এমন স্তব্ধ থাকতে দিতো ? নিশ্চয় শোরগোল করতো, ছেলের সঙ্গের লোকগুলোকে জেরা করতো, সন্দেহ করতো। কোথায় কীভাবে পড়লো, কোন হসপিটাল থেকে ব্যবস্থা হলো, সেটা আস্থাযোগ্য না 'হাতুড়ে' জায়গা ইত্যাদি।

নীহারিকা অবশ্য একবার ডুকরে উঠেছিল, তৎক্ষণাৎ ছেলের বিরক্তিসূচক একটি 'আঃ' ধ্বনিতে সামলে গেছলো। টুসকির মুখে কুলুপ। মুখে কুলুপ সত্যব্রতর নয়নতারার শিলাদিত্যর। তারকেরও সেই একবারই যা। তারপরই নিশ্চুপ।

ছেলেটাকে যে কী আশ্চর্য রকমের ভয় সমীহ করে।....যে নীহারিকা গম্ভীর শান্ত শ্বশুরটিকে পর্যন্ত সুযোগ পেলে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে, সেও এই ছেলের কাছে চুপ।

প্রথম প্রথম অবশ্য খুবই চেঁচামেচি করেছে ছেলের অনিয়মিত আসা-যাওয়া, অনিয়মিত নাওয়া-খাওয়া ইত্যাদি নিয়ে। ক্রমেই ছেলের ওই অস্ফুট একাক্ষর বিরক্তি প্রকাশের উক্তিটি থেকেই, ছেলেকে ভয় খেতে শুরু করেছে নীহারিকা।

টুসকি অবিশ্যি আরো কিছুদিন চালিয়েছিল, কীরে দাদা ! একা তোর ওপরেই 'পৃথিবী উদ্ধারের' ভার পড়ে গেছে ? আহা !....কীরে দাদা, তোদের 'বিপ্লব'টা কতো দূর পর্যন্ত এগিয়ে এলো ? ওই মোড়ের মাথায় ? না চায়ের দোকানের কাছাকাছি ?....দাদা। এম. এস-সিতে এতো ভালো রেজাল্ট করে রিসার্চ শুরু না করে তুই ওই একটা রদ্দি ইস্কুলে মাস্টারী করতে ধরলি ? কোন প্রাণে ধরলিরে ? জানিস তো বারো বছর ইস্কুল-মাস্টারী করলে....কিসে পরিণত হতে হয়।....এও বলেছে, তোর এই যখন তখন অভিযানে বেরোনো আর স্কুল কামাই, চাকরিটা রয়েছে কী করে রে দাদা। ওঃ, সরি। যাদের স্কুল তারাই যে তোর প্রেরণাদাতা সেটা ভুলে গেছলাম।....আচ্ছা দাদা ! চুপিচুপি একটা কথা বল নারে। তোর এই বিরাট রাজকার্যের মধ্যে কোনো প্রেরণাদাত্রীটাত্রী নেই তো ?....

কিন্তু সে স্টেজও অনেকদিন হলো পার হয়ে গেছে। বিনা বাক্যব্যয়ে, কেবলমাত্র একটু ভুঁরু কুঁচকে তাকানোর অস্ত্রাঘাতে, টুসকির সে সব বাচালতা শেষ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

প্রথম প্রথম তো সত্যব্রত অনেক তর্ক করেছেন, প্রশ্ন করেছেন। জানতে চেয়েছেন কী তোর পথ ? কী তোদের মত ? কিন্তু নেহাৎ তরুণ নাতির সংক্ষিপ্ত এবং অবজ্ঞাসূচক উত্তরে ক্রমে থেমে গেছেন।

না। কোনোদিন জোর তলবে তর্ক করতো না বাপ্পা। শুধু একটা অবজ্ঞার হাসি হেসে বলতো, ও কী আর বলে বোঝানো যাবে ?....অথবা বলতো—চোখে ঠুলী বাঁধা থাকলে কী কেউ স্পষ্ট জিনিসটা দেখতে পায় ?....অথবা কখনো ঈষৎ ব্যঙ্গ হাসি হেসে বলেছে, পাবনার উকিলের মাথায় এসব ঢোকানো যাবে না।

আর বাপ-ভাইকে ?

তাদের তো 'মনিষ্যির' দরেই দেখে না কোনোদিন বাপ্পাদিত্য। পিঠোপিঠি ভাই হলেও, ছোটবেলা থেকেই ভাইকে খুব আগ্রহের দৃষ্টিতে দেখতো না সে। যে ছেলেটা লেখাপড়ায় নেহাৎই 'মাঠো', ক্লাশে

উঠতে পারলেই 'যথেষ্ট' মনে করে, দিনে দুখানা 'গল্পের বই' শেষ করতে পারে না, খেলার মাঠে ছোটবার জন্যে দুরন্ত তাগিদ অনুভব করে না, তাকে আবার মানুষ ভাববে কী ?

বড় হবার পরও—শিলাদিত্য যদি দাদার মতাদর্শ আর পথাদর্শ নিয়ে, তর্কের মধ্য দিয়ে নয়, সহজ মন নিয়ে জানতে চেয়েছে, 'দাদা' বলেছে, কেন, এসব 'ভূষিমাল' নিয়ে চিন্তা করতে বসে মাথাটাকে ডিসটার্ব করতে চাস বাবা ? সব ব্যাপার সব মাথায় ঢোকে না।....আরে বাবা, এ পৃথিবীতে কবিতাটবিতা লিখতে, প্রেমট্রেম করতেও তো কিছু লোকের দরকার। তোরা থাকবি সেই দলে।

হ্যাঁ, তখনও ঠাট্টাটাট্টা করে কথা বলতো বাপ্পাদিত্য নামের 'উন্নত গৌরকান্তি' ছেলেটা। যার চেহারায়—হুবহু পাবনার উকিল সত্যব্রত গাঙ্গুলীর ছাপ।

আস্তে আস্তে ক্রমশঃ কী ভাবে বদলে গেল সেই ২র আলো-করা বুকভরা ছেলেটা !....ভিতরে বাইরে। সেই উজ্জ্বল সোনার মতো রং ক্রমেই তামাটে কালচে হয়ে এসেছে। সেই লাবণ্যমণ্ডিত মুখে কেমন একটা কঠোরতার ছাপ। আর ভিতরে ?....একটা প্রাণবন্ত ছেলে যে কীভাবে ক্রমশঃই যন্ত্রে পরিণত হয়ে উঠতে পারে, বাপ্পা যেন তার নমুনা দেখাবার ভূমিকা নিয়েছে।

যন্ত্রই। হৃদয়ের বালাইশূন্য একটা ইস্পাতে-গড়া যন্ত্র।....এই তাদের মতাদর্শ। প্রশ্নহীন আনুগত্য। 'হৃদয়ের' বালাই বর্জিত একটা কাঠামো।

প্রথম প্রথম নীহারিকা ছেলের খাবার সময় সামনেই কাঁদো কাঁদো হতো। বলতো, নতুন নলেন গুড়ের পায়েস খেতে এতো ভালোবাসতিস বাপ্পা, বাটিটাকে সরিয়ে রাখলি ?.....মাংস রান্নার গন্ধ পেলে, আহ্লাদ করে বলতিস, 'মা, আজ বুঝি মাংস ? তার সঙ্গে লুচি করছো তো ?'....সেই লুচি মাংস ঠেলে রেখে তুই রুটি কুমড়োর তরকারি নিয়ে খাচ্ছিস !....এ তোর কী হলো বাবা ?

বাপ্পা বলতো, তোমার এই কান্নাটান্নার ব্যাপারগুলো বড্ড থিয়েটারী থিয়েটারী লাগে মা ! ওটা বরং অন্যত্র খরচ কোরো !....

এরপরে আর ক'দিন সেই উথলোনো মাতৃস্নেহকে প্রকাশ করা সম্ভব ?...

'ভালো' জিনিস খাওয়া না কী অপরাধ। যেহেতু দেশের অর্ধেক লোক খেতে পায় না !....'তোমাদের ইচ্ছে হয় খাও না বাবা যতো পারো।' মানমর্যাদা হারানোর ভয়েই ক্রমশ চুপচাপ হয়ে যেতে হয়েছে নীহারিকাকেও।

তাই এখন ছেলেকে ক'দিনের পর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ফিরতে দেখেও চুপ করে যায় নীহারিকা। চুপ করে থাকে। বাড়ি ফিরে মায়ের ঘরের কাছে নিজের বিছানায় এসে শুলো, এটাই যথেষ্ট ভাগ্য বলে মানছে এখন নীহারিকা।

॥ এগারো ॥

নীলাম্বর ব্যানার্জি অর্থাৎ নীহারিকার পরম আদরের আর ভক্তি-ভালোবাসা এবং সমীহর 'নীলুদা' তাঁর মেদবহুল প্রৌঢ় শরীরটি নিয়েও গাড়ি থেকে নেমেই দুমদাম পা ফেলতে ফেলতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে এসে হাঁক পাড়লেন, কই ? কই রে নীহার ! তোর সেই বীরপুরুষ পুত্রটি কই ? অ্যাঁ ? একবার দেখে চক্ষু সার্থক করতে এলাম।

পেটেন্ট বাজখাঁই গলা, যেটা শুধু দোতলায় কেন, দোতলার ছাদ ভেদ করে তিনতলা পর্যন্ত উঠে যায়। এবং যেটা শুনলেই বোঝা যায়, স্বরের ওই বাজখাঁই ভাবটি কিছুটা তৈরী করাই।....নিজেকে ভালো করে জাহির করতে এও একটা চেষ্টা মানুষের। 'আমার আবির্ভাব মাত্রই পরিমণ্ডল আমার সম্পর্কে সচকিত হয়ে উঠুক।'......

তা হলোই সচকিত।.....নীহারিকা কোনদিক থেকে যেন ত্রস্তেব্যস্তে ছুটে এলো 'নীলুদার গলা না?' বলে।

তিনতলায় সত্যব্রত আর নয়নতারা পরস্পর তাকাতাকি করলেন। এই মানুষটাকে তাঁরা প্রীতির চক্ষেই দেখেন। কারণ, মানুষটা বড়লোক হয়েও উন্নাসিক নয়, বরং বেশ মাই ডিয়ারি ভাব। এবং এনাদের সম্পর্কে 'আত্মীয়স্বজন ও গুরুজন' এই গোছের বোধেরও প্রকাশ আছে। হয়তো এমনও হয় এনাদের কাছে এসে বসে পড়ে ঘণ্টা কাটিয়ে দেন। যেটা নীহারিকার দু-চক্ষের বিষ। নীহারিকার একান্ত 'নিজজনেরা'ও যে কী জন্যে এ বাড়িতে এসেই সত্যব্রত আর নয়নতারার খোঁজ করে তা বুঝে উঠতে পারে না নীহারিকা। এতো কিসের সৌজন্য রে বাবা!....

নীহারিকা তাই তাড়াতাড়ি ঘাঁটি আগলাতে আসে। বলা তো যায় না। নয়নতারা যদি দোতলায় নাতির কাছে এসে বসে থাকেন মায়া দেখাতে, হয়তো এক্ষুণি আগবাড়িয়ে এগিয়ে এসে আপ্যায়িত করতে বসবেন, 'কী বাবা? কতোদিন পরে? অনেকদিন আসোনি বাবা।'

নীহারিকার ভাই, অথচ উনি এমন সৌজন্য দেখাতে আসবেন, যেন ওনারি সাতকালের কেউ। তা নীহারিকার দিকে যে কেউই আসুক, এটাই নাকি ওনাদের পাবনার সহবৎ সৌজন্য!....নীহারিকার দু'চক্ষের বিষ।

নীহারিকা ভিজে হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে কৃতার্থ মন্যের মতো ছুটে আসছিল 'নীলুদার গলা না?' বলে। সামনেই এসে দাঁড়ালো নীলুদার ড্রাইভার ননী। হাতে একটা সুদৃশ্য বেতের বাস্কেট। এটা নীহারিকার পরিচিত, নীলুদার গাড়িতে মজুত থাকে। নীলুদা আসার আগে কোনো কোনোখানে গাড়ি থামিয়ে এটাকে ভর্তি করে নেয় এবং এখানে সেগুলি উজাড় করে দেয়!....এবং সঙ্গে সঙ্গে বলেন 'এই নীহার, আমার ঝুড়িটায় নজর দিবি না খবরদার। ভাবিসনি ওটা সমেতই তোকে 'প্রেজেণ্টো' করা হচ্ছে।'

তা সেসব প্রেজেণ্টের বস্তুগুলি সবসময়ই উচ্চমানের। কখনো উৎকৃষ্ট ন্যাংড়া হিমসাগর আম, কখনো অতি পুষ্ট মর্তমানের ছড়া এবং লিচুর বোঝা। কখনো বা নিউমার্কেটি আপেলের সম্ভার। ফল না হলে নিদেনপক্ষে সন্দেশের বাক্স, 'কেক'-এর বাক্স।

আজ দেখা যাচ্ছে বাস্কেট উপছোন আপেল। আর ভারী একটা আঙুরের থোলো।

এটা বোধহয় রোগী দেখতে আসার কানুনমাফিক।

'বীরপুরুষ' অর্থে তো মাথা ফাটিয়ে আসা বাপ্পা। এই নামকরণটি কিন্তু বাপ্পার এখনকার মাথা ফাটানো বাবদই নয়, ছেলেবেলা থেকেই 'নীলুমামা' বাপ্পাকে বীরপুরুষ নামে ডাকেন। সেই ওর 'বীরপুরুষ' কবিতা আবৃত্তির সূত্রে।

বছর পাঁচ-ছয়ের বাপ্পা যখন তার দেবশিশুসদৃশ মূর্তিটি নিয়ে ঝপ করে মাথায় একটা গামছা কী তোয়ালে দিয়ে পাগড়ি বানিয়ে নিয়ে মহোৎসাহে আবৃত্তি করতে করতে বলতো—'কতো লোকের মাথা পড়লো কাটা!'....তখন তার বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গী দেখে সাবই হেসে গড়াতো। আর নীলুমামা?....হঠাৎ নিজের গলাটা দু-হাতে চেপে ধরে আর্তনাদ করতেন, 'ওহো হো, মাথাটা কোথায় ছিটকে গেল গো? একটা মাত্তর মাথা যে আমার গো! সেটাও গেলো!' তখন উপস্থিত আসরে হাসির বান ডাকতো!

তদবধি ওই বীরপুরুষ।

সেই বাপ্পার চেহারা কি হয়ে গেছে! দেখে দেখে চোখে জল আসে নীহারিকার।

নীলু ব্যানার্জির বাজখাঁই স্বর বাপ্পার কানেও পৌঁছলো বৈকি। আর পৌঁছনো মাত্রই মুখটা একটু বিকৃত করলো।....যদিও বহুকালের মধ্যেই দেখাসাক্ষাৎ নেই, তবু লোকটার ওপর কেমন যেন একটা

বিতৃষ্ণার ভাব পোষণ করে বাপ্পা।....এবং সে বিতৃষ্ণা আরো বাড়ে, যখন মনে পড়ে যায়, ছেলেবেলায় এই লোকটাকে দেখলেই আহ্লাদে আটখানা হতো বাপ্পার। হ্যাঁ, তিন ভাইবোনই হতো।....

হয়তো নীহারিকার নীলুদা আসামাত্রই বাড়িতে একটা উৎসবের মতো সাড়া পড়ে যেতো বলে, হয়তো বা মা অতো খুশী হতো বলে, এবং অবশ্যই তার সঙ্গে যুক্ত হতো, নীলুমামার আনা উপাদেয় খাদ্যসম্ভার।

বড় হয়ে হয়তো এটাই রাগের কারণ হয়ে গেছে। নিজের ওপর নিজের রাগ। ইস ! কী হ্যাংলাই ছিলাম ! মা যখন আহ্লাদে ভাসা গলায় বলে উঠতো, 'এই বাপ্পা, শিলু, টুসকি, দ্যাখ তোদের নীলুমামা কী কাণ্ড করেছে। কতো জিনিস এনেছে—' তখন মনে হতো, উঃ, কতোক্ষণে মা ওগুলো বার করে আমাদের দেবে।

ছেলেবেলার সেই স্মৃতি বড় হবার পর যেন মনকে কষাঘাত করেছে !....হয়তো সকলের এমন হয় না। হয়তো বাপ্পার ভাইবোনেরা এখনো নীলুমামাকে আসতে দেখলে উৎফুল্ল হয়। বাপ্পার মনের গড়ন আলাদা।

বাপ্পার বিশেষ করে খারাপ লাগে মার ওই কৃতার্থমন্য ভাব, আর মুখেচোখে ঝলসে ওঠা আলাদা একটা আলো।

সে আলো আজও ফুটলো।

নীহারিকা ননীর হাত থেকে বাস্কেটটা নিয়ে ফলগুলো অন্য একটা ডালায় ঢেলে, ননীকে বললো, নাও বাবা ননীগোপাল, তোমার বাবুর আসল দামী জিনিসটি ফেরৎ নাও।

ফিরিয়ে দিল বাস্কেটটা।

ননীর সঙ্গে কথা বলার মধ্যেও যেন আদেখলে ভাব নীহারিকার। এটা আজকাল টুসকিও ধরতে পারে।

নীহারিকা ছেলের কাছে ছুটে এলো। এই বাপ্পা, দ্যাখ কে এসেছে ! তোর অ্যাকসিডেন্ট শুনে—উঃ, এতো বড় একঝুড়ি কী ভালো ভালো ফল এনেছে ! আবার কেকও !....কী রে বাবা, এমন অসময়ে ঘুমিয়ে পড়লি না কী ? অ বাপ্পা।

নীলুদা সামনের একটা চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেন। মৃদু হেসে তেমনি বাজখাঁই গলাতেই বলেন, ওরে নীহার, এ যে দেখছি জেগে ঘুম। এ তোর ওই মিহি ডাকে ভাঙবে না।....বলি ওহে বীরপুরুষ, আমার যে বেশ মনে হচ্ছে জেগে ঘুম। বেলা সাড়ে দশটায় ঘুম কী রে ? চোখ খোল, চোখ খোল।....ওরে বাপ ! দ্যাখ শকুনিমামাও নয়, কংসমামাও নয়, কালনেমি মামাও নয়, নেহাৎই নিরীহ গোবেচারী নীলুমামা।

এরপর আর বাপ্পার ঘুমের ভান চলে না। সে চোখ খুলে গম্ভীরভাবে বলে, গলার আওয়াজ শুনলে নিশ্চয় গোবেচারী মনে হয় না।

নীলুমামা হা হা করে হেসে ওঠেন, আরে বাবা ; জানিস না শূন্য কলসীর শব্দ বেশী ! গুণ বলতে তো কিছু নেই যে লোকে একটু মান্য সমীহ করবে ? তাই গলার জোরেই—তো মাথাটা ফাটালি কার সঙ্গে যুদ্ধ করে ?

নীহারিকা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ওমা ! যুদ্ধ হতে যাবে কেন ? পড়ে গিয়ে তো—

নীলুমামা মুচকি হাসি হেসে বলেন, সেটা বুঝি তোর ওই বীরপুরুষ বেটার চ্যালারা ওই বলে বুঝিয়েছে ! আরে বাবা—যে পথটি বেছে নিয়েছেন তোর পুত্তুরটি, সে পথে আছেই এসব ফাইট। হচ্ছিলটা কী ? কাকে টাইট্ দিতে গিয়ে ফাইট ? জমির মালিক ? না নতুন দখলীদার ?

বাপ্পার ভুরুটা কুঁচকে ওঠে। যদিও ভুরুর ওপর পর্যন্তই মাথায় বাঁধা ফেট্টিটা নেমে এসেছে।

এমনিতেই কুঁচকে আছে।

বললো, আপনি তো দেখছি সব খবরই রাখেন, তবে আর জিগ্যেস করছেন কেন ?

অতি সপ্রতিভ নীলুমামা হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে যান। মুখে একটা কালো ছায়া এসে পড়ে। বলেন, সবটাই কী আর জানা যায় বাবা ? তোমাদের সব কতোরকম মন্ত্রগুপ্তি।...তবে রাস্তাটা ভালো ধরিসনি বাবা ! এ রাস্তায় তোদের মতো অনেস্ট ছেলেদের মুশকিল !

বাপ্পা ভেবেছিল লোকটাকে অবজ্ঞা করে ঘর থেকে ভাগাবে। বাপ্পার চোখের আড়ালে মা যতো ইচ্ছে গদগদ হয় হোকগে, বাপ্পার ব্যাপারে কাউকে নাক গলাতে আসতে দেবে না। কিন্তু এখন হঠাৎ একটু সচকিত হয়ে বলে ওঠে, এ কথার মানে ?

নীলুমামা তেমনি গম্ভীরভাবেই বলেন, মানে হচ্ছে তুই—আর তোদের মতো ছেলেরা তো দুর্নীতির সঙ্গে, অন্যায়ের সঙ্গে আপোস করে চলতে পারবি না। অথচ তোদের পার্টির নিয়মটি হচ্ছে 'কর্তাভজা'।

আপনি এতো সব জানলেন কোন সূত্রে ?

নীলুমামা বলেন, ওরে বাবা, সূত্রটুত্র কিছু না। এ দুনিয়ায় চোখ-কান খোলা রেখে চলতে জানলে, অনেক কিছুই জানা যায়। তোর জন্যে আমার দুঃখ হয় বীরপুরুষ। যতো দিন যাবে, দেখবি তোদের কর্তারা তোদের মূল আদর্শ থেকে কতো দূরে সরে এসেছে। দিনে দিনে আরো কত সরে চলেছে। অথচ তোরা সেই মূলটাকে মনেপ্রাণে আঁকড়ে ধরে বসে আছিস !

বাপ্পা হঠাৎ বালিশে ঠেস দিয়ে উঠে বসে বলে, 'মার্কসিজম' সম্পর্কে আপনার কিছু পড়াশুনো আছে ?

পড়াশুনো ?

হঠাৎ নীলুমামা নিজস্ব স্টাইলে দরাজ হাসি হেসে ওঠেন, পড়াশুনো ? তোর নীলুমামা ? ক্ষেপেছিস ? এ ব্যাটাও দেশের বেশীর ভাগ লোকের মতোই না পড়ে পন্ডিত, সবজান্তা। সব নিয়েই কথা কইতে যেতে পারি। আর সব ব্যাপারেই একটা ফতোয়া জারি করতে পারি।

ওঃ। ভালো। বলে বাপ্পা আবার শুয়ে পড়ে।

নীলুদাকে বাপ্পার কাছে রেখে নীহারিকাকে চলে যেতে হয়েছিল আতিথ্যের আয়োজন করতে। মনের মধ্যে রীতিমত অস্বস্তি নিয়ে। যে ছেলে ' কারুর মানমর্যাদা রেখে তো কথা বলতে জানে না। হয়তো নীলুদার মুখের ওপর তুচ্ছতাচ্ছিল্যভাবে কিছু বলে বসবে।....এই তো ঠাকুর্দাকেও তো কাল কীভাবে বললো, বরাবরই দেখি—যা বোঝেন না, তা নিয়ে কথা বলতে আসেন !

তবু সত্যব্রত একটু হেসে বলেছিলেন, 'একটা কথা তো বুঝি রে ভাই, 'দেশ' নিয়ে যদি কিছু চিন্তা করতে ইচ্ছে হয়, তার প্রথম শর্ত হচ্ছে নিজের দেশকে জানা, আর তাকে ভালোবাসা।....দেশকে ভালোবাসতে না পারলে, দেশের মানুষকে ভালোবাসতে না পারলে, দেশের ভালোটা তুমি করবে কোন শক্তিতে ?'

তা অবিনয়ী ছেলেটা আর কথা না বলে, পাশ ফিরে শুয়েছিল।

কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি নীহারিকার। 'ওনার মান্য থাকলো আর গেল, সে নিয়ে মাথাব্যথা কিসের ? বিরোধী পক্ষটি তো তাঁর নিজেরও নাতি। সেখানে নীহারিকার কোনো দায় নেই।

কিন্তু এক্ষেত্রে ?

নীলুদার মুখের সামনে যদি পাশ ফিরে শোয় নির্বুদ্ধি ছেলেটা ! ভেবেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছিলো নীহারিকার। নিজে সামনে থাকলে তবু পরিস্থিতিকে কিছুটা সামাল দিতে চেষ্টা করা যায়।....কিন্তু

এক্ষেত্রেও যে নিরুপায়।.....নীলুদার আপ্যায়নের ভারটি তো আর শুধু টুসকরি ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না!.....

যাক! এখন ওই গলাখোলা হা হা হাসিটা শুনে বেচারীর ধড়ে প্রাণ এলো!

কিন্তু ইত্যবসরে যে নীলুদা আবার সাপের ল্যাজে পা দিয়ে বসে আছেন তা কী জানে ছাই নীহারিকা?

আসলে ওই ছেলেটা সম্পর্কে নীলু ব্যানার্জির ঠিকমতো সমীহ বোধ নেই। তিনি সেই ছোট ছেলেটাই ভাবছেন। তাই আবার বলে বসেছেন, যাই বলিস বাবু, সেকালের নেতারা তাদের চেলাচামুণ্ডাদের মধ্যে দেশাত্মবোধের ভাব এনে দিতে পেরেছিলেন। সেকালে যাঁরা রাজনীতিতে এসেছেন 'দেশ'কে ভালোবেসে। কিন্তু একালে?

বাপ্পা আবার উঠে বসেছে। নীরস বিরস গলায় বলেছে, 'দেশ' বলতে আপনি কী বোঝেন?

যাঃ বাবাঃ। 'দেশ' বলতে কী বুঝি কী রে? দেশ! তার মানে জন্মভূমি! তার মানে আমাদের এই ভারতবর্ষ। যার ইয়ে আকাশে বাতাসে প্রবাহিত হয়ে চলেছে, ভারতীয় মুনিঋষিদের ইয়ে আধ্যাত্মসাধনার চেতনা। যার মধ্যে হাজার হাজার বছরের ঐতিহ্য। যার মধ্যে—

এই সময় বাপ্পাই হঠাৎ বেশ সোচ্চারে হেসে উঠে বলেছে, নীলুমামা। আজকাল শুনেছি যাত্রাটাত্রা করায় কোনো নিন্দে নেই। আপনার প্রতিভা আছে। কোনো যাত্রাদলে নাম লেখালে, আপনি নাম করতে পারবেন।

নীহারিকা আবার ছেলের উচ্চহাসি শুনতে পেল। যেটা নাকি বহুদিনই দুর্লভ হয়ে গেছে। নীহারিকা ভাবলো, আজ কার মুখ দেখে উঠেছিল।

নীহারিকা টেবিলে খাবার সাজিয়ে বলল, টুসকি, তোদের নীলুমামাকে ডেকে আন। বলগে মার চা হয়ে গেছে।...আর শোন—এই আঙুর কটা দাদাকে দিগে যা, বলগে নীলুমামা এনেছে।

টুসকি শঙ্কিতভাবে বলে, দাদাকে আঙুর? দাদা এসব শৌখিন জিনিস খায়?

নীহারিকা বিগলিত গলায় বলে, খাবে—খাবে। দেখিস, আজ কিছু বলবে না। আজ খুব মন ভালো আছে। যা চট করে। দিয়েই মামাকে ডেকে আন।

ডেকে আনতে হলো না। 'মামা' নিজেই নেমে এসেছেন। একবার টেবিলের দিকে আর একবার নীহারিকার আহ্লাদে ভাসা মুখের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ থমকান। তারপরই নীরস বিরস গলায় বলেন, তুই এতো কষ্ট করে এতো সব—আমার কিন্তু একটু জরুরি কাজ আছে রে। চলি।

এ আবার কী। দু-দুটো উচ্চহাসির পর এটা কী? নীহারিকা যেন হঠাৎ সাপের ছোবল খায়।

নীলুদার মুখের দিকে তাকায়। সে মুখ থমথমে অন্ধকার।.....ছেলেটার সেই হাসি কী তবে ব্যঙ্গহাসি?

নির্ঘাৎ তাই।

নীহারিকা সর্বশরীর হিম হয়ে আসে। তবু কষ্টে মুখে হাসি আনবার চেষ্টা করে বলে, 'চলি' মানে? বাঃ। আমি বলে তোমার জন্যে—

নীলুদা তবু দরজামুখো হয়ে বলেন, কী করবো, উপায় নেই রে। একদম ভুলে গিয়েছিলাম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। মিথ্যে খাটুনি হলো তোর।

নীহারিকার চোখের সামনেটা গভীর অন্ধকারে ডুবে যায়। নীহারিকার পায়ের তলার মাটি ধসে যায়। ওর মনে হয় ওর জীবন থেকে 'নীলুদা' নামটি বোধহয় মুছে গেল এবার! আর পারলো না। হঠাৎ রুদ্ধ কণ্ঠে 'নীলুদা' বলে ডেকে উঠে, স্রেফ যাকে বলে 'ভ্যাঁক্' করে, সেইভাবে কেঁদে ফেললো।

নীলাম্বর ব্যানার্জি নামের রীতিমতো ঘুঘু ঘোড়েল লোকটি একবার তাঁর চিরদিনের একটু বিশেষ স্নেহের পাত্রীটির দিকে তাকিয়ে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে ডিসিশান নিয়ে নিলেন। আরে ধ্যেৎ! চিরকেলে কথা, কুকুরের কামড় হাঁটুর নীচে। ব্যস। আচমকা আবার সেই দরাজ হাসিটি হেসে বলে উঠলেন, কী? খুব একখানা রাম ঘাবড়ানো ঘাবড়ে দিলাম তো? ছ্যা ছ্যা। এখনো তুই সেই ছোটবেলার মতো ছিঁচকাঁদুনী আছিস? টুসকি, তোর এই মা-টাকে এতোকালেও একটু মানুষ করে তুলতে পারলি না? কোনো কর্মের নয়।....এইসব সযত্নরচিত সুখাদ্য ফেলে তোদের নীলুমামা সত্যি নড়বে ভাবলি?.....হুঁঃ। অতো বুদ্ধু পাসনি।.....তোর দাদা বললো, 'মামা, আপনি খুব ভালো অ্যাকটিং করতে পারেন দেখছি। যাত্রাদলে নাম লেখালে 'নাম' করতে পারবেন।'.....তো ভাবলাম, একটু পরীক্ষা দিয়ে দেখি। তো দেখছি ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।.....

অতঃপর নীলাম্বর ব্যানার্জি বেশ খানিকক্ষণ ধরে তারিয়ে তারিয়ে নীহারিকার চটজলদি অবদান 'মোগলাই পরোটা', বেসমের গোলায় ডোবানো পার্শে মাছ ভাজা এবং 'আলু, পিঁয়াজ, চিঁড়ে' ভাজা খেলেন।

এবং তার ওপর হঠাৎ সত্যব্রত নেমে আসায়, তাঁর সঙ্গে বহুক্ষণ বাক্যালাপ চালিয়ে তবে প্রস্থান করেন।

হ্যাঁ, ভেবে দেখলেন এটাই হচ্ছে উচিত চাল। ওই অর্বাচীনটার কথায় 'অপমানবোধ' করে একবার চলে গেলে, আর আসা শক্ত। তার মানে একটি মলয় বাতাসের জানলাকে জন্মের শোধ ছিট্‌কিনি লাগিয়ে ফেলা।

পিসির মেয়ে নীহারিকার সঙ্গে কী কোনোরকম অসঙ্গত সম্পর্ক আছে নীলাম্বরের? যার সঙ্গে নাকি বয়েসের ব্যবধান দশ-বারো বছরের। না, তেমন সম্পর্ক আছে বললে অন্যায় বলা হবে।....এ যেন একটা কৌতুকমিশ্রিত 'প্রেম প্রেম' ভাব। নীহারিকার দিক থেকেই যতো আকুলতা ব্যাকুলতা, কৃতার্থমন্যতা। নীলু ব্যানার্জির দিকে অবশ্য ততোটা নয়। খানিকটা মমতা এবং করুণার বশে আরোপিতই।

দোতলা থেকে নামবার সময় ভাবতে ভাবতে আসছিলেন। জরুরি কাজের অছিলা দেখিয়ে চলে তো যাবেনই। আবার যাবার সময় এই কথাটিও বলে যাবেন, 'তোর যদি কখনো নীলুদাকে দেখতে ইচ্ছে করে নীহার, একটু জানাস, ননীকে দিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দেবো।'

তার মানেই নীলুর 'এই শেষ':

কিন্তু নীলু ব্যানার্জি নিজেকে কী আশ্চর্য কৌশলে মুহূর্তে সামলে নিলেন।

পরিতোষ করে খেয়ে এবং অকারণেই অনেকখানিটা সময় খরচ করে চলে গেলেন নীলু।....প্রাণটা ভরাট হয়ে থাকবার কথা। কিন্তু, মাঝখানে ওই আলপিনটা যে অনবরতই বিঁধতে থাকে নীহারিকার চেতনার মধ্যে।....ওই কথাটা বললো কেন নীলুদা টুসকিকে? তোর দাদা বললো, 'যাত্রাদলে নাম লেখালে আপনি 'নাম' করতে পারবেন মামা।'

এরকম কথা বলতে গেল কেন বাপ্পা? কী সূত্রে?

মনের মধ্যে বেশীক্ষণ রাখতে পারে না কথাটা নীহারিকা। টুসকিকে বলেই ফেলে। প্রশ্ন করে, 'কেন' বল তো?

টুসকি ভেবেচিন্তে বলে, হয়তো নীলুমামা খুব হাত-পা নাড়ছিল, বড় বড় কথা বলছিল, তাই। আজ দাদার মুড্‌টা ভালো আছে বোধহয়। ঠাট্টা করে বলেছে।

কিন্তু তাই কী?

প্রথমটায় নীলুদার যে মুখচ্ছবি দেখলো নীহারিকা....সেটাই অভিনয় ? পরবর্তীটা আসল ?....নাকি উল্টো ? বুক উথলে কান্না আসে নীহারিকার। জগতে এই একটা মানুষ নীহারিকাকে নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসে।....কোনো প্রতিদান চায় না, শুধু দিয়েই খুশী। সেই সম্পর্কটুকুর ওপর কি শনির দৃষ্টি পড়তে চললো ?

ছেলে কি নীহারিকাকে 'সন্দেহ' করে ? ভেবেই হঠাৎ খুব রাগ আসে নীহারিকার। কেন ? কী জন্যে ? কী অসঙ্গত ব্যবহার করেছে যে করে ? নীলুদা তার থেকে দশ-বারো বছরের বড় দাদা না ? নাকি আট-দশ ? ঠিক মনে নেই। তবে নীহারিকা যখন ফ্রক পরে বেড়াতো নীলুদা নীহারিকার মাকে বলতো না, 'বুঝলে পিসি, তোমার এই মেয়েটার ফুলো ফুলো গাল দুটো দেখলেই কষে টিপে দিতে ইচ্ছে করে।' বলতো এবং দিতোও।

নীহারিকা বলতো, আঃ নীলুদা, ভালো হবে না বলছি।

নীলু বলতো, মন্দই হোক না। দেখি সেটা কেমন।

সেই নীলুদা কত বড় হয়ে গেছে। বিয়ে থাওয়া ঘরসংসার। কতো বড়লোকও হয়েছে, তবু নীহারিকাকে মনে রেখেছে, এটা কম ভাগ্যের কথা ?'......

হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা যাদের সন্দেহ হবার কথা তাদের তো কই তেমন ভাব দেখি না। আদিত্য তো নয়ই, আমার শ্বশুর-শাশুড়ীও তো ওকে দেখে বেশ হৃষ্টই হন। এই তো আজই তো শ্বশুরমশাই নিজেই চটি ফটফটিয়ে তিনতলা থেকে নেমে এসে বললেন, 'এই যে নীলাম্বর ! ভালো আছো তো বাবা ? অনেকক্ষণ থেকে গলা পাচ্ছি—মনটা চঞ্চল হচ্ছে।'

নীলুদা বললো, 'তিনতলা থেকে আমার গলা পাচ্ছিলেন ?'

তো শ্বশুরমশাই তখন হেসে বললেন, 'এই যে এখন লজ্জা ত্যাগ করে কানে গহনা পরে বেড়াচ্ছি।'

নীলুদা তো খুব উৎসাহ দেখালো। বললো. 'এতোদিন এ লজ্জা ত্যাগ করলে, অনেক ভালো হতো। বললো, আপনার সঙ্গে গল্প করে খুব ভালো লাগলো।'

আমি তো অস্বস্তিতে মরছিলাম, এই বুঝি বলে বসেন, 'গহনাটি মেয়ে করে দিয়েছে।' কী ভাগ্যি সেকথা বললেন না। যাক তবু নীলুদা ওনার সঙ্গে অতোক্ষণ কথা বলায়, আমি স্বস্তি পেলাম। তক্ষুণি যদি চলে যেতো, মনের মধ্যে আরো পিন ফুটতো।.....গিন্নীটিও তো নেমে এলেন। 'বাবা-বাছা' করে আত্মীয়তা করলেন। যাই হোক, ওনাদের মনে যদি 'সন্দেহ' থাকতো, এমন প্রাণ খুলে কথা বলতেন ?....আমার ছেলেটিই অন্যরকম। 'গুরুজন'কে অপমান অপদস্থ করতেই যেন ওর আহ্লাদ।

সত্যব্রত গাঙ্গুলীও তাঁর কুটুম্ব ছেলেটির কাছে এই আক্ষেপই করছিলেন, বুঝলে বাবা নীলাম্বর সেকালের শিক্ষাদীক্ষা আর একালের শিক্ষাদীক্ষায় আকাশ-পাতাল তফাৎ। সেকালের শিক্ষা ছেলেদেরকে নম্রতার শিক্ষা দিতো, ভব্যতার শিক্ষা দিতো, চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতো, শ্রদ্ধেয়কে শ্রদ্ধা করবার, গুরুজনকে সম্মান করবার, আর সর্বোপরি নীতিবোধের শিক্ষা দিতো। একালে ওসব সেকেলে গাঁইয়ামি বলে বাতিল হয়ে গেছে। একালের শিক্ষা হচ্ছে, কী ছেলে কী মেয়ে নির্বিশেষে কেবলমাত্র কৃতী হবার শিক্ষা। কেবলমাত্র 'কেরিয়ার' গড়ে তোলার শিক্ষা। একালের শিক্ষায় ঔদ্ধত্যই হচ্ছে স্মার্টনেস'। আত্মস্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে আধুনিকতা।...আর রাজনীতি ? সেকালের রাজনীতির শিক্ষা ছিল, মানুষের মধ্যে 'মনুষ্যত্ববোধটি' জাগ্রত করবার, মানুষকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করবার, দেশের মানুষকে আপনজন বলে ভালোবাসতে পারবার। আর একালের রাজনীতির শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের মধ্যে থেকে 'মনুষ্যত্ববোধ' নামের জিনিসটিকে নিংড়ে বার করে দূর করে ফেলে দেবার। 'দেশাত্মবোধ'

শব্দটিকে অজানা অপরিচিত করে রাখবার, এবং নীতি-দুর্নীতির বালাই থোড়াই কেয়ার করে, কেবলমাত্র আত্মস্বার্থটি বজায় রাখবার।.....একালের রাজনীতি এই অভাগা দেশটাকে হৃদয়ের দিক থেকে একেবারে দেউলে করে ছেড়েছে।.....এ যুগের জন, অনায়াসেই অন্য সব উন্নত দেশের সঙ্গে তুলনা করে নিজের দেশকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতে পারে, অন্য দেশে গিয়ে নিজেদের দোষ-ত্রুটি-দৈন্য নিয়ে ফলাও করে নিন্দে করতে পারে।.....কোনো বিদেশী এসে আমাদের দৈন্য-দুর্দশার ছবি এঁকে একজিবিশন দিলে, তাকে মাথায় করে নাচতে পারে।.....আর দেশের সব তথাকথিত 'শিক্ষিত' ছেলেরা সুযোগ পেলেই দেশকে ত্যাগ করে, সুখসুবিধের দেশে গিয়ে, সেখানের নাগরিকত্ব নিয়ে সুখ-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করতে পারে। আপন দেশকে উন্নত করে তোলার চেষ্টামাত্র না করে, তাকে অবজ্ঞায়, ত্যাগ করতে দ্বিধামাত্র হয় না আমাদের ছেলেদের !....নেতারা এদিকে তাকিয়েও দেখছেন না। তাঁরা কেবল আপন আপন ঘর গোছাচ্ছেন, গদি সামলাচ্ছেন, আর যাদেরকে হাতের মুঠোয় পাচ্ছেন, তাদেরকে টাইট দেবার চেষ্টা করছেন। সরকার সদ্য পাশ-করা তরুণ ডাক্তারদের গ্রামে যেতে বাধ্য করবার জন্যে আইন তৈরী করছেন, যেতে না চাইলে শাস্তিবিধান করছেন, অথচ তাকিয়ে দেখছেন না তাদেরকে যেখানে পাঠানো হচ্ছে, সেখানে ডাক্তারী করবার মতো ন্যূনতম ব্যবস্থাটুকুও আছে কিনা।

গল্প করবার সুযোগ পেয়ে, আর একটি ভদ্র শ্রোতা পেয়ে, হঠাৎ যেন আবেগে উদাত্ত হয়ে উঠেছিলেন সত্যব্রত।....

নীলুদা চলে যাবার সময় নীহারিকা ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছিল, বাবাঃ ! বুড়ো ভদ্দরলোকের সঙ্গে এতো গপপো !....আমার সঙ্গে কটা কথাই বা হলো ?.....

নীলাম্বর ব্যানার্জি একটু হেসে বলেছিলেন, আমার হচ্ছি ওল্ড স্কুলের ছাত্র, বুঝলি ? গুরুজনকে তার প্রাপ্যটি দিতে হয়, সেটাই শিখেছি। তাছাড়া ওনার সঙ্গে আমার মতের খুব মিল।

তাই দেখলাম।....তুমি যে আবার এতো সব ভাবনাভাব তা তো সাতজন্মে জানতাম না। চিরদিনই জানি মজলিশি স্ফূর্তিবাজ মানুষ। আমোদ-আহ্লাদ, খাওয়া-মাখা, হাসি-খুশী, হৈচৈ এই নিয়েই থাকো।

নীলাম্বর একটু হেসে বলেছিলেন, মানুষ জাতটা তো 'ওয়ান রুম ফ্ল্যাট' নয় রে। তার এই ছোট্ট খাঁচাখানার মধ্যে অনেক ঘর, অনেক কুঠুরী।.....

তা শুনে কী বিশেষ স্বস্তি পেয়েছিল নীহারিকা ? না বাবা, সেই চিরচেনা নীলুদাই ভালো।

কিন্তু নীলাম্বর ব্যানার্জি নিজের ওই 'ওয়ান রুমটি' ছাড়া অন্য ঘর দরজা খুলে বসে সবসময় ? তা তো নয়। আজ সে বড় একটা আঘাত পেয়ে বড় আহত হয়েছিল।

বাপ্পা নামের ওই ছেলেটাকে ছোট্ট থেকেই সে সত্যি বিশেষ একটু ভালোবাসতেন ! নিজের তো সব কটাই মেয়ে। 'ছেলে' জিনিসটিকে মনে হয় একটা দামী জিনিস। তাছাড়া—ছোট থেকেই ছেলেটার দীপ্ত উজ্জ্বল চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত চাহনি, চটপটে কথাবার্তা রীতিমতো আকর্ষণীয়ই ছিল।....সেই ছেলেটা যখন চিরাচরিত বাঁধা রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা ধরলো, তখন থেকেই নীলাম্বর একটু ক্ষুব্ধ। তবু ভাবতেন, হয়তো সাময়িক খেয়াল।....তবে সেই 'নীলুমামা' বলে বিগলিত হওয়া ছেলেটা যে ভিতরে ভিতরে এতোটা ইস্পাত হয়ে উঠেছে তা ভাবেননি। ভাবেননি বলেই নিঃশঙ্ক চিত্তে, ভালোবাসার মনটি মেলে ধরে বলেছিলেন, তোর জন্যে আমার দুঃখ হয় বীরপুরুষ !.....কিন্তু সেই নিঃশঙ্কতার ওপর যে একটি সাপের ছোবল পড়বে তা কে জানতো ? সেই ছোবলের আঘাতেই আহত নীলাম্বরের মনের ভিতরকার অন্য একটি ঘরের দরজা খুলে পড়েছিল।

তারকের মায়ের মনিব বিপুল ঘোষাল, তাঁর এলাকায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন। এখন

উৎসবের সমারোহ। বাড়িতে লোকের বিরাম নেই। অবিরতই আসছে ফুলের তোড়া, ফুলের মালা নিয়ে। আসছে মিষ্টির বাক্স হাতে নিয়ে।.....রমরমা ব্যাপার চলছে ক'দিন। এমন কি তারকের মাকেও বলা হয়েছে, 'ও তারকের মা, তোমার তারককে পরশু এখানে খেতে আসতে বোলো। বোলো গিন্নীমার নেমন্তন্ন।'

সেই কথাই বলতে আসে তারকের মা এ বাড়িতে। অর্থাৎ তার পুরনো মনিবের বাড়িতে। নীহারিকা তাকে কাছে বসিয়ে চা খাওয়ায়, সমীহভাবে কথা বলে। সেই 'বাসনমাজুনি' তারকের মা তো নেই এখন। এখন সে বড় গাছে নৌকো বেঁধেছে!

সে যাক, তারকের কাছে কথাটা পাড়ে তার মা। বলে, দেখলি তো আমাদের 'ঘোড়াইচণ্ডী' কী জাগ্রতো দেবী। বাবুকে জিতিয়ে দিলো কিনা?

তারক মুচকি হেসে বলে, তোর ও 'ঘোড়াইচণ্ডী' বাহুল্য মাত্র। তোর মনিব যে পার্টির তার জেতা ঠেকায় কে? লোক তো এখন আর মানুষকে ভোট দেয় না। ভোট দেয় চিহ্নকে। চোখ বুজে বসে থাকলেও তো জিততো তোর মনিব।

তোকে কে বলেছে এ কথা?

কেউ বলতে হয় না। বোধবুদ্ধি থাকলেই জানা যায়।

তবু তো গিন্নী আমায় চুপিচুপি বলেছে, এই 'বিজয় উৎসব' না কী যেন, তার ডামাডোলটি মিটে যাক, আবার একদিন আমায় দুদিনের ছুটি দেবে, আর অনেক করে পুজো দেবে মা চণ্ডীর নামে!

তা সে তো দেবেই। মানত করেছিল যখন।

তা তুই তাহলে আসিস পরশু। সেদিন নাকি বিস্তর লোক যাবে।....প্যাণ্ডেল বাঁধা হচ্ছে।

ধ্যাৎ! কী পরিচয়ে যাবো?

ওমা। কেন? আমার পরিচয়েই যাবি। তাতে তোর মান যাবে?

আরে বাবা, তা নয়। তুমি তো আর গেটে দাঁড়িয়ে থাকবে না? ওসব বড়মানুষের বাড়ির ব্যাপার। নিশ্চয় দেউড়িতে পুলিশ পাহারা থাকবে। আর সব্বাইকে ধরে ধরে জিগ্যেস করবে, তুমি কে হে?

তা তাতেই বা তোর ভয়টা কী? তুই কী চোর-ডাকাত?

পুলিশ ইচ্ছে করলে 'চোর' বলে ধরতেও পারে। ওদের মর্জি।....আমার আর ওই বিস্তর জনের সঙ্গে খেতে যেয়ে কাজ নেই।

মা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, গিন্নীমা বললো, আগ্রহো করে!

বলবি, হ্যাঁ, বলেছি ছেলেকে। তারপর কী আবার খোঁজ করতে বসবে, 'ও তারকের মা, তোমার ছেলে এসেছিল? খেয়েছিল?'

তারকের মা মুচকি হেসে বলে, তা করতেও পারে। এখন গিন্নীর কাছে তোর মার খুব খাতির। আরো একটি মনস্কামনা আছে, তার জন্যেও মানত করবে মা চণ্ডীর কাছে।

কী মনস্কামনা?

তা জানি না। বলে রেখেছে চুপিচুপি।....

তারপর তারকের মা আক্ষেপের গলায় বলে ওঠে, আমাদের এ বাড়ির বড়খোকার তো আমার মনিবের ওখেনে যাওয়া আসা ছিল। তো এই সময়ই মাতা ফাইটে বিছনায় পড়ে রইলো। ওখেনে কতো ঘটাপটা। ভালো থাকলে তো যেতো নিয্যস!

তারক বললো, বড়দাবাবুর বিষয় নিয্যস কিছু বলতে পারা যায় না মা। উনি এক অন্য জগতের

জীব। হয়তো ওমুখোই হতো না আর।

তো হ্যাঁরে, আচে কেমন?

তারক মাথা নাড়ে, ভালো না। এখন ডাক্তার বলছে, ঘাটা গোলমেলে হয়ে উঠেছে। বোধহয় হাসপাতালে রাখতে হবে, অপারেশন করতে হতে পারে।

ওমা। বলিস কী? তবে যে বলেছিলি, তেমন কিছু না?

তখন তাই মনে হয়েছিল।

হ্যাঁরে, একটু দেকতে যাবো?

তারক শিউরে উঠে বলে, সর্বনাশ। অমন চিন্তাও করিসনি।

কেন রে?

বললুম তো গোলমেলে ব্যাপার, ওনার এখন মেজারের ঠিক নাই।....রাতদিন চুপচাপ পড়ে ভাবছে। বইটইও পড়তে দেখি না। সর্বদা 'ক্ষেপ্ত' ভাব। বাড়ির লোক তা তটস্থ! মাথাটা না বিগড়ে যায় এই ভাবনা আমার।

তারক একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে।

তারকের মা আর একবার বলে, তালে যাবিনি ওখেনে পরশু? মনটা কেমন করতেচে রে।

তারক অগ্রাহ্যভরে বলে, একদিন একপাত নেমন্তন্ন খেয়ে কী তোর তারকের স্বর্গলাভ হবে? অ্যাঁ?

মায়ের প্রাণটা যে কী, তা বুঝবি কেমন করে?

বুঝে কাজ নাই আমার। ওসব ভিড়ভাট্টা আমার সহ্য হয় না। তোমার তারক ঢের ভালো জিনিস খায় মা। তুমিই খেও ভালো করে, তালেই হবে। গিন্নীর পেয়ারের লোক হয়ে উঠছ।

হাসতে থাকে তারক।

বাপ্পাকে আজ হাসপাতালে যেতে হবে।

কী নিরুপায় অবস্থায় পড়ে গেল বাপ্পা। মনে একতিল শান্তি নেই।.....মাথার ক্ষত সারছে না, সম্প্রতি আবার অল্প অল্প জ্বর দেখা দিচ্ছে রোজ।.....

অদৃষ্টের ফের, সেই বিরক্তিকর নীলুমামার গাড়িতেই নিয়ে যাওয়া হবে তাকে। নীলুমামাই এসে বেপোট অবস্থার হাল ধরেছেন। কারণ, বাপ্পার বাবা একটু বিপজ্জনক অবস্থায় পড়লেই চোখে সর্ষেফুল দেখেন। আর মা জানেন অকূলে ভগবানের জায়গায় 'নীলুদা'!

নীলুদা প্রথমেই বলেছিলেন, হাসপাতাল? ছেলেটাকে জবাই করতে চাস নাকি? আজকাল হাসপাতালের কী হাল হয়েছে, কাগজে পড়িস না? আমার জানা এক ভালো ডাক্তারের একটা প্রাইভেট নার্সিংহোম আছে, সেখানে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বাপ্পা বলেছিল, মা, তোমার নীলুদাকে বলো, দয়া করে যেন আমার ওপর নাক গলাতে না আসেন।....কাগজে তো অনেক কিছুই পড়ছ। তা বলে হাসপাতালগুলো কী খালি পড়ে আছে? ভিড়ে তো আলপিন গলে না। তারা মানুষ নয়? আমার জন্যে নার্সিংহোমের ব্যবস্থা করতে বসলে, আমি কিন্তু এই অবস্থাতেই পালাবো।

হ্যাঁ, অহরহ সেই চিন্তাই তো তাড়না করে মারছে বাপ্পাকে। এই বেপোট অবস্থায় পড়ে গিয়ে সংসারের লোকের 'আহা উহু' তার কাছে বিষতুল্য লাগছে। মন কেবলই বলছে, পালা। বাপ্পা পালা! কিন্তু শরীরে কুলোচ্ছে না। তাছাড়া 'পালিয়ে গিয়ে ফুটপাথে পড়ে মরে বেওয়ারিশ মড়া বলবো' এমন ইচ্ছে অবশ্যই নেই। জীবনে কতো কাজ করবার আছে। অথচ—এই অবস্থা নিয়ে পার্টি অফিসে

গিয়ে উঠলেও যে সেখানে জামাইআদর জুটবে, এমন আশা নেই। বাপ্পা কে ? বাপ্পাদিত্য গাঙ্গুলী। একটা তৃণখণ্ড মাত্র। পার্টির কজন তার নাম জানে ? তবু বাপ্পা জানে আমি একটা মহান কিছুর লক্ষ্যে যুদ্ধে এগিয়ে-চলা পদাতিক সৈনিকদের একজন।....কিন্তু হঠাৎ এ কী বিড়ম্বনায় পড়ে গেল বাপ্পা ! যা তার দু-চক্ষের বিষ, আপনজনের 'আহা আহা' আর স্নেহবিগলিত সেবা, তাই সহ্য করতে হচ্ছে।.....

হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা আমায় সেদিন পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল কে কে ? অনীশ আর দিব্যেন্দু না ? কতোদিন যেন হয়ে গেল। দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডারটার দিকে তাকিয়ে তারিখটা মনে মনে হিসেব করে নিল। ছাব্বিশ দিন হয়ে গেছে। তারা কই কেউ—

সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে ধিক্কার দিলো বাপ্পা, কী আশ্চর্য ! আমি সাধারণেদের মতো 'সৌজন্য দর্শনের' প্রত্যাশা করছি ?....তবু—মনটা কেমন যেন খচখচ করতে থাকে। ওদিকের খবরও তো আর জানা হচ্ছে না।

ঠিক এই সময় টুসকি এসে যেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিল।....

খুব সব বন্ধু জুটিয়েছিস বটে দাদা। তোর 'হাফ-লাশ' হয়ে যাওয়া (আধমরাকে টুসকি হাফ-লাশ বলে) শরীরটাকে চ্যাংদোলা করে এনে ফেলে দিয়ে সেই যে পিট্টান দিল, আর একবার উঁকি দিতেও এলো না, 'বন্ধুটা বাঁচলো কী মরলো' দেখতে।

বাপ্পা খুব রেগে উঠে বললো, কে বলেছে ওরা আমার প্রাণের বন্ধু ? একসঙ্গে কাজ করি, এই পর্যন্ত।

তা তাই যদি হয়, বলতে হবে সহকর্মী। তাদেরও তো, একটু মায়ামমতা—'সরি', ওগুলো তো তোদের কাছে বাতিল শব্দ, দায়িত্ববোধও থাকবে ?

আচ্ছা। এবার তাহলে আপনি একটি নীতিবোধের পাঠশালা খুলুন ম্যাডাম। জনগণকে দায়িত্ব কর্তব্য শেখানোর ক্লাস নিন। যা পালা। কিছু ভাল লাগছে না আমার।

টুসকি হঠাৎ কাঁদো কাঁদো হয়ে গিয়ে বলে, আর আমাদেরই যেন খুব ভালো লাগছে। এ তো তবু বাড়ির মধ্যে রয়েছিস, সবসময় দেখতে পাচ্ছি। জ্বালাতন করবার সুযোগ পাচ্ছি। কতোদিন তো তোকে ভালো করে দেখিইনি দাদা।

বাপ্পা হাত বাড়িয়ে টুসকির মাথার বেণীটার একটায় টান দিয়ে বলে ওঠে, ওঃ। তার মানে আমার মাথা ফাটাটা তোর লাভের খাতায় উঠেছিল ?

টুসকি জলভরা চোখেই একটু হেসে ফেলে বলে, তা মিথ্যে বলবো না, হয়েছিল একটু। ডাক্তার তো তখন বলেছিল, ভাবনার কিছু নেই, এমন কিছু না। এখন নাকি বলছে অপারেশন করতে হবে। কী খারাপ যে লাগছে !......

বাপ্পা তাকিয়ে দেখে।

এই মেয়েটা বলছে, 'কতোদিন তোকে ভালো করে দেখিইনি দাদা।' বাপ্পাই কী এদের দেখেছে ভালো করে, দীর্ঘদিনের মধ্যে ? এই সংসারের খবরটবর কিছু জানে বাপ্পা ? এদের সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত আছে সে ?.....কিন্তু কোনোদিনই কী ছিল তা বাপ্পা ? বরাবরই তার মনটা যেন বাড়িছাড়া। মাকে মনে হয়েছে, বড়ো বেশী ন্যাকা। বাবাকে মনে হয়েছে 'রাবিশ'। শিলাদিত্যটাকে 'কিস্যু না' আর এই মেয়েটাকে 'আহ্লাদী পুতুল'। তবু এটার ওপর খুব স্নেহ ছিল। কিন্তু স্নেহ-ভালোবাসা প্রকাশ করাটা তাদের শাস্ত্রে 'খেলোমি'। তাই কখনো কখনো ওকে ডেকে কথা কইতে ইচ্ছে হলেও কয়নি। ভয় হয়েছে, তাহলেই হয়তো 'পেয়ে বসবে'। তাহলেই তাকে 'অতি সাধারণের' দলে ধরে নেবে। আজ মনটা কেমন করে এলো।

কিন্তু কী কথাই বা বলবে ? বললো, এই, কখন যাবার কথা রে ?

শুনছি তো বিকেল চারটেয়। নীলুমামা গাড়ি নিয়ে আসবেন। বাবা আজ আর অফিস যাচ্ছে না!

সেই তোদের ওই 'মহানুভব নীলুমামার' কবলে পড়ে যেতে হলো, এতেই ভীষণ খারাপ লাগছে।

টুসকি আস্তে বললো, উনি কিন্তু তোকে খুব ভালোবাসেন দাদা।

ধন্যবাদ।

টুসকি আস্তে বলে, আগেকার কথা মনে পড়ে তোর দাদা ? কতো সুখেই ছিলাম আমরা। দাদু সেজেগুজে গটগট করে কোর্টে যেতো, দিদা রান্নাটান্না করতো, আমরা ক্যারম খেলতাম, 'মজার অঙ্ক' নিয়ে খেলা করতাম। কী ভালোই ছিলাম!

বাপ্পা এসব কথায় প্রশ্রয় দেবে না। 'অন প্রিন্সিপল' দেবে না, তাই ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, তারও আগে তো আরো ভালো ছিলি। যখন ইস্কুলে যেতে হতো না। হাঁটি হাঁটি পা পা করতিস!

তোর সবতাতেই ঠাট্টা। মরছি আমি নিজের জ্বালায়।

তোর আবার কী জ্বালা হলো ? পাড়ার মস্তানদের সঙ্গে প্রেমট্রেম করছিস বুঝি ?

ধ্যাৎ। ভালো হবে না বলছি দাদা।

আহা, এতোদিনে এসব কিছু করে উঠতে পারিসনি ? তবে আর করলি কী!

টুসকি কৃতার্থ হয়। দাদা তার সঙ্গে এভাবে কথা কইছে। ভাবাই যায় না।

টুসকি বলে, ওসবের মধ্যে আমি নেই।

বলে, কিন্তু বুকটা কেঁপে ওঠে। যুধাজিতের চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কিন্তু যুধাজিৎ কী আর টুসকির আছে ?

বাপ্পা বললো, ছোটবাবু কোথায় ?

ওর যে আবার এই সময় একজামিন চলছে।

একজামিন ? এসময় ওর কী একজামিন ?

কী জানি বাবা। এম. এ'র পর বাবা বলেছিল, এম এড্‌টা পড়ে নে, তা না করে সাংবাদিকতা পড়তে গেল। এদিকে আবার নাকি 'বিজনেস ম্যানেজমেণ্টও' পড়েছে। সব কথা খুলে বলে না। তবে ওর একটা বন্ধু হঠাৎ বিজনেস করে লাল হয়ে যাচ্ছে দেখে ও—

ওঃ। হঠাৎ 'লাল'। বুঝলাম। এসব বন্ধুকে পাচ্ছে কোথায় ?

পড়তো একসঙ্গে।

ভালো। তাহলে ছোটবাবুও লাল হোক।....যা, আমার ঘুম পাচ্ছে।

ওমা। ঘুমোবি কী ? মা তোর ভাত আনছে। বারোটা বাজে। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে জিরিয়ে তারপর তো আবার রওনা দিতে হবে। দাদা রে। ভাল্ লাগছে না। কিছু ভাল্ লাগছে না।

বাপ্পারও কী টুসকির মতোই অবস্থা নয় ? নিরুপায় হয়ে বাড়িতে পড়ে থাকতে অবশ্য খুবই খারাপ লাগছিল। তবু কেমন একটা ভালো লাগা ভালো লাগা ভাব তো ছিল।

এই যে সন্ধ্যে হলেই বাবা অফিস থেকে ফিরেই এ ঘরে এসে বলে ওঠেন, 'কী রে, আজ কেমন আছিস ?' ওই যে দাদু সকালবেলা এসে বসেন খবরের কাগজ দু'খানা হাতে নিয়ে। এবং বাপ্পার সঙ্গে দেশের দশের নানা কথার আলোচনা করেন, একজন বয়স্ক 'বন্ধুর' সঙ্গে কথা বলার মতো। এই যে টুসকিটা যখন তখন এসে আবোল তাবোল বকে যায়, এগুলো যেন আজ বেশ দামী মনে হচ্ছে।

তারক এসে হাজির হলো। বাপ্পার খাটের সামনে ওর স্পেশাল ছোট খাবার টেবিলটা পাতলো।

খাবার জলের গেলাস রাখলো ডিশ চাপা দিয়ে। একটা চেয়ার বিছানার কাছে টেনে এনে তার পিঠে ছোট একটা তোয়ালে রাখলো, তারপর বললো হাতমুখ ধোবেন তো ধুয়ে নিন।

এতোদিন বাপ্পা নিজেই নীচের তলায় নেমে খাবার টেবিলে গিয়ে বসেছে। আর টুসকি হেসে হেসে বলেছে, ভাগ্যিস মাথাটা ফাটিয়েছিলি, তাই তোর সঙ্গে একসঙ্গে খেতে বসতে পারছি। কতোকাল এমন ঘটনা ঘটেনি। তুই বা কোথায়, আমরা বা কোথায়!

নীহারিকা রেগে বলেছে, মেয়ের কী কথার ছিরি! মাথা ফাটাটা 'ভাগ্যিস'।

তা এক হিসেবে। আমার মতে যদি কিছু ভাঙতেই হয়, ঠ্যাঙ ভাঙার থেকে মাথাটা ভাঙা ভালো। ঠ্যাঙ ভাঙলে তো বাবা নট নড়ন-চড়ন হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে হতো!

তখন এইরকমই বলতো। কারণ তখন ডাক্তার বলেছিল, 'তেমন কিছু না।' কিন্তু হঠাৎ অল্প জ্বর দেখা দেওয়ায়, আশঙ্কিত হলো হয়তো 'তেমন কিছু'।

অতঃপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এবং শেষ পর্যন্ত অপারেশনের চিন্তা।

বাপ্পাকে একবারে পেড়ে ফেলেছে। অথচ বাপ্পার প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে, 'পালাই। পালাই।'

নীহারিকা ডাকলো, তারক, আয় একবার। থালাটা নিয়ে যা।

ভাতের থালা তরকারির বাটি ইত্যাদি একা আনতে পারে না নীহারিকা, তার পিঠে কোমরে ব্যথা।

বাপ্পা হঠাৎ বলে উঠলো, তারককে আর মাকেই সবসময় কাজটাজ করতে দেখি। সেই মেয়েটা কী করে?

কোন মেয়েটা?

আঃ। সেই 'আবলুশ কাঠটা'। ইয়ে—কাজল। তাকে তো একটা কাজ করতে দেখি না।

টুসকি হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কাজল? তাকে খুঁজছিস? এই একমাসের মধ্যে তোর খেয়াল হয়নি, তাকে দেখতে পাচ্ছিস না?

বাপ্পা বিরক্তস্বরে বলে, কে কখন কোথায় থাকে, কী করে আমি জানি? নেই বুঝি?

'নেই' বললে কিছুই বলা হয় না রে দাদা! তুইও বলে গেলি তিন-চার দিনের জন্যে কোথায় যাচ্ছিস, তারকবাবুও বললেন, 'তবে আমিও এই সময় দেশে ঘুরে আসি—'

দেশে! তারকের আবার দেশ আছে না কী?

আমরাও তাই ভেবে অবাক হয়েছিলাম। তো তারকের মা তো দেশেটেশে যেতো! মায়ের যদি একটা দেশ থাকে, ছেলেরও আছে। তো সেই মহাসুযোগে, একদিন মা আর আমি ইয়ে একটু বেরিয়েছি, সেই ফাঁকে আমার অনেক কিছু শাড়িজামা জিনিসপত্তর হাতিয়ে কাজলবালা হাওয়া।

য্যাঃ। হাতিয়ে? এতোদিনের লোক! ও তো অনেকদিন আছে।

ওই তো, পৃথিবীতে কাউকে বিশ্বাস নেই রে দাদা। তো—হি-হি—হঠাৎ পাশের বাড়ির গিন্নী সেদিন বললেন, কাজল নাকি যাত্রাদলের হিরোইন হতে গেছে। যার সঙ্গে ভেগেছে, সে ওকে ওই লোভ দেখিয়েছিল আর কী! হি হি। কাজল হবে 'হিরোইন'। স্রেফ চুনকাম করতে হবে সর্বাঙ্গে।

থাক। আর ওই পচা কথা শুনতে চাই না।

বাপ্পা উঠে মুখটা ধুয়ে আসে পাশের বারান্দায় রাখা বালতির জলে। পুরনো ধাঁচের বাড়ি, অ্যাটাচড্ বাথরুমের ব্যবস্থা নেই।

কতোবারই বলা হয়, বাড়িটার একটু সংস্কারের দরকার। সে আর হয়ে ওঠে না। নীহারিকা মাঝে মাঝেই আক্ষেপ করে, আমার জীবনে আর কিছু হবে না। অথচ মনে ভাবতাম ছেলেরা বড়

হয়ে উঠলে, কৃতী হয়ে উঠলে, আমার দিন কেনা হয়ে যাবে। বড়টিই হয়ে গেল অন্যরকম।

তারক এলো, নীহারিকা এলো।

এবং দেখা গেল একে একে এসে বসলেন আদিত্য ও সত্যব্রত এবং নয়নতারা।

আহারের আয়োজনেও অনেক বাহুল্য!

বাপ্পা বলে ওঠে, এর মানে? এতো সব কী?

কী আবার!

নীহারিকা বলে, একটু এটা ওটা করতে ইচ্ছে হলো। খা না ধীরেসুস্থে।

অসম্ভব। তোলো, তোলো। সব তোলো। তারক, একটা থালা আন।

খা না বাবা। এই তো এখন হাসপাতালের ভাত খেতে চললি। কী জুটবে তা কে জানে! নীহারিকার কণ্ঠস্বরই অশ্রুসজল।

আর যেটা নাকি বাপ্পার সবথেকে বিরক্তিকর। অতএব গলার স্বরে সেই বিরক্তি ঝরে পড়ে, ওঃ। তাই একদিনেই ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিতে হবে?

দুর্গা! দুর্গা।

নয়নতারা বলে ওঠেন, তোর মুখে কিছু আটকায় না বাপ! মায়ের প্রাণটা বোঝস না?

ঢের বুঝেছি বাবা। তোমাদের ওই 'প্রাণের' জ্বালায় আমার প্রাণ পালাই পালাই করে।

তারপর চারিদিক তাকিয়ে বলে, তোমরা যেভাবে 'সিন' করে আমার খাওয়া দেখতে বসেছ। মনে হচ্ছে এটাই যেন বাপ্পা গাঙ্গুলীর শেষ খাওয়া!

নয়নতারা আবার অস্ফুটে 'দুর্গা দুর্গা' করে ওঠেন।

সত্যব্রত একটু হেসে বলেন, এ পৃথিবীতে এসে কতোদিকে কতো অত্যাচার সইতে হয় ভাই। একটু আধটু স্নেহের অত্যাচার না হয় সইলেই।

সেটাই সবথেকে মারাত্মক অত্যাচার।

বলে বাপ্পা তারকের আনা একটা ছোট থালায় অনেক কিছু তুলে রেখে ভাতে হাত দেয়।

না, আজ আর কারো দুপুরের বিশ্রাম নেই। অস্থিরতা সকলের মধ্যেই।

এ বাড়ি থেকে কেউ কোনোদিন হাসপাতালে যায়নি।

সত্যব্রতর মায়ের মৃত্যু ঘটেছিল বটে এ বাড়িতে। কিন্তু সে তো গাছের ডালে আলগা হয়ে লেগে থাকা একটা শুকনো পাতার ঝরে যাওয়া! সে মৃত্যুতে শুধু শ্রাদ্ধেই সমারোহ হয়েছিল, মৃত্যুকে নিয়ে নয়।

কে জানে এখন সংসার কোন পথে আবর্তিত হয়!

বাড়ির একটা ছেলে হাসপাতালে যাচ্ছে, এ যেন এদের কাছে একটা বিরাট ঘটনা।

অথচ সেদিন নীলাম্বর বলে গেছেন, তোরা এমন ঘাবড়াচ্ছিস কেন বল্ তো? আজকাল তো হসপিটাল, নার্সিংহোম এসব লোকের জলভাত। কথায় কথায় যায়। একটা ব্রণ পাকলেও নার্সিংহোমে ভর্তি হতে যায়। এ অপারেশন একটা ব্যাপারই নয়। আজকালের অপারেশনের খবর জানছিস তো? একজনের মুণ্ডুটা আর একজনের ধড়ে জুড়ে দিচ্ছে। একজনের কিডনি আর একজনের ভেতরে সেট করে দিচ্ছে। খোল নলচে সব বদলে দিচ্ছে অপারেশনের কায়দায়।

তবু যাত্রাকালে সে আশ্বাসবাণী কোনো কাজে লাগে না।

নীলুমামা গাড়ি নিয়ে আসেন। ননী এবং তারক রোগীর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়িতে তোলে। বাড়ির ডাক্তার 'অজিত ডাক্তার' সঙ্গে ওঠেন।....

ওঠে আদিত্য আর শিলাদিত্য।

নীলুমামা তো অবশ্যই। তিনিই তো কর্ণধার। পাড়ের কাণ্ডারী।.....তাঁকে তো আর এড়ানো যায় না।......কী অসহ্য এইটা।.....

বাপ্পা অনুভব করে এদিকে ওদিকে 'ফোঁস ফোঁস'। মা, টুসকি, নয়নতারা। আদিত্য তো ঘনঘন রুমাল বার করে নাক মুছছে। এমন কী সত্যব্রত পর্যন্ত অন্যদিকে তাকিয়ে বললেন, আমি আর গাড়িতে ভিড় বাড়ালাম না।

নয়নতারা বললেন, তদের তো 'ঠাকুর-দেবতা নাই', তবু মনে মনে একবার ভগবান স্মরণ কর দাদা! মনে বল আসে।

বাপ্পা হঠাৎ জোর গলায় হেসে উঠে বলে, তোমরা সবাই মিলে এমন একখানা সিন করছ, যেন এটা হতভাগা বাপ্পার শ্মশানযাত্রা। ওঃ। গাড়ি ছাড়া হোক।

মনে মনে বলে, 'পালাতে হবে। পালাতে হবে।' এই সব ল্যাৎপেতে স্যাঁৎসেঁতে মায়ার বন্ধন-টন্ধনের জালে আটকা পড়লে আর রক্ষে নেই।

॥ বারো ॥

বাপ্পার কাছে যেটা বরাবর সবথেকে বিরক্তিকর, সেটাই এখন সহ্য করে যেতে হচ্ছে তাকে। বাড়িতে তবু একরকম চলছিলো। তাকে দেখতে আসার ছুতো করে আত্মীয়জন যারা 'বেড়াতে' আসতো তারা কমক্ষণই বাপ্পার বিছানার ধারে বসতো। তারা একবার দেখে, এবং বাপ্পার হাড়-মাথা জ্বলে যায় এমন দু'-চারটি প্রশ্ন এবং মন্তব্য করে ভিড়ে যেতো অন্যত্র। হয় নীহারিকার কাছে, নয় তিনতলায় বুড়োবুড়ির কাছে। পিসির বাড়ির দিকের লোকেরা এলে স্বভাবতঃই ওই ওপরতলায়। নীহারিকার দিকের এলে তার কাছে।

ছেলের তো আর 'মরণবাঁচন' কোনো অসুখ করেনি, কোথায় গিয়ে কী ভাবে যেন মাথায় একটু চোট খাইয়েছে। অতএব একটু 'আহা উহু' করে এবং চুপিচুপি ছেলের মতিবুদ্ধির একটু সমালোচনা করে, চা-জলখাবারে সঙ্গে আড্ডা চালিয়ে বিদায় গ্রহণ। সেটা ক্রমশঃ কমেও আসছিল। কিন্তু হাসপাতালে আসার পর আবার নতুন করে বিপত্তি বাড়লো। যারা দু-একবার বাড়িতে দেখে গেছে, তারাও আবার তার এই অবস্থা পরিবর্তনে হাসপাতালে দেখতে আসছে।...... কী বিরক্তির এই 'দেখতে আসা'।

বাপ্পার মনে হয়, এইসব আসাটা স্রেফ 'কর্তব্য' পালনের পরকাষ্ঠা দেখানো। আসতে হবে। হাতে করে কিছু খাবার বা ফল আনতে হবে, এসব নিয়ম! 'তাসের দেশের' মতোই 'নিয়ম'। অসহ্য।

তার ওপর যেটা বেশী অসহ্য, সেটা রোগীর খাটের ধারে গেঁটিয়ে বসা! বাপ্পার ইচ্ছে করে চেঁচিয়ে বলে ওঠে, আপনারা যান তো। কেটে পড়ুন এবার। আপনাদের 'সৌজন্য সামাজিকতা' এসব সারা হয়েছে তো? আর কেন?

বলে উঠতে পারে না, এটাই অসুবিধে।

অতএব 'হুঁ' 'না' ছাড়া কোনো কিছুই বলে না। চোখ বুজে পড়ে থাকে। তাতে অবশ্য অপর পক্ষের যে কিছু এসে যায় তা নয়। তাঁরা এই ঘরে আরো অন্য রোগীর উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে অনায়াসে জোর তলবে নিজস্ব ঘরোয়া কথা চালিয়ে যান।

অবশ্য সময়টা সকলেরই 'একরকম' এই যা।

এসময় সব রোগীর বেড-এর ধারেই তাদের দর্শনার্থীরা। তারাও একই কাজ করে চলেছে। খুব

খারাপ লাগে।

সময় পারের 'ওয়ার্নিং বেলটা' বাজলে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে বাপ্পা।....আর সেই সময়ই নীহারিকা অথবা আদিত্য অথবা টুসকি, আর নীলুমামা হলে তো কথাই নেই, যে যার নিজস্ব ভাষায় একবার সশব্দ আক্ষেপোক্তি করবেনই, 'এই এক জেদ ছেলের। নার্সিংহোমে থাকবো না, হাসপাতালে থাকবো।' নার্সিংহোমে তো বাবা 'ভিজিটিং আওয়ার্সের এতো রেস্ট্রিকশান থাকে না'।

আশ্চর্য! বলা হয় বেশ জোরেই যাতে ঘরে আর যারা রয়েছে তাদের কানে যায়।...তার মানে তাদের বোঝানো হচ্ছে, এই 'রাজপুত্তুর'টি তোমাদের মতো হাবিজাবিদের সঙ্গে থাকবার মতো সস্তা মাল নয়, কেবলমাত্র এই ছেলের অদ্ভুত এক জেদের জন্যেই।

বাপ্পা ভাবে কী অর্থহীন এই ফল্স প্রেস্টিজ! কোনো মানে হয়? এতে যেন ঘরের অন্যান্য রোগীর কাছে লজ্জায় মাথা কাটা যায় বাপ্পার।

যদিও কারুর সঙ্গেই সে কোনোদিন 'ভাব জমাতে' বসেনি। অন্যেরা যেমন নিজ নিজ খাট থেকেই গলা তুলে, অথবা চলাফেরায় সক্ষম রোগীরা নিজস্থান থেকে অন্যের কাছে এসে সেটা করে। বাপ্পা দেখতে পায়। তবু অচেনা হলেও লজ্জা করে। মনে হয় যেন গলা তুলে বলা হচ্ছে, এ তোমাদের 'দরে'র নয়।

ওঃ কী বিপাকেই পড়া গেছে! কবে যে সেই 'অপারেশনটা' হবে।

এতো টালবাহান এদের। নানাবিধ 'পরীক্ষা' তো আছেই, তার জন্যে সময় গেছে। তাছাড়া একটু নাকি এনিমিয়া ধরা পড়েছে। অতএব ওষুধপত্র খেয়ে সেটা সামলে নাও আগে।

সে সম্পর্কেও মন্তব্য শুনতে হয়েছে, 'এনিমিয়া আর হবে না? শরীরকে শরীর জ্ঞান না করে 'রাজকার্য' করা হয়েছে।'

বাপ্পার এইসব নিয়ে কিছু বলতে ইচ্ছে হয় না। মনে মনেই বলে, নেহাৎই কারে পড়ে গেছি, তাই ওহে নীহারিকা দেবী, এতো সাহস বেড়ে গেছে তোমার। ওঃ একবার এই নিরুপায় অবস্থাটা কাটলে হয়!

এইরকম বিরক্ত চিত্তের সামনে হঠাৎ আবার একদিন পিসি!....সঙ্গে নিজেদের বাড়ির কাউকে দেখতে পেল না, যেটা সচরাচর ঘটেই। কারণ বাড়ির কেউ কেউ তো আসেই রোজ।

একা পিসিকে ঢুকতে দেখেই বাপ্পা মনের ঝাল ঝাড়তে বলে উঠলো, কী হে সন্ধ্যাতারা, তোমার ডিউটি দেওয়া আর শেষ হচ্ছে না? বাড়িতে তো বার দুই হয়ে গেছে বাবা। আবার কেন?

পিসিকে তারা ছেলেবেলা থেকে মজা করতে এভাবে নাম ধরে ডেকেই কথাটথা বলে।

পিসি হাসপাতালের খাট ছুঁলো না। সাবধানে সবকিছুর ছোঁওয়া বাঁচিয়ে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়িয়ে থেকেই মলিন-সলিল গলায় বললো, বাঃ! বাড়িতে দেখেছি বলে কর্তব্য শেষ? হাসপাতালে দেখতে আসবো না? মনটা কী যে ছটফট করছিল। অথচ কিছুতেই সুবিধে করতে পারছিলাম না। কার সঙ্গে বা আসি! সকলেরই এ সময় কাজ। তো এই মেয়েটা আমায় সাহস দিয়ে বললো, চলো বড়মা, আমি নিয়ে যাচ্ছি। তাই—

মেয়েটা।

বাপ্পা তাকিয়ে দেখলো দরজার কাছে পিসির বাড়ির সেই 'পাপিয়া' নামের মেয়েটা। পিসেমশাইয়ের ভাইয়ের মেয়ে। না কে যেন।

ছেলেবেলায় এই মেয়েটা বাপ্পার রীতিমতো ফ্যান ছিল।

'বাপ্পাদার মতো ক্যারাম খেলুক দিকি কেউ?....বাপ্পাদার মতো ঘুড়ি ওড়াবার সাধ্য আছে কারুর?....বাপ্পাদা যা 'ম্যাজিক' দেখাতে পারে, দেখলে 'তাক' লেগে যায়।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

পিসিরা বেলেঘাটায় চলে যাবার পর অবশ্য তেমন যোগসূত্র প্রায় ছিন্ন।....আর বাপ্পারও মনের জগতে 'পিসি মাসি মামা' জাতীয়রা আর বিরাজিত থাকেননি। সেই মেয়েটা এতো বড় হয়ে গেছে? মনে মনে স্বীকার না করে পারলো না বাপ্পা, দেখতেও খুব সুন্দর হয়ে গেছে দেখা যাচ্ছে।...একটু অপ্রতিভ হলো। পিসিকে যে হ্যানস্থার মতো কথা বলা হয়েছে ওর সামনে।

পাপিয়া কিন্তু খুব সপ্রতিভভাবে বলে উঠলো, এই দ্যাখোনা বাপ্পাদা, এদিকে শুচিবাইয়ের রাজা, হাসপাতালের সবকিছুই তো ওনার কাছে অচ্ছুৎ। অথচ 'ছেলেটাকে হাসপাতালে যেতে হলো' বলে কী ছটফট। যেন ত্রিভুবনে কাউকে হাসপাতালে যেতে হয় না। তাহলে হাসপাতালগুলো আছে কী করতে?

যাক! 'আপনি' বলবে না, 'তুমি' বলবে, বাপ্পার সে সমস্যার হাতে হাতেই সমাধান। পাপিয়া দিব্য স্বচ্ছন্দে 'তুমি বললো। অতএব বাপ্পাও বললো, যাক, এতোদিনে তোমার মুখে একটা ন্যায্য কথা শুনতে পেলাম। সকলের তো ওই আক্ষেপ। 'ইস'! হাসপাতাল! হাসপাতালে পড়ে থাকতে হচ্ছে।'

পাপিয়া হেসে উঠে বললো, সে বোধহয় তুমি ভীষণ একটা মূল্যবান প্রাণী বলে।

'প্রাণী।' তবু ভালো! 'জীব' বলোনি এই ঢের। অবশ্য দুটো একই। কিন্তু মূল্যবানটা কিসে?

সে নিজেই হিসেব করো। আপনজনেরা যাকে একটিবার চক্ষে দেখতে পায় না, এতোই ব্যস্ত সে। তাকে লোকে মূল্যবান ভাববে না?

তুমি তো দেখছি অনেক কথা শিখেছো। আগে তো—

বাঃ। বেশ। চিরদিন সেই ফ্রকপরা 'ভ্যাবলামার্কা' মেয়েটাই থেকে যাবো না কী? যাক, তুমি কিন্তু আমায় আগে 'তুই' বলতে বাপ্পাদা।

'তুই'। বলতাম বুঝি?

বাঃ, মনে নেই? ভেবে দেখো।

আমার স্মৃতিশক্তিটা একটু দুর্বল।

পাপিয়া বলে, তা নয়। স্মৃতিশক্তিটাকে বাজে খরচে কাজে লাগাও না।

বাপ্পার হঠাৎ খেয়াল হয় সে আজ এখন অনেক কথা বলছে। আর এদের কথা শুনে ব্যাজার হচ্ছে না। আশ্চর্য তো। পাশের খাটের রোগীরা বাপ্পার গলার স্বর কোনোদিন ভালো করে শুনেছে কিনা সন্দেহ। অথচ আজ বাপ্পা গলা খুলেই কথা বলছে।

পিসি বলে উঠলো, এই হলো। মেয়ের স্বভাব প্রকাশ পেল। রুগী দেখতে এসেও তর্ক জুড়তে বসলো।....তুই আবার 'ভ্যাবলা' ছিলি কবে? অ্যাঁ। চিরদিনই তো কথার জাহাজ, তর্কের রাজা।

বড়মা। আবার তুমি সেই ভুল করছ? সব সময় আমার সব ব্যাপারে রাজা। রাজা। কিন্তু ওটা ব্যাকরণের ভুল বলি না?

পিসি হেসে ফেলে বলে, ব্যাকরণের ঠিক করতে গিয়ে কী তোকে 'তর্কের রানী' বলতে হবে? দ্যাখ না বাপ্পা। উঠতে বসতে আমার সঙ্গে ওই সব চালাবে।

বাপ্পার কিন্তু হঠাৎ মেজাজটা যেন বদলেই গেল। এতোজনের সামনে 'ব্যক্তিগত কথা' বলা দেখলে যে রাগটা হয় সেটা যেন হচ্ছে না। বরং কথা বলতে ভালোই লাগছে।

আত্মীয়জনের সঙ্গে কথা বলতে ভালো লাগে। এটা যেন বাপ্পার কাছে হঠাৎ একটা অনাস্বাদিত স্বাদ। মনের মধ্যে কেমন করে যে একটা বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেছে, তাদের যা 'পথ' তাতে ব্যক্তিগত কোনো কিছু ব্যাপারেই কিছু 'ভালোলাগাটা' অসঙ্গত। তাদের হতে হবে কঠোর কঠিন শুকনো। পৃথিবীতে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটানোর কর্মযজ্ঞের শরিক তারা। তাদের সাধারণের মতো হওয়া

সাজে না।

তাই যে কোনো মুহূর্তে যদি কিছু ভালো লেগেছে তখনি সেটাকে সবলে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছে বাপ্পা।

অথচ আজ সেটার জেরই টানতে ইচ্ছা করছে। সেই ইচ্ছেটাই প্রকাশ পায় তার প্রায় অনভ্যস্ত সরস একটি মন্তব্যে। বলে ওঠে, তা সন্ধ্যাতারা তোমাদের বাড়িটা তো বেশ সেকেলে প্যাটার্নের। এটিকে এখনো 'অন্য বাড়িতে' চালান করা হয়নি যে?

অন্য বাড়ি। হায় কপাল। উনি যে এখন ডাক্তারী পড়তে ঢুকেছেন। বিয়ে-টিয়ের নাম মুখে আনা চলবে না।

ডাক্তারী পড়ছে? তোমাদের বাড়ির মেয়ে?

আর 'আমাদের বাড়ি'। পিসি কৃত্রিম আক্ষেপ দেখিয়ে বলে, সে সব এখন পাল্টে গেছে রে বাবা। এই মেয়ে তো হেসে হেসে সব সময় তোর পিসেকেই বলে, 'আভি জমানা বদল হো গিয়া জ্যেঠু।' ওর ধারণা ডাক্তারী শিখলে লোকের উপকার করতে পারবে।

ধারণটা ভুল নয়। তবে কাজে করাটাই আসল।

পিসি হৃষ্টচিত্তে বলে, তা এই আহ্লাদীর সে গুণে ঘাট নেই। লোকের উপকার করতে পেলে আর—

আঃ। বড়মা। তোমার কী আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই? তাই বাজে বাজে কথা বলতে বসছো?

বড়মার উত্তরের আগেই দরজার বাইরে করিডোরে কোনো দুজনকে কথা বলতে বলতে আসতে শোনা গেল। 'কথা' না বলে 'কলধ্বনি' বললেই ভালো হয়। তবে ধ্বনিটি সুপরিচিত। ঢুকে এলো শিলাদিত্য আর টুসকি।

শিলাদিত্য বলে উঠলো, আরে 'টুনু' রানী যে? কতক্ষণ? বলে টুনু রানীর পার্শ্ববর্তিনীর দিকে একটু সস্মিত দৃষ্টিপাত করে।

আর টুসকি?

পিসির দিকে দৃকপাত মাত্র না করে ওই পার্শ্ববর্তিনীর দিকেই একটি তিক্ত জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে মনে মনে বলে ওঠে, এটি আবার এখানে এসেও জুটেছে!

সেই যুধাজিৎদের গৃহপ্রবেশের দিন থেকেই ওদের ওপর বিজাতীয় বিদ্বেষ এসে গেছে টুসকির। এমন কী চিরভালোবাসার পিসির ওপরই। যেন পিসির ষড়যন্ত্রেই টুসকির একটা নিজস্ব এলাকা বেদখল হয়ে গেছে।

এখন ভাবলো, এই মেয়েটি তো ছোড়দার মাথাটা একরকম ঘুরিয়েই রেখেছেন। টুসকির নিজস্ব এলাকায় হানা দিয়েছেন। আবার আমার দাদার দিকেও নজর ফেলতে এসেছেন দেখছি। এখানে তো কোনো সুবিধে হবার কথা নয়। তবু দাদার মুখের ভাবটা এমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন? দাদার গলার শব্দও বাইরে থেকে শোনা গেল যেন।....এটা তো সুলক্ষণ নয়। রীতিমতো দুর্লক্ষণই। যে দাদা নিজে থেকে কোনো কথাই বলে না, এবং কারো কোনো প্রশ্নের উত্তরে যদি কিছু বলে, যেন নেহাৎই অনিচ্ছাসত্ত্বে, চাপাস্বরে, যেটুকু না বললেই নয়, সেইটুকুই।....অথচ এখন যেন—

নাঃ। এই মেয়েটি ভালোমতোই মোহিনী-মায়া জানে।....ইস্। যদি দাদাকেও অন্য রকম করে দেয়!

এই কল্পনাই টুসকির সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরায়।

গৃহপ্রবেশের আয়োজনে যুধাজিৎ তার মাকে আপ্লুত করে ফেলেছিল বটে, তবে সবাইকে যে

পারেনি সেটা বলাই বাহুল্য।

দিদি জামাইবাবু ছেলেমেয়েদের নিয়ে 'তিন রাত্তির বাস'-এর নিয়ম পালন করলেও, এবং সারাক্ষণ আদরের সাগরে ভাসলেও, আড়ালে আবডালে কেবলিই বলে চলেছিল, 'বাড়াবাড়ি', 'দেখানেপণা', 'হঠাৎ নবাব হলে এই রকমই হয়', ইত্যাদি এবং সহোদর ভাইয়ের বিরুদ্ধে এই সমালোচনা পেশ হচ্ছিল, সতাতো দাদা এবং বৌদির দরবারে। সুরজিৎও দুর্গাপুর থেকে এসে তার বৌ ছেলেমেয়ে নিয়ে গিয়েছে, থেকেছে, তার জন্যে নির্ধারিত এই দ্বিতীয় 'মনোরমা ধামের' পুরো তিনতলাটায়। এবং হেসে হেসে বলেছে, নিউ দিল্লীর মতো এটাকে 'নিউ মনোরমা ধাম' বলা হোক।....এবং একথাও বলেছে, 'ওল্ড' ধামটির থেকে অনেক খোলামেলা।

কিন্তু রিঙ্কু যে ফাঁক পেয়েই তার জন্যে নির্ধারিত তার মায়ের কোলের কাছের দোতলার অর্ধেকের অধিক অংশটি থেকে সরে পড়ে টুক করে তিনতলায় উঠে গেছে, সেই শুরু হয়েছে চাপা সুরের আলোচনা।

'জানি না, হঠাৎ এতোখানি নবাবীর রসদ যোগাড় হলো কোথা থেকে ? শুধু সরল সহজ ব্যবসায় ! হুঁঃ। কেউ ঘাস খায় না, যে সেটা বিশ্বাস করবে।'

'আমার তো দাদা ভয়ই করছে। শেষে না ফাঁসে।'

রিঙ্কুর এই ভীতিবাক্যে বৌদি বঙ্কিম হাসি হেসে বলেছে, কেন ? ছোট সাহেব তো সাফাই দিয়ে রেখেছেন, 'খোদা যব দেতা, তব ছাপ্পর ফোঁড়কে দেতা।'....আমিও তো বলে ফেলেছিলাম, কিসের ব্যবসা ধরেছো হে ছোট সাহেব, 'সোনার বিস্কুট' আমদানী রপ্তানীর নাকী ! তো ওই জবাবখানি জুটলো।

দাদা বললো, মার তো বেশ প্রশ্রয়ই রয়েছে দেখা যাচ্ছে। আহ্লাদের সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে একেবারে।....গৃহপ্রবেশ না, যেন বড়লোকের বাড়ির বিয়ে।....বিয়েবাড়ির মতো তিন দিন ধরে রাজকীয় ভোজ।

বৌদি হেসে ওঠে, কী যে বলো না। আজকাল আবার বিয়েবাড়িতেই দু'-পাঁচ দিন 'ভোজ' আছে না কী ? স্রেফ একরাতের রোশনাই।....পরদিন সকালেই দেখবে প্যাণ্ডেলের বাঁশ খোলা হচ্ছে।....ছোট সাহেব দেখালেন বটে একখানা। চলতেই থাকে এইসব উক্তি।

যদিও এই তিনদিনব্যাপী রাজকীয় ভোজে আপত্তি দেখা যায়নি কারোরই।.....শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও বনছায়ার নিজের ছোটবোনও, যে নাকি ওই তিন দিনেরই অতিথি ছিল সেও কেমন করে যেন এদের দলেই ভিড়ে গেছলো।....কারণ সকলেরই যে একই জ্বালা। এতো বাড়াবাড়ি। হঠাৎ এমন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে পড়া !

জামাইবাবু মারা যাবার পর থেকে দিদি বেচারী যে স্থানহারা মানহারা হয়ে কাটাচ্ছিল, দিদির দ্যাওর যে দিদির সঙ্গে যথেষ্ট শত্রুতা সেধে, বলতো গেলে জামাইবাবুর মৃত্যুরই কারণ হয়েছিল, এবং দিদির নিজের ছেলের অধিক করে মানুষ করা সতীনপোও যে দিদিকে বেশ বেকায়দায় ফেলেছিল, এসব ঘটনায় সে খুবই মর্মাহত ছিল।....মাঝে মাঝেই রিকশা চেপে দিদির সেই দেড়খানা ঘরে বেড়াতে এসে হা-হুতাশ করেছে, এবং এ সান্ত্বনাও দিয়েছে, এদিন থাকবে না দিদি। জিতু একটু মাথা তুলতে পারলেই আবার সুদিন পাবে।....দুটো মা-ছেলে বৈ তো নয়।.......

কিন্তু সেই জিতু যদি বলা-কওয়া নেই, হঠাৎ মাথাটা আকাশে তুলে বসে, তাহলে সেই 'সহানুভূতি আর সমবেদনার' স্নিগ্ধতাটুকু টিকে থাকতে পারে ?

এখনকার সকলেরই হিতৈষী চিন্তা 'ছেলেটা না হঠাৎ ফেঁসে যায়।'

যুধাজিতের ছোট মেসো এবং ভগ্নিপতি দুজনে একত্রে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াতে ওড়াতে রায়

দিয়েছেন 'ব্ল্যাকমানি ছাড়া এ জিনিস হতেই পারে না।'

ভয় কী বনছায়ারও ছিল না ? প্রথম থেকেই তো বুকের মধ্যে ছিল আতঙ্কের বাসা। কিন্তু ছেলের নিরুদ্বেগ আর সদাপ্রফুল্ল ভাব দেখে, সেই ভয়টা যেন ক্রমেই ফিকে হয়ে এসেছে।

যদিও তিনি কেবলই ছেলেকে বলেছেন, এতো কেন রে জিতু ? এতো কেন ?

জিতু মার পিঠ চাপড়ে বলেছে, তুমি তো জননী চিরকাল 'এতো'র ভক্তই ছিলে।

তা হয়তো ছিলেনই সত্যি। কিন্তু তখন যে বুকে জোর ছিল ! এখন সেই বুকটাই যে ফাঁকা হয়ে গেছে। তবু যখনই ভাবছেন, তাঁর জিতু 'মায়ের মনোবেদনা' দূর করতে, অসাধ্যসাধন করছে তখনই বুকটা ভরে উঠেছে।

আশা ছিল এই ভরা বুকের অনুভূতিটা নিয়ে আরো কদিন কাটাতে পাবেন। কিন্তু সপ্তাহ শেষেই মেয়ে জামাই বলে উঠলো, আর তো থাকা যাবে না। এদের স্কুল কামাই হচ্ছে।

অফিসটা অবশ্য কামাই হয়নি তার, কারণ এখান থেকেই সেটা চলছিল। কিন্তু ছেলেমেয়ের ব্যাপারে নাকি নানা খানা অসুবিধে। মাস্টার আসে। সে ফিরে যাচ্ছে। অথচ সাপ্তাহিক পরীক্ষা আসছে।

কিন্তু বড় ছেলে ?

বনছায়া বললেন, সে কীরে সুব্রো, তুইও আজ চলে যাবি বলছিস যে ? বলেছিলি না পনেরো দিনের ছুটি নিয়ে আসছিস ?

তা সে হিসেব তো হাতেই। তোমার গৃহপ্রবেশের আগে চার-পাঁচটা দিন ওখানেই কাটলো। তখন তো আর তোমার এই নতুন বাড়িতে আসা চলতো না।

বনছায়া ঈষৎ আহত গলায় বলেন, 'আমার বাড়ি' বলছিস কেন বাবা ? বাড়ি তো তোদেরই। তো মানছি বটে তখন তো আসা যেতো না। পাঁজিপুঁথির ব্যাপার। তা ওইখানেই তো হয়ে গেল। তখন কদিন ওখানে কাটাতে হলো যখন, বাকি ক'দিন এখানে থাকবি না ?

ছেলে নির্লিপ্ত গলায় বলে, তাই কী হয় ? 'ওর' মাও তো আশা করে বসে আছেন।

বনছায়া কী বলতে পারবেন, তো 'সে আশা' তো তাঁর এই ক'বছর খুবই মিটেছে বাবা। তোর মা বাস্তুহারা হয়ে দেড়খানা ঘরের মধ্যে মাথা গুঁজে পড়ে থেকেছে, একটা রাত তোদের থাকতে বলতে পারেনি। 'তার' মার তো আরও এতো আশা থাকার কথা নয়।'

না, বনছায়া কখনোই কাউকে 'হক' কথা শুনিয়ে দিতে জানেন না। বনছায়া তাই আরো নরম হয়ে বলেন, সে তো সত্যি রে, মায়ের প্রাণ বলে কথা। তবে বেয়ানকে আমি সেদিন বুঝিয়ে বলে রেখেছি।

ঠিক এই প্রসঙ্গে না হলেও বেয়ানের কাছে তিনি বিনয়ে বিগলিত হয়ে বলেছিলেন, এবার তো ভাই তোমার মেয়ের নিজের বাড়ি হলো, মাঝে মধ্যে একটু আসবে-টাসবে। ওরা যখন ছুটিছাটায় আসবে, তখন তো এসে থাকবেই, না হলেও ওই দিদিটার কাছে আসবে, থাকবে। একা এতো বড় বাড়িটায় খাঁ খাঁ করে মরবো।

শুনে যে 'বেয়ান' আহ্লাদে বিগলিত হয়েছিলেন, এমন নয়। মেয়ের সতাতো দ্যাওরের বাড়ি হওয়াকে মেয়ের 'নিজের বাড়ি' হলো বলে আহ্লাদে ভাসবার মতো পাগল তিনি নন।...এই 'বোকা-হাবা ন্যাকা-ধ্যাকা' বেয়ানকে তিনি খুব একটা গণ্য কখনই করেন না। তবু যতদিন কেষ্ট-বিষ্টু একটা বেয়াই ছিল, ততদিন একরকম। তারপর তো আর কোনো প্রশ্নই ছিল না। জামাইয়ের সৎমাকে প্রাণের জন ভাবতে বসবেন না কি ?

তবে সেদিন তার ওই বোকাটে কথার আর প্রতিবাদ করতে বসেননি। গা আলগা করে বলেছিলেন, সে তো ঠিক। তো এইবার ছোটছেলের বৌ আনুন!

এখন বনছায়া সেই কথার জের টেনে বলেন, বেয়ানকে বলে রেখেছি।

ছেলে একটু হেসে বললো, বেয়ানকে বলে রাখলেই তো সব হলো না। বেয়ানের মেয়ে তো মায়ের কাছে যাবার জন্যে অস্থির হচ্ছে। সেও তো বারো মাস দূরে থাকে।

বনছায়া চুপ করে গেলেন।

বনছায়া একটা নিঃশ্বাস ফেললেন। অথচ বনছায়ার মেয়ে? মার কাছ থেকে চলে যাবার জন্যেই অস্থির হলো। বনছায়ার ভাগাটাই এইরকম। তিনি যতই মনপ্রাণ ঢেলে সবাইকে ভালোবাসতে চান না কেন, সেই সবাইরা সে ভালোবাসাকে যেন ধুলোবালির মতো হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলতে চায়।

তবু বনছায়া তাঁর বড়ছেলের কাছে তাঁর মাতৃহৃদয়টিকে একবার মেলে না ধরে পারলেন না। হতাশ আক্ষেপের গলায় বললেন, তাহলে আর এতো বড় একখানা বাড়ি করে কী হলো?

বড়ছেলে অবহেলার গলায় বললো, কী হলো তা তুমিই জানো আর তোমার পুত্ররই জানেন। এটা তো আর আশা করোনি, আমি চাকরী-চাকরী ছেড়ে, তোমার বাড়ি উসুল করতে এখানে বসে থাকবো?

বৃদ্ধ বনছায়ার তো মনে থাকে না ছেলেটা তাঁর নিজের গর্ভের নয়। তাই আবারও মলিনভাবে বলেন, ভেবেছিলাম, ছুটি-টুটি হলেই চলে আসবি, ঘণ্টা কয়েকের তো মামলা। তাছাড়া তোর ছেলেমেয়ের লম্বা ছুটির সময় বৌমা তাদের নিয়ে এসে থাকবে, তুই শনিবারে শনিবারে আসবি। তোর তো এক্সপার্ট 'কাজের লোক' রয়েছে, অসুবিধে কিছু হবে না। তারপর রিটায়ারের পর—

সুরজিৎ তো এই মলিন ভাবটি দেখে একটু করুণাবোধ করতেও পারতো। তাতে তো তার অর্থ-সামর্থ্য কিছুই লাগতো না, তবু সেটুকু করলো না। বরং হঠাৎ যেন ঝাঁজের গলায় বলে উঠলো, ওঃ। আমার রিটায়ারের কথা পর্যন্ত ভাবা হয়ে গেছে? ধন্য! ধন্য! তবে বরাবর এই আশ্চয্যি দেখি, সব সময় নিজের দিক থেকেই সব কিছু ভাবো। অপরেরও যে একটা দিক আছে, তা খেয়াল থাকে না।

বনছায়া হতভম্ব হয়ে গেলেন। সবসময় নিজের দিক থেকেই ভাবেন বনছায়া!

হতভম্ব হয়ে গেলেন বলেই বোধহয় আর কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে ছেলের কথাটাই পুনরুক্তি করেন।

সবসময় নিজের দিক থেকে ভাবি!

তা ছাড়া আর কী?.....ছেলে জেরালো গলায় বললো।

সুরজিৎ যেন ক্রমান্বয়ে পুঞ্জীভূত হতে থাকা ভিতরের জ্বালাটাকে প্রকাশের একটা পথ পেয়ে বাঁচে। তাই নিষ্করুণ গলায় বলে উঠে, তাছাড়া আর কী? তোমার নাতি-নাতনী যে আর একটা গরীব বেচারীরও নাতি-নাতনী, তারও কিছু প্রত্যাশা থাকতে পারে, তা কী একবারও ভেবে দেখেছো?

'আর একটা গরীব বেচারীর' প্রতি মমতাবিধুর ওই মুখটার দিকে তাকিয়ে, বনছায়া বোধহয় তাকিয়েই থাকতেন, যদি সেই মুখটাই বনছায়ার চোখের সামনে থেকে সরে না যেতো।

এখন আর অভ্যাগত বহিরাগতরা কেউই নেই। সাজানো-গোছানো মস্ত একখানা তিনতলা বাড়ির পুরোটাই কারো পদপাতহীন নিঃশব্দ।

বাড়ির সংলগ্ন খোলা জমিটা, যেখানে ক'দিন আগে প্যাণ্ডেল বাঁধা থাকায় সেটাকেও 'বাড়ির'ই অংশ বলে মনে হচ্ছিল; সেটা এখন সকালের রোদে খাঁ খাঁ করে যেন শূন্যতাকে আরো জানান

দিচ্ছে।

নীচের তলার যে দালানটা থেকে গোটা তিনেক সিঁড়ি নামলে ওই জমিটায় নামা যায়, সেই সিঁড়িটার একটা ধাপে বসেছিলেন বনছায়া অদ্ভুত একটা শূন্যদৃষ্টি মেলে। ক'দিন আগের উচ্ছ্বাস আনন্দ আর আড়ম্বরে স্মৃতিটা যেন স্বপ্নের মতো লাগছে।

এই বাড়িটায় এইভাবে একা বাস করতে হবে বনছায়াকে ?

একা ছাড়া আর কী ? জিতু তো সারাদিনই নিজের ধান্দায় ঘোরে। ক'টা দিন অতিথি অভ্যাগতদের খাতিরে তাকে তবু দুদণ্ড চোখে দেখা যাচ্ছিল। আর কী যাবে ?

এখন যুধাজিৎ স্নানের ঘরে ছিল।

বেরিয়ে মাকে কোথাও দেখতে না পেয়ে খুঁজতে খুঁজতে এসে মাতৃদর্শন।

বলে উঠতে যাচ্ছিল, কী ? রান্নাঘর ছেড়ে মাঠে এসে সকালের হাওয়া খাচ্ছ ? গুড্।

কিন্তু বলা হলো না।

বনছায়া ছেলেকে দেখেই বিনা ভূমিকায় সেই কথাটিই আবার একবার উচ্চারণ করলেন। যা সেদিন বড়ছেলের সামনে করেছিলেন। প্রায় হাহাকারের সুরেই বললেন, এতো বড় বাড়িটা তৈরী করে কী হলো জিতু ?

জিতু কী আর মনে মনে এ প্রশ্নের জন্যে প্রস্তুত ছিল না ? ছিলই। তাই তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, কী আবার হবে ? উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়া বনছায়া সরকারের পুনর্বাসন হলো।....এখন প্রেমসে এই পোড়া জমিটায় বাগান করো, ফুল ফোটাও। অথবা ইচ্ছে করো তো লাউ কুমড়ো ঢ্যাঁড়শ ফলাতেও পারো।

একা একা ওইসব করতে যাবো আমি ?

বাঃ ? একা কেন ? সাহায্যকারী হিসেবে একটা মালি-টালি জুটিয়ে আনবো।

তোর কথা শুনলে হাসবো না কাঁদবো তা বুঝতে পারি না জিতু।

কী মুস্কিল ! এই সামান্যটুকুও বুঝতে পারো না, কাঁদার থেকে হাসা অনেক 'বেটার' তাও জানো না।

কিন্তু আমার যে এই শূন্যপুরীখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বুক ঠেলে কান্নাই আসতে চায় রে জিতু !

যুধাজিৎ যে মায়ের হৃদয়বেদনা অনুভব করছে না তা নয়। কিন্তু তার করার কিছু নেই। যার নিজের মধ্যে 'বাঁচার' কোনো সম্বল নেই, অপরের দাক্ষিণ্যের ওপর জীবন-মরণ ; তাকে আর কে বাঁচাতে পারবে ?

তবে সেকথা তো আর বলা যায় না ? তাই বলল, মাই গড্। তুমি তোমার 'মনোরমা ধাম'খানা হারিয়ে ফেলে পরম দুঃখের মধ্যে ছিলে, এখন আবার একটা 'নিউ মনোরমা ধাম' পেলে, অথচ তোমার কান্না পাচ্ছে !

আমি কী শুধু ইঁট-কাঠ-দালান-সিঁড়িই চেয়েছিলাম জিতু ? এই রকম ভূতের মতো একা একা ঘুরতে ?

জিতু একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, আরো যা চেয়েছি, সেটা যোগানো আমার সাধ্যে নেই মা। কিন্তু ভেবে দ্যাখো এখন যদি তুমি তোমার সেই 'ওল্ড মনোরমা ধামেই' থাকতে, এ ছাড়া আর কী অবস্থা হতো ? যারা ছিল, তারা তো তোমায় পরিত্যাগ করে চলেই গিয়েছিল মা। তুমিই এই ভেবে বৃথা কষ্ট পেয়েছো। তারা বাড়িটার অভাবেই চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের মধ্যেকার ভালোবাসার অভাবটা অনুভব করোনি। তাই আবার বৃথা স্বপ্ন দেখেছো, আবার একখানা 'মনোরমা ধাম' পেলেই আবার সবাইকে পাবে ? তা হয় না মা।

বনছায়া অসহায়ভাবে বলেন, তা হলে আমি কী করবো জিতু? এই রকম হাঁ হাঁ করা মস্ত বাড়িখানা নিয়ে?

জিতু আরো গম্ভীর ভাবে বলে, বাড়িখানাকে যদি তুমি লোক দিয়ে ভরাতে চাও মা, তোমার সে সাধ এখনি পূর্ণ হতে পারে। আশেপাশে তাকিয়ে দেখো কতো লোক পাতার ঝুপড়ির মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে। তাদের ডেকে এনে থাকতে বললে কৃতার্থ হয়ে ছুটে আসবে। আর দুবেলা তোমার চরণামৃত খাবে!

বনছায়া রেগে উঠে বলেন, ও আমার সঙ্গে ঠাট্টা চালাচ্ছিস?

কী করবো বলো মা। তেমার সঙ্গে যে আর কিছুই চালানো যায় না গো আমার চিরবালিকা-মা!

বনছায়া কাঁদো কাঁদো গলায় বলেন, তুই কেবল আমার বোকামিটাই দেখিস। কষ্টটা দেখতে পাস না।

যুধাজিৎ এবার সত্যিকার একটু গম্ভীর হয়ে বলে, পাই না কী? পাচ্ছিলাম বলেই তো অনেকখানিটা চেষ্টা করলাম। কিন্তু—

বনছায়া এখন একটু অপ্রতিভ হয়ে যান। যেন নিজের ভুলটা বুঝতে পারেন। তাই তাড়াতাড়ি বলেন, সেকথা অস্বীকার করলে আমার মহাপাপ হবে বাবা। কিন্তু তোর মতো দরদ আর কারো আছে? এই যে তোর বৌদিদি। 'মা মা' প্রাণ করে এমন সাজানো-গোছানো আলো-হাওয়া বাড়িখানায় পাঁচটা দিন থাকলো না। চলে গেল সেই গোবিন্দ ঘোষাল লেনের বাড়িতে।.....তো মাকে ভালবাসে বলেই তো? কিন্তু আমার মেয়ে? কতো 'মা মা' করে? ক বার—

বনছায়া হঠাৎ চুপ করে গেলেন। অর্থাৎ স্বরটা রুদ্ধ হয়ে এলো।

যুধাজিৎ এই আপন হৃদয়ের কাছে অসহায় অবোধ মানুষটার দিকে তাকিয়ে দেখে মনে মনে একটু নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর নিজস্ব দরাজ গলায় বলে উঠলো, আরে ও নিয়ে 'ঘাবড়াও মাৎ' জননী।....দেখো তোমার মেয়ে-জামাই নাতি-নাতনীদের 'উইক এন্ডের' গেস্ট করে ছাড়বো।.....সপ্তাহে দেড়-দুটো দিন অন্ততঃ তোমার বাড়ি সরগরম থাকবে।

এখন বনছায়ার একটু নিঃশ্বাস পড়লো। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে একটু বোধহীনতা থাকলেও সত্যিই রামবোকা নন। একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে বললেন, সে তুই নেমন্তন্ন করে গাড়ি পাঠিয়ে আনা নেওয়া করে হয়তো সেটা ঘটিয়ে তুলবি, কিন্তু নিজের প্রাণ থেকে কী 'মা' কে কতোদিন দেখিনি বলে আসে কী? অথচ বৌমা—আমার ভাগ্য।

'ভাগ্য' নয় মা, তোমার বুদ্ধি। তোমার প্রথম থেকেই চালে ভুল। চিরকাল দেখলাম, তোমার কাছে কেউ এলেই যেন কৃতার্থ, কেউ ডেকে কথা কইলে যেন বর্তে যাও। আর সর্বদাই যেন ভেবে বসে থাকো তোমার সবকিছুতেই খুব ত্রুটি হচ্ছে। যেন যত সব কর্তব্যকর্ম করবার কথা ছিল তোমার, তার কিছুই করে উঠতে পারছো না। কাজেই অপরাধের ভারেই নুয়ে আছো। এতে যা হবার তাই হয়েছে। অন্যেও ধরে নিয়েছে, তোমার একশো হাজার ত্রুটি। তুমি তোমার করণীয় কর্তব্যের কিছুই করে উঠতে পারছো না। আর তোমাকে 'মানুষ' বলে গণ্য করে ডেকে কথা কইলে, অথবা তোমার বাড়ি বেড়াতে এলে তোমায় কৃতার্থ করা হয়।.....বলো ঠিক বলছি কিনা?

বনছায়া একটু হেসে ফেলে বলেন, কী যে বলিস।

ঠিকই বলছি মা। এই হয়। সর্বদাই তোমার 'ভিক্ষুকের' ভূমিকা, প্রার্থীর ভূমিকা। 'প্রার্থীকে' কী 'ভিক্ষুককে' কে আবার পুঁছতে যায়? অবশ্য সত্যিকার 'সুভদ্র' ব্যক্তিজনেদের কথা আলাদা। তেমন জনেরা 'তোমাদের মতো জনেদের' হৃদয়ের মহত্ত্ব বোঝেন। কিন্তু সত্যিকার 'সুভদ্র' আর সংসারে

ক'জন বলো ?.....বেশীর ভাগ জনই ওই অহঙ্কারীরই পূজারী !

অহঙ্কারীর পূজারী ! বেশীর ভাগ জন ? তোর কথার মাথামুণ্ডু বোঝা দায় বাবা !

তোমার পক্ষে তো দায় হবেই মা। কারণ তোমার নিজের তো আর মাথা অথবা মুণ্ডু বলতে তেমন কিছু নেই। তুমি ভাবো, সক্কলকে খুব ভালোবাসলেই সবাই 'আপন' হয়ে যায়। তা হয় না হে বনছায়া দেবী। ও ফর্মুলা জনগণের জন্যে নয়। ওই জনগণের ক'জন আর তোমার ওই অহেতুক ভালোবাসাকে 'মহামূল্যবান' ভেবে ধুয়ে জল খাবে ?....কোনো দামই দেবে না। বরং তুমি তোমার 'প্রাণের ভালোবাসাটিকে' প্রকাশ করতে অহেতুক যতো উপহার দ্রব্য দেবে, অহেতুক নেমন্তন্ন করে করে খাওয়াবে—তারা একটা 'কমপ্লেক্সে' ভুগবে এবং ক্রমেই তোমার বিরোধীপক্ষ হয়ে দাঁড়াবে।.....কারণ ওগুলো তো সবাই করে না। অবচেতনে একটা নিজেকে 'খাটো' ভাবাটা এসে যায়।.....তাহলেই বোঝো। জীবনের প্রথম থেকেই চালে ভুল।....দেখবে যারা ভাঁটুস অহঙ্কারী, যারা কোনো মানুষকেই নিজের থেকে উঁচুদরের ভাবে না, 'কর্তব্য' শব্দটা নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং অন্যের 'ত্রুটি' সম্পর্কে রীতিমতো সচেতন থাকে, তাদেরকেই লোকে সমীহ করে, তোয়াজ করে আর তাদের শিবেরই নাম লেখায়। তাই তোমার মায়ের পেটের বোন, তোমার নিজের পেটের মেয়ে, তারা ওই 'পরের মেয়ে' তোমার বৌমার শিবিরে গিয়ে ঢোকে।

জিতু !

বনছায়া হঠাৎ যেন আর্তনাদের গলায় বলে ওঠেন, এ কথা তুইও বুঝতে পেরেছিলি ? সত্যিই আমি যেন টের পেতাম, সবাই যেন একদলে, আর আমিই যেন 'একঘরে'। একটু আড়াল পেলেই কেমন যেন ফিসফিস কথা।....আর অথচ আমি তা সর্বদাই সকলের 'মন' আর 'মান' রাখবার চেষ্টায় প্রাণপাত করেছি। তাই না এতো আহ্লাদের মধ্যেও মনের মধ্যেটায় যেন কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকেছে।

বনছায়া ছেলের চোখ এড়িয়ে নিজের চোখটা মুছে ফেলবার চেষ্টা করে বলেন, ভেবেছিলাম ভগবান যদি আবার একটু দিন দিয়েছেন, তো আবার আগের মতো হই। চিরকালই তো একই স্বভাব। 'তিনি'ও তো ওই নিয়ে তোর মতোই হাসতেন।....বলতেন, 'যতই তুমি সকলের মন পাবার চেষ্টা করবে ততই তারা তাদের মনটিকে আকাশে তুলে বসে থাকবে।' কিন্তু আমার যে ওইটাই স্বভাব। তার বিপরীত কাজ করতে গেলে নিজের মনের শান্তি নষ্ট হয়।....কোনো ব্যাপারে একটু ত্রুটি করে ফেললে, পাঁচ দিন ধরে মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। ভাবতে থাকি আবার কবে তাকে হাতের নাগালে পাবো, তাহলে ওটা মিটিয়ে নেব।

উঁহু ! বলো ওটা 'মেক আপ' করে নেবো।....হেসে ওঠে যুধাজিৎ, রেলগাড়িদের যেমন হয়, তো প্রথমটা ঢিমেতালে চলে 'লেটে' যাচ্ছে, শেষের দিকে প্রাণপণ দৌড় দিয়ে সেই পিছিয়ে পড়াটা মেক-আপ করে নেয়।

যুধাজিতের কাজ ছিল বিস্তর, তবু মায়ের প্রতি মমতার বশেই এতোক্ষণ কথা চালিয়ে চলেছে। তবে এটা ও না ভেবে পারছে না, এই যে এতোদিন যাবৎ সেই 'শীতলাতলার' দেড়খানা ঘরের মধ্যে বন্দী ছিল মা, সেও তো নিঃসঙ্গই কেটেছে। কে তার সঙ্গী হতে এসেছে ? আর যুধাজিৎ তো ক্রমেই নিজের ধান্ধায়—

হঠাৎ কী ভেবে বলে ওঠে, ভাবছি আজ আর এখন বেরোবো না। বিকেলের দিকে বেরোনো যাবে। অনেকদিন তোমার সঙ্গে একসঙ্গে খাওয়া হচ্ছে না, আজ সেটাই হোক।

তা হচ্ছে না বটে। সেই দেড়খানা ঘরের সংসারের ছন্দটি, কিছুদিন ধরেই ব্যাহত।

বনছায়া বললেন, আমার সঙ্গে। ওমা। তাহলে তো নিরিমিষের জেদ ধরবি। তো আগে বলবি তো ? ওদিকে তো কিছুই—

কেন ? তোমার আজ অরন্ধন ? না কী 'উপোস ষষ্ঠি' ?

আরে বাবা ! তোর এই ঠিকে ঠাকুরটা তো এখনো রয়েছে। এ মাসের কটা দিন থাকবে বলেছিলি ? তাই ওর দিকেই কুটনো বাটনার ব্যবস্থা চলছে। বাজার করেও আনছে ভালোই। তো আমি আর একা নিজের জন্যে কী এতো পাঁচখানা রাঁধতে বসবো ?.....বেলায় দুটো ভাতে ভাত করে নিই।

বাঃ। কী সুচারু ব্যবস্থা। এমন না হলে সুগৃহিণী ! বৃথা অপচয়ের পথ বন্ধ।....মা ! তোমার সেই ঠিকে ঠাকুরটিকে একটু ডাকো তো !

কেন, তাকে আবার এখন কী করবি ? সে আমি যা হোক—

তাকে এই দণ্ডে এই মাসের শেষ দিন পর্যন্তর হিসেব করে মাইনেপত্তর দিয়ে বিদায় দিয়ে দেবো।

ওমা ! সে কী দোষ করলো ?

না না, সে কী দোষ করবে ? সে তো ভালো ভালো বাজার করছে, ভালো ভালো রান্না করে দাদাবাবুকে খাওয়াচ্ছে। অতীব সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু তার উপস্থিতির ফলে তোমায় যদি রোজ ভাতে ভাত খেতে হয়, সেটা বরদাস্ত হবে না। তুমি আমাদের সেই পাখির খাঁচা বাড়িতে দুজনের জন্যে যেমন 'ষোড়শোপচার' না কী বলে করতে, তাই ভালো ! তাতে তোমারও বেকারত্ব ঘুচবে। হা-হুতাশ করবার সময়টা একটু কমবে।

সেই ব্যবস্থাটা ছিল ওদের এই ক'বছরের কেবলমাত্র মাতাপুত্রের সংসারে। দুদিকে রান্নার ঝামেলা করা চলবে না বনছায়ার। যা হবে একই সঙ্গে।

'ছেলেটা নিরিমিষ খেয়ে খেয়ে রোগা হয়ে যাবে ?' ভাবো কী নিরামিষে যা সব ভালো ভালো আছে সে সবের নিয়মিত প্রয়োগ হলে ছেলে মুটিয়ে যাবে !

বনছায়া রেগে বলেছিলেন, তাই বলে তুই এই মা বুড়ির জন্যে কচুঘেঁচু খেয়ে থাকবি ?

কচুঘেঁচু। মাই গড্। কেন, তোমার ছানার ডালনা, ধোঁকার ডালনা, পটলের দোলমা, পোস্তর বড়া, মোচার ঘণ্ট, নারকেল ঝাল, এরা সব অচ্ছুৎ না কী ? সাত্ত্বিক আহার। বলো তা একখানা ওই সাত্ত্বিক রান্নার মেনু দেওয়া রান্নার বই একটা কিনে দিই।

হয়েছে। আর বই কিনতে হবে না। মার আরো ঢের জানা আছে। তাই বলে—তুই বারো মাস বিধবার মতন—কী যে বলিস !

মা গো ! একটা ব্যাপার ভুলে যাচ্ছো মা। শহরের রাস্তায় রাস্তায় 'অমেধ্য বস্তুর' সাপ্লাইয়ের কারখানা অগুনতি। ইচ্ছে হলেই অসাত্ত্বিক হতে পারা যাবে !

তা সেই ব্যবস্থাই চালু ছিল সেখানে।

দৈবাৎ দিদি-জামাইবাবুরা এলে অথবা দাদা-বৌদি কৃপাপরবশ হয়ে একদিন বনছায়ার কাছে খেলে, যুধাজিৎ ভালো হোটেল থেকে খাবার আনিয়ে অতিথি সৎকার করে মায়ের শান্তিবিধান করতো।

তো সেই ব্যবস্থাই এখানেও ফিরিয়ে আনা হোক ! যদিও বাড়ির প্রতিটি তলাকেই 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' করার জন্যে সব তলাতেই 'কিচেন' 'স্টোররুম'।....যেটা বনছায়ার ওল্ড মনোরমা ধামে ছিল না। তেমন অনাসৃষ্টি ভাবনাও ছিল না।

তার একতলার রান্নাঘরে সিমেন্ট গাঁথা জোড়া উনুন, রাক্ষসের মতো কয়লা খেয়ে সারাদিন জ্বলে মরতো।....সেখানে বিশ পঁচিশ বছরের পুরনো মুরলী ঠাকুরের ছিল জমজমাটি কারবার !

বাটনাবাটুনি পদ্মর সঙ্গে পানদোক্তার আঁতাতটি ছিল জম্পেস।....বাসনমাজুনি গজগজ করতো, 'পদ্ম সাতবার চা খায়'।

বনছায়া হেসে বলতেন, 'খাক না বাবা ! তাতে কী আর তোমাদের 'বাবু' ফেল মেরে যাবেন ?'

বলতে গেলে পুরো একতলাটাই ছিল ভৃত্যরাজ্য' !

সেই রমরমার ছবিই, বনছায়ার মনের জগতে হচ্ছে 'সংসারের ছবি'।

বনছায়ার সেই শূন্যতার পূরণ-করা আর কার সাধ্য?

যুধাজিৎ একটা অদ্ভুত মমতায় চেষ্টা চালিয়ে গেলে কী হবে? আর বনছায়ার সময়ের শূন্যতা ভরাট সারা বছরেও না ফুরোতে পারে, এতো পশমের গোলা এনে এনে মজুত করলে কী হবে?

বনছায়া বললেন, তা বলে এক্ষুণি বেচারীকে মাইনে মিটিয়ে ভাগিয়ে দিতে হবে না বাবা! এ কটা দিন চারবেলা খাওয়াটাও ও বেচারীর হিসেবের মধ্যে ছিল। হঠাৎ তা থেকে বঞ্চিত করলে—

যুধোজিৎ দুটো হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, জননী গো। 'মা' তো চিরনমস্যাই, কিন্তু বাড়তি আরো কিছু নমস্কার তোমার চরণে নিবেদন করছি।... তবে আরো একটা হিসেব করতে ভুলে যাচ্ছো। এই ক'দিনের 'বাজার করা' বাবদ 'আয়টা'।... সেটাও তাহলে মাইনের সঙ্গে মিটিয়ে দেওয়া উচিত।...ঠিক আছে। এই মাসের এই সাত দিন তোমার যেমন চলছে চলুক। তারপর আমাদের পুরনো ছাঁচে ফেরা যাবে।

বনছায়া হঠাৎ বেমক্কা ডুকরে উঠে বলে ওঠেন, এভাবে আর কতোদিন তুই মাকে আগলে আগলে জীবন কাটাবি জিতু? এবার একটা বৌ আন। তোরও কষ্ট ঘুচুক, আমারও দুঃখ ঘুচুক।

বৌ! বৌ এনে— একটি বৌ এনে—

হা হা হা।

যুধাজিতের গলা খোলা হাসির শব্দে বামুন ঠাকুর এবং বোধহয় ঘরমুছুনি মেয়েটাও চমকে ওঠে। এতো জোরে হাসি কিসের? কোনোদিন তো এতো এমন শোনা যায় না।

জিতু যেন কষ্টে হাসি থামিয়ে বলে, কী বললে মা? আর একবার বলো তো শুনি?... একটা বৌ এনে ফেললেই 'আমারও কষ্ট ঘুচবে, তোমারও দুঃখ ঘুচবে।' মাগো! তোমার 'নিজস্ব' বলতে তো এই কানাকড়িটা আছে, সেটাও বেহুঁশ হয়ে বিলিয়ে দিতে চাও?

হঠাৎ কেঁদে ফেলার লজ্জার ওপর ছেলের ওই হাসির বহর। তার ওপর আবার ছেলের ওই কথাটি।... বনছায়া সেই ভিজে চোখেই রাগ দেখিয়ে বলেন, কেন বিলিয়ে দেওয়া কিসের? তুই কী আমার সেই রকম ছেলে?

যুধাজিৎ দুই হাত উল্টে বলে, কে 'কী রকম' তা কি আগে থেকে বোঝা যায় মা? তোমরাই তো বলো 'এই বেড়ালই বনে গেলে বনবেড়াল হয়'।

সে যে বলে সে বলে। তুই কখনোই তেমন হবি না। এ আমি লিখে দিতে পারি।

মাগো! দোহাই তোমার। যেন 'স্ট্যাম্প পেপারে' লিখে বসতে চেও না।... জানো আমার একটা বন্ধুর দাদা, বিয়ের আগে 'বাড়িটা' যার ছিল প্রাণতুল্য।... সে এখন মা-বাপ ভাইবোনেদের সঙ্গে কথা বলে না। মানে বলতে সাহস পায় না, বৌ ওর দাদাকে এমন কব্জা করে রেখেছে।

অমন ছেলেকে আমি মানুষ বলি না।

বনছায়া ধিক্কারের আর তেমন ভাষা খুঁজে না পেয়ে এইটুকুই বলেন। যতই হোক একটা 'ছেলে' বলে কথা। বলতে তো আর পারেন না, 'অমন ছেলের গলায় দড়ি'।

তবে কথাটি উচ্চারিত হয়। তাঁরই ছেলে বলে উঠে, এও বলতে পারতে 'অমন ছেলের গলায় দড়ি'। কিন্তু সে লোকও করবেই বা কী? কব্জা করে রাখবার জন্যে যে একখানি মোক্ষম অস্ত্র শানিয়ে রেখে দিয়েছে বৌ। একটু কিছু বলতে গেলেই শাসায়, 'দ্যাখো আমায় বেশী ঘাঁটাতে এসো না। একখানা 'সুইসাইড নোট' লিখে লালবাজারের ঠিকানায় পোস্ট করে দেবো। ব্যস, তারপরই গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ে বাড়িসুদ্ধ সকলের হাতে দড়ি পরিয়ে ছাড়বো।'... আর কিছু বলতে যাবে কেউ তাকে?

বনছায়া অবিশ্বাসের গলায় বলেন, এতোটা আবার হয় না কী।

হয় না ? আছো কোথায় মা ? আরো যে কত হয় তা জানো না তাই।... তুমি তো ভেবে ঠিক করে বসে আছো, বৌ এলে খুব করে ভালোবাসবো। তার যা ইচ্ছে করতে দেবো। তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবো না— কী ভাবোনি এসব ?... ভাবোনি ভালোবেসে আর ভালো ব্যবহারের জোরে আপন করে নেবো ? নিশ্চয় তাই ভেবে রেখেছো। কিন্তু জেনে রেখো মা, এ তোমাদের আমলের— 'যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ'-এর সরল অঙ্ক নয় যে সহজে কষে ফেলা যাবে। এ যুগের অঙ্ক বড় জটিল। অতো সহজে কষে ফেলা যায় না মা।

বনছায়া হতাশা আর রাগের গলায় বলেন, বিয়ে করার মতলব নেই, তাই এতো সব গল্প ফাঁদছিস। বলতে চাস সব মেয়েই ওইরকম দুষ্টু ? ভালো মেয়ে নেই ?

সর্বনাশ। অমন পাপকথা কখনো বলতে পারি ? আসলে দুষ্টু মেয়ের থেকে ভালো মেয়ের সংখ্যাই বেশী মা !... তবে তোমার ভাগ্যে যেটি জুটবে সেটি কী হবে কে বলতে পারে ?

বনছায়া আবার একটু হতাশ নিঃশ্বাস ফেলেন, তাহলে সেটাকে 'আমার কপাল' বলেই মেনে নিতে হবে।

বাঃ। বনছায়া দেবী, বেশ। শুধুই তোমার 'কপাল' ? এই হতভাগাটার কথা ভাবছো না ?

বনছায়া বলেন, সে কথা কী আর ভাবি না বাবা ? তবে এটাও তো ভাবতে হবে, 'ঠাণ্ডা লাগলে অসুখ করতে পারে ভেবে, ঘরের জানলাই খুলবই না', এমন বুদ্ধিই ঠিক কিনা !...

হ্যাঁ, দুঃখ-নিবারণের বোধহয় ওই একটাই দাওয়াই আছে। 'কাপাল'কে মেনে নেওয়া।

তা 'মেনে' আর মানিয়ে নিয়ে চলাই তো নারীজীবনের চিরকালীন ভূমিকা। তার এই ভূমিকাটি সুচারু ছন্দে পালন করে চলতে পারলেই, সমাজ সংসারে ছন্দভঙ্গ। সংসারের সমস্ত সুষমা লাবণ্য আনন্দ অন্তর্হিত।

গরীব হতভাগা নিরূপায়দেরও তো ওই একই গতি। 'কপাল'কে মেনে নেওয়া। এই মেনে নেওয়ার শক্তিটি যুগিয়ে চলে 'পূর্বজন্ম' আর 'পরজন্মের' অলীক আশ্বাস।

'তোমারই বা এতো দুঃখ কেন ?'

কেন আর, পূর্বজন্মের 'কর্মফল'।

'এতো সয়ে মরছ কেন ?'

'পরজন্মে শান্তি পাবার আশায়।'

অর্থাৎ একটা হচ্ছে 'কপালের ফের'। আর অপরটি হচ্ছে পরবর্তী জীবনে 'কপাল ফেরাবার' সাধনা।

শেষ পর্যন্ত ওই 'কপাল'।

তা বনছায়ার প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে বিপরীত নীহারিকা নামের মহিলাটিও শেষমেষ নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার কপাল। আমার পূর্বজন্মের কর্মফল।' বলেছে অবশ্য তুচ্ছ কারণেই।

তবু বলেছে। তুচ্ছ কারণেই বলেছে। কারণ তখনো জানতে পারেনি নীহারিকার 'কপাল' তার জন্যে কী 'উপহার তুলে রেখেছে।

নীহারিকা ভেবেছে, আমার কপাল। তাই তিন তিনটে সন্তানই আমার বিরোধী পক্ষ। আমার বড়ছেলেটাকে— প্রায় যমে নেওয়ার মতোই অহেতুক ছিনিয়ে নিয়ে গেছে একটা অশুভ শক্তি। আমার ছোট ছেলেটা আমায় মনিষ্যি বলেই গণ্যই করতে চায় না। যেন 'করুণার' চোখে তাকায়। আর আমার মেয়ে ?... সে আমার হাত থেকেই সমস্ত সুযোগসুবিধে আদায় করে নেয়, অথচ আমায় ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে দেখে।

আর নিতান্ত 'নিষ্পর' বললেও হয়, যে মানুষটা, যে আমায়ও একটু স্নেহের দৃষ্টিতে, মমতার দৃষ্টিতে দেখে তার ওপর আমার তিন ছেলেমেয়েরই যেন জাতক্রোধ। অথচ তিনজন তিন প্রকৃতির। শুধু ওই একটা জায়গায় কী অদ্ভুতভাবে মিল!

আমার কপাল!

॥ তেরো ॥

আর পারা যাচ্ছে না বাবা! অহরহ মনের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে চলা এই আর্তনাদটি হঠাৎ মুখ ফসকে মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়ে গেল। গেল প্রায় অজ্ঞাতসারেই। বলে ফেলে নিজেই যেন নিজের স্বরে চমকে গেল। তা বাইরে যখন ছিটকে এসে পড়েছে, তার দায় পোহাতে হবে বৈকি। মনের মধ্যে আর্তনাদের ঝড় তোলো, প্রতিবাদের ঝড় তোলো, অবৈধ চিন্তা, হিংস্র চিন্তা বেআইনি চিন্তা, অসঙ্গত চিন্তা যা কিছু নিয়েই নিরুচ্চার উচ্চারণে মুখরিত হও, তার কোনো দায় নেই, ওজন নেই, কিন্তু যে মুহূর্তে? ভিতরের ঝড় বাইরে এসে আছড়ে পড়ে, সেই মুহূর্তেই তার ওজন থাকে, দায় থাকে।

বাপ্পার ওই অহরহ ভেবে চলা কথাটা যেই মুখ ফসকে বাইরে বেরিয়ে এল, সঙ্গে সঙ্গে পাশের বেড্-এর ভদ্রলোক চকিত হয়ে বলে উঠলেন, কিছু বলছেন?

বাপ্পা সচকিত হলো, লজ্জিতও হলো। এভাবে উদ্ঘাটিত হওয়া বাপ্পার পক্ষে রীতিমত অস্বস্তিকর। কিন্তু জানে এখন 'না কিছু বলছি না' বললেও ভদ্রলোক সহজে রেহাই দেবেন না। জানতে চাইবেন, কোথাও যন্ত্রণাবোধ করছেন নাকি? নার্সকে ডেকে দেব নাকি?

ভারী পরোপকারী লোক।

তাই বাপ্পা আলগাভাবে বলে, না, এই বিছানায় পড়ে থেকে থেকে আর পারা যাচ্ছে না। তাই বলছি।

ভদ্রলোক প্রায় অবাক হয়ে বলে ওঠেন, আপনি এই দশ দিন হলো এসেছেন না? হ্যাঁ, দশ দিনই তো!

তাই হবে বোধহয়।

এর মধ্যেই আপনি বলছেন, 'আর পারা যাচ্ছে না।' আমি কতদিন আছি জানেন? তিনটি মাস। থ্রী মান্থস।

কথায় জোর দেবার জন্যে, বাংলা শব্দটির পরই দ্বিতীয়বার সেটি ইংরেজিতে তর্জমা করা ভদ্রলোকের একটি মুদ্রা দোষ। বাপ্পা অবশ্য সাধ্যপক্ষে ওনার গাড্ডায় পড়তে চায় না। তার কার গাড্ডাতেই বা পড়তে যায়? টুসকি তো কখনো কখনো বলে ওঠে, 'দুটো কথা কইলেও কী তোর ইমেজ নষ্ট হয়ে যায় দাদা? কথা বলতে পয়সা তো লাগে না। একেই বলে কিপ্‌টে স্বভাব।'

দাদা যদি ভুরু কোঁচকায়, আহত হয়ে চলে যায়। আর দাদা যদি ক্ষ্যামাঘেন্না করে দুটো কথা কয় তাহলে টুসকি সেই সুযোগে দু'শো কথা কয়ে নেয়। ...এ ভদ্রলোকেরও প্রায় সেই স্বভাব। ডেকে ডেকে কথা বলেন, বাপ্পা হুঁ হাঁ দিয়ে সারে। একদম পাশের লোক, কতো আর এড়ানো যায়?

তবে এইরকম সময়ই বাপ্পার মনে হয় 'জেনারেল ওয়ার্ডেই থাকব' বলে জেদ করাটা বোধহয় একটু ভুল সিদ্ধান্তই হয়ে গেছে। এই প্রায় অসহ্য জায়গায় পড়ে থাকতে থাকতে মনে হয়, মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বোধহয় একটু 'নির্জনতা'। নিজেকে নিয়ে একা থাকার একটি পরিবেশ। তার দাম দিতে বোধহয় একটু মান খাটো করাও চলতো। কিন্তু আর তো সেকথা বলা যায় না! মা তো বার বার বলছে, 'এখানে তোর খুব অসুবিধে হচ্ছে। একটা আলাদা ঘরের ব্যবস্থার জন্যে বলি

না রে?'

যদিও সেই আলাদা ব্যবস্থাটি খুব সহজপ্রাপ্য নয়। টাকা দেব বললেই যে পাওয়া যাবে তা তো নয়। ঘর খালি থাকা চাই। তবে হ্যাঁ, নীলুমামা এ ইশারাও দিয়েছিলেন, 'সে আমি ম্যানেজ করে ফেলতে পারবো। ওর জন্যে চিন্তা নেইরে।' আর ঠিক এই কারণেই বাপ্পা দোদুল্যমান মনকে একটা শক্ত জায়গায় স্থির করে আটকে রেখেছে। আলাদা একটা ঘর থাকলে, প্রাইভেসি থাকতো, থাকতো বই পড়তে পারার সুবিধে। কেউ দেখা করতে এলে স্বস্তিবোধ। তবু—একবার যখন 'না' বলেছে তখন আর 'হ্যাঁ' বলা চলে না। তাও হয়তো চলতো—যদি সেটা ওই নীলুমামার মাধ্যমে না হতো! লোকটাকে যে কেন এমন দু'চক্ষের বিষ লাগে এখন, ভেবে পায় না বাপ্পা। তিনিও যে সেটা না বোঝেন তা নয়, এবং নিজেকে যথেষ্টই গুটিয়ে রাখবার চেষ্টা করেন, তবু স্বভাবটা তো একেবারে বদলাতে পারেন না। তাঁর স্বভাবের গোড়ার কথাই যে হচ্ছে, কেউ কোনো অসুবিধেয় পড়েছে শুনলেই বলে উঠবেন 'নো প্রবলেম। দেখি আমি কী করতে পারি।'

পাশের ভদ্রলোক তো নীলুমামায় মোহিত। নীলুমামা তাঁর সঙ্গেও আত্মীয়সুলভ ভঙ্গিতে কথা বলেন। ডাক্তার কী বলছে, কতটা ইমপ্রুভ করছে, এই সব প্রশ্ন।

চলে যাবার পর ভদ্রলোক বলে ওঠেন, 'আপনার মামার মতো হৃদয়বান লোক আমি কমই দেখেছি।'

ভদ্রলোকের নামটাম জানে না বাপ্পা, শুধু পদবীটা জেনেছে 'পাঠক'। শুনে হঠাৎই ভেবেছিল এই ধরনের পদবীর মূল উৎস কী? এদের পূর্বপুরুষদের পেশাটা কী ছিল ভাগবত-টাগবত পাঠ করে বেড়ানো? গ্রামে গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে কতরকম যে অদ্ভুত অদ্ভুত পদবী কানে আসে। বাপ্পার ওই একটা ছেলেমানুষী স্বভাব, তক্ষুণি তার মূল উৎস চিন্তা করতে চেষ্টা করে। এইতো যেখান থেকে মাথা ফাটিয়ে এলো, সেখানে দু'টো লোককে দেখেছিল, তাদের পদবি হচ্ছে 'সেনাপতি' আর 'সেপাই'। এদের পূর্বপুরুষরা নির্ঘাত কোনো এককালে কোনো রাজাটাজার সেনাবাহিনীতে ছিল। ভেবেছিল বাপ্পা।

এঁর ব্যাপারেও ভেবেছিল, বোধহয় কথক পাঠক গোছের কিছু ছিল এরা আগে।

লোকটার বয়েস বোঝা শক্ত। এমন একটা পাকসিটে মার্কা চেহারা, মনে হয় চল্লিশও হতে পারে পঞ্চাশও হতে পারে। চল্লিশের কম হওয়াও অসম্ভব নয়। তবে ত্রিশ বছরের বাপ্পার সঙ্গে বেশ গায়ে পড়া মাইডিয়ারি ভাবে কথা বলবার চেষ্টা করে থাকেন ভদ্রলোক।

এখনো তেমনি বললেন, দশদিনেই আপনি বলছেন 'পারা যাচ্ছে না'? আর আমি কতদিন আছি জানেন? তিনটি মাস।...এবং বক্তব্যকে আরো জোরালো করতে ইংরেজিতে তর্জমা করে আর একবার বলেন।

আর 'হুঁ হাঁ' করে সেরে নেওয়া স্বভাব বাপ্পা হঠাৎ স্বভাবছাড়াভাবে চমকে প্রশ্ন করে তিন মাস!

সেই তো, তিন মাসের ওপর আরো দু'টো দিন জোড়া দিন।...তাও এখন শুনছি, আরো অনেক সময় নেবে। যদিও বেশি দিন পড়ে থাকলে অনেক প্রবলেমও আছে।

বাপ্পা লক্ষ্য করে দেখেছে, ভদ্রলোকের পায়ে প্লাস্টার করা নেই। এমনকি কোনো ব্যাণ্ডেজও নেই। অথচ বিছানা থেকে নামতেও দেখা যায় না। তার মানে নেমে দাঁড়াবার সামর্থ্য নেই।

বাপ্পা যা করে না আবার তাই করে বসল। খাল কেটে কুমির আনল। অর্থাৎ আবার নিজে থেকে একটা প্রশ্ন করে ফেলল, কী হয়েছে?

ব্যস, খুলে গেল বাঁধের মুখ।

আর বলবেন না মশাই। কপালের ফের। কিছুর মধ্যে কিছু না, ট্রাম থেকে নেমে রাস্তা ক্রশ

করছি, একটা ধর্মের ষাঁড় পাগলা হয়ে উর্ধ্বমুখী ছুটে আসতে গিয়ে পিঠে মারল এক গোঁত্তা। একদম মেরুদণ্ডে। একদম স্পাইনাল কর্ডে!

ধর্মের ষাঁড়! বাপ্পা প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাকায়।

কী? ধর্মের ষাঁড় মানে জানেন না? অ্যাঁ? রাস্তায় দেখেননি কখনো?

বাপ্পা যখন কুমিরকে এনে বসেছে তখন তার হ্যাপা সামলাতেই হবে। তাই আস্তে মাথা নাড়ে।

দেখেননি? রাস্তায় ষাঁড়, গরু, মোষ, কুকুর, ছাগল এসব দেখেননি কখনো? তাজ্জব কী বাৎ।

বাপ্পা একটু বেজার গলায় বলে, তা দেখব না কেন? কিন্তু 'ধর্মের ষাঁড়'টি কী বস্তু?

কী মুশকিল! বাঙালির ছেলে এটা জানেন না? বলি লোকে মা-বাপের শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করে তা জানেন তো? কী ব্যাপার? মুখ দেখে মনে হচ্ছে তাও বোধহয় শোনেননি কখনো। তবে আর কী বলব? ও একটা শাস্ত্রীয় ব্যাপার। একটা ষাঁড়কে দেগে দিয়ে ওই পরলোকগতের স্বর্গ কামনায় পথে ছেড়ে দেওয়া হয়। সে ব্যাটা ইচ্ছেমতো চরে বেড়ায়, তাকে কেউ মারতে ধরতে পারে না। ধর্মের নামে উৎসর্গ তো। যথেচ্ছ বিচরণের স্বাধীনতা থাকে তার, আর কোনো কাজকর্মের দায়ও নেই, শাসনও নেই, তাই বেদম গোঁয়ার হয়।

ভদ্রলোক একটু রহস্যময় হেসে বলেন, তো মানুষের মধ্যেও তেমন জীবের অভাব নেই। আমরাও তাকে ওই নামেই চিহ্নিত করি। সে যাক, এই তো মশাই ব্যাপার। অজ্ঞান, অচৈতন্য লোকটাকে রাস্তা থেকে লোকে তুলে নিয়ে হাসপাতালে দিয়েছিল। অতঃপর হাতের ব্যাগ থেকে ঠিকানা-টিকানা পেয়ে বাড়িতে খবর! পরে জানলাম শিরদাঁড়াটা ফেটে আটফাটা হয়ে গেছে। বুঝুন ব্যাপার। শরীরের আসল জায়গাটাই খতম।...মাস দুই লোহার ফ্রেমের মধ্যে পুরো বডিটাকে আটক রেখেছিল, এখন ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ দিয়ে মাদুর গোটানোর মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পাটিসাপ্টা বানিয়ে রেখেছে।

অভাগার কপালখানা দেখুন। লরীর ধাক্কা নয়, মটর গাড়ির ধাক্কা নয়, ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট নয় যে একটা প্রেস্টিজ থাকবে। কিনা ষাঁড়ের গুঁতো। লোকের কাছে বলতে লজ্জা। প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকে না।

বাপ্পা হঠাৎ হেসে ফেলে।

ভদ্রলোকের বলার ভঙ্গিতে না হেসে পারে না।

আপনি হাসছেন? তা শুধু আপনিই বা কেন? এ আক্ষেপ শুনে সবাই হেসেছে। এভ্রিম্যান। কিন্তু আমার মানসিক অবস্থাটা কেউ ভেবে দেখে? এমনিতে তো নেহাৎই হরিপদ কেরানির জীবন, বিশ বছর ধরে কর্মস্থলে ওই ষাঁড়ের গুঁতোই খেয়ে চলেছি। তো জীবনে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটলো, তাতেও তাই। যদি মরে যেতাম তাহলে লোকে শুনতো মুকুন্দ পাঠক নামের হতভাগাটা মরলো কিনা ষাঁড়ের গুঁতো খেয়ে। তা মরলে অবশ্য ভালই হতো! ব্যাচিলার মানুষ, মা-বাপও নেই, মরলে কার কী এসে যেত? এ এখন কী অবস্থা হয়—

ব্যাচিলার মানুষ!

শুনে যেন একটু ছেদ্দা এল বাপ্পার! কেন কে জানে।

মুকুন্দ পাঠক অবশ্য ওই সব ছেদ্দা অছেদ্দার ধার ধারেন বলে মনে হয় না, তিনি কথা চালিয়েই যান। বলেন, এখন এই ভাঙাচোরা দেহটায় কতটা কী ফিট হবে কে জানে। হয়তো সংসারের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে। ভাই-ভাজের সংসার বৈ তো নয়।

ওপাশ থেকে কে একজন বলে ওঠে, ও মুকুন্দবাবু, 'ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।' 'বে-থা' করে সংসার করেননি যখন তখন শেষ জীবনে তো পরের গলগ্রহ হতেই হবে। মা-বাপ তো চিরকালের নয়।

মুকুন্দবাবু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, তখন অনেক বড় বড় চিন্তা ছিল ব্রাদার। ভাবতাম কম রোজগার, কেন মিথ্যে জঞ্জাল বাড়াই, একা থাকবো, খাবো, মাখবো, বেড়াবো, স্বাধীন জীবনযাপন করবো। রোগ-ব্যাধি হলে হসপিটাল আছে। রোগব্যাধি হলে যে নরককুণ্ডু থাকবে তা কে জানতো ?...তো এই আপনি মুশাই কী যেন নাম আপনার ? কেন মরতে এখানে এসেছেন। আপনাকে তো দেখলে মনে হয় খুব ভালো ঘরের আদরের ছেলে ! আপনি—

বাপ্পা বলে ওঠে, লোককে দেখেই আপনি বুঝে ফেলেন, সে কীরকম ঘরের ছেলে ? আদরের না অনাদরের ?

তা পারা যায় বৈকি ভায়া ! আপনাকে যাঁরা দেখতেটেখতে আসেন রীতিমতো রেসপেকটেবল বলেই মনে হয়। তাছাড়া আমি শুনেছি আপনার মা আপনাকে আলাদা কেবিনে থাকার জন্যে বারবার বলেছেন। তবে আপনি কেন এই অসহ্য অবস্থায়—

বাপ্পা হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠে বলে, এত হাজার হাজার লোক যা সহ্য করতে পারছে তা সেটা আমিই বা সহ্য করতে পারবো না কেন ?

মুকুন্দ পাঠক তার পাকসিটে মার্কা মুখে একটু রহস্যের ব্যঞ্জনা মাখিয়ে বলেন, ওসব আদর্শের বুলি একসময় আমরাও কপচেছি ব্রাদার। সে সব মোহ ভঙ্গ হয়ে গেছে। তবে হ্যাঁ, আলাদা কেবিনে থাকলেও, এর থেকে এমন কিছু স্বর্গীয় অবস্থা পেতেন তা মনে হয় না। আসলে সবাই তো 'স্বরাজ পাওয়া'। এ টু জেড। 'ক' থেকে 'চন্দ্রবিন্দু' পর্যন্ত। কে কার কড়ি ধারে।...ওই একটা জিনিস এনে দিয়েছিল বটে গান্ধীজী। স্বরাজ ! তো সেটাই ভাঙিয়ে এযাবৎ খেয়ে চলেছি আমরা সবাই। আর তারপর যাঁরা এলেন ? অনেক বিগ্ বিগ্ কথা শোনালেন, অনেক স্বপ্ন দেখালেন, নতুন পৃথিবী গড়ে দেবেন প্রমিস করলেন ? তাঁরা এখন—

ওধারের ভদ্রলোক বলে উঠলেন, ওই শুরু হলো মুকুন্দবাবুর পাঁচালি—

কী ? শুনে আপনার গায়ে ফোসকা পড়ছে বুঝি ? হা হা হা। পড়তো মশাই, আমারও একদিন তাই পড়তো। লোকের সঙ্গে তাল ঠুকে লড়তে যেতাম। এখন দেখতে দেখতে চোখের কাজল মুছে ফর্সা।...হ্যান্ করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা। সবাইকে সমান করে দেঙ্গা। মানুষে মানুষে আর ফারাক থাকবে না। আজ আমরা সবাই সর্বহারা, আগামীকালে সবাই একসঙ্গে 'সর্বস্ব' পাবো।...তারপর ? দেখছেন তো ? না কী দেখছেন না ? কেমন সমান সমান ভাগ ? যারা 'কনটেসা' গাড়ি চেপে ভেপু বাজিয়ে রাস্তা দাপিয়ে বেড়াবার তারা তাই বেড়াচ্ছে, যারা বুলেটপ্রুফ গাড়ি চড়বার তারা তাই চড়ছে, আর যারা ষাঁড়ের গুঁতো খাবার, তারা তাই খাচ্ছে। হাসপাতালে এসে কুকুরে চাটা থালায় খেতে বাধ্য হচ্ছে।

মুকুন্দবাবু আপনি থামবেন ? ওপাশ থেকে সেই কণ্ঠস্বর তড়পে ওঠে, আপনার ওই একঘেয়ে কথা শুনতে শুনতে কান পচে গেল আমাদের। যখনি কোনো নতুন মক্কেল পাবেন, তখনি আপনি ওই একঘেয়ে পাঁচালি গাইতে বসবেন ! অসহ্য !

মুকুন্দবাবু চারখানা খাট ডিঙোনো চোখে সেই ভদ্রলোকের দিকে ভস্ম করার ভঙ্গিতে তাকিয়ে বলে ওঠেন, হসপিটাল কারো পিতৃপুরুষের জায়গা নয় যে শুধু আপনার মনের মতো কথাগুলিই বলা হবে ! আপনাদের বুঝি জায়গাটা স্বর্গতুল্য মনে হয় ? অতি উত্তম ! অনন্তকাল স্বর্গবাস করুন। আমার এখানটা নরককুণ্ডু ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। বলি কোনো সভ্য দেশে কেউ ভাবতে পারবে, হসপিটালে একটা বেড-এ দু'ধরনের দুটো রোগী। হ্যাঁ, একটা বেড-এ দুটো পেসেন্ট। কেউ ভাবতে পারবে দোতলায় তিনতলায় পেসেন্টের ধারে পাশে নেড়িকুত্তা ঘুরে বেড়ায়, পেসেন্টের খাবার টেনে নেয়, খাওয়ার পর থালাটা চেটে সাফ করে। গড্ জানে সেটা আর মাজা হয় কিনা। হয়তো

ভাবে সাফ তো হয়েই গেছে।...বলুন ? আর কোথাও ভাবতে পারবে, মেটার্নিটি থেকে সদ্যোজাত শিশুকে শেয়াল কুকুরে টেনে নিয়ে যায় ? হসপিটালের কম্পাউন্ডে শুয়োর চড়ে বেড়ায় ? মুরগী প্রতিপালন হয় ?...পেসেন্টের বরাদ্দ খাদ্য থেকে সরিয়ে 'কর্তা'রা বখরা করে নেন...হসপিটালের দরকারি ওষুধপত্র মায় তুলো ব্যান্ডেজ পর্যন্ত পাচার হয়ে বাইরে বিক্রী হয় ? এতো কিছুই না বলতে বসলে মহাভারত।...বলুন আমাদের এই সোনার দেশটিতে ছাড়া অন্য কোনো সভ্য দেশে হতে পারে এসব জিনিস ? আমাদের হয়। এথচ, আমাদের কর্তারা আকাশে উড়ে উড়ে বড় বড় দেশে গিয়ে বড়মুখ করে বড় বড় বুলি ছাড়েন। আর নিজেদের সাত গুষ্টির ছানাপোনা পর্যন্ত যার যখন একটু মাথাটিও ধরবে তাকে চিকিৎসা করতে 'ওদেশে' পাঠান। হুঁ, ওদেশের ট্রিটমেণ্ট না হলে দীনের বন্ধু দীনবন্ধু দাদাদের মন ওঠে না।

সেই নাছোড়বান্দা লোকটি আবার বলে ওঠেন, এক কথা কত হাজার বার রিপিট করেছেন মুকুন্দবাবু ?

হাজার ? হাজারবার কেন, কালোকে কালো বলতে হলে লক্ষ বার বলা যায়, কোটি বার বলা যায়। বলতে হবে—চোখের ঠুলি খশে পড়লে, আপনাদেরও একদিন বলতে হবে। তবে যদি গণ্ডারের চামড়ার ঠুলি হয় তো আলাদা কথা।

কী ? কী বললেন ? মুখ সামলে কথা বলবেন মুকুন্দবাবু।

মুকুন্দবাবুও সতেজে বলে ওঠেন, কেন মুখ সামলাবো ? হক্ কথা বলতে ভয়টা কী ? কোন কথাটা মিথ্যে বলা হয়েছে বলুন তো শুনি।

বোঝা যাচ্ছে দু'জনেই কলহপ্রেমী। বিশেষ করে ওই চারখানা খাটের ওপারের লোকটি। তিনি এখন অন্য পথ ধরেন, ব্যঙ্গের সুরে বলেন, এতই যদি তো এই হতভাগাদের সঙ্গে নরককুণ্ডে পড়ে আছেন কেন মশাই ? যান না, নার্সিং হোমে চলে যান না ? ভালো ভালো নার্সিং হোমের তো অভাব নেই। 'বেলভিউতে'ও চলে যেতে পারেন। ক্যালকাটা নার্সিং হোমে যেতেই বা বারণ করছে কে ? আমরা আপনার বকবকানি থেকে রেহাই পেয়ে বাঁচি। হাড়ে বাতাস লাগে।

হঠাৎ মুকুন্দবাবুর সেই পাকসিটে মুখটাও কেমন যেন হয়ে যায়। ভাঙামতো গলায় বলে ওঠেন, কী ? আমি চলে গেলে আপনাদের হাড়ে বাতাস লাগে ? ওঃ। এতটা বুঝতে পারিনি। কী করবো বলুন, হাঁটার ক্ষমতা থাকলে আপনাদের রেহাই দিয়ে বিদেয় হয়ে যেতুম। বলেই গুম হয়ে যান।

নিজে নিজে পাশ ফেরার ক্ষমতা নেই, ক্ষমতার মধ্যে শরীরের আধখানা ঢাকা দেওয়া চাদরটা টেনে মুখ পর্যন্ত ঢেকে ফেলা যায়।

দুটো বয়স্ক লোকের অকারণ এই রকম ঝগড়া কোঁদল দেখে অবাক হয়ে যায় বাপ্পা। পরিবেশই কী মানুষকে এইভাবে বিকৃত করে ? তাই করে নিশ্চয়। না হলে বাপ্পা হেন ছেলে হঠাৎ এমন একখানা কাণ্ড করে বসে ? সে কিনা ওই অদূরবর্তী লোকটার দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে, আপনিও তো আচ্ছা। হচ্ছিল আমার সঙ্গে কথা, আপনি হঠাৎ তার মধ্যে নাক গলাতে এলেন যে ?

লোকটা বোধহয় হঠাৎ এই আক্রমণের জন্যে প্রস্তুত ছিল না, তাই একটু থতমত খেয়ে যায়। তবে সামলেও নেয়। গম্ভীর ভাবে বলে, আপনি তো ছেলেমানুষ, মাত্র কদিন হলো এসেছেন, আরো থাকলে বুঝতে পারবেন ওই একঘেয়ে বকবকানি কী বিরক্তিকর ! ভাগ্যের মার খেয়েই পড়ে থাকতে হচ্ছে আমাদের। উপায় কী ? উনি কেবলই বলেন, হাঁটবার ক্ষমতা থাকলে কেটে পড়তেন। বলি পারলে যেতেন কোথায় ? বাড়িতে তো শুনি দাদা-বৌদির সংসার। তারা নিয়ে যাবার জন্যে গা করছে ? হসপিটাল থেকে তো ছেড়ে দিতে চাইছে, নিয়ে যাবার জন্যে প্রেসার দিচ্ছে। তাঁরা আর এ মুখো হচ্ছেন না।

বলে ভদ্রলোক একটি বিড়ি ধরান।

বাপ্পা কিছুক্ষণ কেমন বিহ্বলভাবে তাকিয়ে থাকে। আর তারপরই হঠাৎ তার মাথার মধ্যে একটা কথা পাক খেতে থাকে, হাঁটবার ক্ষমতা থাকলে সটকান দিতাম।'....হাঁটবার ক্ষমতা থাকলে...' যেখানে পথ-কুকুরদের অবারিত দ্বার, সেখানে মানুষ সম্পর্কে পাহারা কী খুব বেশি কড়া ?

নীলুদা বললেন, ছেলেকে রাজী করাতে পারলি না নীরু ?

নীহারিকাকে তিনি তার সংক্ষিপ্ত ডাকনামেও ডাকেন মাঝে মাঝে।

নীহারিকা হতাশ গলায় বলল, কই আর ? কালও তো বলতে চেষ্টা করছিলাম, উল্টে বলল কী জানো নীলুদা, রোজ রোজ দেখতে আসার কী আছে ? এক্ষুণি মারা যেতে পারে এমন রোগী তো নয়। তবে কী ভাগিস দুদিন থেকে এই দুপুরের ভাতটা নিয়ে যাওয়ায় রাজী করাতে পেরেছি। তারক নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসছে। যা অখাদ্য খাদ্য ওখানের। তাই হয়তো—কিংবা আমার খোসামোদে—

নীলুদা বললেন, তাও ভালো। তবে কী একখানা ব্যাটার জন্ম দিয়েছিলি বাবা ! ইস্পাত।

নীহারিকা কাঁদোকাঁদো হয়, ওই তো। আমার ভাগ্যটাই ওই। সন্নিসি বৈরাগী হয়ে যায় তারও মানে বুঝি। যুগে যুগে তাদের মায়েরা এইভাবে জ্বলেছে। কিন্তু এ কী এক উটকো ব্যাপার।

নীলুদা বলেন, এ হিসেবে এদের মনটাও প্রায় সেই রকমই। কট্টরপন্থী। আদর্শে কঠোর। তবে সেই আদর্শটি যে ক্রমেই ভুলভুলাইয়ার পথে নিয়ে যায়। সেটাই মুশকিল। যখন দেশ পরাধীন ছিল আর দেশকে স্বাধীন করবার জন্যে লড়াই ছিল, তখনকার রাজনীতি আর একখকার রাজনীতি আকাশপাতাল তফাৎ। তখন একটাই শ্লোগান ছিল 'বন্দেমাতরম'। তার মধ্যে দলাদলি ছিল না। তা সে যার পথ যে রকমই হোক। মন্ত্র এক। 'বন্দেমাতরম।' এযুগে আর কেউ 'দেশ'কে মা বলে ? ভুলেও না। ওসব সেকেলে হয়ে গেছে। অথচ সেই কম বয়সে যখন পথে দল বেঁধে গেয়ে যাওয়াদের মুখে সেই গান শুনেছি 'বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ।' গায়ে যেন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আর এই আমাদের সোনার বাংলাকে নিয়ে কত গান কত ভালবাসা ভাব ?.... 'ও আমার সোনার বাংলা'— তারপর গিয়ে সেই 'বাংলার মাটি বাংলার জল'.... আবার সেই 'কোন দেশেতে তরুলতা সকল দেশের চাইতে শ্যামল সে আমাদের বাংলা দেশ। আমাদেরই বাংলা রে—।' আমাদের প্রভাসকাকা গাইতেন—মনে নেই ?

নীহারিকা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে, ও নীলুদা, তোমার এত সব মনে আছে ?

মনে কী আর সবসময় থাকে রে ? হঠাৎ একটা কোনো কারণে আলোড়ন উঠলেই—আসলে ছেলেবেলার স্মৃতি তো হারায় না ? সে একেবারে পাথরে খোদাই ব্যাপার। তো দ্যাখ, আমাদের এলাকাড়িতে 'বাংলাদেশ' নামটা থেকেই আমাদের অধিকার চলে গেছে। আমরা আর অধিকার বলে গেয়ে উঠতে পারব না 'ও আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে—।' সে যাক তার জন্যে এখানে এখন আর কারো মাথাব্যথা নেই।.... একসময় মনেপ্রাণে শেখানো হয়েছে— 'আমাদের প্রাণের দেশ রাশিয়া, আমাদের প্রাণের দেশ চীন। চীনের চেয়ারম্যান আমার চেয়ারম্যান।' তারপর কতই তো দেখলি ? বন্দেমাতরম কোথায় তলিয়ে গেল, এল 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'। আর শ্লোগান এলো 'এ লড়াই বাঁচার লড়াই। এ লড়াই রুটির লড়াই।' আর এখন ? এখন শুধু দু চোখ মেলে দেখে যা সারাদেশ জুড়ে শুধু গদির লড়াই। আর কোনো শুভ চিন্তাটিন্তা নেই। 'দেশজননী' শব্দটব্দ নেই।....

এখন তো আবার দ্যাখ আমাদের বাঙালির প্রাণের কলকাতার বারো আনা চলে যাচ্ছে অবাঙালিদের হাতে।....এই পথ হারানো চোরাবালিতে পা ফেলছে, ওই তোর ছেলেটার মতো কত কত ছেলে।... তাদের সামনে যে আদর্শ দেখানো হয়েছিল সে সব এখন ফক্কিকারি। অথচ অনেস্ট ছেলেগুলো সেই আদর্শর জন্যেই সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে চলেছে।....দেশটাকে দেখলে আর আগের কথা ভাবলে এত দুঃখ হয় রে!

নীহারিকা আবার বিমুগ্ধ গলায় বলে, তুমি এত ভাবো নীলুদা? অথচ দেখে মনে হয় তুমি যেন হালকা হাওয়ায় গা ভাসিয়ে জীবন কাটিয়ে দিয়ে চলেছ।

নীলুদা একটু হেসে বলেন, সেটাও মিথ্যে নয়, হয়তো তাই কাটিয়ে এসেছি। কারণ ওটাই আমার জীবনদানি। 'সিরিয়াসনেস' আমার ধাতে সয় না। তবু মন বলে তো একটা জিনিস আছে? এই যে—যখন বাবার কথা মনে পড়ে? মনে হয় না কী একখানা মানুষ ছিলেন! কী রকম এক সেকেন্ডে একটা বড় ব্যাপারের ডিসিশান নিতে পারতেন।...পাড়াপড়শি আত্মীয়-স্বজন সবাই আসতো বাবার কাছে পরামর্শ নিতে। খুব একটা বড়লোকও ছিলেন না, আসলে হচ্ছে পার্সোন্যালিটি।....বাবার মধ্যেও 'দেশভক্তি' দেখেছি। সে একটা অন্য জিনিস। যেন দেশ জিনিসটি সত্যিই ঠাকুর দেবতার মতো। তখন হয়তো সব ভালো বুঝতাম না, এখন মাঝে মাঝে যখন মনে পড়ে, বুঝি, চারিত্রিক বল জিনিসটা কী জিনিস। তোর নীলুদা অবশ্যই চিরকাল হালকা হাওয়ায় ভাসতেই ভালোবাসে। কিন্তু ওই গভীরতাকে তো শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। তোর বাপ্পাকেও তাই আমি মনে মনে শ্রদ্ধা করি নীরু। ওর পথটা হয়তো ওর পক্ষে আর শুভকর নয়, কারণ যারা পথ দেখাতে নেমেছিল তারাই পথভ্রষ্ট হয়ে বসেছে। অথচ ওর সততা ওকে শিখিয়েছে শুধু 'ফলো' করতে। হঠাৎ যেদিন নিজের মনের মধ্যে প্রশ্ন উঠবে, সেদিন বড় একটা ধাক্কা খাবে এই ভয়।

নীহারিকা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তুমি এত সব ভাবো। আমাকে কত বোঝালে। বাড়িতে এসব কোনো কথাই নেই। ওই মানুষটি জানেন শুধু অফিস আর নিজের এক ধরনের জেদ। আর ছোটছেলে আর মেয়ে? তারা তো আমায় মনিষ্যি বলে গণ্যই করে না। যা কিছু জিগ্যেস করতে যাব, হয় ঠাট্টা করবে, নয়তো বলবে ও তুমি বুঝবে না।

নীলুদা হঠাৎ বলে ওঠেন, তোর শ্বশুরমশাই কিন্তু একটা মানুষের মতো মানুষ। অনেকটা আমার বাবার ধরনের।

নীহারিকা অবশ্য নীলুদার এ কথায় তেমন উৎসাহ দেখায় না। সেই মানুষের মতো মানুষটি তো এখনো তাঁর 'পাবনার' বাড়িতেই পড়ে আছেন। নীহারিকাদের থেকে যেন বহু দূরে। তবে নীহারিকাও সেই দূরত্ব ভেদ করতে সচেষ্ট ছিল না কোনোদিনই। মনে হতো ওঁরা ওঁদের স্বাতন্ত্র্য নিয়ে থাকতেই ভালবাসেন যখন থাকুন তাই। এতএব আর ওঁদের কথায় কাজ নেই। এখন নীহারিকা ইচ্ছে করে প্রসঙ্গ পালটায়। বলে ওঠে, আচ্ছা নীলুদা, এত লোকের সঙ্গে তোমার জানাশোনা, ভাগ্নীটার একটা পাত্তর-টাত্তর খুঁজবে তো?

ভাগ্নী, মানে আমাদের টুসকি?

নীলাম্বর হঠাৎ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে হেসে ওঠেন। বলেন, আজকালকার মেয়েদের জন্যেও কী গার্জেনদের পাত্র খুঁজে বেড়াতে হয় না কীরে? গার্জেনদের সে খাটুনিটা তো তারা বাঁচায়। পাত্তরটাকে একদিন ধরে এনে বলে, এই 'গড় করো' এঁরা হচ্ছেন আমার মা-বাবা!' তারপর নিজেও হেঁট হয়ে যুগলে গড় করে বলে, 'মা, বাবাকে কিন্তু একদিন এদের বাড়ি যেতে হবে।'

ইস নীলুদা। তুমি ওদের ভাষাটাও রপ্ত করে ফেলেছ দেখছি।

ওই এইরকমই তো দেখিশুনি। তবে এখন তো দেখি 'লাভ ম্যারেজ'ও ধারে কাটে না, ভারেই

কাটে। বাপের সেই পকেট ফর্সা করে দান সামগ্রী খাট, আলমারি, ফ্রীজ, টি. ভি. সবই ধরে দিতে হয় বিবাহ সভায়, 'নিরিমিষ্যি' যৌতুক বলে। তো সে জন্যে তো বাপ প্রস্তুতই থাকে। কিন্তু ওই ফাষ্ট চ্যাপ্টারটা! পাত্র যোগাড়! ওটা এখনো যোগাড় করে উঠতে পারেনি তোর মেয়ে?

নীহারিকা বলে ওঠে, তুমিও যেমন নীলুদা। এ বাড়ির ধারাটি কী তেমনি দেখছ?

বাড়ির ধারা? বাড়ির ধারা ধরে আজকাল সবাই চলছে দেখছিস বুঝি? আসলে ওতে মা-বাপের রিস্ক কম। পরে মেয়ে রাতদিন মা-বাপকে খোঁটা দিতে পারে না, আহা কী নিধিই জুটিয়েছিল আমার জন্যে?....এই যেমন তুই এখনো চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া মা-বাপকে সর্বদা মনে মনে দুষিস।'

নীহারিকা হেসে ফেলে। বলে, হ্যাঁ। দুষি। বলেছি তোমায়।

আহা ও কী আর বলে বোঝাতে হয় রে? যার চোখ থাকে সে ঠিকই বুঝে নেয়।

বলে নীলুদা হাহা করে হেসে ওঠেন। আর ঠিক এইসময় বাইরের দরজায় কড়া নড়ে ওঠে।....

নীহাকিরা বলে, ওই বোধহয় তারক ফিরল হাসপাতাল থেকে।

সময়টি বড় নিশ্চিন্ততার ছিল।

আদিত্য অফিসে, শিলাদিত্যও সম্প্রতি কিসে যেন অ্যাপ্রেন্টিসে ঢুকেছে, মাইনে পাক না পাক অফিসটাইমে নেয়ে খেয়ে বেরোচ্ছে। টুসকি কলেজে। তারক রান্নাবান্না সারছিল। অতঃপর তারক বড়দাবাবুর ভাত নিয়ে বেরিয়েছে।

তৎপরেই নীলুদার আবির্ভাব।

নীলুদাকে দেখলেই যেন মনটা ভরে যায় নীহারিকার। যাবে না? কে তার সঙ্গে এমন করে এতক্ষণ ধরে ছেদ্দা ভালোবাসার সঙ্গে গল্প করে? কে বলে, এই নীরু, যদি মনে মনে শাপমুন্যি না দিস তো বলি আর এক কাপ চা হয় না?

সবটাই লীলা।

আমিই যাই। যদি অন্য কেউ হয়।

জানে নীরু এতে কৃতকৃতার্থই হবে। তবু বলে।

ওই বোধহয় তারক ফিরল, বলে দরজা খুলতে যেতে যেতে বলে নীহারিকা, দেখি, বাবু কতটুকু কী খেলেন। এমন দুষ্টু ছেলে—দুখানা মাছ বেশি দিলে বলে 'এত কেন? ফিরিয়ে নিয়ে যা। নয়তো বাসে যেতে যেতে নিজে খেয়ে নিগে।'...পাঁচজনের সামনে নাকি ভালো খেতে লজ্জা করে।

কথাটা বলে নেয়। তারকের সামনে তো আবার এক বিষয়ে ভেবেচিন্তে নিক্তির ওজনে কথা বলতে হবে। কোনটা যে কী ভাবে নেবে। অমনি ওর প্রাণের বড়দাবাবুকে লাগিয়ে দেবে।

আর একবার কড়া নড়ে ওঠে। অসহিষ্ণুভাবে।

নীহারিকা চেঁচিয়ে বলে, যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি। ওঃ যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে।

নীলুদা হঠাৎ বলেন, এই, তুই থাক। আমিই যাই। যদি অন্য কেউ হয়।

নাঃ বাবা! এ আমার তারকচন্দ্রের মার্কামারা কড়া নাড়া, বলেই নীহারিকা ছুটে চলে যায়। এবং দরজা থেকেই তার গলার স্বর শোনা যায়, খেয়েছে ভালো করে? নাকি রাগ দেখিয়েছে?

উত্তর শোনা যায় না।

নীহারিকা আবার বলতে বলতে চলে আসে, কীরে বাবা, জবাবটা দিবি তো? তুইও যেন তালেবর লাটসাহেব হয়ে গেছিস।

এখন তারকের গলা শোনা গেল, এবং দেখাও গেল তাকে। সদর দরজার দিকের প্যাসেজটা পার হয়ে এসে হাতের টিফিন ক্যারিয়ারটাকে ঠক করে মাটিতে বসিয়ে রেখে কেমন একটা কঠোর কঠিন আমোঘ গলায় বলে উঠল, বড়দাবাবু হাসপাতালে নাই।

কী? কী বললি? কী বললি?

তারক আরো কঠিন গলায় বলল, যা দেখে এলুম তাই বলছি। কাল রাত থেকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না তাঁরে।

ঠিক এই সময় তিনতলার সিঁড়ির মাথা থেকে একটি ভাঙা ভাঙা গলা বলে উঠল, তারক, বড়খোকার থনে এলি? আজ অ্যাতো দেরি ক্যান?

ডাক্তার এসেই দেখে মুখ গম্ভীর করে বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হস্‌পিটালে রিমুভ করুন। এখনি একটা ই. সি. জি. দরকার। তাছাড়া, হ্যাঁ যত তাড়াতাড়ি পারেন।

কাকে বললেন?

কার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন?

সত্যব্রত গাঙ্গুলীর দিকে তাকিয়ে?

নাঃ তা নয়। সত্যব্রত গাঙ্গুলী অবশ্য সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, পাথরের পুতুলের মতো। দাঁড়িয়েছিল শিলাদিত্যও। সেও প্রায় একই অবস্থায়। কারণ এইমাত্রই বাড়ি ফিরেছে সে।

তবু ডাক্তার তাকালেন তার নীলুমামার দিকেই। কারণ এই লোকটাই তাঁকে নিয়ে এসেছে।

খাটের ধার থেকে একটা নারীকণ্ঠ, প্রায় চীৎকার—আবার হাসপাতাল!

নীলু মৃদু গম্ভীর তিরস্কারের গলায় বললেন, আঃ। নীহার!

নীহার।

তার মানে এই দণ্ডে হাসপাতালে পাঠানোর দরকারটা নীহারকে নয়।

নীলু শিলাদিত্যর দিকে একবার তাকিয়ে ইশারায় তাকে নিজের সঙ্গে আসতে বলে, ডাক্তারের পিছু পিছু এগিয়ে এসে, কিছু প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলে নেন। এখন এই রাত নটার সময় হঠাৎ গিয়ে পড়ে কোন হাসপাতালের হৃদয় দরজা সহজে খোলানো যাবে?

ডাক্তার মানে বাড়িরই চেনা ডাক্তার, কী ভেবে বললেন, আচ্ছা আমি সঙ্গে যাচ্ছি চলুন।

তার মানে মানুষের মধ্যে থেকে 'মনুষ্যত্ব' জিনিসটা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি।

তা যায় নিতো নিশ্চয়ই।

না হলে আদিত্যর অফিসের লোকেরাই বা নিজেদের খরচে ট্যাক্সি করে সযত্নে তাকে বাড়িতে এনে পৌঁছে দিল কেন?

এবং বারবার নীহার ও তার নীলুদাকে অনুযোগ করতে লাগল কেন তারা, ওঁর যখন হার্টের অবস্থা এরকম, তখন হঠাৎ টেলিফোনে ওরকম একটা খবর দেওয়া ঠিক হয়নি।

কিন্তু আদিত্য গাঙ্গুলী নামের লোকটার হার্টের অবস্থা 'এরকম' তা আবার কে জানতো? তার সবথেকে নিকটতম জনই তো সর্বদা তাকে 'হার্টলেস' বলেই অভিহিত করে আসছে জীবনভোর।

॥ চৌদ্দ ॥

আদিত্য গাঙ্গুলীর পাশের সহকর্মীর রিপোর্টে জানা গেল টেলিফোন ধরে উনি বলে উঠেছিলেন, কে বলছেন ? নীলুদা ? আপনি কোথা থেকে ? পাবলিক ফোন থেকে ? কেন ? কি ব্যাপার ?.......

তারপরই বলে উঠলেন, কী বলছেন ? বাপ্পাকে হসপিটালে পাওয়া যায়নি ? গত রাত থেকে ? তার মানে ? তার মানে ?

হাত থেকে রিসিভারটা প্রায় পড়ে গিয়েছিল। আর তার পরই গাঙ্গুলীদা চেয়ারে গড়িয়ে পড়ে বলেছিলেন, পাখার স্পীড্‌টা—

অতঃপর আর কথা বলার অবস্থা ঘটেনি।

ওনার অফিসের ডাক্তারকে ফোন করেছিলেন, পাওয়া যায়নি তাঁকে। কাজেই নিজেরা আর রিস্ক না নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িতে পৌঁছোতে এসেছেন।

হার্ট অ্যাটাক।

এই ফার্স্ট ? আগে আর কখনো ?

নয় ? ঠিক আছে ? আপনাদের ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানকে খবর দিন।

এমনকি একজন ওই 'খবর দেওয়া' পর্যন্ত অপেক্ষাও করেছিলেন। তিনি 'এক্ষুণি যাচ্ছি' শুনে আবার অফিসে ফিরে গেলেন। বাড়িতে টেলিফোন নেই। খুবই অসুবিধেকর ব্যাপার।

ওই নীলুদাই ইতিপূর্বে অনেকবার বলেছেন, ওহে আদিত্য গাঙ্গুলী, একটা দরখাস্ত করে দাও না, তারপর আমি দেখছি।

বয়েসে কিঞ্চিৎ বড়, অথচ মান্যে কিঞ্চিৎ ছোট, তাই শুধু 'আদিত্য' না বলে ওই গাঙ্গুলীটা যোগ করে যেন বাক্যের ভারসাম্য রক্ষা করেন নীলাম্বর।

তা 'আমি দেখছি' এ আশ্বাস পেয়েও আদিত্য গাঙ্গুলী শুধু গা করেনি তাই নয়, বেশ যেন প্রতিরোধ প্রতিরোধ মনোভাব রেখে বলেছিল, কেন ? আমার এই ছাপোষা গেরস্থ বাড়িতে টেলিফোনের এত কী দরকার ? বাবা যখন প্র্যাকটিসে ছিলেন, একবার ঢের চেষ্টা করা হয়েছিল, পাওয়া যায়নি। এখন তো আর সে প্রশ্ন নেই।

শ্যালক তবু বলেছিলেন, আহা, এমনিতেই তো জিনিসটা যথেষ্ট দরকারি না কী ?

আমাদের মতো বাড়িতে কজনার টেলিফোন আছে নীলুদা ? ও রাখা মানেই একটা বাড়তি খরচের দায়। কাজের মধ্যে 'কন্যে' তাঁর বান্ধবীদের সঙ্গে লাগামছাড়া আড্ডা দিয়ে দিয়ে বিল ওঠাবেন।

মুখে এইটুকুই বলেছিল আদিত্য গাঙ্গুলী, তবে মনে মনে আরও কিছু বলেছিল কিনা সেটা বোধহয় ভগবানের পার্শ্বচরেরও জানা নেই।

তবে হয়নি ফোন।

এখন নীলুকে একবার আদিত্যর অফিস, একবার পারিবারিক ডাক্তার এইসব করতে ছুটোছুটি করতে হলো বেশ। অবশ্য দূরেটুরে নয়। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কয়েক গজ গেলেই 'প্রভাত বান্ধব' স্টেশনারি শপ্‌টিতেই পাবলিকের জন্য ফোন রাখা আছে। চার্জ একটু বেশি। তা কী আর করা যাবে ? দরকারের বাড়া মনিব নেই।

তাড়াতাড়িই বেরিয়ে পড়ল ওরা।

আর যেতে যেতে নীলু ভাবলেন, অথচ নীহার তখন যেভাবে চীৎকার করে উঠেছিল, কী বললি ? বলে তখন তো মনে হলো নীহার না হার্টফেলই করে বসে।

নীহার বলল, আমি সঙ্গে যাই নীলুদা।

নীলুদা বললেন, কী যে বলিস। তুই গিয়ে, কী সুবিধে হবে? শিলু রয়েছে, তোদের ডাক্তারবাবু রয়েছেন, আমি তো রয়েইছি। তুই বরং আদিত্যর মা-বাবাকে একটু দেখগে যা।

শুনে রাগ এসে গিয়েছিল নীহারিকার।

আদিত্যর মা-বাবার খুবই কষ্ট বুঝলাম। কিন্তু এই নীহারটা? সে একেবারে ফালতু? অথচ হিসেব মতো তারই তো বেশি প্রাণ ফাটবার কথা। আদিত্যর যদি কিছু হয়, নীহারিকার মতো ক্ষতি আর কার হবে?...আর যে নীহারিকার একটা ছেলে, এই খানিক আগে কর্পূরের মতো উবে গেছে।

তখনো যখন নীলুদা বলল, চল হে তারক দেখে আসি তুমি কী শুনতে কী শুনে এসেছ—

তখন নীহারিকা বলেছিল, আমিও যাই তোমাদের সঙ্গে নীলুদা।

নীলুদা অনায়াসে নিষ্ঠুরের মতো বলেছিল, না না, তুই আবার কী যাবি? ব্যাপারটা আসলে কী তার ঠিক নেই। ওইসব হসপিটাল—ফিটালে অনেক সময় উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপিয়ে বসে। হয়তো কোনো কারণে বেড বদল করেছে। যাই হোক এখন আর এই নিয়ে তোর শ্বশুর-শাশুড়ীকে কিছু বলিসনি তুই। বরং হসপিটালে কোনো ব্যবস্থার জন্যে আমি তারককে নিয়ে বেরিয়েছি—বলে ওনাদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কর।

আশ্চর্য। যার আপনজন, তার থেকেও বেশি চিন্তা ওই ওনাদের জন্যে!

অবশ্য 'ওনাদের' কাছে কথা গোপন থাকেনি। কারণ তারককে নিয়ে হাসপাতালে যথাসম্ভব খোঁজপত্র করে শেষমেষ থানায় ডায়েরি করে এবং আদিত্যের অফিসে ফোন করে, যখন ফিরে এসেছিলেন নীলুদা, তখনো নীহারিকা শ্বশুর-শাশুড়ীকে খাইয়ে নিতে পারেনি। ঘটনা লুকনো যায়নি।

কিন্তু তারপর?

যখন আদিত্যের মানবিকতাবোধ সম্পন্ন সহকর্মীরা আদিত্যকে ট্যাক্সি চাপিয়ে নিয়ে এসে ধরাধরি করে নিচের তলাতেই দালানে একটা চৌকির ওপর শুইয়ে দিল?

না তারপর আর খাওয়া-দাওয়ার প্রশ্ন কোথায়?

নীহারিকার বাকি ছেলেটা আর মেয়েটা?

তারা বাড়ির খবর জানবে কোথা থেকে? তারা যথারীতি নিজ নিজ কর্ম সমাধা করে যথাসময়ে বাড়ি ফিরে দেখেছে, তাদের মাথায় ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা দাদা হাসপাতাল থেকে উধাও। আর তাদের বাবা আকস্মিক হৃদরোগে আক্রান্ত।

একজন একসময় কখন যেন বলে উঠেছিল, তারক? এক গেলাস জল দে তো।

সাড়া পায়নি।

কাজেই জলও পায়নি।

সন্ধ্যা পার হয়ে যাওয়া সময়ে হঠাৎ তারককে একটা ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা নিয়ে এসে দাঁড়াতে দেখে বুকটা কেঁপে উঠল টুনির! বেলেঘাটার শুভ্রাংশু মুখুজ্যের পুত্রবধূ সন্ধ্যাতারার!....মনের মধ্যে যে একটা সহজাত চেতনা কাজ করে চলে, সেই চেতনাই বলে উঠল, 'এ চেহারা ভালো নয়! এ চেহারা কোনো দুঃসংবাদবাহী!'

তারককে সত্যিই ঝোড়ো কাকের তো দেখাচ্ছে। সারাদিনের অস্নাত অভুক্ত ছেলেটার ওপর দিয়েও তো ঝড় কম যায়নি।

টুনি অবশ্য মনকে অলক্ষণে চিন্তা থেকে জোর করে সরাবার চেষ্টা করে। তবু অবচেতনে প্রশ্ন ওঠে, কে? কে? মা? না বাবা? এই প্রশ্নটা আসাই স্বাভাবিক। যদিও মানুষ প্রতি নিয়তই

অস্বাভাবিক আর অনিয়মের দর্শক হয়ে চলে, তবু তার ভিতরে 'স্বাভাবিক নিয়মের' একটা ছক আঁকাই থাকে। সেইটাকে ধরেই চলে তার চিন্তাভাবনা। তাই টুনি 'ভাববে না' ভেবেও, ভেবে ফেলল, কে ? কে ? মা ? না বাবা ?

তবু টুনি সাহসে ভর করে শুকনো গলাকে ভিজে করে বলে উঠল, কী'রে তারক ? তুই এমন অসময়ে ? কী খবর ?

আর তারপরই, খবর শোনামাত্রই টুনি তার স্বভাব ছাড়া ভাবে প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে, অ্যাঁ ? কী বললি ? ও তারক। এ আবার কী কথা ? এ কী বললি, তুই ?

চিরশান্ত সভ্য মার্জিত টুনির কণ্ঠে আচমকা এমন একটা আর্তস্বর ওঠায় বাড়ির যে যেখানে ছিল, ছুটে ঘটনাস্থলে এসে হাজির হলো।

এ বাড়িতে এখনো এই রীতিই রয়ে গেছে। এ বাড়ির কাছে 'আপনজন' শব্দটি যেন গৃহবিগ্রহের মতো সম্ভ্রমের আর পবিত্রতার ! আর এদের 'আপনজন' শব্দটার অনুভূতি বেশ অনেকদূর পর্যন্ত বিস্তৃত !

এ সংসারের সদস্যদের কাছে অপর সদস্যের নিজস্ব আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব চেনা পরিচিত, সকলের হিসেব উঠে আছে পাকা খাতায়।

কাজেই বাড়ির বড়বৌ সন্ধ্যাতারার নিজস্ব আত্মীয়রা সংসারের সকলেরই নিজস্ব 'নিজজন'। অতসব এ সংসারের সদস্যদের সকলের কণ্ঠ থেকেই আর্তস্বর ওঠে, সে কী ? কী বলছো ? হাসপাতাল থেকে হারিয়ে গেছে বাপ্পা ? এমন আবার হয় না কী ?

এই খবরটাই বিস্ময়ের। তার সঙ্গের খবরটি অবশ্য বিস্ময়ের নয়, শুধুই পরম বিষাদের। আচমকা ছেলের উধাও হওয়ার খবরে বাপের 'হার্ট অ্যাটাক' হয়ে বসা খুব বিস্ময়ের না হলেও বিপদের। চিন্তার ! ভাবনার ! অচৈতন্য অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে গেছে আদিত্যকে ! এ সংবাদ যেন অশনি সঙ্কেতবাহী !

মনের অগোচর কথা নেই।

এখন টুনি মনে মনে বলে ওঠে, এর থেকে যে 'মা'র কিছু হলেও ভালো হতো গো !...হ্যাঁ ওই 'মা' পর্যন্তই ভাবতে পারল। সহজাত সংস্কারে মা থাকতে 'বাবা'র কথা ভাবনায় স্থান পেতে পারে না।

এখন তারককে ঘিরে অজস্র প্রশ্ন।

হ্যাঁ তারক। হাসপাতাল থেকে রোগী উধাও হয়ে যেতে পারে ? পাহারা থাকে না ? নার্স ডাক্তার এদের নজর থাকে না ?

ওরে তারক ! হাসপাতালেই কেউ 'কিছু' করে বসে ওই বলে প্রচার করছে না তো ?

ওইটুকু ছেলেটাকে অকারণ 'কে কী' করতে যাবে ? অকারণ ? তা অন্তরালে কোনো কারণ থাকতেও পারে। পার্টি করতো যখন, তখন বিরোধীপক্ষ তো থাকবেই একটা, মতবিরোধের জের হয়তো। তা হয়তোই। তা বলে এমন ভয়ঙ্কর একটা কিছু করে বসতে পারে কেউ। পারবে না কেন ? তোমাদের কাছেই 'ওইটুকু একটা ছেলে' আসলে তো আস্ত একটা মানুষই।....কিন্তু হসপিটাল বলে কথা ! সেখান থেকে 'পেশেন্ট' বিপদে পড়বে ?

মন্তব্যের জোয়ার বইছে।

আজকাল যা অবস্থা, পড়তেই পারে।

হাসপাতালে তো এখন শুয়োর চরে। সমাজবিরোধীদের আড্ডাখানা ! এ কী সেকাল ? যে দূর দূর দেশ থেকে লোকে কলকাতায় চলে আসছে ভালো চিকিৎসা পাবার আশায় ? এসে তো

হাসপাতালেই ভর্তি হতো। তখন কি এমন অলিতে গলিতে মোড়ে মোড়ে প্রাইভেট নার্সিংহোম ছিল ? তবু আসতো লোকে। মফস্বলের লোকেরা জানতো যত দূরারোগ্য রোগই হোক একবার কলকাতায় গিয়ে পড়তে পারলেই বেঁচে যাওয়া।

একদা এক চিন্তানায়ক শহরবাসীকে উপদেশ দিয়েছিলেন 'ব্যাক টু দি ভিলেজ।'....'গ্রামে ফিরে যাও।'

তো কেউ সে উপদেশ নেয়নি। গা করে 'ব্যাক' করেনি। কেউ গ্রামে ফিরে যায়নি। তবে আর কী হবে ? 'মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে গেল না, পর্বতই মহম্মদের কাছে চলে এল।'

তারক ! তুই ঠিক দেখেছিলি ? টিফিন ক্যারিয়ারটা হাতে নিয়ে একটা পাক ঘুরেই চলে আসিসনি তো তোর বড়দাবাবুকে দেখতে না পেয়ে ? তন্নতন্ন করে দেখিসনি ?

তারক গম্ভীর গলায় বলে, বাড়িতে না হোক বিশবার এই একই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। তারপর গে আপনাদের 'নীলুবাবু' আমায় সঙ্গে নিয়ে নিজে চক্ষে দেখে এসে—

দাদার অবস্থা কী খুব চিন্তার তারক ?

তারক যেন এখন ত্রাণকর্তা ভগবান।

তারক যেন সকল প্রশ্নের উত্তর জানা মহাপুরুষ একজন।

টুনির এই উৎকণ্ঠিত প্রশ্নে টুনির হার্টের রোগী শ্বশুর শুভ্রাংশুও তাঁর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আরাম চেয়ারটি ছেড়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন। সান্ত্বনার গলায় বলেন, অতো চিন্তা করছো কেন বৌমা ? তোমার এই হাড়বুড়ো শ্বশুরটা দু'দুবার মরণ-বাঁচন অ্যাটাক হয়েও এখনো পৃথিবীর অন্নজল ধ্বংসাচ্ছে না ?....দাদার জন্যে অতো ভাবনা নয়, সেরে উঠবেন তাড়াতাড়ি। ভাবনা ছেলেটাকে নিয়ে। আচ্ছা তারক, হাসপাতালে ওর কোনো বন্ধুবান্ধব বা ওই রকম কেউ দেখতে আসতো ?

তারক একটু দার্শনিক হাসি হেসে বলে, বন্ধু ? না দাদামশাই, 'বন্ধু' বলে তেমন কেউ আসতো না। মাথাফাটা রুগীটাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে বন্ধুরা সেই যে বেপাত্তা, আর তাদের টিকিও দেখি নাই।

হুঁ। তো তোমায় কে পাঠাল ?

তারককে কারো 'পাঠাতে' লাগে না। তারক যা করে নিজের বিবেচনায় করে ! তো আমি এখন যাই পিসিমা।

পিসিমা, তস্য শ্বশুরঠাকুর এবং উপস্থিত জনমণ্ডলী একযোগে উচ্চারণ করে ওঠেন, ওমা সে কী ? এই অবস্থায় এক্ষুণি ধুলোপায়েই ফিরে যাবে ? একটু অন্ততঃ চা জলখাবার খেয়ে যাবে তো ? সারাদিন তো খাওয়া হয়নি। নাওয়া-ধোওয়াও হয়নি মনে হচ্ছে। যাও হাত মুখ ধুয়ে নিয়ে—

হ্যাঁ এই মুখুয্যে বাড়ির আতিথ্যপ্রবণতা এই রকমই। একজন ভৃত্য সম্পর্কেও সমান মমতায় আর আগ্রহে ব্যস্ত হয় এরা। মানুষ বলে কথা।

দেখতেই তো পাওয়া যাচ্ছে—মানুষটার চেহারায় সারাদিন না-নাওয়া খাওয়ার ছাপ ! তাহলে ? কেবলমাত্র আপনজনেদের জন্যেই উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় অস্থির হতে হবে ?

তারকের কাছে এ প্রস্তাবটা অবশ্যই পরম লোভনীয় বলে মনে হলো, তবু তারক নিজস্ব স্বভাবের ডাঁটে বলে উঠল, নাঃ। অতো সবে দেরি হয়ে যাবে । চলি।

আহা। কতই আর দেরি হবে ?

শুভ্রাংশু বললেন, বৌমা, তোমাদের রান্নাটান্না তো বোধহয় হয়ে গেছে ? তারককে বরং দুটি ভাত খাইয়ে দিলেও পারো ! যা বুঝলাম অন্নটা তো জোটেনি আজ।

ভাত !

এই ঝাঁঝাঁ করা শরীরে তারকের মনে হলো, শব্দটা যেন একটা স্বর্গীয় শব্দ। তবু তারক বলল, না না! ওসব ঝামেলায় যাবেন না পিসিমা! বরং ওই চা-ই একটু—

পিসিমার 'জা' বলে উঠলেন, ঝামেলায় তোমার পিসিমাকে যেতে হবে কেন তারক? ওঁর এখন মন উতলা। তুমি হাতমুখ ধুয়ে এসো তো—যা দেবার আমিই দিচ্ছি!

তারক তার মনিব বাড়িতেও তোয়াজেই থাকে। তবু হঠাৎ তার মনে হলো তোয়াজ আর মমতা এক জিনিস নয়। এ বস্তু দুর্লভ।......চলে গেল হাত মুখ ধুতে।

কিন্তু এ যুগে—এদের সংসারটায় এমন দুর্লভ বস্তুটির সঞ্চয় কী সূত্রে?

হয়তো সেই একদার মানিকতলার মৃগাঙ্ক মুখুয্যের সূত্রেই। ব্যাচিলার মৃগাঙ্ক মুখুয্যের সেই বিরাট সংসারটি, যেখানে গিয়ে দাঁড়ালেই রোজই মনে হতো যজ্ঞিবাড়ি। যেখানে দৈনিক এক এক বেলায় ষাট-সত্তরটি পাত পড়তো। মৃগাঙ্কর সর্বকনিষ্ঠ শুভ্রাংশুর সংসারটি এখনো তার ঐতিহ্যটি কিছুটা বহন করে চলেছে! যে বেচারা নাকি বড়দার আকস্মিক মৃত্যুর পর তার মেজদা সেজদাদের ইচ্ছের চাপে বাধ্য হয়ে নতি স্বীকার করে মানিকতলার সেই চকমিলানো বাড়িখানাকে বিক্রী করার দলিলে স্বাক্ষর করে নিজের প্রাপ্য অংশের টাকাটুকু নিয়ে এই বেলেঘাটায় চলে এসে কেবলমাত্র আপন সংসারটি নিয়েই সংসার পেতে বসেছে।

কিন্তু এ যুগের মতে তার আপন সংসারটুকুও তো 'টুকু'মাত্র নয়! শুভ্রাংশুরও তো চার ছেলে তিন বৌ, এবং তাদের সন্তান সন্ততি। কিন্তু আশ্চর্য! এরা সবাই এখনো এদের চিরদিনের ঐতিহ্যটি যতটা সম্ভব বজায় রেখেছে।

কী করে সম্ভব হলো?

হয়তো অকালমৃত শাশুড়ীর সংসারে অকাল গৃহিণী হওয়া বড়বৌ সন্ধ্যাতারার গুণেই। যে তার হৃদয়ের অফুরন্ত ভালবাসা দিয়ে সংসারটাকে সর্বদা সরসা আর স্নিগ্ধ করে রেখেছে।

হয়তো পরবর্তী স্টেজে আর এ ঐতিহ্য বাহিত হবে না। হয়তো ওই সন্ধ্যাতারারই ছেলের বৌ এসে পুরো সংসারের ছাঁচটাই বদলে দিয়ে ছাড়বে।....তাইতো হয়। একটা মাত্র বৌ-ই একখানা পুরো সংসারের জিওগ্রাফি পাল্টে দিতে পারে।

তবে এখনও এরা পুরনো ছাঁচে আবদ্ধ। তাই বড়বৌয়ের বাপের বাড়ির বিপদকে নিজেদের বিপদ বলে মনে করে মেজবৌ অনায়াসে একটা ভৃত্যকেও সস্নেহে বলে উঠতে পারে, দেখলে তো, মাথায় একটু জল পড়ায় আর পেটে দুটি ভাত পড়ায় শরীরে শান্তি এল কী না, শরীরটিকে তো আগেই ঠিক রাখতে হবে বাবা। বিশেষ করে বিপদ আপদের সময়। খাটতে হয় তো ডবল।

বড় অন্তরঙ্গতার সুর! যে অন্তর একটা ভৃত্যকেও 'মানুষ' বলে গণ্য করে।

হ্যাঁ, এইটাই তো সেই বাড়িটা। দৈবাৎ যে বাড়িটার কাছাকাছি এসে পড়ে যুধাজিৎ বলে উঠেছিল, একটা রাস্তার লোক কিছু না খেয়ে দরজা থেকে ফিরে গেলে যে বাড়ির 'বাড়িসুদ্ধু সবাই মর্মাহত হয়, সে বাড়িটা তো একবার দেখা দরকার।'

সেই দেখার সূত্রেই তো ছেলেটার নাম এ বাড়ির পরমাত্মীয়দের তালিকায় উঠে পড়েছে। যার জন্যে ও বাড়ির টুসকি নামের মেয়েটার সেদিন থেকে দুঃখ অভিমান ক্ষোভ আর হিংসের জ্বালা।

ভাতের সামনে বসে তারকের মনে হলো, যেন কতকাল এই স্বর্গীয় বস্তুটির স্বাদ পায়নি।

এমনিই হয়। দুপুরে তো ভাত তরকারি ভর্তি টিফিন ক্যারিয়ারটা হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে আনতে আনতে তারক কষ্টে চোখের জল সামলে সংকল্প করছিল, বড়দাবাবুকে না পাওয়া পর্যন্ত তারক আর ভাত খাবে না।

সংকল্পটা অবশ্যই অবাস্তব। তবু সেটা যে অবাস্তব, তা একটা দিনেই মালুম হয়ে গেল।

হঠাৎ টুনি বলে উঠল, বাবা! আমি তারকের সঙ্গে ওবাড়ি চলে যাব?

মিনতির গলা! আবেদনের গলা!

আহা টুনির ভাই বৌ নীহারিকা ভাবতে পারে যে এমন মিনতির গলায় তার শ্বশুরের কাছে অতি সামান্য একটা ব্যাপারের জন্যেও একটু অনুমতি চাইছে?

ভাবা যায় না।

শুধু নীহারিকা কেন, আজকের যুগে কেউই কী ভাবতে পারে? টুনির মতো এতোখানি বয়েসের গিন্নীবান্নী তো দূরের কথা নতুন বৌয়েরাই?

না, এ যুগের মেয়েরা অমন 'অবমাননার' জীবনের কথা ভাবতে পারে না। সে একটা 'অ্যাডাল্ট' মানুষ নয়? তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছে আর গতিবিধির একটা স্বাধীনতা থাকবে না? কোথাও একটু বেরোতে হলেই কর্তা গিন্নীর পারমিশান নিতে হবে? কেন? নজরবন্দী আসামী নাকি?

বলতে আসুক দিকি কেউ তেমন কথা, জোঁকের মুখে নুন দেবার মতো শুনিয়ে দেব না আচ্ছা করে?

খুব ভদ্র মার্জিত সভ্য বৌ হলে, বড়জোর সেজেগুজে চটিটা পায়ে গলাতে গলাতে বলে, 'মা, একটু বেরুচ্ছি।'

তো এ যুগে 'মা'য়েরা খুবই বুদ্ধিমতী, তাঁরা আর দ্বিরুক্তিমাত্র করেন না। সস্নেহে বলেন, এসো। বলেন, 'দুর্গা দুর্গা।'

কিন্তু 'বাবা' সম্প্রদায়টি (যদি পুত্রবধূ আসা অবস্থা পর্যন্ত জীবিত থাকেন। থাকেন না তো বড় একটা।) এখনো যুগের ধর্মটি আয়ত্ত করে উঠতে পারেননি। তাঁরা অর্থাৎ তাঁদের একজন রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত থাকলে নির্ঘাৎ বলে বসবেন, 'এখন আবার কোথায় বেরোচ্ছ বৌমা?'

ব্যস! তারপর যা হবার তাই হবে। এবং পরে পুত্ররত্ন অনায়াসে বাবাকে জ্ঞান দিতে আসবেন, 'আশ্চর্য! দেখই যখন মান থাকে না, তখন সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসো কেন?'

কিন্তু বেলেঘাটার এই মুখুয্যে বাড়িটায় এখনো তেমন হাওয়া ঢোকেনি। তাই গিন্নীবান্নী বৌ মিনতির সুরে বলে, বাবা! আমি তারকের সঙ্গে একটু ও বাড়ি চলে যাব? মনটা বড্ড কেমন করছে!

বাবা বলেন, তা তো করতেই পারে মা। তা যাবে তো যাও। তাহলে তুমিও একটু খেয়ে নিয়ে—

কিন্তু এই উদার ছাড়পত্র কোনো কাজে লাগল না। তারক গম্ভীরভাবে বলল, আমি তো এখন আর ও বাড়ি ফিরছি না।

ফিরছি না? ও মা! রাত তো প্রায় নটা বাজে, এতো রাত্তিরে আর কোথায় যাবি তারক? আর কাউকে খবর দিতে হবে?

তারক দুটো হাত উল্টে বলে, জানিনে। আর কে কোথায় আছে ওনাদের, তাও জানি না। মেসোমশাইয়ের দিকে এই আপনাকেই জানি।....আর যা করবার ওই নীলু মামাবাবুই করবে! সর্বঘটে কাঁঠালি কলা। 'যেদিকে জল পড়ে সেদিকে ছাতি ধরে।'

'যেদিকে জল পড়ে, সেদিকে ছাতি ধরে—' এমন একটি মহৎ ব্যবহারের সঙ্গে 'সর্বঘটে কাঁঠালি কলা' শব্দটি খাপ খেলো কিনা তা বোধহয় ভেবে দেখেনি তারক। অথবা ভেবে দেখবার বুদ্ধিই নেই। তবে তার ভিতরকার একটা অবজ্ঞার ভাব তার চোখে মুখে ফুটে ওঠায় ওই মহৎ ব্যবহারটিকেই গৌণ করে দিল।

শুভ্রাংশু বিচক্ষণ ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বললেন, বিপদের বাড়ি, তারক হয়তো কোনো দরকারি কাজ নিয়ে বেরিয়েছে। তোমার মনটা যখন বেশি উতলা হচ্ছে, দেবুর সঙ্গে, কী খোকার সঙ্গেই চলে যাও।

দেবু অর্থাৎ টুনির বর দেবাংশু, আর খোকা টুনিরই পুত্ররত্ন স্নেহাংশু।

টুনি একটু মলিনভাবে বলে, যে যাবে আজ তো আর রাতে ফিরতে পারবে না। সকালে দুজনারই তাড়া। সেই ভেবেই। তারককে বলছিলুম। কী রে, তারক। তোর কী অন্য পাড়ায় কাজ?

তারক গম্ভীরতরভাবে বলে, কাজ আর তারকের কোনো পাড়াতেই নাই পিসিমা। আপনার কথাটা রাখতে পারলুম না, মাপ করে দেবেন। মেজ পিসিমা, আপনার যত্ন চিরকাল মনে থাকবে। চলি—বলে হঠাৎ সামনের জনেদের এক একটা প্রণাম ঠুকে বেরিয়ে যায় তারক।

ব্যাপার কি বল তো বৌমা?

শুভ্রাংশু বললেন, তোমাদের তারকের আজকের ভাবটা যেন কেমন অন্যরকম মনে হলো।

মেজ জা বললো, সত্যি! হঠাৎ 'চিরকাল মনে থাকবে' বললো কেন?

এই সময় পাপিয়া বলে উঠল, কিছুই নয়, ও একটু কায়দা করে কথা বলতে ভালোবাসে। তাছাড়া ওর ওই 'বড়দাবাবু' তো প্রাণ! মনটন ভালো নেই; হয়তো মানতফানত করতে কোনো মন্দিরেটন্দিরে যাবে।.....যাক গে, তুমি চট্‌পট রেডি হয়ে নাও বড়মা, আমিই তোমায় নিয়ে যাচ্ছি। আমার তো আর সকালবেলা অফিসের তাড়া নেই, রাতে না ফিরলেও চলবে।...মা। আমার আর বড়মার খাবারটা দিয়ে দাও তো চট জলদি।

টুনি বিমনাভাবে বলে, তুই নিয়ে যাবি? তোর সঙ্গে এতো রাত্তিরে—

আঃ। তুমি থামো তো বড়মা। কলকাতা শহরে নটা রাত্তিরকে কেউ এতো রাত বলে না! তোমাদের শ্যামবাজারের পাড়ায় দেখবে চলো, এখন সন্ধ্যে। মা। কুইক!

তারপর বলে ওঠে, দাদু তোমার আপত্তি নেই তো?

দাদু বলেন, নাঃ! তোরা এখনকার মেয়েরা তো আর আগের মতো 'চেলির পুঁটুলি' হয়ে নেই। তোরাও তো ছেলেদের মতোই। তবে সাবধানে যাবি। সত্যি ও এ রকম একটা খবর পেয়ে, নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকা তো যায় না!

টুনি।

হাপসে পড়লেন নয়নতারা। তুই এসে গেছিস। খোকারে যখন হাসপাতালে নিয়ে গেল, আমার প্রাণের মদ্যে কেবলই তোর মুখটা। ভাবচি, কে খবরটা দেবে? তো, পেলি কোনো খবর?

ওই তো তারক গিয়ে বলল—

তারক? অ। সে তবে নিজের বুদ্ধিতে তোর কাচেই গেচল। আর ইদিকে তারক তারক রব। কই ডাকতো তারে!

ওমা! সে তো এলো না। বলল, কাজ আছে এখন ফিরবে না। তাই পাপিয়া আমার মেজ জায়ের মেয়ে—

নয়নতারা ক্লান্তক্লিষ্ট স্বরে বলেন, অর আর পরিচয় লাগবে না টুনি। দেখছি না জন্ম বধিই। তারপরই হতাশভাবে বলেন, কী হবে টুনি?

টুনি কেঁদে ফেলে।

ঠাকুর যা করবেন।

পাপিয়া এসে আস্তে নয়নতারার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে, আপনাদের ঠাকুর যা করবেন ভাবেন তা যখন করেই ছাড়েন, জানেনই, তাহলে আর 'কী হবে' ভেবে লাভ কী দিদা?

নয়নতারা রুদ্ধ কণ্ঠ বলেন, বুঝি তো সবই দিদি, তবু মন মানে কই? পাবনার ওই মানুষটার মতন স্থিরতা আসে কই? যা টুনি, তর বাপের কাছে। এম্বুলেন্স গাড়িটা বরিয়ে যাওয়া অবধি সেই

যে একখান বই হাতে বসেছে, কাঠ না পাথর।

টুনি আস্তে বাবার ঘরে ঢুকে যায়।

পাপিয়া শুকনো মুখে বলে, আর সবাই কোথায় দিদা?

আর সবাই আর কে দিদি? ছোটখোকা তো ওর বাপের সাথে গেছে মামার গাড়িতে। টুসকি কোথায় কে জানে। বৌমা তো হাসপাতালে যাবার জন্যে জেদাজিদি করছিলেন, তো অর দাদা নিল না। বলল, সেখেনে কতো রকম ঝামেলা। তো সেই অবধি ঘরে খিল বন্ধ করে শুয়ে আচেন। মেয়ে কত ডাকাডাকি করল, দরজা খুলল না। ত—বৌমার প্রাণের মদ্যেটা যে কী করছে তা কী বুজছি না দিদি? দু'দুটো ধাক্কা।....তবে উনি এমন ভাব দ্যাকাচ্চেন, যেন সকল কষ্ট ওঁরই, আর এই দুই বুড়াবুড়ির বুকে যেন দুখান্ করে মুগুর পড়ে নাই। যেন এরা কেউ না। পড়্শী—

হঠাৎ মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সামনের ছাতে চলে যান।

বাংলা কাগজ যুধাজিৎ মায়ের জন্যেই রাখে। নিজের ভাগের ইংরিজি খানা হাতে রেখে, মায়েরটা মায়ের কাছে পৌঁছতে যেতে যেতে হেডিং গুলোয় চোখ পড়েই যায়। আগলাভাবেই চোখ ফেলছিল, কারণ নিজে গুছিয়ে বসবে 'স্টেটসম্যান'টাকে নিয়ে। হঠাৎ চোখটা আটকে গেল একটা খবরে—প্রথম পৃষ্ঠাতেই নিচের দিকে—

....'হাসপাতাল থেকে রোগী উধাও।' হাসপাতালের নামটা দেখল। মনে মনে হাসল একটু! যা অবস্থা হয়েছে আজকাল আমাদের রাজ্যের, তাই এইরকম জায়গা থেকেও এমন ঘটনা ঘটে। বোধহয় কুকুরে তাড়া করেছিল। শোনা যায়। তা এইসব হাসপাতালে জেনারেল ওয়ার্ডেটোয়ার্ডে কুকুররা নাকি যথেচ্ছ বিচরণ করে বেড়াবার ছাড়পত্র পায়।....মাকে দেখাবে বলে পড়তে পড়তেই যাচ্ছিল, হঠাৎ থমকে গেল, রোগীর নাম বাপ্পাদিত্য গঙ্গোপাধ্যায়....নলিন সরকার স্ট্রীটস্থ আদিত্য গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র! এই রোগীর মাথায় এখনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিল। অথচ—রোগী ওয়ার্ড থেকে পলায়ন করতে পারল। খবরে প্রকাশ উক্ত রোগীর পিতা নাকি পুত্রের এভাবে নিখোঁজ হওয়ার খবরে তৎক্ষণাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন।'

অতঃপর আরো যা লেখা, তা হচ্ছে প্রতিবেদকের বিক্ষুব্ধ মন্তব্য! কলকাতা শহরেই যদি এমন ঘটে, তাহলে মফস্বল জায়গাগুলির অবস্থা কী? সেই প্রশ্নে নানা কথা।

আসলে আজকাল সাংবাদিকদের নিয়ম অনুসারে প্রায়শঃই এ ধরনের ঘটনাকে ভাষার কারুকার্যে একটি গল্পের চেহারা দেওয়া হয়। কাজেই আরো কিছু ইনোনো বিনোনো মন্তব্য রয়েছে।....কিন্তু এ ব্যাপারটা কী? নলিন সরকার স্ট্রীট! আদিত্য গাঙ্গুলী। বড় যেন পরিচিত শব্দ।....ওঁর বড় ছেলেটি যে 'পার্টি কবলিত' সেকথাও জানা। তবে তার নামটা জানা ছিল না যুধাজিতের। কিন্তু দুই আর দুইয়ে চার-এর মতো একটা স্থির সিদ্ধান্তেই আসতে হয়—'শিলাদিত্য'র সঙ্গে মিল রয়েছে নামটার!

খুব গোলমেলে ব্যাপার তো! কে এরা?

মাকে চিরাচরিত নিয়মে সকালবেলায় যেখানে পাবার কথা, সেখানে অর্থাৎ রান্না অথবা ভাঁড়ার ঘরে পাওয়া গেল না। দেখল কাজের মেয়েটা একটা বঁটি নিয়ে বসে আলু ছাড়াচ্ছে। যুধাজিৎকে দেখেই একগাল হেসে বিনা প্রশ্নেই বলে ওঠে, মাসিমায়ের খোঁজ করছেন? তিনি এখন বাজার করতে বেরিয়েছেন।

যুধাজিৎ আকাশ থেকে পড়ে, বাজার করতে?

মেয়েটা কান অবধি দাঁতের বাহার ছড়িয়ে বলে, তাই তো বললো মাসিমা, যাই বাগানে গিয়ে একটু বাজার করে আসি। বিনি পয়সার বাজার হি হি! সিম হয়েছে, উচ্ছে হয়েছে—

যুধাজিৎ 'বাজার করতে যাওয়ার' অর্থ হৃদয়ঙ্গম করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।...যাক, যা ভাবা গিয়েছিল, তা কাঁটায় কাঁটায় ফলে গেছে। এই কিছুকালের মধ্যেই বনছায়ার বাগানের নেশা ধরে গেছে।...তবে লক্ষ্য করে দেখেছে যুধাজিৎ ফুলের থেকে যেন ফলের দিকেই অধিক ঝোঁক মার। এর নামই হচ্ছে জাত সংসারী।

তাছাড়া আগে চিরকালই টবে টবে ফুলের সাধনা করেছেন, ফসলও ফলিয়েছেন। তবে সে তো একটা গতানুগতিক ব্যাপার। কিন্তু শাক পাতা সব্জির ফসল? নাঃ, তেমন ঘটনা ইতিপূর্বে ঘটেনি। বালীগঞ্জ এলাকায় বড় রাস্তার ওপর কারই বা তেমন হয়? এ একটা আলাদা নেশা!

যদিও খবরের কাগজের খবরটায় যুধাজিৎ একটু চিন্তান্বিত, তবু এখন হেসে হেসেই মাকে বলে, কি মা, বেচারী বাজারের ফড়েদের অন্ন মারছ?

বনছায়ার হাতে একটি ছোট মতো বেতের ডালা, তাতেই তুলে জমা করেছেন চারটি সিম, চারটি উচ্ছে, কয়েকটা টোমাটো, বেশ লকলকে একগাছা লাউডগা, আর ঝুরো ঝুরো চারটি ধনে পাতা। আর চারটি কাঁচা লঙ্কা।

বনছায়ার ফসলের সম্ভারের চেহারাটি অবশ্যই 'নিউমার্কেটিয়' নয়, ছোট্ট ছোট্ট উচ্ছে, সরু সরু সিম, বাঁকাচোরা ছোটবড় মিশোনো কাঁচা লঙ্কা। তবে লাউডগাটি মন্দ না, আর ধনে পাতাগুলো বেশ তাজা!

বনছায়া একগাল হেসে বলেন, দ্যাখ না এরপর আলু ছাড়া আমাদের এই ছোট্ট সংসারটির যুগ্যি সব সব্জি করে ছাড়ব! কী মজা যে লেগেছে রে—সত্যি হবে কী না হবে ভেবেও খানিকটা করে জায়গা খুঁড়ে মেথি আর আস্ত ধনে ছড়িয়ে দিয়েছিলাম, ওমা দিব্যি পাতা ধরে গেছে। কাল তোকে মেথি শাকের সুক্ত খাওয়াবো।

যুধাজিৎ বলে, তাহলে তুমি আর বেকার নও? মোটামুটি একটা কর্মসংস্থান হয়েছে?

বনছায়া আবার হেসে ফেলেন। বলেন, তা সত্যি, এ বেশ একটা নেশার মতো। ছোট্ট ছেলেটা হাসতে শিখলে কী হামা দিতে শিখলে দেখে যেমন একটা আহ্লাদ আহ্লাদ ভাব হয়, গাছে ফলধরা দেখলেও যেন তেমনি হয়।....দুগগা বলেছে, পেঁপে গাছেও নাকি খুব তাড়াতাড়ি ফল ধরে। কাঁচা পেঁপে তো খুবই উপকারী একটা তরকারি। আর ওই দ্যাখ না কুমড়োলতায় কেমন ছোট্ট ছোট্ট কুমড়োর ছানা ধরেছে, বাড়তে বেশি সময় লাগে না। 'মাটি' বড় জিনিস রে।

যুধাজিৎ দেখে তার মায়ের মধ্যেকার চিরকালের সেই আনন্দময়ী বালিকা ভাবটি ফুটে উঠেছে, মুখের হাসিতে চোখের চাওয়ায়।

মা, কত অল্পে সন্তুষ্ট। মনে মনে ভাবল যুধাজিৎ।

তারপর বলে উঠল, ব্যস। তাহলে তো সংসারের একটা মস্ত খরচ বেঁচে যাচ্ছে। কাঁচা বাজারের খরচ তো আজকাল সোজা নয়। তাছাড়া একদম গাছভাঙা ফ্রেশমাল।

ঠাট্টা করছিস?

বাঃ! ঠাট্টা করব কেন? সত্যিই তো। আমিই তো তোমায় প্ররোচনা দিয়েছিলাম, বাগান করো, আর ছেলের বৌ আনি আনি বাতিক থাকবে না।

বনছায়া রাগরাগ ভাব দেখিয়েও হেসে ফেলে বলেন, বটে? কাঁচা পেঁপে আর কাঁচা লঙ্কা ফলিয়েই আমার ঘর-সংসার ভরে উঠবে?...তোর মাথায় কী এতো দুষ্টুবুদ্ধিও খ্যালে রে। নে চল।

হয়েছে তোমার বাজার করা?

হয়েছে।

আবার হেসে ফেলেন বনছায়া।

চা-টা খেয়েছ?

খেয়েছি বাবা খেয়েছি। কুটুমবাড়িতে আছি নাকি, তাই খোঁজ নিচ্ছিস?

কী জানি। তোমার তো আবার বারোমাসে বারোশো পার্বণ। তো কাগজটাগজ পড়ো?

ও মা। তা আবার পড়ি না? বলে কাগজের জন্যে হাঁ করে থাকি। এসেছে?

এসেছে। আচ্ছা মা, এই খবরটা একটু পড় তো।

বনছায়া বলেন, চশমা তো সঙ্গে নেই, ঘরে যাই। কেন কী খবর রে?....বনছায়ার স্বরে উদ্বেগ।

পড়েই দ্যাখো।

ঘরে চলে এসে চশমা পড়ে চোখটা বুলিয়েই বলেন, এসব ঘটনা তো নিত্যিই দেখি। হাসপাতাল থেকে পালানো, হাসপাতালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা, তা হ্যাঁরে, নামগুলো কেমন চেনা চেনা লাগছে যে। তোর সেই বন্ধু—গৃহপ্রবেশের সময় যার মা-বোন এসেছিল, বোনটার হঠাৎ শরীর খারাপ হলো, তারাই নয় তো? তুই যখন খামে ঠিকানা লিখছিলি, দেখেছিলাম যেন আদিত্য গাঙ্গুলী, নলিন সরকার স্ট্রীট। অ জিতু, তাদের কেউ নাকি?

যুধাজিৎ বলে, সন্দেহ হচ্ছে।

ও মা। কী সর্বনেশে কথা। শীগ্‌গির একবার খোঁজ নে!

তাই ভাবছি।

ভাবছি আবার কী! তাড়াতাড়িই খোঁজ নেওয়া উচিত। তারা না হয় তো ভালো। তবে হলে—

যুধাজিৎ হঠাৎ একটু হাসির মতো করে বলে, আচ্ছা মা এই যে তুমি বললে, তারা না হলেই ভালো! কিন্তু যাদের হয়েছে, তাদের তো সেই একই কষ্ট। অথচ—

বনছায়া একটু থমকান। তারপর একটু হেসেই বলেন, আমাদের মনটা তো এমনি গণ্ডিবদ্ধই রে জিতু। সেখানে যতটুকু ধরবার ততটুকুই ধরে। গণ্ডি ছাড়িয়ে বাড়াতে বসলে কী আর সংসার করা হতো মানুষের? প্রতিদিন কত কত দুর্ঘটনা ঘটছে। খবরে শুধু হতাহতের সংখ্যা দেখা হয়। ওই নিহতরা যখন চেনা না হয় তখন লোকে খায়দায় নিত্যকাজ করে চলে। অচেনা অজানা নিহতদের জন্যে শোক করতে বসলে কাউকেই আর বেঁচে থাকতে হতো না বাবা!....আমাদের এই ছোট গণ্ডির মধ্যেকার সুখদুঃখের ভারই কী কম? তাই তো বয়ে ওঠা যায় না। অচেনাদের জন্যে একবার 'আহা' করা ছাড়া আর বেশি কে করে বল?

ও মা। কী সর্বনেশে কথা। শীগ্‌গির একবার খোঁজ নে। তা হ্যাঁরে ওদের কোনো ছেলে হাসপাতালে ছিল না কী? জানতিস কিছু?

যুধাজিৎ একটু থেমে বলে, কবে যেন একদিন শিলাদিত্যর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়েছিল, কথায় কথায় বলেছিল, তার পার্টিপ্রেমী দাদা নাকি কী কাজে কোথায় কোন অজ গাঁয়ে গিয়ে পড়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে এসেছে।

ও মা। তা দেখতেটেখতে যাসনি?

দেখ মা, শিলাদিত্য তেমন সিরিয়াসলি বলেওনি। বরং যেন ঠাট্টার ভাবে বলেছিস, পড়ে গিয়ে কী লাঠি খেয়ে তা কে জানে? জমিজমার বর্গাদারি নিয়ে কী যেন করতে গেছল। সেখানে মাথা ফাটাফাটি কিছু আশ্চর্য ব্যাপার নয়। তারপর আর তেমন খেয়াল হয়নি। তবে বিশেষ সন্দেহ হচ্ছে নামটা দেখে।

হ্যাঁ! তাই দেখছি। বাপ্পাদিত্য, শিলাদিত্য! ভাইয়ে ভাইয়ে মিলিয়ে রাখার মতোই।

তবে একেবারে একই নামের লোক থাকেও বিস্তর।

বনছায়া আস্তে বলেন, আহা যেন তাই হয়। যেন অন্য লোকেদের ব্যাপারই হয়।

যুধাজিৎ ঈষৎ হাসে, আচ্ছা মা অন্য লোকেদের বিপদ হলে কিছু এসে যায় না কী বল? যা শত্রু পরে পরে! আঁ্যা।

বনছায়া একটু থমকান, ছেলের এই পরিহাসটুকু পরিপাক করে নিয়ে গম্ভীর হাস্যে বলেন, বিশ্বসদ্ধু জনের সুখদুঃখুর বোঝা বইতে পারি এমন শক্তি কোথায় বাবা? তাহলে তো রোজ সকালে খবরের কাগজ খুলে শোকাচ্ছন্ন হয়ে বসে আহারনিদ্রা সংসার করা বন্ধ হয়ে যায়। দৈনিক কত লোক দুর্ঘটনায় পড়ছে আর হতাহত হচ্ছে তার হিসেব রাখতে পারবি?

সব্জির ডালাটা নিয়ে দুর্গার কাছে নামিয়ে রেখে কী দিয়ে কী রান্না হবে সেই আলোচনায় নিমগ্ন হন।

যুধাজিৎ একটু তাকিয়ে দেখে। অনেক দিনের মতো আর একবার ভাবে মাকে শুধু বোকাশোকা ভালো মানুষই ভাবি। কিন্তু মার নিজস্ব এক ধরনের জীবনদর্শন আছে, সেখানে মাকে যুক্তিতে হারানো যায় না!

কিন্তু চেনাচেনা মনে হলে তো আর শুধুই 'আহা' করে বসে থাকা যায় না?....অতএব গিয়ে হাজির হতে হয়।

তা টুসকির কপাল, কড়া নাড়ার শব্দ পেয়ে দরজা খুলে দিতে গেল কিনা এবাড়ির অতিথি মেয়েটাই।

আপনি এখানে?

যুধাজিৎ একটু অবাক হয়ে তাকাল। কারণ দরজায় কড়া নাড়ামাত্রই দরজাটা যে খুলে দিল, তাকে এখানে দেখবার কথা নয়।

পাপিয়া একটু হেসে বলল, কেন, আপনি জানতেন না এবাড়ির সঙ্গে আমার একটা নিকট সম্পর্ক আছে?

সম্পর্ক একটা আছে জানতো যুধাজিৎ। কিন্তু সেটা কী খুব নিকট? জ্যেঠিমার বাপের বাড়ি না ওই রকম কী যেন একটা না? তবে সে কথা বলল না। শুধু বলল, জানতাম। তবে দেখা হয়ে যাবে, এমন প্রত্যাশা নিয়ে আসিনি।

সংসারে সর্বদাই তো অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটছে। এখানের ঘটনা আপনি জানেন?

যুধাজিৎ আস্তে বলল, দেখুন, অনেকদিন আসাটাসা হয়নি—

ওখানেও হয়নি।

তা ঠিক। নানা ধান্ধায় দিন যাচ্ছে। আজ সকালে হঠাৎ খবরের কাগজে একটা খবর দেখে কীরকম যেন সন্দেহ হলো—

সন্দেহ সত্যি!

তাহলে শিলাদিত্যর দাদাই হাসপাতাল থেকে—

হ্যাঁ।

কোনো খবর পাওয়া যায়নি?

এখনো পর্যন্ত তো না।

ওর বাবা কেমন আছেন?

আছেন ইনটেনসিভ কেয়ারে। আসুন ভেতরে।

শিলাদিত্য নেই?

আর বলবেন না। বেচারা শিলুদার অবস্থা দেখে মায়া হয়। একদিকে বাবার অসুখ, একদিকে

দাদা হারানো, তার সঙ্গে মায়েরও শরীর খারাপ। দেখেশুনে আমি তো কদিন এবাড়িতে রয়েই গেছি। বড়মাকে নিয়ে এসেছিলাম সেদিন।

বলেই একটু থেমে বলল, 'বড়মা', মানে আমার জ্যেঠিমা, এবাড়ির মেয়ে, তা জানেন তো? টুসকিদের পিসি।

তা জানি।....একটু হাসল যুধাজিৎ।

মনে মনে ভাবল, বললে বলেই মেনে নিলাম। তোমাদের এইসব সম্পর্কের জটিল জাল ভেদ করতে পারি, এমন ক্ষমতা নেই।

বাড়িতে ঢুকে আসতে আসতেই সন্ধ্যাতারা গলা বাড়িয়ে বলে উঠল, কে এল রে পাপিয়া? তারক এলো বুঝি?

তারক। ইস। বড়মা তুমি যে এই চারদিন ধরে কেবলই তারকের স্বপ্ন দেখছ! সেই মহাপ্রভুটিও তাঁর বড়দাবাবুর মতোই নিরুদ্দেশ হয়ে গেলেন মনে হচ্ছে।

সন্ধ্যাতারা হতাশ গলায় বলে, ছেলেটার আসলে কী সে তো এখনো রহস্য। ভগবান জানেন স্বেচ্ছায় উধাও, না কেউ কিছু করেছে।

যুধাজিৎ এগিয়ে এসে একটা প্রণাম করে।

সন্ধ্যাতারা তার চিবুক স্পর্শ করে বলেন, থাক বাবা থাক! ভালো থাকো। মা ভালো আছেন?

ছিলেন। আজ সকালে কাগজটা পড়ার পর থেকে আর ভালো নেই। আমায় তো ঠেলেই পাঠালেন, যাবি তো দেরি করছিস কেন? যা!

সন্ধ্যাতারা বলে, ভারী সুন্দর মানুষ। তাই ছেলেও এতো সুন্দর। এসো বাবা! বসবে এসো। হ্যাঁরে পাপু টুসকি কোথায় রে?

এই যে একটু আগে লন্ড্রী থেকে কাপড় না কী যেন আনতে গেল। এসে যাবে। ওই তারক বিহনে এখন অনেক কাজ বেড়ে গেছে তো!

যুধাজিৎ ভিতরে এসে বসে পড়ে বলে, দেখুন এ বাড়ির বড় ছেলেটি সম্পর্কে মনে হচ্ছে ততটা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। কেউ কিছু করেছে এমন বোধ হয় না। খুব সম্ভব নিজেই—

পাপিয়া আস্তে মাথা নাড়ে, ব্যাপারটা সেইদিকেই টার্ন নিচ্ছে। হসপিটালে খোঁজ নিতে গিয়ে ওয়ার্ডের সব পেশেন্টকে জেরা করে করে দেখা গেছে, বাপ্পাদা নাকি বলতো, অসহ্য! এভাবে বন্দী হয়ে থাকা যায় না।.....আবার আর এক অচল অনড় পেশেন্ট নাকি একদিন খুব জোরগলায় বলেছিল, 'আমার যদি পা থাকতো, তাহলে এই নরককুণ্ডে একদিনও থাকতাম না।' তো বাপ্পাদার মাথাটাই জখমি। পা-টা তো—একটু হাসলো পাপিয়া।

যুধাজিৎ বলল নরককুণ্ড!

ওরা তো তাই বলছিল। অথচ বাপ্পাদার জেদ, সাধারণ সবাই যেভাবে থাকতে পারে সেভাবে থাকতে পারব না কেন? আমার অবস্থা আছে বলেই আমি আলাদা কোনো ফেসিলিটি নেব? কক্ষণো না। তো শুনলাম, যে রাত থেকে নিখোঁজ, সেইদিনই নাকি ওই রকম সব আলোচনা তুঙ্গে উঠেছিল। তাতেই মনে হচ্ছে, কেটে পড়া। কট্টর আদর্শবাদী লোকগুলোকে নিয়ে সংসারে খুব জ্বালা, তাই না? কারোর সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না।

যুধাজিৎ একটু তাকিয়ে বলে, আমার জীবনদর্শন তাই। কট্টর হয়ে স্রেফ 'একঘরে' হয়ে থাকা। এবং সংসারের আপনজনেদের দুঃখের কারণ হওয়া। তার থেকে বরং কট্টরমিটা কিছুটা কমিয়ে—

এই সময় সন্ধ্যাতারা চা আর খাবার নিয়ে এসে হাজির হয়।

যুধাজিৎ খুব অস্বস্তির গলায় বলে, এই দেখুন, কী মুশকিল! সেই আপনি চা টা করে—আমাদের

বাঙালি বাড়ির এই এক অদ্ভুত অন্যায় ধারা চির প্রচলিত। বাড়িতে অসুখ-বিসুখ, কী বিপদ-টিপদের সময়েও অতিথি সৎকারটি পুরোদস্তুর করা চাই। আমি কিন্তু এনাকে বলেছিলাম বারণ করে আসতে। দেখুন তো এখন—

পাপিয়া হেসে ফেলে বলে, বারণ করলেই যেন শুনতেন বড়মা!

সন্ধ্যাতারা তাড়াতাড়ি বলে, এ আর এমন কী বাবা! ঘরের ছেলের মতোই দিয়েছি। শিলু এলে তাকেও তো চা খাবার দেব? নাকি দেব না? তাকে কি অতিথি সৎকার বলা হবে?

আপনি এখন এখানেই আছেন?

থাকছি বাবা ক'দিন। এখানে যা অবস্থা। তারকটা সুদ্ধু বেপাত্তা। বৌদির শরীরও খারাপ। ওদিকে দাদার জন্যে মা-বাবা সর্বদাই কাঁটা হয়ে আছে··। ফেলে যাই কী করে?

পাপিয়া বলে ওঠে, যাবেই বা কেন? শুধু শ্বশুরবাড়িতেই ডিউটি দিতে হয়? যে বাড়িতে জন্মেছ, তার প্রতি কোনো ডিউটি নেই? শুধু কুটুম্বের মতন আদর খাওয়ার বিধি? ভেরি ব্যাড্।

সন্ধ্যাতারা হেসে ফেলে বলে, শুনছো তো বাবা, মেয়ের বাক্যি? সবসময় সকলের ন্যায্য অন্যায্য বিচার করে চলে।

যুধাজিৎ একটু হেসে বলে, ভেরি গুড।

সন্ধ্যাতারা বলে, আজ তুমি এলে, বাড়িতে একটু হাসির আলো দেখা গেল। সর্বদা একটা দম আটকানো বুক চাপা ভাব। আমি তো বলছি রাতদিন ঠাকুরকে ডাকছি। তিনি কী আর মুখ তুলে চাইবেন না?

যুধাজিৎ চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে ওই সরল বিশ্বাসে উদ্ভাসিত মুখটার দিকে তাকায়, তাকায় পাপিয়ার দিকেও। এবং বলে ওঠে, আপনাদের ঠাকুর সম্পর্কে আমার অবশ্য তেমন 'ভক্তি ভাব' নেই পিসিমা। মুখ তোলা না তোলার ব্যাপারটা তাঁর মনমর্জি।

এই দেখো। তুমিও এই পাপুটার মতো কথা বলছ। না বাবা, তেমন অন্তর থেকে ডাকলে—

হঠাৎ আবার দরজার কড়া নড়ে উঠল।

পাপিয়া যেতে যাচ্ছিল, যুধাজিৎ তাড়াতাড়ি বলল, আপনি থাকুন!....আমি দেখছি।

খুলে দিল দরজাটা।

আর দরজায় দাঁড়ানো জন, চমকে এবং প্রায় ঘাবড়ে বলে উঠল, 'আপনি!'

ইস্। কী বেপোট অবস্থা!

লক্ষ্মীর ফেরৎ কাপড়ের বান্ডিলটি রীতিমতোই দৃশ্যমান। এসব কাজ কবে আবার করেছে টুসকি? কাজল ছিল, তারক ছিল ও যাবৎ। আর পড়বি তো পড়বি এই মানুষটার সামনে।

ছি ছি।

যুধাজিৎ কিন্তু অবলীলায় 'দিন' বলে ফস করে ওর হাত থেকে বান্ডিলটা টেনে নেয়।

কী আশ্চর্য! আপনি কেন? ইস।

আপনি অনেকক্ষণ বয়েছেন, শেষটুকু লাঘব করার পুণ্যটুকু অর্জন করি।

কখন এসেছেন?

তা অনেকক্ষণ! সৎকার পর্ব হয়ে গেছে।

সৎকার পর্ব!

বাঃ! মানে আবার কী, অতিথি সৎকার। যেটা নাকি সংসারের যে কোনো অবস্থাতেই অবশ্যকরণীয়।

এগিয়ে ভেতরে আসে।

আর টুসকি দেখে মণ্ডে পাপিয়া।

দেখেই রাগে মাথা জ্বলে ওঠে টুসকির।

ওঃ। তার মানে বেশ অনেকক্ষণ ধরেই আড্ডা হয়েছে। টুসকি তো গোড়াতেই লন্ড্রীতে যায়নি। গিয়েছিল, পাড়ার এক বান্ধবীর বাড়ি। বেরোনো তো হচ্ছে না কদিন।

পাপিয়ার দিকে একটা তিক্ত দৃষ্টি হেনে ঘরের মধ্যে চলে যায় সে, কাচানো কাপড়গুলো নিয়ে।

যদিও পিসিমা এসে থাকায়, টুসকি হাতে চাঁদ পেয়েছে। নচেৎ এই গোলমেলে সময়ে তারকবিহীন বাড়িতে টুসকির কী দুরবস্থা হতো, ভাবা যায় না! মা তো অঙ্গ ঢেলে পড়ে আছেন। নীলুমামা যখন এসে খবরাখবর দেন, তখনি যা ওঠেন একটু। পিসিমা তো বিপদতারিণীর মূর্তিতেই সংসারটাকে কী নিপুণভাবে কায়দা করে ফেলেছেন। দেখে কে বলবে, বছরের পর বছর উনি এ-বাড়ির রান্নাঘরের ছায়াও মাড়াননি।

আশ্চর্য, নয়নতারাও মেয়ে এসে সংসারের কেন্দ্রবিন্দুতে বসায় যেন একটা শক্ত অবলম্বন পেয়েছেন। তিনিও রান্নাঘরের ধারেকাছে এটাওটা করছেন। যা নাকি নীহারিকার এলাকায় ভাবাই যায় না।

এলাকাটা অবশ্য নীহারিকারও থাকে না, থাকে তারকের।

এত বিষাদাচ্ছন্ন অবস্থাতেও হঠাৎ যেন সংসারটাকে 'বাড়ি বাড়ি' ভাব লাগে টুসকির, যখন দেখে রান্নাঘরের দরজায় নয়নতারা বঁটি পেতে বসে কুটনো কুটছেন আর ভিতরে সন্ধ্যাতারা রান্নায় ব্যস্ত।

পাপিয়াটাও থেকে গেছে ক'দিন। বলেছে, বড়মা যে আবার আমায় না দেখলে চক্ষে অন্ধকার দেখেন। থেকেই যাই মামার বাড়িতে দু'দশ দিন। ছুটি রয়েছে যখন।

আসলে এই ডাক্তারি পড়া মেয়েটা এদের এই অবস্থার মধ্যে ভিতরে ভিতরে একটা দায়িত্ব অনুভব করছে। তবে মুখে সেটা বলছে না।

টুসকির সুবিধে এই পাপিয়ার উপস্থিতি যেন বাড়িতে একটা পুরুষ ছেলের উপস্থিতি তুল্য। হাসপাতালে খবর নিতে যাওয়া, ওষুধপত্রের দরকার হলে কিনে আনা, এসব অবলীলায় করে এবং নীলুমামার সঙ্গেও একান্ত সহজ। সর্বোপরি হচ্ছে নীহারিকাকে খাওয়ানো।

'আমার খাবার ইচ্ছে নেই' বলে কাঠ কবুল নীহারিকাকে পাপিয়া প্রায় ধমকেই খাওয়াচ্ছে। যেটা টুসকির পক্ষে অসম্ভব ছিল।....মা না খেয়ে পড়ে থাকলে দাদু দিদারও তো যম যন্ত্রণা। এক কথায় ওই দু'টো মানুষ থাকায় টুসকি যেন বর্তে গেছে।

কিন্তু তাই বলে পাপিয়া টুসকির অনুপস্থিতিতে তার প্রেমিকের সঙ্গে জমিয়ে বসবে?

পাপিয়াকে বাবা বোঝাও ভার।

ছোড়দাটা তো সর্বদা ওনার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকে।....অথচ সেদিন হাসপাতালে বাপ্পাকে দেখতে গিয়ে পাপিয়ার চোখে দেখেছে কী গভীর দৃষ্টি!

আর এই যুধাজিৎ নামের হ্যাংলাটা।

এলি তো ঠিক সেই সময়েই। যখন টুসকি বাড়ি নেই। ওকে খবরটা দিল কে? ছোড়দা নিশ্চয়।

কিন্তু টুসকিকে দরজা খুলে দেবার সময় ওই হ্যাংলাটার চোখেমুখে যে একটা আলো ফুটে উঠেছিল, সেটারও তো একটা মানে আছে? সঙ্গে সঙ্গে টুসকির হাতের বোঝাটাও টেনে নিল কত সহজে।

ঘর থেকে বেরোতে একটু দেরি করে টুসকি। নিজেকে ঠিক করে নিতে।

যদিও বাড়িতে এখন বিপদ, দুশ্চিন্তা, তবু—একটি তরুণীচিত্ত আপন চিন্তায় আবর্তিত না হয়ে পারে না।

নাঃ। ক'দিন দেখে শুনে তো মনে হচ্ছিল ওই পাপিয়াটা বাপ্পাদিত্য নামে দুর্লভ রত্নটির দিকেই

ঝুঁকে বসে আছে। তাহলে মন্দের ভালো।....দুর্লভেরই সাধনা কর তুই বসে বসে।

যদিও তাতে ছোড়দা হতভাগাটার একটু কষ্ট হবে।....যাকগে—ও একটা নেহাৎই তরলচিত্ত লোক। কাউকে জুটিয়ে নেবেই।

কিন্তু টুসকি নিজে?

টুসকি কী কখনো মনে মনে ভাবতে পারছে—ওই মানুষটার সঙ্গে ভবিষ্যৎ জীবনটাকে জড়াবে? টুসকির মধ্যে যে এখনো ভয়ের বাসা!....জাতপাতের গন্ডি অতিক্রম করে কী ওকে এ—বাড়িতে গ্রহণ করা হবে?

অবশ্য তার আগে ভাল করে দেখতে হবে পাপিয়ার দিকে হ্যাংলাটা কোন চোখে তাকায়।

॥ পনেরো ॥

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে নীলাম্বর বলে উঠলেন, বুড়ো ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে মনটায় এতো কষ্ট লাগছে রে নীরু। এতোদিন—তা বোধহয় চার পাঁচ বছর হবে অ্যাঁ? প্র্যাকটিস ছেড়ে দিয়ে বসে থেকে আবার রুজি-রোজগারের চেষ্টায় ঘানিতে জুততে যাওয়া! ভাবা যায় না। এখন নাহয় আমি পৌঁছে দিয়ে এলাম, বিকেলে ফিরতে তো হবে একা ট্রামে। নামিয়ে দিয়ে আসার সময় মুখটা এমন দেখাল।

নীরু অর্থাৎ নীহারিকা কিন্তু তার নীলুদার এই মমতাপূর্ণ আক্ষেপোক্তিতে আর্দ্র হওয়া দূরে থাক রীতিমতো বেজারই হলো। নীলুদা লোকটা তারই আপনজন, তাকে দ্যাখভাল করবার তালে সর্বদাই এক পায়ে খাড়া, এই তো ছিল এ পর্যন্ত। হঠাৎ, কিন্তু বিশ্বসুদ্ধ সবাইকে প্রেম বিলোতে বসবে? এ আবার কেমন কথা? হ্যাঁ, নীহারিকার স্বামী-পুত্রের জন্যে প্রাণপাত কর সে আলাদা কথা, তার একটা মানে আছে। তাই বলে তার শ্বশুর-শাশুড়ী সাতগুষ্টির সবাইয়ের জন্যে প্রাণ কাঁদবে?

বেজার ভাবটা চাপা দিতে পারে না নীহারিকা, ঘাড় বাঁকিয়ে বলে, কী জানি, তুমি কাকে কখন কেমন দেখো। যাত্রাকালে 'দুর্গা দুর্গা' করার সময় কর্তাগিন্নী দু'জনের মুখেই তো দিব্যি আলো আলো ভাব দেখলুম!....যেন বেকার যুবকের চাকরি জুটে গেছে।

দূর। কী যে বলিস।

যা বলি ঠিকই বলি নীলুদা। আমি তো আর আজ দেখছি না। ওনারা দুটি মানুষ যেন এ সংসার থেকে আলাদা। ওঁদের দু'জনার যেন নিজস্ব একটা জগৎ। এ সংসারের সঙ্গে যেন স্রেফ ওপর ওপর ভাব।....ওই যে তোমার বৃদ্ধ ভদ্রলোক আবার ধরাচুড়ো পরে কোর্টে বেরোলেন, এতে গিন্নীর মনের মধ্যে তো দিব্যি আহ্লাদের হাওয়া! বলেও তো ফেললেন তখন—

বলেই চুপ করে যায় নীহারিকা।

তার নীলুদা তার মুখের দিকে একটি গভীর এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। তারপর বলেন, কী বলে ফেললেন?

নীলুদার দৃষ্টিটা যেন অন্তর্ভেদী। চট করে একটা সাজিয়ে গুছিয়ে বলার মতো ভাষা মুখে আসে না নীহারিকার। তাই বলে ফেলে, 'খোকা যে আমার হাসপাতাল থেকে ছাড়ান পেয়ে ঘরে ফিরেছে, এতেই আমাদের দু'মানুষের বুকে সাতটা হাতির বল এসেছে।'

ওঃ। এই কথা!

নীলু একটু হেসে বলেন, ওনাদের দু'মানুষের দেখছি যথার্থই অর্ধাঙ্গ-অর্ধাঙ্গিনী নাম সার্থক। মনের

ভাব-ভাবনা যা আসে সবই দু'মানুষের একরকম! আইডিয়াল! তা সত্যি বলতে আদিত্যর জন্যে রাতদিন কাঁটা হয়ে থাকা অবস্থা ছিল তো! আমিই তো রাতদিন তোদের ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছি, ওহে মশাই, ব্যাটা নীলাম্বর ব্যানার্জির মুখটা রেখো! যেখানের জিনিস, আবার যেন সেখানে ফেরত দিয়ে আসতে পারি। সেটা পেরে যেন বাঁচলাম। তো ওনারা সেকেলে মানুষ, তায় আবার 'গ্রাম্য', তাই ওই সাত সাতটা হাতি এসে বুকে ঢুকে পড়েছে।

হেসে ওঠেন খোলা গলায়।

তুমি হাসছো নীলুদা! কিন্তু আমার—ঠিক আছে। ভগবান কপালে যা লিখেছেন, তাই হবে।

আবার কপালের কথা তুলছিস কেন? আদিত্যর তো ক্রমেই একটু একটু উন্নতি হচ্ছে।

তোমরাই দেখছ। আমি তো কিছু দেখছি না। হবেই বা কিসে নীলুদা? ছেলেটা তো সেই অবধি নিঁখোজ হয়ে রইলো, তার ওপর আবার এই—

নীলুদা শেষটা না শুনেই বলেন, আহা ছেলের ব্যাপারে একটু তো আলোকপাত হয়েছে। তোদের সেই তারক নাকি কোনখান থেকে একখানা পোস্টকার্ড ছুঁড়েছে,'বড়দাদাবাবুর জন্য চিন্তা করিবেন না।'

হ্যাঁ, হঠাৎ এমন একখানা পোস্টকার্ড এসে হাজির হয়েছে বটে কদিন হলো। কোথা থেকে লিখেছে তা জানায়নি, আর আজকাল তো পোস্ট অফিসের ছাপ থেকে 'প্রেরণের' জায়গার হদিস পাবার প্রশ্নই নেই। এখন ডাককর্মীর সব কালিমাশূন্য। স্ট্যাম্পের ওপর যে ছাপটি মারা হয়, সেটা মনে হয় প্রায় জল দিয়ে ছাপা হয়েছে। তারিখও মিলবে না, জায়গাটার নামও মিলবে না।

তবে কথাটা তো তারকের। 'বড়দাবাবুর' জন্য চিন্তা করতে নিষেধ করে পরে লিখেছে, আশা করিতেছি, বাবু ভালো আছেন ও হাসপাতাল হইতে বাড়ি ফিরিয়াছেন। ইতি—

শতকোটি প্রণাম অন্তে

তারক।

বহু চেষ্টাতেও জায়গাটার নাম উদ্ধার করা যায়নি। কিন্তু লেখাটাই কী তারকের?

কে তার হাতের লেখা জানে? কবে কাকে চিঠি দিয়েছে? তবে টুসকি কোথা থেকে কিছু ফালি ফালি কাগজ নিয়ে এসে বলল, হ্যাঁ হাতের লেখা তারকেরই বটে। এই যে মাঝে মাঝে বাজার এনে হিসেব লিখে দেখাতো? দেখা হতো না অবশ্য গ্রাহ্য করে, এখানে ওখানে গুঁজে রাখা হতো হয়তো। কোনো বইয়ের মধ্যে, কি ড্রয়ারের হিজিবিজির মধ্যে। ..তো এখন অবশ্য দেখা গেল, 'যাকে রাখো—সেই রাখে।' কিন্তু ওই পর্যন্তই। সন্ধান করার উপায় হয়নি।

তবু ধরে নিতে হবে বড়দাবাবুর সঙ্গে কোনোরকম যোগাযোগ হয়েছে তার।

নীলু অবশ্য একবার বলেছিলেন, ওই ব্যাটাই নাটের গুরু কিনা কে জানে! হয়তো আগে থেকে ষড়যন্ত্র করা ছিল লোক দেখিয়ে ভাত তরকারি ফিরিয়ে এনে হা-হুতোশ করল।'

হতে সবই পারে। দুটো মানুষ যখন প্রায় একই সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল।

এখন নীলু বললেন, ব্যাটা তারক নির্ঘাৎ সন্ধান জানে। তারপর বললেন, হ্যাঁ, আর একটা কী যেন বলেছিলি?

আর একটা?

নীহারিকা সচকিত হয়ে বলে, বলছি তোমার ভগ্নিপতির কথা! তার ওপর আবার ওনার বাবার এই কেঁচে গণ্ডুষ করে কোর্টে যাওয়া দেখে, ভেতরে ভেতরে ধাক্কা খেয়ে...

কথার শেষটা না শুনেই উত্তর দেওয়া নীলুর চিরকালীন স্বভাব। তাই আবারও বলে ওঠেন,

তা অবশ্য সত্যি। মনে ধাক্কা লাগতেই পারে। ওর বসে যাওয়ার জন্যে বুড়ো বাপের আবার খাটতে বেরোনো—

নীলুদা গো! তুমি এতো বুদ্ধি ধরো, তবু এতো অবোধ! ওই ধাক্কাটা কী বুড়ো বাপের কষ্টর জন্যে?

তবে? তাহলে আবার কী জন্যে রে? অ্যাঁ?

ও তুমি বুঝবে না নীলুদা।

যাব্ বাবা। এর মধ্যে আবার না বোঝার কি আছে?

আছে। এ ধাক্কাটা হচ্ছে এক ধরনের হিংসে আর হতাশার।

কী বললি? অ্যাঁ? হিংসের! মাথাফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোর? যা দিকি আর দু কাপ চা আন দিকি বেশ কড়া করে। তোর এক কাপ, আমার এক কাপ। চটপট।

নীহারিকাকে অবশ্য এ আদেশে উঠতেই হয়।

নীলাম্বর ব্যানার্জি নামক লোকটা তার চলার দিকে তাকিয়ে দেখেন, মুখে ফুটে ওঠে একটি সূক্ষ্ম কৌতুকের হাসি। হ্যাঁ, সময় বুঝে অবোধ সাজতে হয় বৈকি! কাউকে চিনে ফেলেও মুখের ওপর তো বলে ফেলা যায় না 'তোমায় চিনে ফেলেছি হে'।

তবু ওর ওপর একটা মায়া ভালোবাসা রয়েই গেছে। আকৈশোরের একটু মধুর আকর্ষণ। আর তাছাড়া ও নীহারিকার ওই 'নীলুদাতে' বিগলিত ভাব। অবহেলা করা শক্ত। আসলে মানুষটা হৃদয়বান এবং সৌজন্যবোধসম্পন্ন। আবার নিজেকে বিকশিত করবার বাসনাটিও ষোল আনা।

মনে মনে হাসে।

ভাবে নিজের গিন্নীটিকেও তো হাড়ে হাড়ে চিনে ফেলেছি। দেখছি ভেতরে ঢের ভ্যাজালের কারবার। তবু জানতে কি আর দিই 'বুঝে ফেলেছি তোমায়'। মেয়ে জাতটার মধ্যে অনেক গোলমেলে ব্যাপার থাকে। হে নীহারিকা, তোমার শ্বশুর আবার কর্মক্ষেত্রে নামতে গেলেন, আর তোমার স্বামী চিরকালের মতো অপটু হয়ে রইল, এতে তোমার মধ্যেই হিংসের জ্বালা! বুড়ো মানুষটা যে সংসারের প্রয়োজনেই আবার কাজের ধান্ধায় বেরোতে বাধ্য হলো, তা না ভেবে তুমি ভাবছ, বুড়ো আবার কাজে জুততে যেতে পেয়ে আহ্লাদে টগবগ করছে। আশ্চর্য!

তবে হ্যাঁ। নির্ভেজাল শ্রদ্ধা করবার মতো কেউ কেউ থাকে বৈকি। যেমন ওই বৃদ্ধা মহিলাটি। নয়নতারা। নীরু বলছে—'ওঁরা যেন এ সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন। ওনাদের যেন নিজস্ব একটা জগৎ আছে।'

খুব বুদ্ধিমতী নাহলে কখনো এমনটা সম্ভব হয়? যখনি বুঝেছেন, 'সংসার' তাঁদের অ্যাভয়েড করছে, তখনি নিজেদেরকে গুটিয়ে সরিয়ে নিয়ে নির্লিপ্তর ভান করেছেন। আশ্চর্য, নীরু একবার ভাবে না, তার স্বামীটি ওই বৃদ্ধা মহিলারই একমাত্র পুত্র। ওঁর মনে ছেলের এই অবস্থার জন্যে বেদনা নেই? যত দুঃখকষ্ট শুধু তোরই?

চা নিয়ে এলো নীহারিকা।

নীলাম্বর তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বলেন, আদিত্যকে আর ডেকে ডিসটার্ব করলাম না, বলে দিস, গেলাম। চলি। দেখি ওবেলা আদিত্যর বাবার ফেরার ব্যাপারে যদি কিছু করা সম্ভব হয়।

নীহারিকা নীরস গলায় বলে, উনি যদি এখন নিয়মিত প্র্যাকটিসে নামেন, তুমি দু'বেলা ওঁর যাতায়াতের দায় নেবে?

আহা তাই কি আর সম্ভব? তবে প্রথম প্রথম দু'চারদিন যদি—বাপ্পার জন্যে বেশি চিন্তা করিস না। আমি বলছি নির্ঘাৎ ওর ভক্ত হনুমানটি ওর কাছে গিয়ে জুটেছে এবং দেখভাল করছে।

ওর মাথায় তখনো ব্যাণ্ডেজ ছিল নীলুদা।

আঃ। কি মুশকিল। ছিল বলে কী চিরকাল থাকবে? ওসব এক আধটু ক্রমে আপনিই ঠিক হয়ে যায়। আমি বলছি।

পিঠে একটু চাপড় মেরে দিয়ে চলে যায়।

এটুকু না হলে আবার হয়তো এখন ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কাঁদতে বসবে। সে গুণে তো ঘাট নেই।

মেখলা ফিরছিল তার এক বান্ধবীর বাড়ি থেকে। হেঁটে ফিরছিল। নিজেদের বাড়ির কাছ বরাবর খ্যাঁচ করে একখানা গাড়ি থেমে গেল। নেমে পড়ল চালক। বলে উঠল, গুড্ গড। আশাই করতে পারিনি দরজায় কড়া নাড়া দেবার আগে ভাগ্য এমন প্রসন্ন হবে।

প্রথমটা অবশ্যই থতমত খেয়ে গেছিল, তবে মুহূর্তেই বুকের মধ্যেকার আলোড়নটাকে সামলে নিয়ে চোখ তুলে শান্ত গলায় বলল মেখলা, সুন্দরভাবে কথা বানিয়ে বলতে আপনি খুব ভালোবাসেন। তাই না?

বানিয়ে!

যুধাজিৎও শান্ত গলায় বলল, পুরুষ জাতটার স্বভাব কী জানো? মেয়েদের কথায় সহজে অপমান বোধ করে না।

সত্যি কথা শুনলে অপমানবোধ হবে কেন?

যুধাজিৎ এদিক ওদিক তাকাল। রাস্তা দিয়ে লোক চলাচল করছে দু'চারটে, একটা রিকশাগাড়ি চলে গেল প্রায় গা ঘেঁষে। ভেতরে একটি স্থূলাঙ্গিনী মহিলা ও দুটি স্কুল ড্রেস পরা বাচ্চা। স্কুল থেকে নিয়ে আসছেন মনে হয়। টুসকিও তাকিয়ে দেখল। না মুখ চেনা নয়।

কিন্তু মুখ চেনা হলেই বা কী হয়? টুসকি কী কোনো মারাত্মক অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে? একখানা থেমে পড়া গাড়ির সামনে একটা ছেলের মুখোমুখি একটু দাঁড়ালেই কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায়?

ভগবান জানেন, কী হয় আর না হয়?

তবু মেখলার মনে হলো, ভাগ্যিস চেনামুখ নয়।

যুধাজিৎ গাড়িটার গায়ে আস্তে আঙুলের একটু টোকা দিয়ে গলার স্বরে একটু হাসির ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে বলল, মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ইতিপূর্বে বোধহয় কোথাও বেশ কিছু দাগা পেয়েছ।

তার মানে? গলার স্বরে উত্তেজনা চাপা থাকে না মেখলার।

মানে ওই একটাই। দাগা না পেলে, এমন সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠবে কেন? ভালোবাসায় বিশ্বাসী হতে পারো না কেন?

টুসকি অবশ্যই মনে মনে কেঁপে উঠল। তবু অনমনীয়তার ভঙ্গিতে বলল, ভালোবাসায় বিশ্বাস! হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে এমন একটা আষাঢ়ে গল্প ফাঁদা কেন?

আষাঢ়ে গল্প! ঠিক আছে। অপমানবোধ বা অভিমানবোধটোধ না থাকুক, পুরুষজাতটার একটা বাস্তববোধ অবশ্য থাকেই। অতএব ওসব কথা থাক। তোমাদের বাড়িতেই যাচ্ছিলাম, যাওয়া চলবে? সেটা জেনে নিয়ে চেষ্টাটা চালাব।

আঃ। কী যে বলেন! 'যাওয়া চলবে না' আবার কী কথা? চলুন তো! আসুন।

অশেষ অনুগ্রহ। তাহলে গাড়িটায় উঠে পড়লে ভালো হয়।

এ মা। এইটুকুর জন্যে আবার গাড়িতে ওঠা কী?

টুসকি এখন সহজ ভঙ্গিতে আসে। আর তো মাত্র দু'মিনিটের রাস্তা।

তা তো দেখছি। তবে গাড়িটা এখানে বেওয়ারিশ পড়ে থাকবে?

বাঃ, আপনি চালিয়ে নিয়ে চলে আসুন।

আর তুমি পা চালিয়ে? সত্যি, সমস্যার কী সহজ সুন্দর সমাধান। উঠে এসো প্লীজ। না হয় একটা চক্কর মেরে দু'মিনিটটাকে পাঁচ সাত মিনিটে তোলা যেতে পারে।

টুসকির আবার বুকটা ধড়াস করে ওঠে। চক্করে মারা মানে! মতলবটা কী লোকটার?

আঃ। আবার চক্কর মারার কী আছে? আপনার স্টার্ট দিতে দিতেই তো আমি পৌঁছে গিয়ে কড়া নাড়া দিয়ে ফেলব।

যুধাজিৎ এবার একটু গভীর গলায় বলে, আচ্ছা মেখলাদেবী, আমায় কী আপনার খুব একটা দুর্বৃত্ত বলে মনে হয়?

ধ্যাৎ। যাাঃ।

যাক তবু ভালো। ফর্মে এলে। তোমার মুখ দেখে মনে হলো যেন আচমকা আমি একটা নারীহরণের নায়ক হয়ে বসতে পারি।

বাবাঃ। বাবাঃ। এতো কথাও জানেন। উঠছি বাবা উঠছি।

বলে গাড়িতে উঠে বসে মেখলা। সামনের সিটেই বসে অবশ্য।

যুধাজিৎ স্টিয়ারিংটা ধরে হাতের ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বলে, জাস্ট পাঁচ মিনিট!

তারপর মেখলাদের বাড়ির সামনে দিয়েই এগিয়ে গিয়ে খানিকটা পাক খেয়ে ফিরে এসে বাড়ির দরজায় দাঁড়ায়। আশ্চর্য, এই সময়টুকু কিন্তু কেউই একটুও কথা বলেনি।

টুসকরি মনের মধ্যে হাজার চিন্তার উথালপাথাল। তার ব্যবহারটা খুবই গর্হিত হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, কেনই বা এমনধারা করতে গেল সে? এতে তো যুধাজিতের কাছে খেলোই হয়ে গেল। যদি যুধাজিৎকে দেখে নেহাৎ সাধারণভাবে বলে উঠতো, 'আরে আপনি? আমাদের বাড়িতেই আসছেন? ভালো ভালো আসুন। আসুন।' কী সুন্দর হতো।

মানসম্মানটাও অটুট থাকতো।

কিন্তু ওই লোকটাকে দেখলেই কী যে হয়ে যায়।

যুধাজিতের মনের মধ্যে কেমন যেন একটা কৌতুকের ভাব।

গাড়ি থেমে নামার পর যুধাজিৎ বলল, হসপিটাল থেকে ফিরে মেসোমশাই ভালোই আছেন আশা করি।

হসপিটাল থেকে ফিরেছেন আপনি জানলেন কী করে?

জানাটা খুবই শক্ত ব্যাপার?

মানে এর মতো তো কই আসেনই নি।

না এলে জানা যায় না?

টুসকরি মুখে আর কথা যোগায় না। চুপ করে দরজার দিকে এগিয়ে যায় কড়া নাড়তে।

যুধাজিৎ হাত তুলে বলে, একটু পরে। তারপর বলে, তোমার দাদারও তো একটু খবর পাওয়া গেছে?

দাদার। মানে ঠিক খবর বলা যায় না, তবে—

ওই তবেটুকুই অনেকখানি টুসকি!

তারপর আবার ও বলে, তোমার দাদুকে যে এই বয়সে আবার কর্মক্ষেত্রে নামতে হলো, এই খবরটাই বরং কষ্টের। শিলাদিত্যকে এতো করে জপালাম, 'চলে আয় আমার সঙ্গে।' তো বাবুর বোধহয় মানে ঘা লাগল। তোমরা দুই ভাইবোনই বড্ড বেশী মানী! এ যুগের পক্ষে খুব উপযুক্ত নয়।

বলেই চট করে দুটো সিঁড়ি টপকে দরজার কড়াটা বেশ জোরে নাড়িয়ে দিল।

তিনতলায় ওঠবার আগেই ধড়াচূড়া সমেতই ছেলের ঘরে এসে ঢুকলেন সত্যব্রত। আস্তে বললেন, কেমন আছিস রে খোকা?

খোকা ক্লান্ত চোখদুটো খুলে তাকাল।

ভাবশূন্য মুখে নীরস গলায় বলল, আমার আবার কেমন থাকা না থাকা!

সত্যব্রত অপ্রতিভভাবে বলেন, আহা তা ভাবছিস কেন? মনটাকে একটু চাঙ্গা করতে চেষ্টা কর। সেটাও শরীরে প্রভাব ফেলে।

আমার কথা থাক। তোমার আজকের এক্সপিরিয়েন্সটা আশা করি খুব উৎসাহজনক।

সত্যব্রত যেন অপরাধীর ভূমিকায়। মলিনভাবে বলেন, কী যে বলিস! হারানো জায়গা আবার উদ্ধার করা সহজ না কী? এই ক'বছরই কতো নতুন মুখ এসে গেছে? তবে হ্যাঁ পুরনো পরিচিতরা খুব 'ইয়ে' করলেন।

'আহ্লাদ করলেন' বলতে গিয়েও মুখে বাধল! তাই 'ইয়ে' দিয়ে সারলেন।

আদিত্য আর কোনো কথা বলল না।

সত্যব্রত একটুক্ষণ বোকার মতো চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে আবারও অপ্রতিভ গলায় বললেন, বৌমার ভাই ওই নীলু ছেলেটা যে কী ভালো! দেখি আবার আমার ফেরার জন্যেও গাড়ির ব্যবস্থা করে বসে আছে।

আদিত্য হঠাৎ একটা বাজারচলতি কটু কথা বলে বসে। বলে, পয়সা থাকলে লোকে বেয়াইয়ের বাপেরও বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধ করে বাবা।

সত্যব্রত একটু আহত গলায় বলেন, শুধু পয়সা থাকলেই বলছিস কেন খোকা। পয়সা তো কতজনেরই থাকে। 'দিল'টাও তো থাকা চাই। মানুষের ভালো দিকটা দেখতে হয় রে।

খোকা আর কোনো কথা বলে না, পাশ ফিরে দেওয়ালমুখো হয়ে শোয়।

সত্যব্রত আরো একটুক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে অধিকতর বোকাটে গলায় যেন বাতাসকেই শুনিয়ে বলেন, যাই চানটা সেরে নিয়ে আসি।

'আসি' কথাটা কী অর্থহীন নয়?

আবার কী তিনি এখুনি এখানে এসে দাঁড়াবেন? দাঁড়াবেন সেই আবার আগামীকাল বেরোবার আগে? সেই চোরের মতো অপরাধীর ভূমিকায়।

কী আশ্চর্য। ভাবেননি ভূমিকাটা এমন অপরাধীতুল্য হবে।

তিনতলায় ওঠার মুখেই দালানের একধারে রান্নাঘর। মানে একদা নীচেরতলায় সাবেকি রান্নাঘর বাতিল করে নীহারিকা দোতলায় যে ছোটমতো ঘরটাকে রান্নাঘর বানিয়ে নিয়েছিল।

তার মধ্যে থেকে যেন খুটখাট কিছু শব্দ আসছে। তার মানে আছে কেউ ভিতরে। সত্যব্রত একটু থামলেন। নয়নতারা কী? সত্যব্রতর জন্যে চা-টা কিছু করতে নেমেছেন?

ভাবলেন, তবু সাহস করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন না। তারক চলে যাওয়ার পর থেকে নতুন কোনো রান্নার লোক জোটেনি। অথবা জোটানোর চেষ্টাও করা হয়নি। নীহারিকাই রাঁধে এবং রোজই তার 'মাথা ছিঁড়ে পড়ে'। তবু নয়নতারা একটু সাহায্য করতে এলে রীতিমতো আপত্তি জানায়। ওকে নাকি তার সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশি হয়।

তবু সত্যব্রত একবার ভাবলেন আজকে হয়তো নয়নতারা থাকলেও থাকতে পারেন।

তবু সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেন। আর উঠতে উঠতেই সিঁড়ির শেষ বাঁকটা ঘুরতেই সে ভুলটা ভাঙল। সিঁড়ির মুখেই নয়নতারা দাঁড়িয়ে। মুখে ব্যগ্র উৎকণ্ঠা!

সত্যব্রত উঠতে দিয়ে একটু পাশ কাটিয়েই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলেন এবং অনেকদিন আগের মতো সত্যব্রতর কোটটা খুলতে সাহায্য করলেন।

কিন্তু নীহারিকার সেই সূক্ষ্ম সন্দেহটি কি একেবারেই অমূলক? নয়নতারার ওই বার্ধক্যের রেখা আঁকা শীর্ণ মুখটায় কী সেসময় একটি তরুণীর লাবণ্যের আভাস পাওয়া গেল না?

সত্যব্রতর অবশ্য এখনো চেহারাখানা দেখবার মতো। যাকে বলে 'উন্নত গৌরকান্তি'। এখনো মজবুত বলিষ্ঠ গড়ন। অনেকদিন পরে আবার স্যুট পরায় যেন বয়েসের খানিকটা ঝরে গেছে। যেটা দেখে পর্যন্ত নীহারিকা অবচেতনে একটা অন্তর্দাহে জ্বলছে। ওই লোকটা তার শ্বশুর কিংবা তার স্বামীর বাবা, এ সম্পর্কটা যেন মনে আসছে না, মনে আসছে লোকটা ওই খুনখুনে বুড়ি নয়নতারার বর।

'খুনেখুনে বুড়ি' শব্দটা অবশ্য নীহারিকারই আবিষ্কার। ছোটখাটো গড়নের রোগা পাতলা আর ধারালো টিকলো নাকমুখওয়ালা মানুষটার মুখের চামড়ায় অনেকগুলো আঁকিবুঁকি ঠিক ওই বিশেষণটিই মনে এনে দিয়েছে নীহারিকার। বয়েসের থেকে বেশি বুড়োই দেখায় নয়নতারাকে।

রংটা অবশ্য নয়নতারারও ফর্সাই, পাবনার সেই বড় উকিল জমিদারবাবুর ছেলের বৌ হবার উপযুক্ত যোগ্যতা তো থাকা চাই।

বৌ দেখে সবাই বলেছে, 'আহা যেন সরস্বতী ঠাকরুণটি।' তবু—সত্যব্রতর কাছে লাগে না।

সকালবেলা যখন নীলুর একান্ত নির্বেদে তার গাড়িটায় উঠে বসেছিলেন সত্যব্রত, তখন নীলুর ড্রাইভার ননী বলে উঠেছিল, আরেব্বাস! দাদামশাইকে যে সাহেব হেন দেখাচ্ছে গো!

এখন সেই সাহেব হেন মানুষটার দিকে তাকিয়ে কী নয়নতারার মনের মধ্যে একটা পুরনো আবেগের জোয়ার এলো না? সেই ক্ষণমুহূর্তটিতে কী মনে পড়ল নয়নতারার—তার বড় নাতিটা নিঁখোজ, একমাত্র ছেলেটা বিছানায় পড়ে!

মনে পড়ল না। অন্তত: একটুক্ষণের জন্য না। মনে হলো তিনি যেন পিছিয়ে অনেকটা দূরে চলে এসেছেন। কর্মক্ষেত্র থেকে সদ্যপ্রত্যাগত যুবক স্বামীর দিকে তাকিয়ে বিহ্বল দৃষ্টি ফেলছেন। হ্যাঁ এটাই তো আজন্মের রোগ নয়নতারার, স্বামীতে বিহ্বল। এখনো সে রোগ রয়েই গেছে।

আজ অবশ্য পরক্ষণেই বলে উঠলেন, খোকারে দেখ্যে আইলে?

সত্যব্রত বললেন, হুঁ!

ঠাকুর যে আবার কবে অরে সুস্থ কর‍্যে তুলবেন?

সত্যব্রত একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

নয়নতারা এখন আবার অন্য কথায় এলেন। বললেন, অখন তো তেমন গ্রীষ্ম নাই, এই সন্ধ্যেমুখোয় চান করবে?

সত্যব্রত বললেন, চান না করলে চলে?

গরম জল দিব এট্টু।

মাথা খারাপ।

আরে মশাই, দেখতেই না হয় অখনো যুবাটি রইছ। বয়স তো হইছে? না হয় নাই?

বলে একটু মধুর হাসি হাসলেন নয়নতারা।

সত্যব্রতও হাসলেন। বললেন, বয়েস ভাবলেই বয়েস। না ভাবলে নয়।

আজ কোর্টে গিয়া কেমন লাগল?

ভালোই। পুরনো চেনাদের সঙ্গে দেখা হলো। কেউ কেউ তো আমার থেকেও বয়সে বড়ো।

তাঁরা খুব খুশী হলেন।

নয়নতারা একটু নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, এই সাতে খোকাও যদি ভালো হইয়া আবার অফিসে যাইত, কতো সুখ হইত।

এটা প্রশ্ন নয় অতএব উত্তরের দায় নেই। সত্যব্রত সাবান তোয়ালে নিয়ে ছাদের পাশেই স্নানের ঘরে ঢুকে যান।

নয়নতারা উৎকণ্ঠিতভাবে সিঁড়ি দিয়ে দু'এক ধাপ নেমে আসেন। বৌমা কী ব্যবস্থা করছে শ্বশুরের জন্যে ? বাড়ি থাকা মানুষ, বিকেলবেলা যখন ওদের চা হতো, এক কাপ পাঠিয়ে দিতো। হয়তো সঙ্গে দু'খানা বিস্কুট। নয়নতারা কখনোই চা খান না। তাঁর বৈকালিক জলযোগ সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকে না। সে যাক, আজ এই মানুষটার জন্য তো কিছু আয়োজনের দরকার !

বৌমাকে ডেকে কিছু জিগ্যেস করবেন, এমন সাহস হচ্ছে না। একটু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ টুসকির গলা শুনতে পেলেন। বলছে, আমায় দাও আমি দাদুকে দিয়ে আসছি। শুনি গে বুড়ো ভদ্দরলোক কি দিগ্বিজয় করে এলেন।

নয়নতারা হঠাৎ আহ্লাদে চোখে একঝলক জল উপছে পড়ল। মনে হলো, ঠাকুর, পৃথিবীতে এতো মধুর কথাও ছিল ?

॥ ষোল ॥

তারকের মা কপালে হাত দিয়ে বলে উঠল—তুই যে আমায় তাজ্জব করে দিলি রে তারক। অ্যাঁ। বড় খোকা আমাদের ঘরে গে রয়েচে ?

তারক গলা নামিয়ে বলে, আস্তে বাবা আস্তে। তো এখনো পর্যন্ত তো রয়েচে, আর ক'দিন আটকে রাখতে পারবো, ভগবানই জানে। মাথার ঘা তো সেরে গেছে দেখা যাচ্ছে।

আহা ! ভগবান ভালো রাখুক। তো সারলো কিসে ? ডাক্তার দেখালি ?

দূর কোথায় ডাক্তার ? জ্যাঠা জবরদস্তি করল কী একটা শেকড়বাকড় ছ্যাঁচা রস নিয়ে, তো বড়দাবাবু হেসে বলল, আচ্ছা দাও ! দেখি মৃত্যুটা কোনদিক দিয়ে আসে।...তো জ্যাঠা বলল, মিত্যু হতে যাবে কেন ? এ তো কোবরেজি গাছড়া। আমাদের গা-গঞ্জে ক'জনা আর সামান্যর জন্যে ডাক্তার বদ্যি করাতে পারে বাবু ? এইসব দিয়েই দিন চালানো। তো সত্যি বলতে সেরেও তো গেল। বড়দাবাবু বলল, ভালোই হলো রে তারক আমার একটা শিক্ষা হলো। ভাবছি আর শহরে বাজারে নয়, অনেক দূরে চলে যাবো। গরীব-দুঃখী আদিবাসী-টাসীদের সঙ্গে মিশে দেশটাকে ভালো করে চেনা করবো। তো হয়তো এইভাবেই কতকিছু শিখতে পারব, জানতে পারব !'

তা হ্যাঁরে তারক, খোকার মতলবটা কী ? আর ঘরে ফিরবে না ?

কী জানি ? এখন তো তাই মনে হচ্ছে।

আর তুই ?

আমার আর নতুন কী ? মুনিব যেখানে, নফর সেখানে !

কী ?

হঠাৎ ফস করে যেন আগুনের মতো জ্বলে ওঠে তারকের মা, এ তো আচ্ছা জুলুম। মুনিবের পায়ে দাসখৎ লিকে দিয়েচিস না কী ?

তারকও উষ্ণ হয়। বলে, কোথায় কী লিকে দিয়েচি, সেকথা থাক ? 'জুলুম' বলছিস ক্যানো ? বড়দা আমায় জুলুম করে সঙ্গে নে এসেচে ? আমি বলে হত্যে হয়ে খুঁজে খুঁজে তাকে বার করিচি !

তো ওই মানুষ যদি চেরজম্মো বাউন্ডুলে হয়ে বেড়ায় তুইও তাই বেড়াবি?

তারক দু'হাত উল্টে নিরুপায়ের ভঙ্গি করে বলে, অগত্যে।

তারকের মা আরো রেগে গিয়ে বলে, ক্যানো? তুই তার বে করা পরিবার'? তাই রণে বনে অরণ্যে তার সাতে গাঁটছড়া বেঁদে ঘুরতে হবে?

মার এই রাগ দেখে আর তুলনা শুনে তারক হো হো করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, এ তো আবার আর এক মজার কথা বললি মা! এখনকার কালে কী আর 'বে করা পরিবারই' তাই থাকে? 'ভালো লাগলো রইলুম, ভাল্না লাগলো ছাড়লুম' এই তো ধারা এখোন।

তারপর একটু আস্তে বলে, বড়দাবাবু একখানা মহেৎ মানুষ মা। উনার সেবা করতে পেলেও তারক হতভাগা মানুষ গৎরে যাবে। তবে মতিগতি বুঝি ন'। মাঝেমদ্যে ভয় হয় সাধু সন্নিসি হয়ে যাবে না তো?

তারকের মা পরিতাপের গলায় বলে, কি জানি। প্রেথম থেকে মা-বাপ শক্ত হাতে রাশ টানেনি বলেই এমনটা হয়ে পড়েচে রে তারক। সময়ে জোর করে বে থা দিলে বদলে যেতো!

নদের নিমাইয়ের তো বে হয়েছিল গো মা। হয় নাই? আর সেই বুদ্ধদেবের? ও কোনো কাজের কথা না। তবে আসলে কী হয়েচে জানিস? যাদেরকে বিশ্বাস করে জীবনটাকে বিকিয়ে বসেছিল, ` ` ৎ যেন দেকতে পেয়ে গেচে তাদের মদ্যে সব ভ্যাজালের কারবার! তার সাক্ষী এই তোর মুনিব। ভোটে জিতে বাবুর এখোন কী নম্বা চওড়া দেকচিস তো? নবাব না বাদশা, এই ভাব। আর এই হতভাগা ছেলেগুলান? মা হাতে করে একখানা সন্দেশ দিতে এলে খেতোনি। বলতো, ওসব বড়মানুষদের জন্যি। পুজোয় একটা ভালো পোশাকও নিতো না। 'দেশের লোক' গরীব। আমাদেরও গরীবী চালে থাকা দরকার।' অথচো ওদিকে—

তারকের মা নিঃশ্বাস ফেলে বলে, তা দেকচি বটে। বাবুয়ানার শেষ নাই। অ্যাখোন আবার গিন্নীর জন্যে আলাদা একখান গাড়ি, ইচ্চে মতন বেড়াবে বলে।

তাহলেই বোঝ। যাক, এখনি চলি। নেহাৎ একবার তোর সঙ্গে দেকা না করে গেলে হাঁপিয়ে মরবি—তাই!

তারকের মা হঠাৎ ছেলের কাঁধটা প্রায় খামচে ধরে বলে ওঠে, তারক রে, তুই এই অভাগা মুখ্যু মায়ের মুখ্যু ছেলে, তবু তোর ভেতরে এই বিবেচনা রয়েচে, আর বড়খোকা বিদ্বান, বুদ্ধিমান হয়ে বাপ-মায়ের প্রাণটা বিবেচনা করচে না? বাপ যে ছেলে নিরুদ্দিশ হয়ে গেছে শুনে মরতে পড়েচে, খবর তো তোরই কাচে?

তারক একটু অসহায়ভাবে বলে, বিদ্বান পণ্ডিতদের মন বোধহয় শক্ত। কড়া হুকুম, যেন উনি কোথায় আচে ফাঁস না করি।

তুই চুপিচাপি একটা খবর দিয়ে দে না বাবা? তাতে তোর পুণ্যি বৈ পাপ হবে না! অন্ততো ছেলেটা বেঁচে আচে, ভালো আচে জানতে পারলেও—

হঠাৎ চোখটা আঁচলে মুছে বলে, অনেকদিন ওদের নেমক খেয়েছিলুম রে তারক, এখনো ওদের তরে প্রাণটা কাঁদে!

তারক আস্তে বলে, আচ্চা দেকি?

সেই প্রতিশ্রুতির ফলশ্রুতিতেই সেই পোস্টকার্ড। তাও তারক বুদ্ধি করে তাদের গাঁ থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে চিঠিটা অন্য গ্রাম থেকে পোস্ট করেছিল। যদিও অতো কষ্ট না করলেও চলতো।

গমনোদ্যত তারককে মা আবার আটকায়, তা হ্যাঁরে, আমাদের মতন ঘরে বড়খোকা খায় কী?

কী আবার? জেঠি যা রাঁধে। আমাদের মতনই মোটা চালের ভাত, আস্ত কলাইয়ের ডাল,

আবোড় জাবোড় চচ্চড়ি। আমি তো সে জিনিস মুখে তুলতে পারিনে। ওই কুচোকাচা যা মাচ আনে জ্যাঠা পুকুরে গামচা ছাঁকা দিয়ে, তাই দিয়েই—তো বড়দাবাবু আমার কুচো মাচও খেতে পারে না। তো জ্যেঠির সেই ঢঙিনী ভাইঝিটা মাঝেমধ্যে কলকেতার বাজার থেকে বাঁদাকপি নিয়ে আসে। বড় আলু নে আসে! বলে, 'মুনিবরা তাকে খেতে দেচে।' আমি বিশ্বাস করি না।

এই মরেচে। তার আবার অ্যাতে দরদ ক্যানো?

তারক অবজ্ঞাভরে বলে, ঢঙিনীদের যা স্বভাব। বয়েসের পুরুষ বেটাছেলে দেকলেই মন উসখুশ করে।

দেকিস বাবা সাবধান।

তারক আর একবার হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, মা রে, যে আদিখ্যেতায় নন্দীভৃঙ্গীকে কাৎ করতে পারল না তাতে মহাদেব কাৎ হবে?

তারকের মা চিন্তিত আর সন্দিগ্ধ গলায় বলে, তাও জগতে ঘটে রে তারক। নন্দীভৃঙ্গী তো পাকা পক্কান্ন। সব বোজে। কে কী চীজ চেনে। ভোলানাত মহাদেব যে সরল সিদে।

দূর। ওসব চিন্তে ছাড়। বললুম শীগগিরই চলে যাচ্ছি।

কোতায় যাবি বাবা তারক?

এখনো তো মনস্থির করে নাই। কখনে বলে বাঁকড়ো পুরুলিয়ার দিকে চলে যাবে, কখনো বলে সুন্দরবনের দিকে যাবে।

অ তারক। তাহলে আমি তোর খপর পাবো কি করে বাপ?

তারক আশ্বাসের গলায় বলে, পৃথিবীর বাইরে চলে না গেলে, যে করে হোক খবর একটা করবই তোর। নিশ্চিন্দি থাকিস।

এখন আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে হয় না তারকের মাকে, আর কথার মাঝখানে কেউ ছুটে এসে বাধা দেয় না, 'অ আমার কপাল। বামুনদি তুমি এখানে? ওদিকে বাড়ি তোলপাড় হচ্ছে তোমার তরে।'

এখন তারকের মা ছেলে এসে খুঁজছে শুনলে, গিন্নীর কাছে ছাড়পত্র নিয়ে বেরিয়ে এসে হয়তো কোনো পার্কের বেঞ্চিতে এসে বসে, নয়তো পুরনো চেনা মুড়িওয়ালি দিদির দাওয়ায় এসে বসে।

এখন তারকের মার পদমর্যাদা অনেক বেড়ে গেছে। রান্নাঘরের ভারপ্রাপ্ত বটে এখনো, তবে দাসদাসীমহলে প্রায় 'বড়বাবুর' পোস্ট। এবং যেহেতু রাঁধুনী তাই 'বামুনদি' নামটিও কায়েম হয়ে গেছে।

সুযোগ পেলেই মনিববাড়ির সমালোচনা করে তারকের মা, তবে এ বাড়ি যে সহজে ছাড়বে, এমন মনে হয় না। এখানে আরাম আয়েস আধিপত্য! বলতে গেলে গিন্নীর 'খাসদাসী'র সম্মান। গিন্নী এখন তাঁর নিজস্ব গাড়িতে করে যখনই যেখানে যান দক্ষিণেশ্বর কী 'চিত্তেশ্বরীতলা', গণৎকারের অফিসে কী 'ভরের কালীবাড়িতে'....তারকের মা তাঁর বিশ্বস্ত সঙ্গী। খবরটি পাঁচ কান করবে না সেটা নিশ্চিত। পাঁচ কান হলে নাকি বাবুর মানমর্যাদা কমে যাবে।

তো বিশ্বাসী তারকের মা প্রতিটি ব্যাপারেই।

ঘরের বাক্স আলমারীর চাবিও নাকি গিন্নী অনায়াসে তারকের মার হেফাজতে রাখতে দেন। তাছাড়া—এখন আর তারকের মাকে মাসে মাসে দেশে গিয়ে 'মরণাপন্ন' মাকে দেখতে হয় না। সময় বুঝে 'মা একদিন মরেছে।'

অতএব মনিব গিন্নী তারকের মায়ের ওপর আরো সন্তুষ্ট।

মাকে কতদিন আর জীইয়ে রাখা যায় ? তাছাড়া দরকারও ফুরিয়েছে, জমিজমা নিয়ে ভাসুরের সঙ্গে ভাগভিন্ন হওয়ার কাজটা মিটেছে। তাছাড়া আর এখন নতুন করে জমিজমা গরুবাছুর কেনার উৎসাহ নেই তারকের মায়ের। ছেলেই যদি দেশে এসে বাস না করে, সে আর কীজন্যে ভূতের জঞ্জাল বয়ে বেড়াবে ? শেষতক্ সবই ওই জা-ভাসুরের ভোগেই লাগবে।

তারকের মা নিজেকেও জরিপ করে দেখেছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে একটা মানুষের মতো মানুষ হয়ে সংসার করার বাসনায় যদি ছাই পড়ে, নিজে যে সে শেষ জীবনে একা বসে দেশ ভিটেয় পড়ে থাকতে পারবে, এমন মনে হয় না। সেও তো বলতে গেলে 'আজন্ম' কলকাতায় কাটাল। 'স্বপ্ন' যদি সফল না হয়, তাহলে এইভাবেই জীবনটা কাটিয়ে দেবে, ব্যস।

এখন তো দিব্যি সুখেই আছে।

আদর্শের বিরোধ ?

তারক তার মায়ের মনিবকে ছেদ্দার চোখে দেখে না ? সে আর কী করা যাবে ? তবু দাঁড়িপাল্লার অন্যদিকটাও তো দেখতে হবে ? আরাম, আয়েস, প্রতিপত্তি, আধিপত্য, ক্ষমতা—এসবের মোহ কী সোজা নাকি ? বলে মহা মহা বিদ্বান পণ্ডিত আদর্শবাদীরাই এসবের মোহে আদর্শে জলাঞ্জলি দিয়ে লোকচক্ষে হাস্যাস্পদ হয়েও সেইসব আঁকড়ে বসে আছেন, তো তুচ্ছ এক পরান মণ্ডলের বিধবা আর তারক মণ্ডলের মা মানদা মণ্ডল।

মায়ের সঙ্গে সঙ্গে একটু এগিয়ে তারক ভারী দ্বিধায় পড়ে। এক্ষুণি ফিরে যাবে ? একবার খোঁজ নিয়ে যাবে না বাবু কেমন রইলেন ? আদৌ রইলেন কিনা ? যে অবস্থা শুনে গেছে তাতে তো সে ভয়ও রয়েছে। আশ্চর্য বড়দাবাবু সে চিন্তার দিক দিয়ে যায় না। ওনার একমাত্র চিন্তা কেউ যেন না ওনার খোঁজ পায়। আবার না বাড়ির খপ্পরে পড়ে যেতে হয়।

তারক দু'একবার বলেছে, 'কে জানে বাবু কেমন রইল।' বড়দাবাবু অনায়াসে বলেছে, 'সব ঠিক আছে বাবা, সব ঠিক আছে। ভাবনা করতে বসতে হবে না।'

দোমনা ভাব নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশে যাবার জন্যেই দরকার মতো বাসের জন্যে দাঁড়ায়, আর হঠাৎ যেন ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে।

সেই বাসস্ট্যাণ্ডেই দাঁড়িয়ে একজন।

তারক বলে, তুই ? এখানে ? আরে বাবা !

সেকথা আমিও তোমায় শুদোতে পারি। তুমি এখেনে !

হুঁ। তো মাথায় তো দেখছি খুব সিঁদুর লেবড়েছিস ! বে-টা হলো কবে ?

রাজারাজড়ার ঘরের বে' তো নয় তারকদা যে, রাজ্যির লোক টের পাবে !

কালীঘাটে গিয়ে লেবড়ে এসেছিস বোধহয়।

যা বলো !

তো এখন আছিস কোথায় ? আর খেটে খাস বলে তো মনে হচ্ছে না। কী মার কাটারি সাজ মাইরী ! তাজ্জব বনে যাচ্ছি।

'খেটে খাই না' তা বলতে পারব না তারকদা। তবে হ্যাঁ 'ঝি, রাঁধুনী' খাটা নয়। যাত্রা দলের আধা হিরোইনের পার্ট প্লে করতে হয়।

অ্যাঁ। বলিস কী ? যাত্রাদলের হিরোইন ?

হিরোইন তো বলি নাই তারকদা, বলিচি আধা হিরোইন।

আরে বাসরে বাস। সেটাই কম নাকী ? এরপর কেপাসিটি দেখাতে পারলে হিরোইন হতে

কতক্ষণ ? বাবুদের বাড়ি থেকে চুরিচামারি করে পালিয়ে গিয়ে এমন একখানা দাঁও পেলি কোথা থেকে রে ? অ্যাঁ ?

চুরিচামারি মানে ? ভালো হবে না বলছি তারকদা।

না হলে না হবে। তারক হক কথা না বলে ছাড়ে না। তো মাথায় সিঁদুর লেপে দিয়ে আবার যাত্রাদলে ঢুকিয়ে নিলো, এমন একখানা কাপ্তেন জোটালি কী করে রে কাজলবালা ?

অ্যাই তারকদা, এখন আর 'কাজলবালা' নয়, এখন নতুন নাম 'বিজলীরানী'।

আরে সাবাস ! একবারে 'বিজলী' ! হা হা হা। কে দিল রে নামটা ?

কে আবার। যার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধলুম সেই দিলো। যাত্রার দলের চাকরী তো ! ওই লোভ দেখিয়ে দেখিয়েই তো—

অ। বুঝেছি। এদিকে বাবুদের আমার ওপর কী সন্দ। বলে, তুই নিশ্চয় কাজলকে নিয়ে ভেগেছিস ! 'গলায় দিতে দড়ি জুটবে না' তারকের তাই কাজলকে নিয়ে ভাগবে।

ওঃ। খুব যে অহঙ্কার। বলি তুমি তো এমন অছেদ্দা করছ, মাসিমা তো মাথায় করে নাচলো। দিদিমণি পর্যন্ত—

কী ? মাসিমা মাথায় করে নাচল, কোন মাসিমা ?

কেন, টুসকি দিদির মা।

ওবাড়িতে গেছলি তুই ?

কেন যাব না ? দু'জনায় গিয়ে পেন্নাম করে এলুম। এক হাঁড়ি রসগোল্লা নে গেলুম। কত আহ্লাদ করল মাসি।

তারক অগ্রাহ্যের গলায় বলে, এনতার গুলতাপ্পি মেরে যাচ্ছিস মনে হচ্ছে।

ওঃ। গুলতাপ্পি ! তা'হলে তাই। বলে কাজল একটু ঠিকরে সরে যায়।

অতঃপর মানভঞ্জনের পালা।

সত্যিমিথ্যেটা তো যাচাই করতে হবে। একেবারে ডাহা মিথ্যে কী আর হবে ? একেবারে রসগোল্লার হাঁড়ি পর্যন্ত আমদানি করবে ?

তারক তাই এগিয়ে গিয়ে বলে, আরে বাস। সেই মহারানী মার্কা মেজাজটি তো ঠিক আছে দেখছি। বে থা হয়ে কমেনি। বলি তোর নিয়ে যাওয়া রসগোল্লার হাঁড়ি মাসিমা নিল ?

কেন নেবে না ? বরং কত বলল, এতো খরচা করতে গেলি কেন ? সবাই তোমার মতন অহঙ্কারী নয় তারকদা, বুঝলে ? তুমি চিরকাল জেনে এসেছ গরীব-দুঃখী কেলে কুচ্ছিৎ কাজলকে ঘেন্না করতে হয় ! সবাই তা ভাবে না। এই তো অধিকারীমশাই বললো, রঙের জন্যে কিছু এসে যায় না, পেটের গুণে বিজুলি হানবে। মুখের কাটুনি ভালো আছে। চোকের বাহার আচে।...নিয়ে নিল। করচি তো প্লে।

হঠাৎ একটু মুচকি হেসে বলে, তুমি তো চোর ছ্যাঁচোড় অনেক কিছু বললে গো তারকদা, মাসিমা কী খাতির করল যদি দেখতে। টুসকিদিদিও। আমার বরকে পেলেটে করে মিষ্টি খাওয়ালো। তাপর গে আমি অব্যেসের বশে মাটিতে বসতে যাচ্ছিলুম তাড়াতাড়ি বলল, আহা হা সিল্কের শাড়িটা নষ্ট হয়ে যাবে, সোফায়েই বোস বাবা !

অ্যাঁ !

তবে আর বলচি কী ?

কাজলের চোখেমুখে এখন সত্যিই বিজলী ছিটকোয়, আমারেও তো মাসিমা নিজে হাতে করে পেয়ালা করে চা খাবার ধরে দিল। বলল, তুই পাঁপর ভাজা ভালোবাসিস, তাই ভাজলাম দুখানা।

মা মেয়ে উভয়েই ছাড়তেই চায় না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কেবল যাত্রাদলের বিত্তান্ত বিবরণ শুনতে চায়। টুসকিদি তো আবার হেসে হেসে বলল, তো তেমন ভালো পালাটালা হলে আমাদের 'পাশ' দিস কাজল!

তারক একটু বঙ্কিম হাসি হেসে বলে, সংসারে তালে সবই সম্ভব। অ্যাঁ।

কাজল গর্বিত কণ্ঠে বলে, দিন এলেই সম্ভব হয় তারকদা। আমার বে-তে কিছু দিতে পায়নি বলে টুসকিদি'র একখানা নতুন কেনা সিল্কের শাড়ি, বাড়ির ডামাডোলে পরা হয়নি, সেখানা জোর করে গছিয়ে দিল।....আমিও তেমনি ওস্তাদ বলে ফেললাম, এই মুখপুড়ি কাজল তো তার বে'র 'উপহার' না বলেই চেয়ে নে গেছল গো দিদি। আবার কেন দিয়ে লজ্জায় ফেলা। তো শুনে ওনারাই যেন লজ্জায় লাল। য্যাঃ! কী যে বলিস। ভারী তো দুখানা পুরনো শাড়ি বেলাউস। তো বে' করতে যাচ্ছিস জানলে আমরা নিজেরাই ভালো করে দেওয়াথোওয়া করতুম।....ঠাকুমা আবার আমায় 'মাছ খাস' বলে কুড়িটা টাকা দিল। যেন সত্যিই কেউ আপনজন শ্বশুরবাড়ি থেকে এয়েচে। মেসোমশাই পর্যন্তো—

বলেই কাজল হঠাৎ প্রায় কেঁদে ফেলে বলে ওঠে, য্যাখন পেন্নাম করতে ঘরে ঢুকলুম, হাত তুলে আশীব্বাদ মতন করে 'থাক থাক' বলে বলল, 'কীগো কাজলকে কিছু খেতে দিয়েছ? শ্বশুরবাড়ি থেকে এলো।'

তারক হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, সবই ওই সিঁদুরটার গুণ, বুঝলি কাজল? ওটা না দেখলে তোকে কেউ এতো পূজ্যি করতো না।...তো মেসোমশাইকে তাহলে দেকলি?

দেকলুম। দেকে তো সুখ হলো না। বিছানায় পড়ে আচে।

তবু তো 'আচে' রে। শুনে বাঁচলুম। ভেবে মরছিলুম, আচে কী নাই।

দুগ্‌গা। দুগ্‌গা। থাকবে না কেন?

এইমাত্তর পৃথিবীতে পড়লি নাকী রে কাজল? মানুষ মরে না? সেদিন যে আবস্তা দেখে গেছলাম—

হঠাৎ কাজল উদ্দীপ্ত গলায় বলে ওঠে, তবে এও বলি তারকদা, গরীব দুঃখী কাজল অভাবে পড়ে দু'খানা পুরাতন শাড়ি বেলাউস হাতিয়ে নে গেচলো বলে, তারে চোর ছ্যাঁচোড় অনেক কিছুই তো বললে? আর নিজে কী?

নিজে কী? তার মানে?

মানেটা নিজেই বুঝে দ্যাখো। এতোকাল ওনাদের কম নেমক তো খাও নাই, কিন্তুক নেমকহারামিতে কিছু কসুর করেচো? সংসারের একখানা সারের সার দামী মাল সরিয়ে এনে কেটে পড় নাই?

তারক কপাল কুঁচকে বলে, হঠাৎ এ আবার কী আবোলতাবোল বকতে শুরু করলি?

আবোলতাবোল কিসে? বড়দাবাবুর সাথে ষড়যন্তর করে তুমি তেনাকে নিয়ে সটকান দাওনি?

কী? ষড়যন্ত্র করে? বলি কে বলেচে একথা? তারক অগ্নিশর্মা হয়ে বলে, অ্যাঁ? কে বলেচে?

পষ্ট করে কী আর বলেচে? তবে কাজল তো আর বোকাহাবা নয়। ভাব দেখেই সব বুঝে নেয়। মাসিমার কথায় বুজলুম। বড়দাও হাসপাতাল থেকে হাওয়া হয়ে গেল, আর তুমিও না-বলা-না-কয়া, হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে, এতে মানুষ কী বুজবে?

তারক এখনো ক্রুদ্ধ গলায় বলে, কী আর বুঝবে? তারক ওই সাড়ে ছ'ফুট লম্বা লোকটাকে চুরি করে ভেগেছে।

'চুরি করে' তো বলে নাই। ভাব দেখে মনে হলো যেন সেই রকম সন্দ। দুটো মানুষ একই

সঙ্গে হাওয়া হয়ে গেল!

তারক রাগে ফেটে পড়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ কোনদিক থেকে যেন একটা ভেধ্যাড়াঙ্গে মতো লোক হনহনিয়ে এসে বলে, তুমি এখেনে? তোমারে না কয়ে গেলুম ওই পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে।

কাজল ঝঙ্কার দিয়ে বলে, গাছ পাতর নাকী? যে একটু নড়াচড়া করবে না? চেনা মানুষকে দেকলুম।....এই আমার সেই তারক।

ওঃ। নমস্কার বলে লোকটা হাতদুটো জোড় করে একটা নমস্কারের ভঙ্গী করে পা চালাতে শুরু করে।

কাজলও তার পিছু পিছু দৌড় দিতে দিতে বলে, বাবাঃ। কী রাগ। আর নিজে যে 'একটু আসচি' বলে সাত ঘণ্টা দেরি করা হলো। তারকদা চিনে রাখো এই আমার 'হাজব্যাণ্ড'!

দৌড় মারে সেই দ্রুতগামীর কাছাকাছি পৌঁছতে।

কাজল রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া তারকের কাছে হেসে হেসে আর অহঙ্কারী অহঙ্কারী ভাবে যে গল্প করে গেল, সে গল্প কিন্তু অতিরিক্ত নয়। সত্যি সত্যিই 'কাজল' নামের সেই বেইমান 'বিশ্বাসঘাতক' মেয়েটা যখন চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়ে অতি অবলীলায় জমকালো সাজসজ্জা করে তার বরকে সঙ্গে নিয়ে পুরনো মনিব বাড়িতে দেখা করতে এলো, অথবা বলা যায় 'বর'কে দেখাতে এলো, তখন সেই দাগা খাওয়া মনিববাড়ি তাকে 'দূর ছাই' করার বদলে, যেন দেখে আহ্লাদে আটখানা হলো!

হয়তো এইরকমই হয়। যে প্রাণীটা একদা নিতান্ত তুচ্ছর ভূমিকায় করুণার পাত্র হয়ে থেকে গেছে, কাটিয়ে গেছে শাসিত হয়ে এবং ছেঁড়া বিছানায় শুয়ে আর চট-ওঠা কলাই-করা থালায় ভাত খেয়ে, সে যদি হঠাৎ অনেকখানিটা উঁচুতে উঠে গিয়ে আত্মবিশ্বাসের আলোয় মুখ মেজে অকুণ্ঠিতভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, তখন তার 'অন্যায়' বা 'অপরাধ'টা আর মনে আসে না, বরং সমীহর সঙ্গে নিজেদের মধ্যেই যেন একটা কুণ্ঠিত ভাব আসে। সে কুণ্ঠার ধরনটা অনেকটা এইরকম—ইস। একে আমরা কী হ্যানস্থার চোখেই দেখতাম। ছি ছি।'

অবশ্য এরকম ক্ষেত্রে হয়তো কখনো কখনো একদম বিপরীত মানসিকতাও দেখা যায়। দীনহীন জন যদি 'বেশ একজন' হয়ে এসে সামনে দাঁড়ায়, তার সম্পর্কে অবজ্ঞা আর তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিটা বেশী করে প্রকাশ করে জানিয়ে দিতে 'এঃ খুব যে একখানা ময়ূরপুচ্ছ লাগিয়ে এসে অহঙ্কার দেখাচ্ছিস্, আসলে তুই 'কী' তা কী আমরা ভুলে গেছি না কী? সেই তো রোঁয়া-ওঠা দাঁড়কাকটা তুই'।

হয়তো এদের মধ্যে কিছুটা ঈর্ষার ভাবও থাকে। সেই ঈর্ষার বশে কিছুতেই ওই চুড়োয় উঠে যাওয়া লোকটারও অতীতটাকে ভুলতে রাজী হয় না।...'ওঃ। ভারী একখানা গাড়ী চড়ে বেড়িয়ে বাহার দিচ্ছিস। বলি, কী ছিলি তা জানি না? নিজের চক্ষেই তোকে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অন্য লোকের গাড়ি ধুতে দেখেছি।'

'দেখেছি'। অতএব কিছুতেই তোর সেই গাড়ি ধোওয়া মূর্তিটাকে মন থেকে সরাব না।

তা গাড়ি ধোওয়ার চাকর থেকে নিজেই গাড়িবান হওয়ার দৃশ্যটি বিরল হলেও, একেবারে অসম্ভব নয়। বিশেষ করে এ যুগে! কেবলমাত্র লোটাকম্বল সম্বল করে বৃহৎ বিশাল মরুভূমির পথ পার হয়ে—'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলার' দেশে এসে পড়ে, কোটিপতি হওয়ার দৃষ্টান্ত অবশ্য সব যুগেই ছিল, আছেও। কিন্তু—সে তো খেটেপিটে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।

এ যুগে খাটাপেটা না করেও হয়ে যায় দেখতে পাওয়া যায়। শুধু বুঝেসুঝে একখানা মুরুব্বি

ধরতে পারলেই হলো। মুরুব্বির জোরেই সর্বদাই দেখা যায়, আজ যে গাড়ি ধুচ্ছে, কাল সে গাড়ি চড়ছে।

বেশী ক্ষেত্রেই কিন্তু জনসাধারণরা, ওই অতীত মূর্তিটিতেই বিগলিত হয়, সমীহে গদগদ হয়।

আদিত্য গাঙ্গুলীর বৌ মেয়ে মনে মনে নিজেদের সম্পর্কে খুব একখানা 'বিশেষ' ধারণা পোষণ করলেও, আসলে তারা ওই সাধারণের দলেই। তাই টুসকি দরজা খুলে কাজলকে দেখে—'তুই আবার কোন লজ্জায়?' না বলে, চেঁচিয়ে ওঠে, মা! দ্যাখো কে এসেছে।

আর সেই 'মা'ও কে এসেছে দেখে, বেজার মুখে 'তুমি হঠাৎ কী মনে করে?' বলে অবজ্ঞার বদলে বিগলিত হয়ে বলেন, ওমা! কাজল। তুই! ওরে বাবা। বিয়ে হয়ে গেছে দেখছি যে।

অতঃপর তো আবার তখনি জানা হয়ে গেল, শুধু 'বিয়ে হয়েই' কাজলের মহিমা শেষ হয়নি। কাজল আর এক উচ্চতর মহিমান্বিত লোকের বাসিন্দা হয়ে বসেছে।

কাজল একটা যাত্রাদলের নায়িকার ভূমিকার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে।

নিজেই সেই ঘাটতিটুকুকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে, না গো মাসিমা, অ্যাখনো পুরোপুরি হেরোয়িন করেনি, অ্যাখন সাইট হেরোয়িন, তবে চান্স আছে। আমার অ্যাক্টো নাকি পোপাইটারের খুব পছন্দ।

টুসকি হেসে উঠে সংশোধন করে দিয়ে বলে, হেরোয়িন নয় বাবা, 'হিরোইন'।

কাজল অম্লান বদনে বলে, তোমাদের 'বোনাইও' ওইরকম ভুল ধরে দিদি। তো আমি বলি, যাকগে যার নাম ভাজা চাল তার নামই মুড়ি। লোকে বুঝতে পারলেই হলো।

তারপর কাজল বর্ণিত আদরযত্ন ছাড়াও আরো কিছুর চাষ হতে থাকে তখন কাজল আর তার পুরনো মনিবগিন্নী ও কন্যার মধ্যে। চাষটা এই—এক পক্ষের অবিরত কৌতূহল প্রশ্ন, আর অপর পক্ষের ঈষৎ মদগর্বভাবে সেই সব প্রশ্নের উত্তরদান।

টুসকি অনায়াসেই নিজ অভিজ্ঞতার দৈন্য স্বীকার করে বলে, সিনেমা থিয়েটারের নায়ক নায়িকাদের ভেতরের কথা তবু অনেক জানা রে কাজল, সর্বত্রই বেরোচ্ছে। তবে তোদের যাত্রার লাইনের ব্যাপার তেমন কিছু জানা ছিল না। বাবাঃ। এতো সব ঝামেলা পার হয়ে তবে যাত্রাদলের রানী? হি হি। তা রানী হবি। তোর চেহারাখানা তো মারকাটারি। রংটাই যা হি হি ভূসোকালির মতো।

সে 'হি হি'-তে অবশ্য কাজলও যোগ দেয়। বলে, ও দিদি। মেকআপ-এর গুণে ভূসোকালিকেও মেম বানিয়ে ছাড়ে। যা পেণ্ট লাগায়, তাজ্জব বনে যেতে হয়।

অতঃপর তাজ্জব বনে যাবার মতো বেশ কিছু গল্প করে কাজল। মোহিত হয়ে শোনে 'দিদি' আর তার মা।

আশ্চর্য বৈকি। নয়নতারাই না হয় এদের ভাষায় চিরকেলে হ্যাবলা-খ্যাবলা, আপন প্রেস্টিজ রেখে কথা বলতে জানেন না। কাজেই তিনি যদি কাজলকে দেখে পুরনো কথা বিস্মৃতি হয়ে হাস্যবদনে বলে ওঠেন, 'অ কাজল, তর বরখানি তো দেখছি তর থেকে অনেকখানি গোরা। বেশ! বেশ! ত শ্বশুরঘরে আর কে কে আছে?' সেটা বিস্ময়ের নয়।

কিন্তু অতিমাত্রায় প্রেস্টিজজ্ঞানসম্পন্না নীহারিকা? আবার তার থেকেও আশ্চর্য, কাঠখোট্টা মার্কা আদিত্য গাঙ্গুলী। যে নাকি এখন অ-শক্ত হয়ে বিছানায় পড়ে। সেও কী করে বলে, থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না। তা হ্যাঁরে টুসকি, কাজলকে চা-টা কিছু খেতে দিয়েছিস?

মানুষের হৃদয়রহস্য বোঝা ভার। কই আদিত্যর তো মনে পড়ল না, ওই পাজী লক্ষ্মীছাড়া মেয়েটার কারণেই তাঁকে একদা থানায় ছুটতে হয়েছিল, এবং না হক খানিকটা অপদস্থ হতে হয়েছিল।

অবশ্য অপদস্থবোধটা শিলাদিত্যরই বেশী হয়েছিল। শিলাদিত্য এ সময়ে বাড়িতে থাকলে কী

হতো বলা যায় না।

কিন্তু বাড়িতে সে আর থাকে কতটুকু? ক্রমশঃই তো ডুমুরের ফুল হয়ে উঠছে। শুধু হঠাৎ ভালোমত একটা চাকরী জোটাতে পেরেছে বলেই কী? তা চাকরী তো নটা পাঁচটা।

বাকি সময়টা? কী করে সে আটটার আগেই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়ে? আর কী বা করে রাত সাড়ে নটা-দশটা অবধি? জিগ্যেস করলেই রোজ অফিসে একটা করে বাড়তি কাজের ছুতো দেখায়। অথবা রাস্তায় যানজট ইত্যাদি।

নীহারিকা রেগে রেগে বলে, দুপুরের 'লাঞ্চ' তো অফিসের ক্যান্টিনে সারিস! রাত্তিরের 'ডিনার'টাও তাহলে এবার থেকে সেখানেই সারিস।

শিলাদিত্য অবলীলায় বলে, তো তোমাদের যদি আমার জন্যে বসে থাকতে খুব বেশী অসুবিধে হয়, তাই হয়তো করতে হবে শেষ পর্যন্ত।

এরপর আর কী বলার থাকে? কেঁদে ফেলা ছাড়া?

নীহারিকার মনের দোসর বলে কেউ নেই।

মেয়েও আজকাল 'একটা কিছু করা দরকার' বলে চাকরীর চেষ্টায় হন্যে হয়ে বেড়াচ্ছে। অথচ ঠিক যে কোন ধরনের কাজের যোগ্যতা আছে তার তা নিজেও বোঝে না। গান একটু শিখছিল বটে, কিন্তু সেটা এমন কিছু নয় যে, খুব বাচ্চা ছেলেমেয়েদেরও একটু তালিম দিতে পারে। নেহাৎ সাদাসিধে বি. এ. পাশ। স্কুলেও কাজ মিলবার আশা নেই। প্রাইমারি স্কুলে চেষ্টা করতে গেলেও বলে, বি. টি-টা করে নিন না আগে। বি. টি-টা পাশ করা ছাড়া কোনো স্কুলের দরজায় মাথা গলানো যাবে না।

তবে কিনা, সেটা হলেই কী এমন পরমার্থ লাভ হয়ে যাবে? হাজার হাজার বি. এ., বি. টি. বেকারের তালিকা বাড়িয়ে চলছে না?

মান-সম্মান খুইয়ে টুসকি এক একদিন ছোড়দাকে পাকড়াও করে জেরা করে, আচ্ছা ছোড়দা, তুই বা একটা সাধারণ গ্র্যাজুয়েট হয়ে অমন মারকাটারি একখানা চাকরী জুটিয়ে ফেললি কি করে?

'মারকাটারি' আবার কে বলতে এলো তোকে?

তোর আচার-আচরণেই মালুম। 'টাই' পরে অফিস যাস। অফিস ক্যান্টিনে খানদানি খাওয়া! মেজাজও তো ক্রমেই খানদানি হয়ে উঠছে।

বেশী বাজে বকিস না। থাপ্পড় খাবি।

তার জন্যে গাল পেতেই আছি। তো আমায় একটা কিছু জুটিয়ে দে না বাবা।

হুঁঃ। বেড়ালের ভাগ্যে একটা শিকে ছিঁড়েছে বলেই, ব্যাটা বেড়ালটা সর্বশক্তিমান হয়ে গেছে না কী? সর্বদাই তো আতঙ্ক, আবার না কোথাও 'দড়ি ছিঁড়ে' বসে। সরকারি চাকরী নয় যে একবার ঢুকে পড়তে পারলে যাবজ্জীবেৎ। সে তুমি তবিল তছরূপের দায়েই পড়ো, আর যে কোনো প্রকার কেলেঙ্কারির ফাঁসেই ফেঁসে যাও। ঠিক জাল কেটে বেরিয়ে আসতে পারবে। বে-সরকারি ব্যাপার! সর্বদাই হারাই হারাই।

টুসকি বলে ওঠে, সে কীরে? কেন? তোদের ইউনিয়ন নেই? যার নাম গড়ফাদার! যে এইসব কর্মজীবীদের রক্ষা করতে হাল ধরেই থাকে।

শিলাদিত্য আর একটু ব্যঙ্গের গলায় বলে, হুঁঃ, খুব কথা শিখেছিস।....থাকিস তো ঘরের মধ্যে বসে, শিখিস কার কাছে?

সর্বদা ঘরের মধ্যে বসে থাকি, এ খবরটি সাপ্লাই করল কে শুনি? নিজে তো ডুমুরের ফুল। কতক্ষণ দেখিস কাকে?....আমি এখন হন্যে হয়ে যে কোনো একটা চাকরী খুঁজে বেড়াচ্ছি তা খবর

রাখিস ?

না, এতোটা রাখি না। তবে এটাই জিজ্ঞাস্য, এতো বেশী দরকারটাই বা কী ? আদিত্য গাঙ্গুলী তো 'দুর্ভাগ্য ভাতা'র অনুদান মিলিয়ে পেনসনটি মন্দ পাচ্ছেন না। নীহারিকা গাঙ্গুলীর নিজস্ব হাতখরচ-টরচের একটি সোর্স তো আছেই চিরটাকাল। তার উপর বৃদ্ধ গাঙ্গুলী তো আবার নতুন করে ইয়াং হয়ে রুজিরোজগারের ধান্ধায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, তো শুনি মন্দ আয় করেন না। তাছাড়া—এই অভাগা শিলাদিত্য গাঙ্গুলীরও সংসারে যৎসামান্য কিছু কনট্রিবিউশন রয়েছে—আর কত চাই ?

টুসকি ঝঙ্কার দিয়ে বলে, ওঃ। 'আর কত চাই !' ওঃ ! বাজারদরের বাড়বৃদ্ধির হিসেব রাখিস না ? তো বলি—শিলাদিত্য গাঙ্গুলীর যৎসামান্য কন্ট্রিবিউশানই বা কেন হে ? তার তো আয়ের সবটাই মায়ের হাতে তুলে দেওয়া উচিত। এখন এই সংসারটার ভার নেওয়াটা তো তোরই কর্তব্য।

তাই না কী ?

শিলাদিত্য তিক্ত ব্যঙ্গের মুখটা কুঁচকে বলে, দুঃখিত। আপনার মতো কর্তব্যজ্ঞান শিলাদিত্য গাঙ্গুলীর নেই ম্যাডাম। আর কর্তব্যজ্ঞানের দায়ে নিজেকে বিকিয়ে দেবার মতো নির্বোধও নয় সে।

টুসকি অবাক চোখে তাকিয়ে বলে, আশ্চর্য ! তুই কী দারুণভাবে বদলে গেছিস ছোড়দা !

ছোড়দা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, তা বদলানোই তো স্বাভাবিক। বদলানোই তো জীবনের ধর্ম। দায়িত্ব-কর্তব্য। যতসব ফসিল কথা। তাই যদি হয়, তো কেন হে মেখলা দেবী, এই ব্যাটা কী চোরদায়ে ধরা পড়েছে ? প্রথম এবং প্রধান দায়িত্বটি আইনত যাঁর সেই মহানুভব ব্যক্তিটি তো দিব্যি একখানি মহান ব্রতের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে দায়িত্ব এড়িয়ে কেটে পড়ে বসে আছেন ! তাঁর বিষয় তো কিছু বলা হয় না ?

টুসকি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, তুই কী আজকাল ড্রিঙ্ক-ফিঙ্ক করতে শুরু করেছিস ছোড়দা ? কথাবার্তার ধরনটা তো ভালো দেখছি না।

ওঃ। বটে ? ড্রিঙ্ক করনেওয়ালাদের ধরনধারণ জানা হয়ে গেছে না কী ?

তোর সঙ্গে আর কথা কইতেও ইচ্ছে হচ্ছে না ছোড়দা। ভাবতে পারছি না, এতো বদলে যেতে পারে মানুষ।

শিলাদিত্য সেই তিক্ত হাসি হেসে বলে, মানুষই তো বদলায়। গরু-গাধা বাঘ-ভাল্লুক এদের বদল ঘটে না। এরা আদি ও অকৃত্রিম। তুই কী ভাবছিস তুই কিছু বদলাসনি ? নিজে বুঝতে পারা যায় না এই যা। বলে শুয়ে পড়ে শিলাদিত্য।

শুচ্ছিস যে ? খাবি না ?

নাঃ। মাকে বলে দিয়েছি। বেডসুইচটা টিপে ঘর অন্ধকার করে দেয়।

টুসকি সেই অন্ধকারটার দিকে তাকিয়ে থাকে কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো। সেই ছোড়দা। সত্যিই কী সবাই এতো বদলায়।

'সবাই' হয়তো নয়। তবে বেশীরভাগই বৈকি। বিশেষ করে এই যুগে। এ যুগ যেন প্রতি মুহূর্তে নিজেকে ভেঙে ভেঙে রূপান্তর ঘটিয়ে চলছে। তাই বড় বেশী বদলে যাচ্ছে পৃথিবী ! আকাশ পাতাল বদল। অবিশ্বাস্যভাবে, অভাবিতভাবে।

তবু ওরই মধ্যে আবার কেউ কেউ আপন চরিত্রে অবিচল থেকে যায়। তারা নির্ভেজাল অপরিবর্তনীয় কোনো ধাতুতে গড়া। বেলেঘাটার মুখুয্যেবাড়ির গৃহিণী সন্ধ্যাতারা যেমন, নিজে ছেলের বৌয়ের শাশুড়ী হয়ে গিয়েও এখনো এপাড়া থেকে ওপাড়া—একদিনের জন্যে বাপের বাড়ি আসতে হলেও বুড়ো শ্বশুরের কাছে গিয়ে আবেদন জানায়, 'বাবা ! আজ একটু নলিন সরকার স্ট্রীটে যাব ? দাদাকে অনেকদিন দেখতে যাওয়া হয়নি।'

গিন্নীবিহীন সংসারে তো বিয়ে হয়ে অবধিই গৃহিণীর পোস্টটা পেয়ে বসে আছে সন্ধ্যাতারা, তবু সেই পোস্টের অধিকারটিই কখনো প্রয়োগ করে না সে। যদিও সেই পোস্টের দায়টা পুইয়ে আসছে চিরকাল। তবু এই তার স্বভাব। চেষ্টাকৃত নয়। স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ। গুরুজনকে সমীহ করতে হয়, এই চিরাচরিত অভ্যাসের বোধ। অথচ সন্ধ্যাতারার সবে বিয়ে হয়ে আসা পুত্রবধূটি? এখনি তো সে—

কিন্তু তার কথা থাক। সন্ধ্যাতারার কথা হচ্ছে তাই হোক।

এই আবেদনের 'না মঞ্জুর' হবার কোনো প্রশ্ন অবশ্য নেই। কারণ সন্ধ্যাতারাও এমন অবুঝ নয় যে, অঙ্কটঙ্ক না কষেই, আবেদনপত্র হাতে এনে দাঁড়াবে। সংসারের স্থির অবস্থা দেখলে তবেই এমন ইচ্ছে প্রকাশ।

অতএব সেই সন্ধ্যায় সন্ধ্যাতারা ওপাড়ায় গিয়ে 'টুনি' হয়ে বসল তার রোগশয্যাশায়ী দাদার পাশে।

আদিত্যর অবশ্য আহ্বানও নেই, বিসর্জনও নেই। যদিও বোনকে দেখে খুশী একটু না হলো তা নয়, তবে তার প্রকাশটা খুবই শান্ত নিরুত্তাপ।

'কীরে টুনি? হঠাৎ এ বাড়ির কথাটা মনে পড়ল যে? তো রাতটা থাকবি তো? সেই বুড়ো ভদ্রলোক আবার 'মা মা' করে হেদোবেন না তো?'

এইটুকুই সম্ভাষণ!

নীহারিকা অবশ্য সৌজন্যের ত্রুটি রাখল না। এবং তার ছেলেটা আর মেয়েটা যে সবসময় বাইরে থাকে, কাজের লোক নেই ইত্যাদি সে সব তাড়াতাড়ি জানিয়ে দিলেন।

কিন্তু সত্যিকার আহ্লাদে বিগলিত হলেন সত্যব্রত। সত্যব্রত আশা করেননি বাড়ি ফিরে তাঁর উদ্বেল হৃদয়ের ভারটি নামানোর জন্যে একটু ঠাঁই পাবেন। দালান পার হতে হতে ভয়ে ভয়ে ছেলের দরজার দিকে তাকাতেই আহ্লাদে বুকটা ভরে গেল। ভয়ে ভয়েই তো তাকান, সেখানে যে এক অদ্ভুত শীতলতা বিরাজ করে।

হ্যাঁ, আজ সত্যব্রত বড় বেশী উদ্বেলিত। মাঝে মাঝে একটু-আধটু উদ্বেলতা বহন করে আনেন না তা নয়, ভাবেন বাড়ি গিয়ে গল্প করবো, কিন্তু বাড়িতে ঔদাসীন্যের হিমশীতল স্পর্শে সেটা জুড়িয়ে যায়। ছেলে-বৌ নাতি-নাতনী কেউই সত্যব্রতর কথা বলার ইচ্ছেটাকে গুরুত্ব দেয় না। হয়তো বলে, 'এই ব্যাপার! তা এতে আর অবাক হবার কী আছে?'

শেষমেশ অবশ্য নয়নতারা।

কিন্তু ওদের কাছেও যে বলতে ইচ্ছে হয়।

আজ টুনিকে দেখে যেন হাতে চাঁদ পেলেন। তাও আবার আদিত্যর ঘরে! এবং আদিত্য যেন বোনের সঙ্গে কিছু কথাই কইছে।

সত্যব্রত আজ অকুণ্ঠিত চিত্তে ছেলের ঘরের মধ্যে ঢুকে এলেন। বলে উঠলেন, টুনি এসেছিস? ভালো ভালো। খুব ভালো। আজ ওখানে যা একখানা দারুণ ঘটনা ঘটেছে রে শুনলে অবাক হয়ে যাবি।

টুনি তাড়াতাড়ি সরে এসে বাবাকে প্রণাম করে বলে ওঠে, উঃ বাবা! তোমায় এই স্যুট-ট্যুট পরে কী ভালো দেখাচ্ছে গো। সেই আগেকার মতন। তাই না দাদা?

দাদার দিক থেকে অবশ্য কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না।

সত্যব্রতর যেন ভয় হয় এই সুন্দর সুখময় মহামুহূর্তটি এক্ষুণি বুঝি উপে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি

বলে ওঠেন, অনেক কিছু আগেকার মতো দেখলে ভালো লাগে, তাই না ? আর যদি অনেক আগেকার কাউকে দেখতে পাওয়া যায় ? কেমন লাগে বল ? আজ এমন একজনের সঙ্গে দেখা হলো রে—একেবারে অভাবিত। আচ্ছা বল তো—নাঃ। তুই আর কী করে মনে করবি, তুই তো চলে এসেছিলি নেহাৎ ছোটবেলায়।.... আদিত্য, আমাদের সেই পাবনার হর্ষ ডাক্তারকে তোর মনে আছে ? হর্ষবাবু ডাক্তার ? আমাদের বাড়ির কাছাকাছিই থাকতেন। রোগা কালো ! তোর তো মনে পড়া উচিত। কত ওষুধ খেয়েছিস তুই তাঁর। রেগে রেগে বলতিস, 'বিচ্ছিরি ওষুধ। তেতো পচা। হর্ষবাবু ডাক্তার নিজে খান না।'

হেসে ওঠেন জোরে।

টুনিও তার সঙ্গে।

নয়নতারা মেয়ের সঙ্গে প্রথম সম্ভাষণটি সেরে সন্ধ্যেপুজোটি সারতে গিয়েছিলেন, হঠাৎ যেন চমকে যান। হাসি ? না আর কিছু ? না না, হাসিই তো। কতদিন এমন গলা খুলে হাসেননি সত্যব্রত। তাও আবার ছেলের ঘরে বসে।

আর পুজোর আসনে বসে থাকা যায় ?

তাড়াতাড়ি প্রণাম সেরে নেমে এলেন।

আর সত্যব্রত তাঁকে দেখেই বলে উঠলেন, এই তো আসল মানুষ এসে গেছেন। আচ্ছা, তোমার হর্ষবাবু ডাক্তারকে মনে আছে ?

নয়নতারা সঙ্গে সঙ্গে গালে হাত দেন, শোনো কথা। হর্ষবাবু ডাক্তারকে মনে থাকবে না ? কেন ? কী হয়েছে তাঁর ?

তাঁর আবার কী হবে ? তাঁর কী আর কিছু হওয়াহয়ির কাল আছে ? তিনি তো নেই। আজ হঠাৎ তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা।.... 'দেখা' মানে আমি অতো খেয়াল করিনি। সেই ছেলেই এগিয়ে এসে ফট করে প্রণাম করে বলে উঠল, 'গাঙ্গুলী কাকা, আমায় চিনতে পারছেন ?'.... সত্যি বলতে আমি প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারিনি। সে নিজেই আবার বলে উঠল, 'আমি হরষিত। আপনাদের হর্ষবাবু ডাক্তারের বড় ছেলে। সেই পাবনার—'

তখন আর চিনতে বাকি থাকে ? বলতে কি পাঁচজনের চোখের সামনেই প্রায় জড়িয়ে ধরি আর কী। আর লজ্জাও করল, 'আমি তোমায় চিনতে পারিনি, আর তুমি আমায়—তুমি আর তখন কতটুকু ছিলে ? অ্যাঁ ?' তা আদিত্যর থেকে ক'বছরের বড়ই হবে। নেহাৎ ছোট ছিল না। অনেক ইতিহাস, অনেক কাহিনী। একদিন আসবে বলেছে। ভয়ে ভয়ে বলছে, 'কাকিমা আছেন তো ? মানে ভালো আছেন তো ? একদিন প্রণাম করে আসবো।' আসলে আমিও একটু ঠাট্টা করে ফেললাম। বললাম, 'কেন হে ? আমায় দেখে কি 'বউ মরা হতভাগা' বলে মনে হচ্ছে ?'

......কোর্টে ক্লার্কের কাজ করে। বাপের মতই রোগা কালো। বলল বটে, 'অনেক কথা বলবার আছে কাকা, বাড়ি গিয়ে বলবো।' তবু ওই বার লাইব্রেরীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একঘণ্টা কথা। অনেকেই আসছে যাচ্ছে, তাকাচ্ছে, আমার সে খেয়ালই নেই।....খুব দুঃখের ইতিহাস, বুঝলে ?

নয়নতারা বলে ওঠেন, ত দেশবিভাগ হওয়ার পর কার আর সুখের ইতিহাস রইছে ? অ্যাঁ ? সবারই তো দুঃখের ইতিহাস। বলে, কতো কতো বেঘোরে মিত্যু ! কতো কতো লাঞ্ছনা অপমান—

সত্যব্রত বলেন, হ্যাঁ, সে সব তো আছেই। সে তো অবর্ণনীয়। তবে এর ব্যাপার আবার অন্য। আপনজনের কাছ থেকে ধাক্কা খাওয়া।.... আমরা তো বাড়ির ছেড়ে চলে এলাম, বাবার সেই মুহুরি রশিদ মণ্ডল দ্যাখাশোনা করবে বলে আশ্বাস দিয়েছিল—

আদিত্য বলে ওঠে, তা আর আশ্বাস দেবে না কেন ? মনে তো জানছে পিছন ফিরলেই কলাটি।

সব তার হয়ে যাবে।

তা অবশ্য ঠিক নয় রে আদিত্য। ব্যাপারটা যে চিরদিনের মতো, একথা তখন কেউ ভাবেনি। সবাই ভেবেছিল, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। ক্রমশই আশা ফুরোতে লাগল। তা ওই রশিদই শেষ পর্যন্ত খুব ভালো ব্যবহার করেছিল। আমাদেরকে নৌকোয় তুলে দেওয়া পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছিল। সে সময় সেই সাহায্যটুকুই ছিল পরম মূল্যবান। তবে আমাদের হর্ষ ডাক্তারের ছেলে হরষিতের আলাদা ব্যাপার। ওরা দুই ভাই, তো হরষিত নাকি বরাবর হাঁপানি রুগী বলে বিয়ে করেনি। ওর ছোট ভাই মনসিজের মস্ত সংসার, ছেলেমেয়ে মিলিয়ে সাত-আটটা। তাছাড়া বৌ, আবার বৌয়ের একটা বিধবা বোন। তো—দেশে একটু গোলমাল বাধতেই ওরা কলকাতায় চলে এসেছিল বৌয়েরই বাপের বাড়ির দিকের কার বাড়িতে।....তারপর জানিস, দাদাকে লিখল, পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ওর মামাশ্বশুরের চেনা এক মুসলমান ভদ্রলোক, ব্যবসা-ট্যাবসা কিছু করেন, তিনি তাঁর বাড়ির সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো হিন্দুর বাড়ি বিনিময় করতে চান, অতএব যদি তাদের বাড়িটা নিয়ে কথা হয়।....তো তাই হলো, এই হরষিতও তো তখন দেখছে, নাঃ, আর থাকা চলছে না ! সবাই একে একে চলে যাচ্ছে। তো বাড়ির দলিল-টলিল কাগজপত্র ভাইকে সব পাঠিয়ে দিল। ডাক্তারের সেই অতো বড় বাড়ি, আমবাগান, দুটো মেছো পুকুর, সবকিছু পেয়ে যাবে পার্ক সার্কাসের ভদ্রলোক। তা তিনি সত্যিই ভদ্রলোক, ভালোভাবেই লেখাপড়া করিয়ে ওসব বদলাবদলি করিয়ে ছিলেন। ওঁর বাড়িও মস্ত। আর খাস কলকাতায়।....তো বেচারা হরষিত জানে, বুদ্ধিমান ভাই যা করছে ঠিকঠাক করছে। কিন্তু ভাইটি যে কত বেশী বুদ্ধিমান তা তখনো টের পায়নি। পাবনা ছেড়ে চলে এসে কলকাতায় পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এসে দাঁড়াতেই ভাই সোজা জানিয়ে দিল, এখানে একসঙ্গে থাকা পোষাবে না। তার শ্বশুরবাড়ির বিস্তর আত্মীয় রয়েছে তার সঙ্গে।

আমার থাকা চলবে না ?

হরষিত অবাক হয়ে বলল, আমার তো সংসার নেই, একটা মানুষ। একখানা ঘরে থাকবো বৈ তো নয়।....না, তাতেও অনেক অসুবিধে। বাড়তি একটা মানুষের হাঁপা সামলাতে পারবে না তার বৌ !.....তখন হরষিত তো রেগে উঠতেই পারে ? বল্ ? রেগে বলল, তো বাড়ির অর্ধেকটা তো আমার। আমি নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নেব। অর্ধেকটা আমায় ছেড়ে দে।....তা শুনলে বিশ্বাস করবি নিজের সহোদর ভাই অনায়াসে দাদার নাকের ওপর দলিল ফেলে দিয়ে দেখাল। দাদার নামগন্ধ নেই সেখানে। পাবনার ডাক্তার হর্ষ সমাদ্দারের বাড়িবাগান ইত্যাদি সব তাঁর ছেলে মনসিজ সমাদ্দারের। কাজেই বিনিময় সূত্রে কলকাতার পার্ক সার্কাসের মনসুর আলির তিনতলা বাড়িটি সম্পূর্ণ তার।

হরষিত নাকি কেঁদে ফেলে বলেছিল, আমি বিশ্বাস করে সব তোকে ভার দিয়েছিলাম। সেই বিশ্বাসের বদলে তুই আমায় এতোখানি ঠকালি ?....তো ভাই নাকি হেসে বলেছিল, 'এ দুনিয়ায় বোকারা চিরকালই ঠকে।' ভাবতে পারিস ?

আদিত্য অবজ্ঞার ভঙ্গীতে বলে, এ আবার ভাবতে না পারার কী আছে ? তুমি ওকালতি করো, জানো না ভাই ভাইকে ঠকায়, ছেলে বাপকে ঠকায়, কাকা জ্যাঠা ভাইপোকে খুন করে সম্পত্তি গ্রাস করে। তোমার পক্ষে অবাক হওয়াটা অ্যাবসার্ড।

সত্যব্রত ব্যথিতভাবে বলেন, তা জানি। শুধু ওইটুকু কেন ? আরো কত কত ভয়ঙ্কর ঘটনার সাক্ষী আমরা, আইন-আদালতের লোকেরা। তবু—কী জানিস, ভাবতে কষ্ট হচ্ছে আমাদের পাবনার লোক। একেবারের চেনাজানা লোক ! হর্ষ ডাক্তারের মতো একজন ভালো লোকের ছেলে ! সে এমন কাজ করল !

বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, বয়স্ক মানুষ ওকালতি করে বুড়ো হয়ে যাওয়া সত্যব্রত গাঙ্গুলীর এইরকম একটা অদ্ভুত ভাবপ্রবণতায় আচ্ছন্ন হয়ে এমন বোকার মতো কথা বলা আশ্চর্য বৈকি!

আদিত্য বলে, বাবা তো কোর্ট থেকে ফিরেই গল্পে জমে গেল দেখছি। চা-টা খাবে না?

তার মানে ওয়ার্নিং বেল।

অতঃপর এ ঘর থেকে সরে পড়ো সবাই।

অবিরত একা একা থাকার ফলে লোকসঙ্গ তার কাছে ভারী লাগে। একসঙ্গে মা-বাবা-বোন এবং অধৈর্যের মূর্তি বৌও। ওরও যে এইরকম বোকাটে উচ্ছ্বাস ভালো লাগছে না তা বোঝা যাচ্ছে।

কোন কালের চেনা একটা পুরনো জনের ছেলের সঙ্গে দেখা হওয়া যে 'একখানা দারুণ ঘটনা' এটা ওদের কাছে হাস্যকর। কিন্তু সত্যব্রত মনে মনে স্মৃতি রোমন্থন করে চলেন, বাবাকে কী শ্রদ্ধা সমীহ করতেন হর্ষ ডাক্তার। তাছাড়া সে আমলে তো আবার 'ব্রাহ্মণ' বলে আলাদা একটা মর্যাদা দেওয়া ছিল। ছেলেবেলা থেকে দেখেছি পাড়ার সব মহিলা এসে কী কী সব ব্রত পুজো উপলক্ষে মাকে, যাকে বলে সম্বর্ধনা সম্মান জানিয়ে যেতেন। তারপর ছেলেমেয়ের বিয়েটিয়ে বা কোনো কারণে 'শ-কাজ' না কিসে মায়ের ডাক পড়তো। লোকে দেবীর মতো ভক্তি দেখাতো। মা তো ছিলেন শুচিবাইয়ের রাজা! সারাক্ষণই ভিজে শাড়ি পরে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু ওইসব বিশেষ দিনে মা যখন চওড়া লালপাড় গরদ শাড়ি পরে সিঁদুরটিপ-ফিপ পরে দাঁড়াতেন, সত্যিই দেবীর মতো দেখাতো। গায়ের রং তো ছিল শঙ্খশুভ্র! শেষ জীবন অবধিই ছিল। সে তো নিশ্চয় তোদের মনে আছে, অ্যাঁ? তবে কিনা সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরটিপ, পায়ে আলতা, আর চওড়া লালপাড় শাড়ি—এসবে যে মহিমা মহিমা ভাব দেখাতো, তেমন তো আর থান-ধুতি মোড়া চেহারায় খোলে না। তা সে যতই রূপটুপ থাক। কী বলিস? নয়?

কাকে বলছেন?

আর কাকে, হঠাৎ পরম ভাগ্যে পেয়ে যাওয়া টুনিকে।

একসঙ্গে এতোগুলো কথা বলছেন সত্যব্রত, এটাই তো এক আশ্চর্য ঘটনা। তায় আবার এ ধরনের ভাবপ্রবণ কথা! টুনির তো মনেই পড়ে না বাবাকে এমন উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলতে কবে কতদিন আগে দেখেছে!

হ্যাঁ, 'ঠাকুমা' নামের সেই 'শঙ্খশুভ্র' মহিলাটিকে মনে পড়ে টুনির, তবে সেটা অনেকটা ভীতিমন্ডিত! বিকৃতমস্তিষ্ক সেই মহিলা তো রাতদিন অকথ্য গালাগালি করতেন, যার প্রধান টার্গেট হচ্ছেন নয়নতারা। নয়নতারার কুমন্ত্রণাতেই যে তাঁর ছেলে মাকে দেশ থেকে নিয়ে এসে একটা খাঁচায় ভরে রেখে অযথা যন্ত্রণা দিচ্ছে, এটাই ছিল তাঁর গালমন্দর প্রতিপাদ্য বিষয়!

হ্যাঁ, এইটুকু স্মৃতিই সেই মহিলা সম্পর্কে।

টুনি দেখছে তার বাবার স্মৃতিতে ধরা আছে একটি 'দেবী দেবী মূর্তি'।

সত্যব্রত অবশ্যই একটু ব্যতিক্রম। নইলে ক'জনের আর এমন মনে থাকে? বুড়োবুড়ি অবস্থাদের সবাই ধরে নেন যেন চিরদিন এই অবস্থাই দেখছে তাদের। তারা অ-শক্ত অক্ষম অপটু বুদ্ধিহীন।

ছেলেরা ভুলে যায় বাবা নামের ওই বাতিকগ্রস্ত বুড়ো লোকটাই একদিন এই পৃথিবীর মাটিতে তাদের মতোই মটমটিয়ে হেঁটে বেড়াতো।. আর হয়তো তার ক্যাপাসিটির জোরেই ছেলেদের এই ঘরবাড়ি সাজানো সংসার! হ্যাঁ, ভুলে যায়। একদম ভুলে যায়। বৌয়ের কর্মদক্ষতায় বিগলিত আর সদা-সন্ত্রস্ত পতিকুল মনে রাখে না আজকের যুগের সংসার চালনার বহুবিধ সুবিধাযন্ত্র, আর দুটো একটা কাজের লোকের সাহায্যের খুঁটিতে ভর করে বৌয়ের এই গুণপনার মহিমা। তাও তো হয়তো

একটি কী দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে ! অথচ মা ? মায়ের আমলে যে সংসার যাত্রা নির্বাহে এতো রকম সুবিধে ছিল না। হয়তো সামান্য একটা বাসনমাজুনি রেখেই চালিয়েছে মা। এবং মানুষ করে তুলেছে সাত-আটটা ছেলেমেয়েকে, কে ভাবতে বসে সে কথা ? মায়ের যৌবনকালের কর্মময়ী হাস্যময়ী উজ্জ্বল মূর্তিটি মনে রাখবার দায় কে বহন করছে ? মা চিরকালই এইরকম ঘ্যানঘেনে রোগগ্রস্ত অক্ষম অপটু বুড়ি। যে নাকি তার অনি কনিষ্ঠ বৌয়ের ওপর নিজের অভিজ্ঞতার বাহাদুরি চাপাতে আসে। বৌ ঠিকমত নিয়মপালার মধ্যে চলছে কিনা তার খবরদারি করতে বসে বৌকে খাপ্পা করে তোলে। মাকে তাই অনায়াসেই বলা যায়, 'যা বোঝো না, তাই নিয়ে কথা বলতে আসো কেন ? সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসো কেন ? যে মানুষটা খেটে মারা যাচ্ছে, অকারণ তাকে ব্যস্ত করে তার মেজাজ খারাপ করে দিতে যাও কেন ?'

বাবা চিরদিনই অবুঝ একবগগা বাতিকগ্রস্ত বুড়ো, আর মা চিরদিনই ন্যাতা-জোবড়া অকর্মা সংসারজ্ঞানহীন বুড়ি। ব্যস।....অন্ততঃ বুড়ো মা-বাপের জীবদ্দশাকালে এর বেশী আর কিছু মনে পড়ে না ছেলেদের।

হয়তো তাঁরা মরে যাবার পর কদাচ কখনো—খুব স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন ছেলে মা বাপের 'জীবনদৃপ্ত' দীপ্ত জীবনের দিনের চেহারাটি মনে রাখে।

আর মা যদি খেটেও থাকে, তো সেটা বোকামির বশে। সেই সব এলোপাথাড়ি খাটুনির কোনো মানে হয় না। কাজেই তার কোনো মূল্যও নেই।

বার্ধক্যগ্রস্তদের ঝুলি ভরে ওঠে এই অভিজ্ঞতায়।

কিন্তু সত্যব্রত তাঁর পাগলী মায়েরও দেবীমূর্তিটি সযত্নে মনের মধ্যে লালন করে এসেছেন তাহলে।

মনে রাখার ক্ষমতাটি বোধহয় সত্যব্রতর একটু বেশীই। সেই স্মৃতির সমুদ্রটি কোথায় যেন থিতিয়ে ছিল, হঠাৎ সামান্য একটা বাতাসের ধাক্কায় উত্তাল হয়ে উঠছে সে সমুদ্র।

ভাগ্যিস 'টুনি' আজ তার শ্বশুরের কাছে আবেদন জানিয়েছিল, 'আজ একবার নলিন সরকার স্ট্রীটে যাবো বাবা ?'

টুনি আজ তার আসল বাবার কাছে এসে পড়ে, বাবার এই নতুন রূপটি দেখে হাঁ করে তাকিয়ে দেখে। সেই তার চিরদিনের মিতভাষী বাবা। একসঙ্গে এতো কথা বলছেন।

ঘরের মধ্যে পায়চারি করছেন আর বলে চলেছেন, এখন সব ঘটা করে 'সংহতি' আর 'সম্প্রীতি'র বুলি কপচাচ্ছে। যেন ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারপর খুঁটি সামলাতে আসা। লক্ষ্মীর ঘটটি আগলাতে আসা ! দেশভাগের সর্বনেশে আগুন জ্বালিয়ে অখণ্ড ভারতটাকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়ে, বলে কিনা, আগে নাকি জাতপাতের বাড়াবাড়ি ছিল, তাতেই ভেতরে ভেতরে ভাঙন ধরেছে। আমি ওকথা মানি না। এখন জাতপাতের বিচার উঠে গেছে। কোথায় গেছে ? এখন আর 'জল চল অচল' শব্দটা নেই, এই তো ? দরকারে পড়ে যে কোনো জনের হাতে ভাত খাচ্ছো, এই তো ? বলি তাদেরকে তোমরা সমশ্রেণী ভাবতে পাচ্ছো ? 'আপনজন' ভাবতে পারছো ? আমরা সকলের হাতের ভাত জল খেতাম না ! ঠিক কথা ! খুব খারাপ ব্যবস্থাই। তবু ভালো করে ভেবে দেখলে, তার সঙ্গে 'হাইজিনের' একটা সম্পর্কও ছিল। সকল শ্রেণীর পরিচ্ছন্নতাবোধ সমান নয়। তবু—যাদের হাতে খাওয়া নিষেধ ছিল, তাদের 'আপনজন' ভাবতে কোনো অসুবিধে ছিল না আমাদের। আবদুল চাচা, বাহার চাচা, সইদা ফুফু বেগমদাদি, এদেরকে আমরা একান্ত আপনজন বলেই মনে করতাম। তাঁদের সঙ্গে খাওয়া-মাখা ছিল না বলে ভালোবাসায় কোনো ঘাটতি ছিল না। তোমার মনে আছে টুনির মা, আবদুল চাচাকে আমরা কী মান্যভক্তি করতাম ? বাবাও 'আবদুল ভাই' ভিন্ন কথা বলতেন না। কিন্তু ওই, অভ্যাসগত নিয়মে একটু ছুঁই ছুঁই ভাব ছিল। সেটা নেহাৎই অভ্যাসমতই। বহিরঙ্গে।

তো তাঁরাই কি তার জন্যে কিছু অসম্মানবোধ করতেন ? মোটেই না। এঁদেরও তো এটা মজ্জাগতভাবে জানা ! মুহুরি চাচা, একতলায় বাইরের বারান্দায় একটা নির্দিষ্ট চেয়ার থাকতো তাঁর জন্যে, এসে বসতেন। বাড়ির মধ্যে থেকে তাঁর জন্যে মিষ্টি আসতো, মুড়ি আসতো, গেলাস ভর্তি সদ্য জ্বাল দেওয়া গরম দুধ আসতো। তিনি সে সবের সদ্ব্যবহার করে বলতেন, 'আঃ। প্রাণডা য্যান জুড়াই গ্যালো। দাদার থনে আইলে সক্কলকার প্রাণ জুড়ায়। তো এই বাসনগুলান কোথায় থুইয়া যামু ?' বাবা বলতেন, থাক থাক! ও নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। ওখানেই দেয়ালধারে থাক।.....আবার আবদুল চাচা ? তিনি খুব রসিক মানুষ ছিলেন। মান্যগণ্য বিদ্বান মানুষ। বাবার সঙ্গে কেজো কথা কইতেই আসতেন, তবু মাঝে মাঝেই গানের সুর ভাঁজতেন, দুই এক কলি গানও গাইতেন। মাকে বলতেন 'বৌঠান'। তো হেসে হেসে বলতেন, 'বৌঠানরে কখনো চক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হলোনা, শব্দভেদী বাণের মতন ছানাচিনির সুবাদে চেনা।.....'

ছানাচিনি ! মানে ? টুনি অবাক হয়।

ওই তো ! ওইভাবেই মজা করে কথা বলতেন। আসলে তাঁর খুব প্রিয় খাদ্য ছিল, বাড়ির গরুর দুধের সদ্য সদ্য ঘরে কাটানো গরম ছানা আর চিনি। জানা ছিল বলেই তিনি এলেই তাঁর জন্যে ওই ব্যবস্থা। যদিও করতেন আমার পিসিই। মায়ের তো সর্বদাই সময় অভাব। তবে নির্দেশটি দিতেন মা-ই। তো শুনে হাসবি, ঘরের গরুর খাঁটি দুধের পুরো একটি সেরের ছানা বানিয়ে আবদুল চাচার জন্যে চলে আসতো ভেতর থেকে। আসতো ভারী আর মস্তবড় একটা রুপোর বাটিতে। তার সঙ্গে রুপোর চামচ। জল দেওয়া হতো রুপোর গেলাসে।....

....আবদুল চাচা পরিতোষ করে সেই ছানার তালটি ফিনিস করে, জলটি খেয়ে গেলাস নামিয়ে রেখে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে বলতেন, বৌঠান আমাদের ভারী সেয়ানা মেয়ে। কী বলেন দাদা ? সোনারুপায় তো ছুঁত লাগে না, তাই রুপোর বাটিতে ছানাচিনি, রুপোর গ্লাসে পানি ! মেহ্‌মানের মান্যটাও করা হইল, আবার গিরস্থর বাসনের জাতিটাও বজায় রইল।

বাবার সঙ্গে খুব কাছাকাছি বয়সের সহকর্মী বন্ধু। বাবা বলতেন, তুমি এতো ফাজিল আবদুল। তো শব্দভেদী বাণ তো তুমিই ছুঁড়ে যাও, কই সাড়া পাও কখনো ?

'আরে বলেন কী দাদা ? এই একতাল ছানাচিনি ? বাণের বদলে কামানের গোলার তুল্য ছুটে আসে।'.....তারপর সে কী হা হা হাসি। তেমন হাসিই আর জীবনে শুনতে পাই না। আকাশভেদ করা হাসি।....

রাত্রে টুনি মায়ের কোল ঘেঁষে শোয়।

বিছানা দেখে টুসকি খুব হেসে গেছে, পিসিকে 'খুকুমণি' বলে। শিলাদিত্যও অপেক্ষাকৃত সহজভাবে পিসির সঙ্গে কথা বলেছে। বাড়িতে আজকাল যেটা দেখা যাচ্ছে না আর। সেই সর্বদা কৌতুক করে কথা বলার অভ্যাসটাই যেন বদলে গেছে তার। আজ একটু পুরনো অভ্যাসে কথা বলল !

তা এতেও তো অপমান অভিমান আসে নীহারিকার। অন্যের কাছে তোমরা সবাই ভালো, আর আমার কাছেই কাঠ কাঠ ! কেন ? আমায় এমন হ্যানস্থা কেন ?

হয়তো নীহারিকা মনস্তত্ত্বের অতি গভীরে ডুবতে জানে না বলেই এই 'কেন'র উত্তর খুঁজে পায় না। ছেলেমেয়েরা শৈশবে তেমন বুঝতে না পারলেও একটু বড় হলেই মায়ের 'প্রেমিকা' মূর্তিটি একদম দুচক্ষের বিষ দেখে।

তা নীলুর মধ্যে মাত্র একটু ক্ষ্যামা ঘেন্না করুণা আর সহৃদয় মমতার ভাব থাকলেও নীহারিকার মধ্যেকার ভাবটি তো প্রেমিকারই। ছেলেমেয়ের চোখে যেদিন থেকে ধরা পড়েছে, নীলুমামা এসে

দাঁড়ালেই মায়ের চোখেমুখে আলো জ্বলে ওঠে, সেদিন থেকেই বিরূপতার সঞ্চার। দুটো মানুষেরর প্রতিই!

এমন হয়। বৈধ অবৈধতার প্রশ্ন তো দূরের কথা, অনেক ছেলেমেয়ের বাবার সম্পর্কে মায়ের বিগলিত ভাব দেখলেও বিদ্বেষ ভাব আসে। টুসকির ছেলেবেলায় তার ক্লাসের একটা মেয়ে বলেছিল, তোর বাবা যখন অফিস থেকে ফেরে তোর মা কী করে রে?

টুসকি অবাক হয়ে বলেছিল, কী আবার করবে? চা-টা তৈরী করতে লাগে।

আর আহ্লাদে গদগদ হয়ে গলে পড়ে না?

এ মা? সে আবার কী?

আমার মা এইরকম। দেখলে মাথায় রাগ উঠে যায়। একে তো বাবা ফেরবার একঘণ্টা আগে থেকে হাঁ করে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, আমি ডাকাডাকি করলেও আসবে না, তার ওপর আবার যেই না বাবাকে আসতে দেখবে, ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলে ধরবে। যেন এক মিনিট কড়া নাড়লে ক্ষয়ে যাবে বাবা। বাবাও তেমনি, আমার কথা কানেই নেবে না। আজেবাজে করে উত্তর দেবে, আর মার কথা হাঁ করে শুনবে। তখন দুজনের কী আহ্লাদ। মুখে যেন আলো জ্বলে!

কত বয়েস তখন টুসকির ? বড়জোর বছর সাত-আট। সেই মেয়েটাও তাই। সে অবশ্য তার প্রথম সন্তান, একটাই সন্তান। টুসকির ওপরে দুই দাদা। কারো মুখে আলো জ্বলার দৃশ্য অনুধাবন করতে টুসকির একটু সময় লেগেছিল। এবং করে পর্যন্তই বিদ্বিষ্ট হতে শুরু করেছিল।

আসলে সন্তান তার মাকে শুধু মাতৃমূর্তিতেই দেখতে চায়। ব্যতিক্রম ঘটলেই বিরক্তি আসে তার। তবে টুনির মতো মেয়েদের কথা আলাদা। সে তার মা-বাবাতে চিরবিগলিত। নিতান্ত ছেলেবেলায় বলতো, আমার বাবার মতন সোন্দর পৃথিবীতে নেই। বাবা সাহেবদের থেকেও সোন্দর। আজ এই বুড়ো বয়েসেও মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে বলে, বাবাকে দেখে আজ এতো ভাল লাগল মা। কতদিন বাবাকে এমন প্রাণ খুলে কথা বলতে শুনিনি।

মা হেসে বলল, কানের দুয়োর বন্ধ হয়ে গিয়ে প্রাণের দুয়োরেও পাত্তর চাপা পড়েছিল।....

তারপর একটু করুণ হাসি হেসে বলে, পাবনার মানুষকে দেখে আজ একেবারে ভেতরটা উথলে উঠেছে রে। অখনো সবখান প্রাণ সেই পাবনায়।

নিজেও খানিকক্ষণ সেই পাবনারই স্মৃতিচারণ করে হঠাৎ বলে ওঠেন, ত পুরনো কথা থাক। নতুন কথা হোক। তোর ছেলেটা তো দুম করে নিজে নিজে একখান বে করে বসে, খুব খেল দ্যাখাল। ত, বৌ কেমন হলো তাই ক।

টুনি একটু চুপ করে থেকে বলে, কেমন আর? এখনকার মতোই। আমাদের কালের মতো কী আর হবে?

নয়নতারা একটু হাসেন, তুই তো চিরদিনের চাপাধাতের! খুলে কী আর বলবি? ত যাক, ভালো সংসারে পড়েছে, শিক্ষেদীক্ষে হয়ে যাবে!

অন্ধকার ঘর। কেউ কারো মুখের চেহারা দেখতে পায় না। তবে এখন চাপা মেয়ে টুনির একটু হাসি শোনা যায়। চাপা হাসিই। সেই হাসির সঙ্গে খাদে নামানো গলায় বলে, হলেই ভালো। ঠাকুরের কাছে সর্বদা সেই প্রার্থনা। তবে একটা আগুনের ফুলকি ছিটকে এসে পড়ে একটা পাড়া ভস্মীভূত করে ফেলতে পারে মা! হঠাৎ যেটা ছিটকে এসে পড়েছে, সেটা ঢিল না আগুনের ফুলকি, সেটাই বুঝতে চেষ্টা করছি।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকেন নয়নতারা।

তারপর আস্তে মেয়ের গায়ে একটি হাত রেখে বলেন, তরে আমি চিরটাকাল বোকাসোকা

ভালোমানুষ ভেবে আসি টুনি। তর মদ্যে যে এতো চিন্তার খ্যালা হয় তা কখনো ভাবি না।

টুনি আস্তে বললে, আমিও জানতাম না মা। এখন ভাবতে ভাবতে কত রকম কথা মাথায় এসে যায়।....তবে বড় ভাবনা হয় মা, বড় ভাবনা হয়। এতোদিনের সুখের সংসারটা—একটা বৌ হতে—

থেমে যায়।

তারপর গলার স্বর ফিরে পেয়ে বলে, তোমার কাছেই বলছি, আর কারো কাছে তো বলার নয়, আমায় মান্য করুক না করুক ক্ষতি নেই, কিন্তু খুড়শাশুড়ীদের যে ডোণ্টো কেয়ার করে, এতেই তো বুক কাঁপে। তাছাড়া—তোমার জামাইকেও—

আবার থামে। যেন চিরদিনের চাপা স্বভাবের দরজাটা খুলে পড়তে পড়তেও, আটকে যেতে চাইছে। তবু রাত্রির অন্ধকারে, জগতের একান্ত আপনজনের কাছে বুঝি সেটা শেষ পর্যন্ত খুলেই পড়ে। নতুন বৌয়ের বেপরোয়া ব্যবহার, লজ্জাহীনতা সংসারের অন্য সদস্যদের গ্রাহ্যের মধ্যে না আনা এবং গৃহকর্তাকে অনায়াসে বুড়ো ভদ্দরলোক বলে উল্লেখ করা। বলে, উনিই নাতির দোষ ঢেকে মেনে নিয়ে বলেছিলেন, 'মুখ্যু ছোঁড়াটা দুম করে 'লেখাপড়া'র বিয়ে করতে বসল কেন ? আমায় জানালে আমিই যথারীতি ব্যবস্থা করতাম। আজকাল তো এমন বামুন শুদ্দুরের বিয়ে কতই হচ্ছে।'.....শেষ পর্যন্ত ঘটা করে বৌভাতও দিলেন দেখলে ? ঠিক তখনি দাদার বাড়াবাড়ি অসুখ। তোমাদের তো যাওয়াই হলো না।....তো আমার শ্বশুরমশাই তো নাতবৌ বলে খুব কাছে টানতে চান, কেমন যেন ছিটকে চলে আসে। দিব্যি অন্যদের শুনিয়ে বলে, বাবাঃ। খুব বেঁচে গেছি। পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছি ! যা বকবকানি শুরু হয়েছিল। বুড়োদের এই এক রোগ। কেবল পুরনো কথার পাঁচালি গাইবে।.....আবার বলে, বাবাঃ। কে জানতো এতোবড় একখানা রাবণের গুষ্টিতে এসে পড়তে হবে। প্রাণ হাঁপিয়ে আসে।

নয়নতারা এখন একটু কঠিন গলায় বলেন, তর ছেলে কিছু কয় না ? বৌরে সুশিক্ষা দেয় না।

ছেলে ?

সন্ধ্যাতারা একটু ক্ষুব্ধ হাসি হেসে বলে, সে বলবে ? সে তো সর্বদা ভয়ে কাঁটা।

ভয়ে কাঁটা ? কিসের এতো ভয় ? অ্যাঁ ?

ওই তো কে বলে। ভয়ে যেন চোর হয়ে থাকে। বাড়িতেও—খুড়িদের কাছে বোনেদের কাছে মুখ তুলতে পারে না, আবার বৌয়ের ভয়েও তটস্থ।....বৌ যখন ইচ্ছে সেজেগুজে বেরিয়ে যায়। 'কোথায় যাচ্ছো' বললে রেগে আগুন হয়। বলে, 'চোরদায়ের আসামী নাকি যে উঠতে বসতে জবাবদিহি করতে হবে ?'

নয়নতারা এখন হতভম্ব হয়ে বলেন, কী কইছিস টুনি ? তর ব্যাটাটা কোথা থেকে এই অবতারকে ঘরে নিয়ে এলো।

টুনি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, তার নিয়তিই গছিয়ে দিয়েছে। ছেলেটার অবস্থা দেখলেও দুঃখু হয় মা।

নয়নতারাও একটা পরিতাপের নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আমারও এমন কপাল হলো। সেই অবধি আদিত্য বিছানায়। বাপ্পাটারও খোঁজ নাই। তারক পালাল। সাহস করে যে একদিন নাতি-নাতিবৌ রে ডাকবো, তা হচ্ছে না। বৌমার সামনে বলতেই ভয় লাগে। নচেৎ একদিন কাছে এনে দেখতাম, কেমন তার মতিবুদ্ধি। বুঝ দিলে বুঝ মানে কিনা !

টুনি একটু হাসে, এরা তোমাদের হিসেবের খাতায় ধরে না মা। বুঝ মানাবে তুমি ? হুঁঃ। ওসব কিছু ভাবি না। শুধু ঠাকুরকে ডাকি যদি মতিবুদ্ধি ভালো করে দ্যান।

নয়নতারা বলেন, ত আমাদের ঠাকুরই ভরসা। নিজে হাতে তো করণের কিছু নাই। ত এই ভাবি, ঠাকুর ক্যান মানুষের মুতিবুদ্ধি ভালো করে দ্যান না? এই যে বিশ্বরাজ্য জুড়ে মারামারি হানাহানি, এই যে আস্ত দেশখান কেটে দুখান করা, এসবই তো মানুষের দুর্মতির ফল। তবে? সকলে সকলকে এট্টু ভালোবাসল, এট্টু সয়ে-বয়ে নিল, তালেই তো চুকে গ্যালো ল্যাঠা। তাই না? ক' টুনি? আগে মানুষ অ্যাতো ছিলেছিঁড়া ধুনকের মতো ছিল না। তোদের ছেলেকালেও ত দেখছস—

এই সময় হঠাৎ পাশের ঘর থেকে সত্যব্রতর গম্ভীর অথচ স্নেহকোমল কণ্ঠের স্বর ভেসে আসে, অ টুনি। মায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে যে রাত কাবার করে আনলি। এবার ঘুমিয়ে পড়।

অন্ধকারেই জিভ কেটে চুপ করে যায় দুটি প্রাণী। ইস। তাদের কথার শব্দে সত্যব্রতর ঘুম আসছে না! ছি ছি।

আসলে যে আজ সত্যব্রতর নিজেরই ঠাণ্ডা মাথায় ঘুমিয়ে পড়ার প্রশ্ন নেই তা এরা জানবে কী করে? সত্যব্রত ভেবে চলেছেন, হর্ষ ডাক্তারের বড় ছেলে ওই হরষিত সমাদ্দার বলেছে একদিন আসবে। তার অপেক্ষায় না থেকে নিজে থেকেই একদিন যদি বাড়িতে ডাকি?

কিন্তু নিজের মধ্যে তো সে জোর নেই। বাড়িতে ডাকলে, যে মানুষটাকে যত্নআত্তির ভার নিতে হবে, সে যে একান্তই প্রতিকূল মনোভাব দেখাবে, তাতে তো সন্দেহমাত্র নেই।

আদিত্য হয়তো বলে বসবে, ভারী তো এক কোর্টের কেরানী! কবে তার বাপের সঙ্গে চেনা ছিল বলে তাকে নিয়ে এতো মাতামাতি কিসের? আর তার বৌ?

সেইদিনই হয়তো তার দারুণ মাথা ধরবে?

সংসারের কূট কচালের মধ্যে না থাকলেও সাধারণ অভিজ্ঞতায় এসব জানা সত্যব্রতর। ইস! তারক কাজল দু-দুটো কাজের লোক হাওয়া হয়ে গেল। বর্তমান অর্থসঙ্কটের কালে হয়তো এটা শাপে বর। দু-দুটো মানুষকে পোষা। তবু থাকলে ঠিকই কুলিয়ে যেতো, এটাও ঠিক। তাই হয়। ওরা থাকলে তবু সত্যব্রত একটু পৃষ্ঠবল পেতেন। সে সুখ গেছে। এখন সব বিষয়ে আদিত্যর বৌয়ের মুখাপেক্ষী! বাইরের কোনো লোক এলে সাহস করে তার জন্যে এক কাপ চায়ের আবেদন করতেও ভরসা পান না। সত্যব্রত। মনের মধ্যে ইচ্ছের কাঁটাটা বিঁধতে থাকলেও, তার সামনে খুব অন্যমনস্কের ভাবে থাকতে হয়, যেন বাড়িতে অতিথি এলে তার আপ্যায়ন করতে হয় এটা সত্যব্রতর মাথায় নেই। পাবনার গাঙ্গুলী বাড়ির সত্যব্রত গাঙ্গুলী। যাঁদের বাড়িতে পথচলতি লোকও বাড়ির সামনে একটু দাঁড়ালে তাকে ডেকে 'জলপানি' দেওয়া হতো।

কী সেই জলপানি?

তা 'রাজার জন্যে রানী, কানার জন্যে কানি'। নেহাৎ অচেনা অভাগাদের জন্যে বস্তা বস্তা মুড়ি তো মজুত থাকেই, তার সঙ্গে ভেলিগুড়, তালপাটালি, নারকেল নাড়ু। আর তেমন অতিথি হলে? দুধের সাগর তো মজুত থাকেই। গোয়ালে গোয়ালভর্তি দুধেলা গাই! এক গেলাস গরম দুধ ও দুটো বাতাসা বরাদ্দ তাদের জন্যে! কে কেমন লোক, কাকে কী দিতে হবে, সেসব ছিল পিসির নখদর্পণে। আর কাকিমারা ছিলেন তার খিদমদগার।

সত্যব্রতর প্রায় আধপাগলী মাকে কেউ কাজের ক্ষেত্রে হিসেবের তালিকায় ধরতো না। কিন্তু তাঁর প্রাপ্য মর্যাদাটুকু পুরোমাত্রায় দেওয়া হতো তাঁকে। পিসি সকল কাজে একবার জিগ্যেস না করে ছাড়তেন না, 'অ বড়বৌ! এখন কও তো কারে কী দেওয়া হবে? কার ঘরে নিমন্তন্ন যাবে?' এমনি সব প্রশ্ন।

তিনি অবশ্য ঝেড়ে জবাব দিতেন, 'শোনো কথা? তোমার চে আমি বেশী বুঝি ঠাকুরঝি?'

সৌজন্য আর সম্মান রক্ষার দায় আর এ যুগ বহন করতে রাজী হয় না।

হর্ষ ডাক্তারের ছেলে এলে তাকে যে পরিমাণ আদর-আপ্যায়ন করা উচিত, তার সিকিও কী পেরে উঠবেন সত্যব্রত? পুরুষ জাতটা সংসারক্ষেত্রের এই জটিলতার কাছে বড় অসহায়।

কিন্তু নয়নতারা?

তিনি কী এতোই অক্ষম? তিনি পারবেন না হালটা ধরতে? না, তেমন কিছু অক্ষম তিনি নন, এখনো দশ বিশটা লোককে রান্না করে খাইয়ে দিতে পারেন। কিন্তু—তাঁকে নৌকোর হালটা হাতে দিতে রাজী হচ্ছে কে? নৌকোর বর্তমান মালিক? নাঃ। রান্নাঘরের ধারেকাছে শাশুড়ীকে আসতে দেয় না নীহারিকা।

যদি নয়নতারা সসঙ্কোচে বলেন, একা খেটে সারা হচ্ছো বৌমা, আমারে কিছু কাজ দাও না? যেমন পারি করি।

বৌমা অজান্তেই বলেন, আপনাকে আবার কী ভার দেবো? এক হেঁশেলে দুজনা! এতে আমার সুবিধের থেকে অসুবিধেই বেশী।

তবে?

কে আর তার অসুবিধে ঘটাতে যাবে?

কিন্তু চিন্তায় ফেলেছে পাবনার হর্ষ ডাক্তারের ভাগ্যবিড়ম্বিত বড় ছেলেটা। হর্ষিত সমাদ্দার।

দোকান থেকে কিনে আনা দৈ-মিষ্টি ইত্যাদি দিয়ে যতোটা যা হতে পারে, অথবা কতটা কী হতে পারে ভাবতে ভাবতে নিজেই রাত কাবার করে আনেন।

পাবনার হর্ষ ডাক্তারের ছেলে। সত্যব্রতর কলকাতার বাড়িতে আসবে। ভাবা যাচ্ছে না।

॥ সতেরো ॥

পুরুলিয়া জেলার একটি গ্রাম। নাম 'আরসা'। আপাত অর্থহীন অসংখ্য নামের মধ্যে একটি নাম। তবে নেহাৎ গণ্ডগ্রাম নয়, গ্রামের নামে থানা আছে, ডাকঘর আছে, এবং একটি হাইস্কুল ও একটি প্রাইমারি স্কুলও আছে। অর্থাৎ সরকারি খাতা-কলমে আছে এসব। এমনকি একটা সরকারি হাসপাতালও নাকি আছে।

তবে কতটা কী কার্যকরী আছে, সেটা অনুমানসাপেক্ষ।

স্কুল আছে বলেই যে নিয়মিত পঠনপাঠনও আছে, এমন মনে করার হেতু নেই। কারণ স্কুলের মাস্টারমশাইদের ক্লাস নিতে আসার থেকে অনেক সব জরুরি কাজ থাকে। আর হাসপাতালে ডাক্তার নার্স বা ওষুধপত্র থাকাটা যে আবশ্যিক, এটা কর্তৃপক্ষের খেয়ালে না থাকায়, নেহাৎই চালাঘরতুল্য সেই হাসপাতালটিতে রোগী ছাড়া এ, ও, সে কিছু লোকজন আছে। 'চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী' এই গালভরা বিশেষণটির অধিকারী নকুল জমাদার তার স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, মুরগী, ছাগল, শুয়োর ইত্যাদি নিয়ে সুখে ঘরসংসার করছে।

এই 'আরসা' গ্রামেরই একপ্রান্তে সরকারি উদ্যোগের কর্মসূচির অন্তর্গত একটি উদ্যোগে সদ্য পাশ করে বেরোনো ডাক্তারদের একটি সেবাশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে।

খাতায়-কলমে 'বাধ্যতামূলক' না হলেও ওই সদ্য পাশ করে বেরোনো জনা কয়েক ডাক্তারকে আসতেই হয়েছে। সরকারি 'কর্মসূচির' রূপায়ণের একটি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত দৃশ্যও তো থাকা দরকার।

এঁদের শিবিরের একটি ভবিষ্যযুক্ত নামকরণও হয়েছে 'পরিষেবা'! সেই নামটি কঞ্চির ফ্রেমে বাঁধা দরমার টুকরোর ওপর কাগজ মেরে লিখে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে স্কুলবাড়ির গেটে। কারণ ওই স্কুলবাড়িতে স্থাপিত হয়েছে এই শিবির।

যদিও স্কুল সারা বছরই প্রায় ফাঁকা ফাঁকাই থাকে। তবে আপাততঃ এখন গ্রীষ্মের বন্ধের দরুন আইনসঙ্গতই ফাঁকা। ডাক্তার এবং তাঁদের অনুষঙ্গে আসা জনা আষ্টেকের এই দলটির স্কুল বাড়ির মধ্যে হেসে খেলেই জায়গা হবার কথা। কারণ স্থানীয় এক কৃতী ব্যক্তির মায়ের নামে উৎসর্গীকৃত এই 'ভবতারিণী স্মৃতি বিদ্যালয়'টির আয়তন মোটামুটি ভালোই। এবং পারিপার্শ্বিক অন্য অনেক কিছুর মতো দীনহীন চেহারার নয়।

কিন্তু ওই দলটি এসে পৌঁছনোর পরই স্থান থাকতেও স্থান সংকুলানের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। কারণ 'রিসেপশন কমিটি' ওনাদের ট্রেন থেকে নামানোর সময়ই সভয়ে লক্ষ্য করেছিলেন, এই সদ্যপাশ করা বেরোনো তরুণ ডাক্তারদের মধ্যে একটি তরুণীও বিদ্যমান।

ব্যাপারতো তাহলে গুরুচরণ !

ওই গণ্ডা দুই ছোঁড়ার সঙ্গে (মনে মনে কী না বলা যায় ?) একটা সুন্দরী তরুণী !

ডাক্তার মিস মুখার্জি অবশ্য তাঁর হালকা তনুখানির মতোই একটু হালকা হাসির হাওয়া ছড়িয়ে, 'না না। তাতে আমার কিছু অসুবিধে হবে না' বলে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু অভ্যর্থনা সমিতির একটা দায়িত্ববোধ নেই ? আর এই 'আরসা' গ্রামে 'সমাজরক্ষক সম্প্রদায়ের' ধুলো-গুঁড়োও কি কিছু অবশিষ্ট নেই ?

অতএব স্কুলের হেডমাস্টারমশাই গোপীমোহন পাড়ুই প্রস্তাব দিলেন, ওনার থাকার ব্যবস্থা আমার বাড়িতে হবে।

শুনে মিস মুখার্জি যে খুব একটা পুলকিত হলেন, তা অবশ্যই নয়। তিনি 'ব্যর্থ' হবে বুঝেও আর একবার চেষ্টা চালালেন, মিছিমিছি আবার আপনার বাড়ির সকলকে বিব্রত করা। সত্যিই আমার এখানে কোনো অসুবিধে হবে না। এরা সকলেই তো আমার পরিচিত।

কিন্তু সে-কথা কখনো টেঁকে ?

গোপীমোহন সবেগে মাথা নেড়ে বলেন, আমার বাড়ির লোকের অসুবিধের প্রশ্ন ওঠেই না। আপনাকে সেবা করতে পেয়ে সবাই ধন্য হয়ে যাবে।

যদিও উচ্চারণে জেলাসুলভ কিছু 'টান' আছে, তবে গোপীমোহনের ভাষাভঙ্গী পরিষ্কার।

মিস মুখার্জি মনে মনে ভাবলেন, আপানাদের অসুবিধে না হলেও, আমার নিজের তো বিলক্ষণ অসুবিধে বোধ হচ্ছে। এভাবে দলছুট হয়ে থাকায় একত্রে আসার যে আনন্দময় পরিবেশটুকু পাওয়া যাবার কথা, সেটি তো ঘুচল !

এমনিতে—এই 'পরিষেবা'র দলে নাম লিখতে প্রায় বাধ্য হওয়ায় মনে মনে সকলেই বেজার। কারণ স্থানটা পুরুলিয়া জেলা, আর কালটা গ্রীষ্মকাল।

গরমকালে পুরুলিয়ার জলকষ্ট তো সর্বজনবিদিত। নাকি মাটি ফেটে চৌচির হয়ে যায়। খাল-বিল, ডোবা-পুকুর, পাতকুয়া সবকিছুই তো জলশূন্য হয়ে ওঠে, এমন কী সরকারি অনুদানে নির্মিত গভীর নলকূপগুলিতেও আর সহজে জল উঠতে চায় না।

অবশ্য নলকূপগুলি যথার্থই 'গভীর' কিনা সে বিষয়ে স্থানীয় বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের গভীর সন্দেহ আছে। অবশ্যই অথবা নিশ্চয়ই গ্রামোন্নয়নের কর্মকাণ্ডের বিধি অনুযায়ীই হয়েছে এসব। সে বিধিতে 'গভীর' হবার কথা নয়।

যাক ওসব কুটকচালে কথা !

গরমকালে পুরুলিয়ার মতো জায়গায় নেহাৎই ব্যাগার খাটতে আসতে বাধ্য হওয়া উৎসাহজনক না হবারই কথা। তবু একটা 'বন্ধুদল' এ বয়েসে আহ্লাদের। মিস মুখার্জির ক্ষেত্রে তাতেও বাদ সাধলেন পাড়ুইমশাই।

পাড়ুইমশাইয়ের বাড়ির একটা বাগাল যখন মিস মুখার্জির ব্যাগ বেডিং মাথায় চাপিয়ে বিকশিত দন্তে বলে উঠল, 'চলেন দিদিমণি ! টুক্‌খানি পথ মাত্তর !'

তখন তোটক বোস গলা নামিয়ে হাসি চেপে বলল, যান মিস মুখার্জি, 'জ্যাঠামশায়ে'র হেফাজতে নিরাপদ গোয়ালে গিয়ে আশ্রয় নিন গে !

বিভাস রায় বলল, যা বলেছিস। এখানে নখী দন্তী শৃঙ্গীদের মধ্যে ফেলে রেখে যাওয়া ? উঃ। সর্বনাশ ! সত্যি ! এই গার্জেন টাইপের লোকগুলো দেখি সর্বত্রই বিরাজিত। দেখুন গে ওনার গিন্নীটি আবার কী টাইপের !

বাগাল বা রাখাল ছোকরা চলতে চলতে পিছু ফিরে দাঁড়ায়।

অগত্যাই মিস মুখার্জিকে চলতে শুরু করতে হয়।

বেলা বেশ চড়ে উঠেছে। শৌখিন ফোল্ডিং ছাতার কর্ম নয় এই তাত থেকে রক্ষা করতে ! পথটা 'টুক্‌মাত্তর' এই যা ভরসা ! ছেলেটা অবশ্য মহানন্দেই মাথায় বোঝা চাপিয়ে চলেছে। এই 'সোন্দর দিদমণি'টা যে দলবিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের সম্পত্তি হয়ে গেল, এতে ছোকরা রীতিমত খুশি।

ম্যাস্টোরবাবুর বাড়িতেই তো তার স্থিতি।

তোটক এবং বিভাস গোপীমোহনের গিন্নী সম্পর্কে যে সন্দেহবাণী ব্যক্ত করেছিল, সেটা অমূলক। ভদ্রলোক অকৃতদার। যৌবনকালে নানা রাজনৈতিক আবর্তে পাক খেয়ে জেলটেলও যেন খেটেছেন, কাজেই বিয়ে করে ঘরসংসারী হবার ফুরসত হয়নি। তবে পরবর্তী জীবনে বহুবিধ প্রলোভন সত্ত্বেও 'বড় গাছে' নৌকো বাঁধতে যাননি। নিজস্ব একটা আদর্শের মতবাদে স্থির থেকে এই স্কুলটি এবং ছোটভাই ভাইবৌদের সংসারটির ভালোমন্দ নিয়েই কাটিয়ে যাচ্ছেন। কাঁচাপাকা কদমছাঁট চুল মাথা, রোগা লম্বা শুকনো শুকনো চেহারাটা দেখে বয়েস বোঝা শক্ত। ষাটের নীচেও হতে পারে, পঁয়ষট্টির ওপরেও হতে পারে। যদি 'পঞ্চাশ' বলে বসে, তাতেও হেসে ওঠা চলবে না।

তা বয়েস যাই হোক, বাড়িতে সংসারের হেড্। এবং স্কুলে হেড্‌মাস্টার, এই পদমর্যাদাই তাঁর সকলের প্রতিই একটা অভিভাবকসুলভ মনোভাব গড়ে তুলেছে।

বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি নানা জটিলতার মধ্যে স্কুলটার ইচ্ছেমতন উন্নতি করতে না পাওয়ায় ভদ্রলোক নিতান্তই ক্ষুব্ধ। মাস্টাররা কেউই যথাসময়ে স্কুলে আসা অথবা 'প্রতিদিন আসা'কে দরকারি বলে মনে করেন না, এবং হেডমাস্টারকে তোয়াক্কাও করেন না। ভিতরে ভিতরে যে হেড্‌মাস্টারকে কোনোমতে বিতাড়নের ষড়যন্ত্র চলছে, তাও গোপীমোহনের অবিদিত নয়। তবে, পায়ের তলায় একটু শক্ত মাটি, গোপীমোহন এই 'ভবতারিণী স্মৃতি বিদ্যালয়ের' প্রতিষ্ঠাতার ভ্রাতুষ্পুত্র, এবং স্কুল পরিচালনার ভারও তাঁর উপর অনেকটা ন্যস্ত করা আছে 'কর্তার ইচ্ছেয় কর্ম' হিসেবে।

তবে শেষরক্ষা হবার আশা কম। কারণ, তলে তলে নৌকোর তলায় ফুটো করে চলার ফলে নৌকোয় জল উঠছে বিস্তর। ছেঁচে ছেঁচে আর কত ফেলা যায় ? একদিন ভরাডুবি হবেই।

এখন তো গ্রামেগঞ্জে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়েই চলছে যত কূটকচালে রাজনীতি। 'নিরক্ষররা সাক্ষর হয়ে উঠুক', এমন বুদ্ধিহীন ইচ্ছা পোষণ করেন না শাসকদল। গোয়ালারা কী চায় তাদের খাটালের গরু-মোষগুলো চৈতন্যলাভ করুক ? তাঁরা চান প্রাণীগুলো পর্যাপ্ত খোল-ভূষিমাখা বিচিলির জাবনা নিয়ে নির্লিপ্ত চিত্তে চক্ষু মুদে জাবর কেটে চলুক, আর দুগ্ধ দোহনকালে দোহনপাত্রে ওই বাড়তি খোল-ভূষির প্রতিফলন ফলাক। ব্যস।

তবে সেই পোষা প্রাণীগুলো অন্যত্র বা যত্রতত্র তচনচ করে বেড়াক, প্রশ্রয় দিতে হবে বৈকি ! ওরাই তো খুঁটি। আর 'খুঁটির জোরেই তো মেড়া লড়ে'।

রাখাল ছেলেটার কথা বেঠিক নয়, একটু হেঁটেই গন্তব্যস্থানে পৌঁছে যাওয়া গেল। আর পৌঁছেই ডাক্তার মিস মুখার্জির আর একবার মনটা নতুন করে দমে গেল। এই একটা অজানা অচেনা গেরস্থ লোকের অন্দরে ঢুকে পড়ে থেকে যেতে হবে তাঁকে?

নিজে অবশ্য তিনি সংসারী গেরস্থ ঘরেরই মেয়ে। কিন্তু নিজের বাড়ি, আর বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে অপরের বাড়ি।

তবে কার্যতঃ তাকে ঠিক অন্দরে ঢুকে যাওয়ার অবস্থায় পড়তে হলো না। গোপীমোহনের বাড়ির সদর অংশেই তার থাকার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছেন গোপীমোহন। তাই ওদের সঙ্গে কথা কয়েই আগে আগে চলে এসে ওই রাখাল ছেলেটাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

বাড়িটার আয়তন নেহাৎ কম নয়, ছড়ানো-ছিটোনো বেশ খানিকটা জমির মাঝখানেই বাড়ি। তবে কেবলমাত্র সামনেই একখানি 'দালানকোঠা'। ভিতরে এল শেপ্-এ সারি সারি বেশ কয়েকখানা ঘর থাকলেও তার মাথাটা অ্যাসবেস্টাসের। তবে দেওয়াল পাকা। মেজেয় বিলিতি মাটির প্রলেপও আছে।

সামনের এক টানা রোয়াকের ওপর টানা লম্বা ঘরখানার অর্ধাংশ পাড়ুইমশাইয়ের বৈঠকখানা। এবং বাকি অর্ধাংশ একটা কাঠের পার্টিশন দিয়ে ঘিরে শয়নঘর।

স্ত্রী-পুত্রের বালাই নেই, অন্দরে ভাদ্রবৌদের কলকল্লোল, কাজেই এই ব্যবস্থাটিই তাঁর বরাবরের। এই শোবার ঘরটিই তিনি 'মেয়ে ডাক্তারবাবু'র জন্যে ছেড়ে দিচ্ছেন। খুব তাড়াতাড়ির মধ্যেই সুব্যবস্থা করে ফেলেছেন পাড়ুইমশাই।

মেয়ে ডাক্তারবাবু এসে দেখলেন, পার্টিশান ঘেঁষে একটি সরু চৌকির ওপর সদ্য পাটভাঙা একখানা ফেমাস বাঁকুড়ার চাদর। দুটো মাথার বালিশে ফর্সা ওয়াড় পরানো। জানলার ধারে একটি ছোট টেবিল আর চেয়ার। কোণে একটি টুলের ওপর মাটির কলসীতে খাবার জল।

কিন্তু তিনি দেখার আগেই তো মাথা থেকে মোটগুলো নামিয়ে ছেলেটা যতটা সম্ভব দন্তবিকশিত করে বলে উঠল, উব্বাস। মেয়ে ডাক্তারবাবুকে রাখা করাতে ম্যাস্টোরবাবুর ঘরটো যে এক্কেবারে উল্টা করা হয়েছে দেকচি! ইখানকার জিনিস উখান, উখানকার জিনিস ইখান। কী ফার্সা বেছনা!

ছেলেটার কথাটা সত্যি। মাস্টারবাবুর চৌকিটা ছিল জানলার ধারে, যাতে গায়ে একটু হাওয়া আসে। টেবিল-চেয়ারটা ছিল পার্টিশানের গায়ে। কিন্তু একতলার ঘর। 'মেয়েছেলেকে' জানলার ধারে শুতে দেওয়া শ্রেয় মনে করেননি "ম্যাস্টেরবাবু'। এবং নিজের সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে উদ্বাস্তু বনে যেতে হলেও, এই ব্যবস্থাই ন্যায্য মনে করেছেন। বাড়ির মধ্যে সর্বদা চ্যাঁ ভ্যাঁ! মেয়েদের গজালি। ডাক্তার মেয়ের অসুবিধে। আবার বাড়ির মধ্যেও ওরকম একটা উচ্চমানের জীবকে ঢুকিয়ে দিলে অন্দরের স্বস্তি ঘুচবে।

অর্থাৎ ডাক্তার মিস মুখার্জিকে বেশ খানিকটা সুবিধে উপহার দিতে, গোপীমোহন নিজে অনেকখানি অসুবিধে কিনলেন।

যাক। যার যা নিয়তি।

কিন্তু মেয়ে ডাক্তারবাবু মনে মনে যতই অস্বস্তিবোধ করুন, মোট বয়ে আনা ছেলেটাকে একটু বখশিস দেওয়া উচিত বিবেচনায় তার সঙ্গে আলাপ জমাতে বলেন, এই ছেলে! তোমার নাম কী?

'তোমার!'

ওকে আবার কে কবে 'তুই' ছাড়া 'তুমি' বলেছে?

ছেলেটা মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, উব্বাস। 'পদ'র কী মান্যি গো। বলি পদ আবার 'তুমি' হলো কবে? না না! কানে বাজল। 'তুই'! তুই।

অগত্যাই প্রশ্নকারিণী হেসে ফেলে বলে, বেশ, না হয় তাই হলো। তো নামটা কী?

ওই তো বলা করলাম 'পদ'।

পদ! শুধু 'পদ'। এ আবার একটা নাম হয় না কী?

হওয়ালেই হয়।

পদ তাচ্ছিল্যভরে বলে, মা-বাপ তো 'নিরাপদ' নাম রাখা করেছিল। তো তারা হড়ুম-দুড়ুম মরে গেলে, অতো বড়োটা বলা করার কার দায়? 'পদ'ই ঢের। তো আপুনার নামটা কী শুনি? তা'লে সেই নামে দিদমণি বলি বটেক! কাঁহাতক 'বিটিছ্যালা ডাক্তারবাবু' 'বিটিছ্যালা ডাক্তারবাবু' বলা করা যায়?

'বিটিছ্যালা ডাক্তারবাবু'। এটা আবার কী ভাষা!

শুনে তো তাজ্জব। তাঁর আড়ালে যে এই নামের চাষ চলেছে, সেটা তাঁর জানার কথা নয়। তাই কষ্টে হাসি চাপতে চাপতে বলে ফেলেন, কী বললি? কী ডাক্তারবাবু?

ক্যানো? বিটিছ্যালা ডাক্তারবাবু।

এই নামে ডাকবি আমায়?

পদ অবশ্য এতে দমল না। জোর গলায় বলে উঠল, তো পদর 'ভ্রোম'টা কী হলো বটেক? আপুনি বিটিছ্যালা না?

তা বটে। তা নই বলা চলে না।.....হাসি চাপতে রীতিমত চেষ্টা করতে হয়।

তালে? আর ডাক্তারবাবু না?

হ্যাঁ, তাও তো বটে! ডাক্তার যখন তখন অবশ্যই 'বাবু'। তো সত্যি আমাকেই বা অতো বড় নামে ডাকতে তোর কী দায়? বলবি পাপিয়াদি।

টুক থামা করো বটে। কী নামটো বললে?

পাপিয়া। পাপিয়াদি বলবি।

পা-পিয়া! ওই নাম তুমার?

এবার আপনি ছেড়ে 'তুমি'।

পাপিয়া হেসে বলে, কেন নামটা তোর পছন্দ নয়?

উববাস। পদোর পছোন্দো। পদ একটা মনিষ্যি? তা নামটা তো তুমার ভালো রাখা করা হয়েছিলো বটে! উটা অ্যাকটা মিঠে সুর পাখির নাম বটে!

বাঃ। তবে তো তুই সবই জানিস। আচ্ছা বেশ, এদিকে আয়। এই নে একটু মিষ্টি কিনে খাস।

পাপিয়া তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট ধরিয়ে দেয়।

সত্যি বলতে প্রথমটা দুটাকাই দিতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো দুটাকায় কী বা হয়। ভারী মায়া লাগছে ছেলেটাকে দেখে। রোগা হাড়সার চেহারা। পরনে কেবলমাত্র একটু ছেঁড়া ময়লা গামছা মালকোঁচা করে পরা। সর্বাঙ্গ ধূলিধূসরিত। মাথার চুলগুলোয় তেল পড়ে বলে মনে হচ্ছে না। যদিও হাস্যবদন, তবু দেখে ভারী মায়া লাগছে।

হ্যাঁ, বেলেঘাটার মুখুয্যে বাড়ির (যে বাড়ির হাড়মজ্জা মায়ামমতার নির্যাসে টইটুম্বুর) মেয়ে পাপিয়া এই সদ্য পাশ-করা ডাক্তারদের দলে এসে হাজির হয়েছে।

বাড়িতে ওকে অনুরোধ করেছিল, 'বাবা। এই গরমে পুরুলিয়া! তুই চেষ্টা চরিত্র করে দ্যাখ্ না, যদি যাওয়াটা আটকানো যায়।'

বিশেষ করে জ্যাঠা-জ্যেঠিই এই অনুরোধে জপিয়েছে।

কিন্তু ও মেয়ে যে গোড়া থেকেই নিজমনে তার বিপরীত চেষ্টা করেছে। সব আগেই 'ইচ্ছুক'দের

তালিকায় নাম বসিয়ে রেখেছে। মেয়ে তাই হেসে বলেছিল, 'আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে সরকারকে বলে-কয়ে ক্যাম্পটা যদি দার্জিলিঙে করানো যায় ! কী বলো ? তাহলে আর তোমাদের কোনো চিন্তা থাকবে না।'

তারপর অবশ্য একটু ছোটখাটো বক্তৃতাও দিয়েছিল, ডাক্তারি পড়ার আদর্শ আর উদ্দেশ্যটি কী ! সেই উদ্দেশ্য আর আদর্শের সঙ্গে আরাম খোঁজার চেষ্টা চলে কিনা।

তা যাক্, মায়া তো হলো। কিন্তু ছেলেটা যে ওই পাঁচ টাকার নোটটা হাতে পাওয়া মাত্রই স্রেফ সাপের ছোবল খাওয়ার মতোই শিউরে উঠে নোটখানা ঝপ করে আবার দাতার হাতে ফেলে দিয়ে বলে উঠল, উব্বাস ! এটো কী বটেক ? লিয্যস করে দেখা করে দিবেক তো ?

কী মুস্কিল। দেখেই তো দিলাম। বললাম যে মিষ্টি কিনে খাবি।

ওঃ, পদ আক্কোস ? অতোগুলান মিষ্টি খাবেক ?

আরে দূর ! এতে আবার তোর কতোগুলান হবে ? নে না বাবা।

বলে আবার নোটটা ওর হাতে চালান করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু পদ অনমনীয়।

পদকে কী ডাক্তারদিদি মারা পড়াতে চায় ? রাখবে কোথায় অতো টাকা ?

বাঃ, রাখবি কেন ? খাবি তো !

খাবে ! ওটা পাঁচ টাকার নোট না ?

পদ তার জীবনে এমন অবাস্তব কথা কখনো শোনেনি। ডাক্তারদিদির মাথাটা খারাপ ! দিদি বরং তাকে একটা পঞ্চাশ নয়া দিক। যেটা না কী ন্যায্য হবে।

ডাক্তারদিদি বলে ওঠে, পঞ্চাশ পয়সা ? তাতে কী হবে শুনি ? দোকানী তাহলে তোকে শুধু একখানা শালপাতা দেবে।

হ্যাৎ !

পদ জোর গলায় বলে, উতে পাঁচটো জিলুপি তো হবে বটেক।

বাঃ, জিলিপি খাবি কেন ? রসগোল্লা খাবি। আমি ভালেবেসে দিচ্ছি, নে না।

পদ কিন্তু অটল অনমনীয়।

পদর হাতে নোট। পদ দোকানে গিয়ে রসগোল্লা খেতে চাইবে ? দোকানী তাহলে তাকে কান ধরে ম্যাস্টোরবাবুর কাছে ধরে নিয়ে এসে 'বকা খাওয়াবে না' ? বলবে না নির্ঘাৎ এটা চুরি করেছে পদ !

পাপিয়া সেই ভীতকাতর নিরুপায় মুখটার দিকে তাকিয়ে একটা হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে।

সত্যি ! কী দুঃখী ছেলেটা। কেউ কিছু দিলেও ভয়ে নেবার সাহস নেই। অথচ ওর সমস্ত অবয়বের মধ্যে একটাই মাত্র ছাপ ! বঞ্চিত হতভাগ্য। বিশ্ব জুড়ে নাকি 'শিশু শ্রমিক' নিয়ে মাথাব্যথা চলছে, শিশু শ্রমিকবিরোধী আন্দোলন চলছে। অথচ এই রকম লক্ষ লক্ষ শিশু নিদারুণ অসহায়তা আর বঞ্চনার মধ্যে হাড়পেষা শ্রম করে চলেছে।

ছেলেটা নাকি এই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির গরুর রাখাল। ওই রোগা লিকলিকে দুখানা হাত আর কাঠির মতো দুটো পা ছাড়া যেটা চোখে প্রকট হয়ে ওঠে, সেটা ওর খসখসে শুকনো জিরজিরে চামড়ায় ঢাকা পাঁজরগুলো। ডাক্তারের চোখ ছাড়াই যাদের সহজে গুনে ফেলা যায়। কী করে সামলায় গরুদের ?

পাপিয়া হতাশ গলায় বলে, নিবি না ?

পদ ওই মলিন হয়ে যাওয়া মুখটার দিকে তাকিয়ে দেখে বোধহয় করুণাপরবশ হয়েই বলে,

'তবে নয় অ্যাকটা গোটা ট্যাকাই দাও।'

তাতেই রফা!

সঙ্গে ছিল কী ভাগ্যিস ক'টা 'কয়েন'!

চকচকে গোল টাকাটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে পদ। মুখটা চকচকে হয়ে ওঠে। তারপর সেটাকে তার গামছার কৌপিনের ট্যাঁকে ভালোমতো পাক দিয়ে সুরক্ষিত করে ইশারায় জানায়, কেউ দেখে ফেললে পদর নিস্তার নেই।

পাপিয়ার আবার একটা গভীর নিঃশ্বাস পড়ে। সংসারী মানুষরা এমন হৃদয়হীন কেন?

কিন্তু গোপীমোহন মাস্টার কী লোকটা খারাপ? না কী হৃদয়হীন?

মোটেই তা নয়। বরং তাঁর বাড়িতে রাখাল-বাগাল, দু-এ'কটা মুনিষ এবং বাসনমাজুনি খড়কাটুনি গোবরকুড়ুনিরা অন্য যে কোনো বাড়ির থেকে সুখে থাকে। তুলনামূলকভাবে বেশী পায়। গোপীমোহনের কঠিন আদেশে বাড়ির মেয়েরাও এদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কৃপণতা করতে সাহস পায় না। কেউ যদি বৃহৎ গামলার এক গামলা ভাতও পেটে চালান করে ফেলে আবার বলে, 'টুকুন ভাত গো জননী।' তখন রাগে ব্রহ্মাণ্ড জ্বলে গেলেও টুকুন ভাতটি তাদের খালি হয়ে যাওয়া পাতে ফের ঢালতেই হয়। 'টুকুন' মানে তো অন্তত এক কাঁসি।

সকালের জলপানিতেও এ বাড়িতে ঢালাও মুড়ি আর ঢালাও ঢেলা গুড়। একধামা মুড়ি নিয়ে যখন বসে, দেখে বিশ্বাস হয় না অতো মুড়ি খাওয়া সম্ভব। কিন্তু জলের ছাট দিয়ে দিয়ে ভিজিয়ে সেই বিরাট মুড়ির সম্ভার যখন তারা থাবা থাবা করে চিমড়ে পেটের মধ্যে চালান করে ফেলে, সে দৃশ্য দেখতে অনভ্যস্ত দর্শকের চোখ কপালে উঠে যায়।

এমন ঢালাও খাওয়া আর কোনো বাড়িতে রাখাল-টাখালদের জোটে না। কাজেই পদ ভালই আছে।

কিন্তু যাদের অনভ্যস্ত চোখ? তাদের চোখে ধরা পড়ে কী অপরিসীম বঞ্চনা আর দুঃখের সঙ্গে কাটে এইসব হতভাগ্যদের জীবন।

গোপীমোহনের ভাদ্রবৌরা ভাসুরের ভয়ে ওই বাগাল ছোঁড়ার পেটপূর্তি হয়ে আশা মেটা পর্যন্ত ভাত-মুড়ি দিতে বাধ্য হয় বটে, মনে মনে বেজার হয় বিলক্ষণ! এবং সেই বিরক্তিটা ওই ছেলেটার ওপর পড়ে বলেই, উঠতে বসতে চলতে ফিরতে বকুনি খেতে হয় তাকে।

তবে পদ তাতে দুঃখবোধ করে না। ভাত-মুড়ি খাওয়ার মতোই 'বকা খাওয়াটা'কেও সে প্রাপ্য বস্তু হিসেবেই সমানভাবে গ্রহণ করে চলে।

পাপিয়া ছেলেটার কাছে জানতে চেষ্টা করছিল, স্নানটানের ব্যাপারটার ব্যবস্থা কী। অপরের বাড়ির মধ্যে এসে বাস করতে ঢুকলে ওইটাই তো সবথেকে অস্বস্তিকর সমস্যা। দলের সঙ্গে স্কুলবাড়িতে অবশ্যই এই অস্বস্তিটা হতো না। হয়তো 'মেয়ে' বলে একটু বাড়তি সমস্যা দেখা দিত। তো সেক্ষেত্রে সুষ্ঠু একটা ব্যবস্থাই দেখা যেত। আবার মেয়ে বলেই একটু বাড়তি সুযোগও পেত! কিন্তু এখানে এখন কী করা? কোনো মহিলাকে তো দেখা যাচ্ছে না।

পাপিয়া ভিতরের দরজার দিকে চোখ ফেলল। দরজাটায় একটা 'পর্দা' নামক বস্তু ঝোলানো আছে বটে তবে বাতাসে উড়ে উড়ে ভিতরের দৃশ্যটি প্রকাশ করছে মাঝে মাঝে। কিন্তু সেখানে শুধু খানিকটা ঘাসচাঁচা মেটে উঠোন, আর একটা তুলসীমঞ্চের একাংশ নজরে পড়ছে মাত্র। আর কিছু না। কেউ কোথাও নেই।

পাপিয়া গলা নামিয়ে বলল, এ বাড়িতে 'মেয়ে-বৌ' কেউ নেই?

পদ একটু অনুধাবন করে একগাল হেসে গলা নামিয়েই জানাল, বৌ? ম্যাস্টোরবাবু তো বিহাই

করেনি।

তাহলে? বাড়ির মধ্যে আছে কে?

থাকবে তো নিশ্চয়। তুলসীতলা যখন আছে, তখন সেখানে প্রদীপ দেবার লোকও নিশ্চয় আছে।

পদ দুটো আঙুল দুবার দেখিয়ে ইশারায় জানাল, ম্যাস্টোরবাবুর দুটো ভাই আর সেই দুজনের দুটো বৌ আছে। তারপর দুহাতের পাতা ছড়িয়ে জানালো, ওই দুজনের সাকুল্যে দশটা 'ছানা' আছে।

পাপিয়াও চোখের ইশারায় জিগ্যেস করল, কই তারা?

মূকাভিনয়ের ধরনেই উত্তর প্রত্যুত্তর, তারা 'ডাক্তারবাবু'র ভয়ে 'ভিতর' দিকে লুকিয়ে আছে।

ভয়! ভয় কেন?

ভয় হবে না? ম্যাস্টোরবাবু এসে বলে যায়নি ডাক্তারবাবুর সামনে কেউ যেন গোলমাল না করে।

পাপিয়া হতাশভাবে বলে, কিন্তু আমার তো এখন চানের দরকার।

এর উত্তর জানা নেই পদর। অতএব পদর সেই মূক-এর ভূমিকা।

সবাই কোথায় চান করে?

ওঃ। সে তো পুষ্কর্ণীতে। তো এখন তো সে পুষ্কর্ণী হাজামজা শুকা।

পদ আর কিছু বলার আগেই হাতের ছাতাটা মুড়তে মুড়তে গোপীমোহন ব্যস্ত-সমস্তভাবে ঢুকে আসেন। এবং খুবই লজ্জিতভাবে তাড়াতাড়ি কৈফিয়ৎ দেন মূল ব্যাচকে ঠিকমতো প্রতিষ্ঠিত করতে তাঁর এতোক্ষণ লাগল।...মিস মুখার্জির ওপর খুবই অবিচার হয়ে যাচ্ছে। ইস্! নাওয়া-খাওয়ার কত দেরি হয়ে গেল!

তারপরই পদর দিকে চোখ পড়তে ধমকের সুরে বলে ওঠেন, এখনো এখানে? মাঠের গরুগুলোকে দেখছে কে?

পদর ভীত মুখের দিকে চেয়ে পাপিয়া তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, ও যাচ্ছিল। আমি গল্প করে ওর দেরি করিয়ে দিয়েছি মাস্টারমশাই।

মাস্টারমশাই একটু হাসি কোঁচকানো মুখে বলেন, গপ্পোর যুগ্যি লোক পেয়েছেন বটে!

কী করবো? আর তো কাউকে দেখছি না।

ইঃ। ভেরি সরি। পদ, তুই তোর কাজে যা। ছাড়া গরু দেখলেই কে কখন একটাকে ধরে 'পণ্ডে' দেবে।.....

'পণ্ডে' দেওয়া একটা রাখাল-চলিত ভাষা।

সুযোগ পেলেই পরের গরুকে ধরে 'বেওয়ারিশ গরু-মোষের' থানায় জমা দিয়ে আসা একধরনের প্রতিবেশীসুলভ শত্রুতা। বলে আসবে 'আমার বাগান মুড়োচ্ছিল। আমার উঠোনে ঢুকে এসেছিল।'

পদ ছুট মারে। ট্যাঁকে হাতটা শক্তভাবে রেখে।

পাড়ুইমশাই ভিতর বাড়িতে ঢুকে যান। পরক্ষণেই একটা বছর আটেকের মেয়ে একটা ছোট কাঁসার বাটিতে একটু সরষের তেল আর একখানা নতুন গামছা নিয়ে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে স্বয়ং পাড়ুইমশাইও। মেয়েটার পরনে একটা ফ্রক, চুলটায় আঁটিসুঁটি করে বেণী বাঁধা। নাকে নোলক।

তেল গামছা।

পাপিয়া হেসে ফেলে বলে, এসব লাগবে না। আমার সঙ্গেই আছে। শুধু জলটা কোথায় দেখিয়ে দিলেই—

নিশ্চয়। নিশ্চয়। আসুন। এদিকে—

বলে গোপীমোহন তাকে ভিতর বাড়ির উঠোনে নামিয়ে এনে পাশের দিকে বাঁশ আর দর্মায় তৈরী একটা 'ঘের'-এর সামনে নিয়ে আসেন। এইটি তাঁর নিজস্ব স্নানঘর। যেটাকে তিনি বোধহয় রাজকীয়ই

ভাবেন।

তার দরজা থেকেই দেখা যাচ্ছে, মরচেপড়া একটা জলের ড্রাম ও একটা মগ।

পাপিয়ার গলা শুকিয়ে আসে। ক্ষীণভাবে বলে, জল আছে?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আছে বৈকি। বলে রেখে গেছি জল রাখতে।

তারপর ঢোক গিলে বলেন, তবে এ সময় তো এখানে বিশেষ জলকষ্ট! যেদিন যেমন জোটে। পুকুরটুকুর তো সব শুকনো। আমার বাড়ির পাতকুয়াটি আমার পিতার আমলের, প্রাচীন এবং গভীর! তাই জল বেশী শুকোয় না। তবে অনেক নীচেয় নেমে যায়। আপনার কষ্ট হবে। কী আর করবেন? কষ্ট করতেই তো সরকার আপনাদের এখানে পাঠিয়েছেন

উচ্চারণে জেলাজনিত 'টান' থাকলেও কথাবার্তা বেশ টানটান মাস্টারবাবুর।

পাপিয়ার একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে, 'বাকিদের কী হলো?' কিন্তু লজ্জা করল। বিনা প্রশ্নেই পাড়ুইমশাই অনুক্ত প্রশ্নের উত্তরটি দিলেন, 'ওনাদের অবশ্য সব ঠিক আছে স্কুল বাড়িতে ডিপ টিপকল, পাকা পায়খানা, চানের ঘর সবই আছে। আবাসিক ধাঁচে বানানো হয়েছিল তো বাড়িটা।'

ওঃ, ওনাদের সবই আছে। বেচারী পাপিয়াই মেয়ে হয়ে চোরদায়ে ধরা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি এলো, মেয়ে? না 'বিটিছ্যালে'। কিন্তু 'মেয়ে' হওয়ার অসুবিধেটি যে কতটি, সেটা বোধহয় আজই প্রথম এতো বেশী অনুভব করে পাপিয়া। মনে মনে ভাবে, আমি যে দলছাড়া হয়ে থাকতে জোরালো আপত্তি করতে পারলাম না, সেও তো মেয়ে বলেই? তাতে আমার নির্লজ্জতা প্রকাশ পেত। কিন্তু মানুষের কী শুধু চান করার জলটুকু পেলেই চলে?

না, তা চলে না, সেটা বিচক্ষণ মাস্টারমশাইও জানেন। তাই তিনি, ওই বাথরুমের পিছনে আরো একটা 'ঘের' দেখিয়ে দেন, ইটের গাঁথুনি। তার মানে আরো রাজকীয়।

বহুকষ্টে পাপিয়ার কণ্ঠ থেকে স্বর বেরোয়, এখানে কী 'সার্ভিস সিস্টেম'?

সার্ভিস সিস্টেম!

গোপীমোহন একটু থমকালেন। তারপর সামলে নিয়ে বলে ওঠেন, ইয়ে, নাঃ। মানে সার্ভিসের লোক কোথা? তেমন লোক মেলে না। ইয়ে, মানে—ইটালিয়ান টাইলসের দেওয়াল, শাওয়ার গিজার বেসিন বাথটব, একাধারে গরম জল ঠাণ্ডা জলের কল। হয়তো বা কারো কারো বাথরুমেও ফ্যানের হাওয়ার স্থানীয় সকলেই মাঠটাকেই প্রেফারেন্স দেয়। কী করবে? অবস্থা কোথায়? ইয়ে, মানে—প্রথম দিন আপনার একটু অসুবিধা হবে। স্কুলবাড়িতেও তো ওই একই বেবস্থা! নিন নিন চান করে নিন। আহারে বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে।

খুবই সহৃদয় কণ্ঠ।

আহার। সে চিন্তা তো আসছে না।

পাপিয়া তার শাড়ি-জামা-তেল-সাবান ইত্যাদি নিয়ে ফাঁসির আসামীর বধ্যভূমিতে যাবার মনোভঙ্গি নিয়ে সেই 'ঘের'-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে। আর তখনি তার মনে হয়, এইটাই আমাদের আসল দেশ। আমাদের গর্ব আর অহঙ্কারের পাদপীঠ, আমাদের 'রাজ্য'।

রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষ এইভাবেই জীবন-যাপন করে। মুষ্টিমেয় কিছু ভাগ্যবান জন, মহোৎসাহে রাজ্যের অগ্রগতির হিসেব দেয়, আর নিজেদের সরু চালুনিতে ছাঁকা শহুরে জীবনটিকেই 'এটাই দেশের অবস্থা' ভেবে পরম শান্তিবোধ করে।

আর নেতারা? মন্ত্রীরা? তাঁদের কথা তো বাদই দাও।

তাঁদের 'ওয়েস্টার্ন স্টাইলের' স্নানের ঘরে মোজাইক টাইলসের মেজে, ব্যবস্থা, এমনকি টি. ভি.

সেটও। হয়তো আরো কিছু!

এই 'জনগণে'র নেতা তাঁরা। এদের ভোটে তাঁদের 'গদি' শক্ত থাকে।

নতুন কিছুই নয় অবশ্য। এ ব্যবস্থা আদিঅন্তকালই পৃথিবীতে আছে।...চিরকালই কথা আছে, 'রাজায় প্রজায় এক হয় না!...পায়ে মাথায় সমান হয় না।'

তবে হঠাৎই একদিন মানুষ একটা আশ্চর্য নতুন কথা শুনেছিল, এবং এখনো শুনে চলেছে। সে কথা হচ্ছে, 'এই চিরকেলে পচা পুরনো ব্যবস্থা থাকবে না। এ ব্যবস্থা চুরমার করে ফেলা হবে। 'পায়ে মাথায় এক করা হবে'।....হ্যাঁ, বটবৃক্ষ থেকে বেগুন গাছটি পর্যন্ত সমান সাইজের হয়ে যাবে। এর নাম সাম্যবাদ। দুনিয়ার মজদুর এক হয়ে লড়ে তামাম দুনিয়াকে এক ছাঁচে ঢালাই করে ফেলবে। 'ফেলবে' কেন, ফেলছে। কর্মযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে অনেক দিনই। চলে চলেছে সে হোম-যজ্ঞি বৃহৎ বৃহৎ দেশে। তবে কারো চোখের সামনে নয়। সবকিছুই লোকচক্ষুর অন্তরালে। লৌহ যবনিকা স্থাপিত। সেই যবনিকার অন্তরালে চলেছে যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার কাজ। সমস্ত পৃথিবীর সামনে অন্ধকার দুর্বোধ্য, যবনিকা কম্পমান। কবে উন্মোচিত হবে সেই যবনিকা! কী দেখবে! কী দেখব!

কী দেখল সেটা পরবর্তী ইতিহাস।

আমাদের এই অভাগা রাজ্যে সেই যজ্ঞ-হোমের ভস্মটীকাটুকু এসে পৌঁছেছিল বৈকি। তাতে কত আশার বাণী শোনানো হয়েছে তাবৎ জনকে। 'কেউ আর পা থাকবে না রে। সবাই মাথা হয়ে যাবে।'

তো সেই শিক্ষাটুকু নিয়েছে বৈকি কিছু কিছু জন। যারা যুগযুগান্তর ধরে 'পা'য়ের অমর্যাদায় কাটিয়ে এসেছিল তারাই মাথায় চড়ে বসেছে। কিন্তু আগের 'মাথা'রা? তারা নেমে এসে সমান হয়েছে? পাগল না কী? তাদের জন্যে আরো উচ্চ আকাশ নেই?

অনেক কিছু ভেবে চলেছিল পাপিয়া, তার এই নবলব্ধ অভিজ্ঞতার তীক্ষ্ণ কামড়ের মধ্যে। প্রথমটা হতাশভাবে দাঁড়িয়ে ভেবেছে, কী করে কী করবে! একসময় নিজেই পাপিয়া আবার অবাক হয়ে দেখল স্নান নামক ঘটনাটা ঘটিয়ে ফেলে পাটভাঙা শাড়ি-জামা পরে দিব্যি মানুষের চেহারাটি নিয়ে লোকসমাজে দেখা দিতে সক্ষম হয়েছে।

সন্ধ্যের মুখে দলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল। ঘটাতে তো হবেই। কাল সকাল থেকেই তো কর্মসূচী অনুযায়ী অভিযানে বেরোতে হবে।....

তবে আপাততঃ দেখা গেল এরা দিব্যি আড্ডা দিচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। মিস মুখার্জিকে দেখে সমস্বরে হৈ হৈ করে উঠল, এই যে ম্যাডাম! এসে গেছেন। আপনার জন্যেই সবকিছু আটকে রয়েছে।

সবাই এরা পরিচিত বন্ধুজন। তবে শৌভনিক হচ্ছে পাপিয়াদের পাড়ার ছেলে। 'তুই-তোকারির' সম্পর্ক।

পাপিয়া তীক্ষ্ণ হাসি হেসে বলল, আমার জন্যে সব আটকে রয়েছে? কোনটা? খাওয়া-দাওয়া নাকি? দিব্যি তো আড্ডা চলছে।

আহা। কাজের ব্যাপারটার তো আলোচনা মুলতুবি রয়েছে।

অনেক ধন্যবাদ। একটু বসতে পারি কী?

চৌকিতে বসে থাকা ওরা একটু সরে সরে জায়গা বার করে বলে উঠল, 'জ্যেঠু' অ্যালাউ করবেন তো একাসনে বসতে?

আঃ। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে না কী, তাই করবেন না।

শৌভনিক বলে ওঠে, কেন ? উল্টো গাইছিস কেন ? তোর তো স্পেশাল খাতির ! গোয়ালে না রেখে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে তোয়াজ। তা জ্যাঠামশাইয়ের খবরদারিতে কাটল কেমন ?

আর বলিস না। রীতিমতো একটি এক্সপিরিয়েন্স। শুনবি দুঃখের কথা ! বাড়ির মহিলারা কেউই 'ডাক্তারবাবু'কে মুখ দর্শালেন না। একটা নাবালিকা আর একটা বালক যোগাযোগের সেতু। তবে ভাতের থালাটা অবশ্য বয়ে নিয়ে এলেন এক মহিলা আবক্ষ অবগুণ্ঠন টেনে। বাইরের দিকে যে ঘরে থাকতে দিয়েছে, সেই ঘরেই এনে হাজির !....যখন প্রতিবাদ করে উঠলাম, এ কী ! এখানে কেন ? আপনাদের সঙ্গে বসিগে চলুন। তখন মাস্টারমশাই সবিনয়ে জানালেন, ওনাদের তো ভুঁয়ে পিঁড়ি পেতে বসে খাওয়া অভ্যাস। কিন্তু ডাক্তারবাবুকে তো তা দেওয়া যায় না। তাই স্পেশাল ব্যবস্থা। একটা বড় টুলের ওপর থালা বসিয়ে দিয়ে গেল পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে।

তোকে 'ডাক্তারবাবু' বলছে ?

বাঃ ; বলবে না ? পয়সাকড়ি খরচা করে খেটেখুটে ডাক্তার হইনি আমি ? তার একটা মান্য নেই !

হো হো করে হেসে ওঠে সকলে।

তাই বলে দেখে মহিলারা ঘোমটা দেবেন ?

দিলেন তো। তবে একটি বালিকা লেগে পড়ে বসে থেকে সমানে জিগ্যেস করে চলল, আর কিছু লাগবে ? আর কিছু লাগবে ?

হুঁ, তা আমাদের তো এখানে—থাক সে কথা। তোর ভাগ্যে অতিথি সৎকারটা ভালই জুটেছে তাহলে।

তা বলতে পারিস। প্রায় 'সৎকারের' অবস্থায় এনে ফেলার যোগাড়। বললে বিশ্বাস করবি সাত-আট রকম তরকারি, সবই প্রায় একই চেহারার, প্রত্যেকটার ওজন অন্তত হাফ কিলো করে ! বাটি ভর্তি ভর্তি। তার সঙ্গে ইয়া বাটির এক বাটি দুধ।

অ্যাঁ, এই বাজারে ? তাহলেই বলুন ঠিক বলেছি কিনা ? স্পেশাল খাতির।

আমার বদলে কেউ গিয়ে ওই স্পেশালটা ভোগ করুনগে না। সেই গামলার সাইজের একবাটি দুধকে খাওয়াবার জন্যে কী ঝুলোঝুলি। 'বাড়ির গরুর' দুধ। নাকি অতীব সুস্বাদু ! আমাদের কলকাতায় দুধের এমন স্বাদ মিলবে না!

তোটক বলে, সবই সত্যি। তবে এখানের এখন যা আবহাওয়া দেখছি গরুরা কী দুধ দিচ্ছে ? মাঠে তো ঘাস নেই।

কি জানি। একদিনেই তো অস্থির লাগছে। আবার আসবার সময় প্রশ্ন, রাত্রে ডাক্তারবাবুর ভোগের আয়োজনটা কী হবে ?

শৌভনিক লাফিয়ে ওঠার ভঙ্গীতে বলে, তাই না কী ? আমাদের তো স্রেফ 'ভাত' দেখিয়ে দিয়েছে। আমাদের সেবায় যাদের নিয়োগ করা হয়েছে, তারা না কী রুটি বানাতে জানে না। তুই কী বললি ?

বলবো আবার কী ? বেলা তিনটের সময় যা আহার হয়েছে তার জের চলবে কাল সকাল অবধি।.....তবে মনে হয় না, রুটি নামক বস্তুটি এখানে তেমন চালু ! আমি প্রথমটায় মেয়েটিকে বলেছিলাম, তোমরা যা খাও তাই। তা উত্তরে জানলাম, বালখিল্যদের নাকি রাত্রের আহার শুধু মুড়ি।....আর বয়স্করা একমেবাদ্বিতীয়ং ওই ভাতই।.....আসলে গ্রামের জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই রে। কত জায়গায় কত রকম। আমাদের যেন বদ্ধমূল ধারণা কলকাতাটাই, অথবা গ্রেটার কলকাতাও বলা যায়। আমাদের পুরো রাজ্যটা। মানে ওটাই পুরো 'পশ্চিমবঙ্গ' !

একবার সন্ধানী দৃষ্টি চালালেই ধরা পড়ে যাবে—কিন্তু থাক ওসব ফালতু কথা, কাজের কথাটা হোক এবার।

কাজের কথাটথা হয়েছিল বৈকি!

সরকারি কর্মসূচি অনুযায়ী অভিযানের ছকটি ঠিক করাও হয়েছিল। কিন্তু কাজ?

কী ভাবে? তা 'ভাবটা' এই—

গ্রামে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি মানুষকে স্বাস্থ্য-সচেতন করে তোলা। অপরিষ্কার জল ফুটিয়ে খাওয়ার নির্দেশ! গর্ভবতী অবস্থায় কী কী পালনীয়। শিশুর জন্মের পর নির্দিষ্ট সময় হাসপাতালে গিয়ে 'ইনজেকশন' খাইয়ে আসার বিশেষ প্রেরণা।

এছাড়া হঠাৎ আক্রমণকারী কোনো সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে, রোগীকে যতসম্ভব তাড়াতাড়ি হাসপাতালে নিয়ে এসে অন্তত—আউটডোরে দেখাতে নিয়ে আসা। এবং বাড়ির সবাই নিজেরা কীভাবে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তার নির্দেশিকা দেওয়া।

হ্যাঁ, এই ধরনের অনেক কিছুই সূচি রয়েছে এদের কাজের জন্য!

তবে সে সূচিকে রূপায়ণ করা?

সাধ্য নাকী?

যেখানে খাবার জলই দুষ্প্রাপ্য, হয়তো মাইল মাইল রাস্তা হেঁটে সেই খাবার জল সংগ্রহ করে আনতেই ছাতি ফাটে, সেখানে জল ফুটিয়ে খাবার মতো বিলাসিতা? তা বিলাসিতাই বৈকি। অন্য একদিকেও। যাদের দুটো চাল ফুটিয়ে ভাত সেদ্ধ করবার মতো জ্বালানি জোটে না, তারা জল ফুটিয়ে খাবার কথাটা পাগুলে কথা বলে মনে করবে না?

শিশুকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে 'পোলিও' প্রতিষেধক খাইয়ে আসবে? কোন হাসপাতালে গিয়ে? যেখানে ডাক্তারের চিহ্নমাত্র নেই, 'ওষুধ'টা স্বপ্নবিলাস মাত্র, এবং নামকা ওয়াস্তে যে কটা বেড আছে, সেখানে রোগীর বদলে জমাদারের স্ত্রী-পুত্র, সন্তান-সন্ততি বসতি করে, সেই হাসপাতালে?

আউটডোর!

তা নামটা ঝোলানো আছে বটে, দর্মাঘেরা বারান্দায় একটা কেঠো চেয়ার-টেবিল আর একখানা টানা লম্বা বেঞ্চের সামনে। নামই আছে, নামের মাহাত্ম্য বিকাশের চিহ্ন নেই। চেয়ারখানায় না কি—প্রায়শঃই ওই জমাদারের বুড়ো হয়ে যাওয়া পোষা কুকুরটা স্রেফ কুকুরকুণ্ডলী হয়েই শুয়ে থেকে ঝিমোয়, আর বেঞ্চটায়—জমাদারগিন্নী সময় পেলেই বছর দশেকের মেয়েটাকে টেনে এনে বসিয়ে তার মাথার উকুন বাছে। এইটাই বোধহয় তার সবচেয়ে প্রিয় অবসর বিনোদন।

কিন্তু এসব তো নেপথ্য দৃশ্য! কাগজে কলমে, সরকারি খাতায় পূর্বতন রিপোর্টে তো সবই আছে। সেইভাবেই রিপোর্ট তৈরি করতে পারলেই বখেড়া চুকে যায়।

'ডক্টরস্ ক্যাম্পের' দ্যাখ্ভালের ভারপ্রাপ্ত নগেন সোরেন। বেয়াড়া এই ডাক্তার চারটের অভিযোগ ক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত হয়ে বলে, আমি কী করবো? আমার কী করবার আছে?....আপনাদের যা বলবার 'অঞ্চল প্রধানকে' বলুনগে না।

'অঞ্চল প্রধান!'

কই তিনি?

তিনি! তিনি কী এই অভাগা নগেনের মতো এইসব ছেঁড়া কাজ করতে আসবেন? অভিযোগ জানাতে হলে তাঁর কাছে গিয়ে জানাতে হবে। সেই কাছটা? সে তো ঝালদার কাছে। বিরাট বাগান, মস্ত বাড়ি। তিনি কি আরসায় পড়ে থাকবার লোক? তবে অভিযোগটা মশাই কী এমন গুরুতর?

হাসপাতালে ডাক্তার নেই, ওষুধ নেই, ব্যাণ্ডেজের তুলো নেই, ইন্‌জেকশনের ছুঁচ নেই, বেড্‌-এ রোগী থাকার মতো অবস্থা নেই, এসব কী খুব একটা নতুন কথা? গ্রামেগঞ্জে ঘুরে ঘুরে দেখে আসুনগে না। বরং এদিককার মধ্যে এই 'আরসা' গ্রামটাই অনেকের থেকে ভালো। আপনাদের শহরে-নগরেই কী এর থেকে খুব ভালো?

জলাভাব? সে তো প্রকৃতির অভিশাপ।

কিন্তু গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের নথিভুক্ত এ অঞ্চলের সেই পাঁচটা নলকূপ কোথায়? একটা 'গভীর' আর চারটে অগভীর। বিশ্বব্যাঙ্কের মঞ্জুরীকৃত টাকায় বিগত মার্চের মধ্যেই যেগুলোর কাজ শেষ হয়েছিল?

নাঃ। এবার রাগ নয়, হাস্যের পালা নগেন সোরেনের।

টিপকল। পাঁচটা।

দপ্তরের হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে বলেই, তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে? সাকুল্যে তিনটে টিপকলের মালপত্তর এসেছিল, একটা 'গভীরে'র আর দুটো 'অগভীরের'। তো গভীর জলের মাছ অঞ্চল প্রধান ওই 'গভীরটা' নিজের উঠোনে বসিয়ে নিয়েছেন। এখনো জল উঠছে। তবে আরো খরা হলে কী হবে বলা যায় না।

বাকি দুটোর মধ্যে একটা অকেজো হয়ে পড়ে আছে, 'ঘাড়' 'হাতল' লোপাট হয়ে। বাকিটায় জল একটুক একটুক ওঠে বটে, তো সে জলে নাকি দারুণ ক্ষার। খাওয়া যায় না।

ব্যবস্থার দোষ দিচ্ছেন বটে টাটকা তাজা 'ডাক্তারবাবুরা'। বলি জলে ক্ষার, সেটাও কী কর্তাদের দোষ? সবকিছুতেই গরমেন্টের সমালোচনা করা, আর নেতাদের দোষ দেওয়া, এটা এখন একটা ব্যাধিতে দাঁড়িয়ে গেছে লোকের। এই নিয়ে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতাও দিয়ে ফেলে নগেন।

লোকটা তাদের তদারকিতে আছে। তাই বেশী চটায় না কেউ তাকে। লোকটাকে কারুরই ভালো লাগে না।

বিভাস বলে, আমাদের এই 'দ্যাখ্‌ভালের' খাতে যতটি 'ব্যয়' ধরা হয়েছে বা হবে, তার কতটি এই মাননীয় নগেন মহাশয়ের পকেটে ঢুকে যাবে বলে মনে হয় তোদের? বেশ ভালো অঙ্কের একটি কী বলে ব্যয়বরাদ্দ হয়েছে নিশ্চয়!

তোটক হাসে। বলে, 'সকল পক্ষী মৎস্যভক্ষি', মাছরাঙাই কলঙ্কিনী।' ....শুধু নগেন মহাশয় কেন? ধাপে ধাপে অনেক পকেটেই যাবে কিছু কিছু। আহা। এটা ভেবেও কিন্তু এক এক সময় প্রাণে বেশ বেদনা অনুভব করি! ভাগে ভাগে ভাগ করতে করতে কার ভাগে আর কতটুকু পড়ে?

তা বটে। সমস্ত বিভাগেই তো একটা 'চেন'-এর কারবার। উঁচুতলা থেকে নেহাৎ নীচুতলা পর্যন্ত সবাই সেই 'চেন'-এ আটকা পড়ে আছে।

পাপিয়া হতাশ গলায় বলে, সত্যি ভাবলে এতো খারাপ লাগে। যেখানে যতটা বরাদ্দ, তার সবটাই যদি যারা সত্যি পাবার তারা সবটা পেত! তাহলে—

সবটা! হায় অবোধ বালিকা।

শৌভনিক বলে, অর্ধেকটাও যদি পেত, কৃতার্থ হয়ে যেত! টি. বি. হসপিটালের পেশেন্টদের 'মিল' থেকে কীভাবে ভাগবাঁটোয়ারা হয়, শুনেছিলি তো?

আচ্ছা শৌভনিক, মানুষ এতো লোভী কেন বল্‌ তো?

পাপিয়ার এই সত্যিকার বেদনার্ত হতাশ প্রশ্নে কিন্তু বাকিরা সশব্দে হেসে ওঠে।

মিস মুখার্জি! আপনি এতো ইনোসেন্ট কেন বলুন তো?

কাজ করতে এসেছে। অথচ না আছে কাজের পরিবেশ, না আছে কাজের উপযুক্ত উপকরণ।

সংশ্লিষ্ট জনেদের সহযোগিতাহীনতাও লক্ষণীয়।

পাপিয়া বিরক্তভাবে বলে, আচ্ছা, আমরা কী এখানে কোনো বিয়ের বরযাত্রী হয়ে এসেছি নাকি? আমাদের থাকা-খাওয়ার যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, কেবল সেই ব্যবস্থাই দেখছি। চল্ শৌভনিক, একটু এমনি বেড়িয়ে আসা যাক। এসে পর্যন্ত তো এই একটা জায়গাতেই পাক খাওয়া হচ্ছে। খুব ভিতরের দিকে, নেহাৎ গণ্ডগ্রামের মধ্যে কোথাও চলে গিয়ে—

বাকি তিনজন, এবং ওদের সঙ্গে আমাদের মধ্যে ক'জনের দলের সুকুমার আর অনীশ বলে ওঠে, ওঃ বাবা, যা কঠিন পথ ওখানকার! চড়াই উৎরাই। তাছাড়া রোদ চড়া হয়ে উঠল বলে—

তাবলে এইভাবে বসে বসে! কোনো মানে হয় না। এই শৌভনিক, তুই তো সেই করে যেন পদব্রজে বঙ্গদর্শন না কিসে নাম লিখিয়েছিলি!

হুঁঃ। ক্লাস নাইনে, ওই নামই লিখিয়েছিলাম, শেষ পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল?

হয়নি তা জানি। ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ জ্বরে পড়ে গিয়েছিলি। তা যাকগে, সেই অসমাপ্ত ব্রতটা সমাপ্ত করবি চল্।

শৌভনিক দুষ্ট হেসে বলে, শুধু দুজনে? তাও অজানা পথে? যদি জ্যেঠুর হার্ট অ্যাটাক হয়ে যায়?

আঃ। বেশী বাজে কথা বলবি না। একেই তো আমায় হারেমে ঢুকিয়ে ফেলে জীবন মহানিশা করে তুলেছেন ভদ্রলোক। তার ওপর অতি যত্নের বাড়াবাড়ি। তাছাড়া—

পাপিয়া উদাস উদাস গলায় বলে, চোখের সামনে একটা প্রতিকারের উপায়হীন অন্যায় অবিচার দেখা যে কী কষ্ট। সেই ছোট ছেলেটার কথা বলেছিলাম মনে আছে? ইস, ওই রোগা হাড়জিরজিরে ছেলেটাকে দিয়ে যে কী অমানুষিক খাটায়। কুয়ার জল কোন গভীরে চলে গেছে, ওই ছেলেটাকে দিয়ে সেই জল টেনে তোলায়। ভাবতে পারিস?

অভাবিতও নয়। শহরেই কী দেখছি না অহরহ।

জানি। কিন্তু ছেলেটা এমন অদ্ভুত, ওই কষ্টের মধ্যেও সর্বদা দাঁত বার করেই আছে।

তার মানে কষ্টের বোধ নেই।

কী জানি কী! হয়তো তাই। একদিন হেসে হেসে বলেছিলাম, তোকে আমার খুব পছন্দ হয়েছে, আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। গেলে আমাদের বাড়ির সব্বাই খুব ভালবাসবে দেখিস। যাবি তো বল্? শুনে না হেসে গড়িয়ে পড়ল! বলে, ধ্যেৎ।

হ্যাঁ, সত্যিই একদিন বলেছিল পাপিয়া সেকথা।

পদ বলেছিল, ধ্যেৎ।

কেন? কেমন রেলগাড়ি চড়বি। কলকাতা দেখবি।

পদ অবলীলায় বলেছিল, আর উই গরুগুলনকে কে দেখা করবে? অ্যাঁ? ম্যাস্টোরবাবু? হি হি।

বাঃ। এখানে কী আর কোনো লোক নেই গরু চরাতে?

আছে তো কী? গরুগুলান ওদের চেনা-জানা? পদকে না দেখলে উয়াদের পেটে খড়-ভূষি ঢুকবে?

আর তারপরেই বলেছিল, ধুস। 'আরসা' ছেড়ে কোথাও থাকা করা যায়?

তখনি অবশ্য মনে হয়েছিল পাপিয়ার, তা ঠিক। সেটা বনের পাখিকে খাঁচায় ভরে আদর করার মতোই হবে ওর পক্ষে। কিন্তু ওর খাটুনিটা দেখলে ভীষণ মন খারাপ লাগে। অথচ ওই মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির সকলেই শুধু নয়, তিনি স্বয়ংও দিব্যি নির্বিকারভাবেই সেই ব্যবস্থা দেখেন,

এবং একটু ত্রুটি হলেই ধমক দিতেও কসুর করেন না। তবে হ্যাঁ, বড়জোর কখনো বলেন, খিদে লেগেছে? তালে কিছু খেয়ে নে। তাতেই কৃতার্থ পদ!

কত অল্পে সন্তুষ্ট এরা!

পাপিয়া বলল, কেউ না যাও, আমি একাই চললাম।

তারপর? রাস্তা হারিয়ে গেলে? তোকে তো কেউ বলতে আসবে না, পথিক. তুমি কী পথ হারাইয়াছো?

দ্যাখ্ শৌভনিক, মনে রাখিস তুই এখন একজন 'ডাক্তারবাবু'। এখনো এতো ছ্যাবলামার্কা থাকা চলে না। পথ হারালে, সবাই মিলে খুঁজতে বেরোবি। তবু .ছুটা হাঁটা হবে। ভাবনা নেই বাবা। বেশী দূর যাব না। বলে পাপিয়া এমনিই একটু এগোয়।

কিন্তু শৌভনিক সঙ্গে সঙ্গে আসে। বলে, বনেজঙ্গলে গিয়ে পড়ে যদি বাঘের পেটে চলে যাস, ফিরে গিয়ে মাসিমা-মেসোমশাইকে কী জবাব দেব?

ওঃ। বাঘের মুখ থেকে বাঁচাবি আমায়? অ্যাতো বাহাদুর!

তোটক একটু অর্থপূর্ণ হেসে বলে, বাঁচতে না পারুক, একসঙ্গে মরতে তো পারবেন!

ওদের দুজনকে নিয়ে এরা রীতিমতোই হাসি-কৌতুক করে! এবং ভাবে, বাল্যপ্রেম দানা বাঁধছে।

কিন্তু পাপিয়া? সে কী অন্যত্র বাঁধা পড়ে নেই?

কিন্তু আজ পাপিয়াকে এমন জোর করে ঠেলে পথে বার করল কে? সে কী তার ভাগ্য? না নিয়তি?

তাই এলোমেলো খানিকটা ঘুরে শৌভনিক যখন বলে ওঠে, অনেক বেড়ানো হয়েছে, এবার ফেরা যাক। ঠিক তখনি পাপিয়া হঠাৎ এবড়ো-খেবড়ো উঁচু-নীচু রাস্তায় প্রায় ছুটতেই থাকে। আর অভীষ্ট জায়গায় পৌঁছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বলে, তুমি। এখানে।

॥ আঠারো ॥

তুমি! এখানে!

প্রশ্ন নয়, যেন রুক্ষ বালিয়াড়ির ওপর হঠাৎ আছড়ে এসে পড়া ঝড়ের সমুদ্রের একটা উদ্বেল ঢেউ। সেই ঝড়টা বিস্ময়ের ক্ষোভের উত্তেজনার, হয়তো বা ধিক্কারেরও, আর তার সঙ্গে অপ্রত্যাশিত একটা আনন্দের।

যাকে প্রশ্ন করা হলো, তার মধ্যেও কী এই হঠাৎ আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ধাক্কায় একটা ঝড় উঠল না? বিচিত্র রসাস্বাদিত অনুভূতির ঝড়! তবু সে তার চিরস্বভাব মতো ভিতরের উদ্বেল ঢেউকে কণ্ট্রোলে রেখে অনুত্তেজিত গলায় বলল, এ প্রশ্নটা অবশ্য আমিও তোমায় করতে পারি!

আমাকে? আমার মধ্যে তো তোমার মতো কোনো রহস্য নেই। আমি তো—

সংক্ষেপে নিজের এখানে আসার কারণটা বিবৃত করে পাপিয়া আরো ক্ষুব্ধ উত্তেজিত স্বরে বলে, কিন্তু তুমি কী বাপ্পাদা? তোমার ব্যাপারটা কী? কী সাংঘাতিক ছেলে তুমি।

বাপ্পা সেইভাবেই বলে, সে পরিচয় তো অনেকদিন আগেই পাওয়া হয়ে গেছে!

সে একরকম! তবু তো বাড়িতে থেকে টেকে—কিন্তু এটা কী? এর কোনো মানে আছে? আশ্চর্য! এভাবে নিখোঁজ নিরুদ্দেশ হয়ে চলে এসে—বাড়ির লোকেদের কথা একবারও মনে পড়ল না বাপ্পাদা? মনে হলো না তোমার এই অদ্ভুত খেয়ালের ফলে কী অবস্থা ঘটবে তাঁদের।

বাপ্পা এ ধিক্কারেও অবিচলিত ভাব বজায় রেখে বলে, আমার সম্বন্ধে অতো প্রশ্ন নেই। এই পাষণ্ড পামর ছেলেটাকে তাঁরা অনেকদিন আগেই খরচের খাতায় লিখে রেখেছেন।

সহজে উত্তেজিত হবার মেয়ে নয় পাপিয়া, হয়তো বা আদৌ উত্তেজিত হবার নয়, কিন্তু এখন এই অপ্রত্যাশিত জায়গায় হঠাৎ অভাবিত একটা হারানো জনের দেখা পেয়ে গিয়ে পাপিয়া যেন তার স্বভাবের বাইরে এসে পড়েছে।

উত্তেজনায় পাপিয়ার ঠোঁট কাঁপছে, হাত-পা কাঁপছে, হাতের তালু ভীষণভাবে ঘামছে। পাপিয়া ওই অদ্ভুত সাজে সজ্জিত লোকটার দিকে তাকিয়ে আরো বিচলিত হচ্ছে।

এই সেই বাপ্পাদা!

ইদানীং অনেক অনিয়ম বেনিয়ম আর শরীরের ওপর অত্যাচারের ফলে তার সেই রাজকীয় চেহারাটার বারোটা বেজে গেছে অনেকদিন। তারকের মায়ের ভাষায়, 'সায়েবের মতো রং তাঁবার মতো হয়ে গেছে যে গো।—' তবু তার সেই দীর্ঘোন্নত গঠনভঙ্গী, আর ধারালো কাটানো মুখের ছাঁচে পাবনার সত্যব্রত গাঙ্গুলীর যে সাদৃশ্যটুকু বজায় ছিলো, তার থেকেই সনাক্তকরণ। দূরে থেকেও।

হয়তো আশেপাশে ভিড় করে থাকা একদল দেহাতি মানুষদের মধ্যে মাথাটা অনেকখানি উঁচু বলেই, দূরে থেকেও মুখ দেখা গেছে। ওই অদ্ভুত সাজ সত্ত্বেও।

তা অদ্ভুত বৈকি! বাপ্পার পরনে একটা ডোরাকাটা পায়জামা, গায়ে একটা ছাইরঙা মোটা কাপড়ের পাঞ্জাবি, পায়ে একটা বিধ্বস্ত বিবর্ণ চপ্পল, যেটার নাকি একদার নাম ছিলো 'কাবুলী'!

আর বাপ্পার মাথায় ছিলো একটা খেজুরপাতায় বানানো 'হ্যাট'। হ্যাঁ, এরা 'হ্যাটই' বলে। তবে গবেষণা করলে বোঝা যায়, এটা ইচ্ছে এদের চিরকালীন 'টোকার' একটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। টোকার অসুবিধে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় উড়ে যেতে পারে, কিন্তু একে একটি বন্ধনডোর দিয়ে চিবুকের নীচেয় আটকানোর ব্যবস্থা আছে। বোধকরি সেই কারণেই ওর ওই নাম-গৌরব।

বাপ্পার একরাশ রুক্ষ চুল মাথা ছাড়িয়ে ঘাড়ে নেমে আসতে চাইছে, আর গালভর্তি দাড়ি জানান দিচ্ছে— এখানে দাড়ি কামানোর মতো বিলাসিতার অভ্যাসটা বজায় রাখেনি বাপ্পা।

দাড়ির প্রথম আবির্ভাবের কিছুদিন পর বাপ্পা একবার চেষ্টিত হয়েছিল দাড়ি রাখতে, শখে বা নিত্য ঝঞ্ঝাটের দায় এড়াতে কিনা কে জানে! কিন্তু নিজের অস্বস্তিতেই সে ইচ্ছেটা বাতিল করেছিলো। বলেছিলো, নাঃ। পোষাবে না। মুখটাকে ক্লীয়ার করে মোছা যায় না।

কিন্তু এখন বাপ্পার গালভর্তি দাড়ি।

তবু পাপিয়া দূর থেকে দেখেও চিনে ফেলে শৌভনিককে একেবারে ভুলে গিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসেছে। এবং এখনো সেই ভুলে যাওয়াটাই রয়েছে। পাপিয়ার মনেও পড়ছে না বেশ কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে শৌভনিক তাকে অবলোকন করে চলেছে।

কিন্তু শুধু কী ওইটুকুই ভুলে বসেছে পাপিয়া? পাপিয়া তো এও ভুলে গেছে, বাপ্পার সঙ্গে তার সম্পর্কের সূত্র কতটুকু, আর সেইটুকুর জোরে কতটা পর্যন্ত যাওয়া চলে। কোনখান পর্যন্ত টানা আছে তার অধিকারের সীমারেখা!

ভুলে গেছে বলেই পাপিয়া রুদ্ধ স্বরকে জোর করে 'ক্রুদ্ধ'য় পরিণত করে বলে ওঠে, ওই বলে গা ঝাড়া দিতে চাইছো বাপ্পাদা? তুমি কী ইঁট-পাথর না লোহা-লক্কড়?

বাপ্পা পাপিয়ার ওই ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ উত্তেজিত মূর্তিটার দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হয় বৈকি। এই ভঙ্গি এই স্বর অবশ্যই নীহারিকাকে মানাতো, হয়তো টুসকিকেও, কিন্তু পিসির বাড়ির এই মেয়েটা? ও কেন?

ছেলোবেলায় চঞ্চল অস্থির বাকাবাগীশ যাই থাকুক, বড় হয়ে তো অতি শান্ত নম্র স্থির একখানা

মেয়ের রূপেই দেখা গেছে। তবে হ্যাঁ, বাপ্পার মাথা ফাটার সময় নার্সিংহোমে যে ক'দিন পিসির সঙ্গে এসেছে কিংবা ঠিক বলা হয়, পিসিকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তখন যেন মেয়েটার চাহনির মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ একটা গভীর অতলস্পর্শতা দেখে একটু আশ্চর্য হয়েছে। এ চাহনি যেন অন্য এক লোকের।

এমনকি পিসির সঙ্গে কথা কইতে কইতে ও যেন অনুভব করেছে, একজোড়া গভীর কালো অতলস্পর্শী চোখ বাপ্পার মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে।

চাহনিরও একটা অনুভূতি আছে বৈকি! স্পর্শানুভূতির থেকে খুব কম নয়।

তবে তখন বাপ্পা ওই অপ্রয়োজনীয় চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেছিল। ভেবেছিল, হঠাৎ বড় হয়ে উঠলেই বোধহয় মেয়েদের চোখের চাওয়ার ভঙ্গিটঙ্গিগুলো বদলে যায়।

কিন্তু এখন? এখন তো হঠাৎ বড় হয়ে ওঠার ব্যাপার নয়।

এখন তাই বাপ্পাকে ওই দৃষ্টিটা যেন অস্বস্তিতে ফেলে। বাপ্পা অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দেয়, হয়তো তাই। মাও যখন তখন এই কথাটা বলতো বটে।।

তারপরই তাড়াতাড়ি বলে, কিন্তু এই রোদের মধ্যে এভাবে দাঁড়িয়ে—

পাপিয়া এখন স্থির গলায় বলে, নিজেকে তো ইঁট-পাথর লোহা-লক্কড়ের সমগোত্র বলেই স্বীকার করলে বাপ্পাদা। তাহলে আর এ চিন্তা কেন? রোদ-বৃষ্টি-ঝড় কিছুতেই এসে যাবে না আমার। আমি শুধু জানতে চাই, খুনী আসামীর মতো এভাবে পালিয়ে এসে লুকিয়ে থাকার মানেটা কী?

আমি তা বরাবরই মানেহীন কাজই করে আসছি বাবা।

পাপিয়া সেই নিজের অধিকারটা ভুলে যাওয়া অবস্থাতেই প্রায় ধমক দেওয়ার সুরে বলে, থামো। কথার প্যাঁচ মেরে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা কোরো না। জানো তোমার জন্যে তোমাদের বাড়ির কী অবস্থা! তুমি হাসপাতাল থেকে হারিয়ে গেছ এই খবরটা শুনে তোমার বাবা হার্ট অ্যাটাক হয়ে—

বাবা।

বাপ্পা যেন বিহ্বল হয়। বাবার আবার তার সম্পর্কে এতোটা সেন্টিমেন্ট ছিলো কবে। যদি মায়ের কথা বলতো তাও বোঝা যেত। কিন্তু পাপিয়া নামের ওই স্বভাবছাড়া উত্তেজিত হয়ে ওঠা মেয়েটা কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেল কেন?

বাপ্পার বুকের মধ্যেটা যেন আচমকা ঠাণ্ডা মেরে গেল। তাই শুধু ভাবশূন্য গলায় উচ্চারণ করল, 'বাবা'।

পাপিয়াও অবশ্য হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে আসা কণ্ঠকে আবার মুক্ত করে আস্তে বলে, বেশ কিছুদিন ইনসেনটিভ কেয়ারে থাকতে হয়েছিল। এখনো প্রায় বেডরিডন অবস্থায়। সংসার চালাবার জন্যে তোমার দাদুকে এখন আবার নতুন করে কোর্টে বেরোতে হচ্ছে। সবের মূলে তোমার এই দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ বাপ্পাদা। অবশ্য বলতে পারো আমি এতো কথা শোনাবার কে? আমার কী রাইট আছে? কিন্তু—

বাপ্পা হঠাৎ একটু সরে এসে গভীর গলায় বলে, ছিঃ পাপিয়া!

পাপিয়া। এই নামটা ধরে সেই ছেলেবেলার পর আর কোনোদিন ডেকেছে বাপ্পা?

বাপ্পার নিজের কানেই যেন কেমন অদ্ভুত লাগল। আর যে শুনল? তার মধ্যে এক প্রবল আলোড়ন ওঠে। সেই আবেগের ভার তারও নিজের কাছে নতুন।

অথচ পরিবেশটি আবেগের পক্ষে একদম হাস্যকর। মাথার ওপর প্রখর রোদ (শৌখিন ছাতায় অথবা খেজুর পাতার হ্যাটে কতটা রক্ষা হয়?), আশেপাশে তৃণশূন্য রুক্ষ পাথুরে ভূমি! অদূরে একদল দেহাতি লোক তাদের শিক্ষাদাতা গুরুকে আচমকা এক রমণী কেড়ে নেওয়ায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে থেকে, ক্রমে সবাই উবু হয়ে বসে পড়েছে।

ওদিকে শৌভনিকও অবলোকন করতে করতে ক্রমশঃ কেমন একটা সন্দেহে পৌঁছে গিয়ে ভাবতে শুরু করেছে, এগিয়ে গিয়ে জিগ্যেস করবে কিনা পাপিয়ার কী দেরি হবে?

এমনি মহামুহূর্তে কোন দিক থেকে যেন নাটকের আর এক নট এসে হাজির হয়ে বলে ওঠে, পাপিয়া দিদিমণি! আপনি!

ফেরার সময় শৌভনিক বলে, ওই অদ্ভুতদর্শন ব্যক্তিটির সঙ্গে যেরকম মশগুল হয়ে গিছলি, আমি তো ভাবলাম ফিরেই যাই। তুই বোধহয় আর ফিরতে পারবি না।

গেলেই পারতিস। তোকে তো আমার বডিগার্ড হয়ে আসতে বলেনি কেউ। এমন বোকার মতো কথা বলিস! ওকে তুই দেখিসনি কখনো?

জীবনেও না।

জীবনেও না? খোকনদার মামাতো ভাই না? বলতে গেলে আমাদেরও। আগে তো কত এসেছে আমাদের বাড়িতে। ইদানীং অবশ্য পার্টি-ফার্টিতে মিশে অনেক ইতিহাস সৃষ্টি করে, হসপিটাল থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলো। ওদের বাড়ির অবস্থা—মানে বড়মার বাপের বাড়ির অবস্থাটা ভেবে দ্যাখ। এতোদিন পরে হঠাৎ দেখতে পেয়ে ভাবছিলাম তো ধরে টেনেই নিয়ে এসে ওর বাড়িতে পৌঁছে দিইগে।

বড় বেশী কথা বলে ফেলল না পাপিয়া?

এখন কী এতো কথা কইবার মতো অবস্থা ছিলো ওর?

ছিলো না। আর ছিলো না বলেই বুঝি স্বভাববিরুদ্ধভাবেই এতো কথার চাষ চালিয়ে চলেছে। ভয় হচ্ছে স্তব্ধ থাকলেই বুঝি বাইরে থেকে পাপিয়ার মনের মধ্যেকার তুমুল আলোড়নটা দেখতে পাওয়া যাবে। অতএব কথাই ভালো। কথাই আবরণ। কথাই আত্মরক্ষার অস্ত্র। অতি সহজ ভঙ্গির তড়বড়িয়ে কথা বলে অপর ব্যক্তির সন্দেহ সন্দেহ ভাবটাকে উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে যাওয়া যাবে।

শৌভনিক এখন বলল, ও। তোর বড়মার সেই পার্টিপ্রেমী ভাইপোটি? নিরুদ্দেশের খবরটা যেন শুনেছিলাম মনে হচ্ছে। যাক। ঝটপট খবরটা তাদের কাছে পৌছে দে। তা নিরুদ্দেশ হওয়ার উদ্দেশ্যটা কী? কোনো খুনখারাপির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েননি তো মহাশয়।

আঃ, শৌভনিক। ছোটলোকের মতো কথা বলিস না।

আরে ব্বাস। খুব টেনশনে রয়েছিস মনে হচ্ছে।

আছিই তো। ভাব তো, যদি আমি ওদের বাড়িতে খবর দিয়ে বলি এখানে রয়েছে, আর তাঁরা ছুটে আসেন। আর সেই অবকাশে মহাশয় ব্যক্তিটি আবাব উড়ে পালান!

তা এতো ওড়াউড়ির রহস্যটা কী?

অন্য কিছুই না, বাড়ির লোক পাছে আটকায়। ওর নিজস্ব জীবনদর্শনে বাধা পড়ে।

হ্যাঁ, সারাপথটাই কথা বলতে বলতে এসেছে পাপিয়া।

সে কী শুধুই শৌভনিকের সন্দেহ নিরসনের জন্য? নাকি ঠিক এই মুহূর্তে নিজের মনের মুখোমুখি হতেও সাহস হচ্ছে না বলে?

বাপ্পা নামের ওই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে পাপিয়ার মধ্যে যে সমুদ্র উথলে উঠবে এমন কথা কী আর কল্পনাতেও ছিল? পাপিয়া তো শুধু ওই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বাবদ, তার পরম ভালোবাসার 'বড়মা'র মনোকষ্ট আর তাঁর বাপের বাড়ির দুঃখ-বেদনার কথা ভেবেই সর্বদা ওই পালানো লোকটার ফিরে আসার প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে।

বাপ্পা নামের ওই নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ছেলেটাকে হঠাৎ দেখতে পেয়ে পাপিয়ার মধ্যে যে সমুদ্র উথলে উঠবে এমন কথা কী তার কল্পনাতেও ছিল ? পাপিয়া তো শুধু নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া বাবদ তার পরম ভালোবাসার 'বড়মা'র মনোকষ্ট আর তাঁর বাপের বাড়ির দুঃখ বেদনার কথা ভেবেই সর্বদা ওই পালানো লোকটার ফিরে আসার প্রার্থনা করেছে ঈশ্বরের কাছে। এর বেশী কিছু, এমন ধারণা পাপিয়ার নিজের মধ্যে তো ছিলো না।

অথচ ! অথচ ওকে দেখামাত্র যেন পাপিয়ার মধ্যে সপ্তসিন্ধু উথলে উঠল। কথায় আছে, 'মনের অগোচর পাপ নেই।' তা একে যদি পাপ বলো তো পাপ।

পাপিয়ার তো বাপ্পাকে দেখামাত্রই 'বাপ্পাদা' বলে তার ও'প'ব আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হয়েছিল। পাপিয়া এখন সেই ভয়ঙ্কর ইচ্ছেটার কথা ভেবে অবাক হচ্ছে, 'ভয় পাচ্ছে।

পরবর্তী অবস্থা অবশ্য অন্যরকম।

পাপিয়া যখন বলে উঠেছিলো, তারক ! তুমি ' তুমি বাপ্পাদার সঙ্গে ?...এবং তারক অবলীলায় উত্তর দিয়েছিল, তা রামচন্দ্র যেখেনে, হনুমানও সেখেনে—তখন পাপিয়া তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠেছিলো, তোমরা দুজনেই সমান নিষ্ঠুর আর বিশ্বাসঘাতক।

আর তারপর বাপ্পার সঙ্গে তর্ক চালিয়েছিলো তেমনি তীক্ষ্ণস্বরে, আর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে।

কিন্তু সেটা কোথায় ?

সেই রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ?

নঃ, তা নয় অবশ্য।

বসবার জায়গা জুটেছিলো। সময়ও।

তাহলে কী পাপিয়ার একান্ত অনুরোধ রেখেছিলো বাপ্পা নামের ওই নির্মায়িক ছেলেটা ? দেখা করেছিলো সেই হেডমাস্টার গোপীমোহন পাড়ুইয়ের বাড়িতে গিয়ে ?

তা বলে তা নয়।

বাপ্পা সেই ছেলে না কী ?

অথচ বাপ্পার মধ্যেও হঠাৎ খুব একটা অস্থিরতা এসেছিলো পাপিয়াকে দেখে। খুব আকুলতা এসেছিলো, এই কথা ভেবে পাপিয়াকে বসতে বলার কোনো জায়গা নেই সেখানে। তার মানে দুচারটে বাক্য বিনিময়ের পরই চোখের সামনে থেকে অন্তর্হিত হয়ে যাবে ও। বলল, 'আর দু দিন পরেই তল্পি গোটাতে হবে।' তাহলে আর কখন দেখা হবে ?

কিন্তু যখন পাপিয়া তারককে দেখে, ওদের অনেক কথা শুনিয়ে দিয়ে বলেছিলো, একটু মানুষের মতো ব্যবহার কোরো বাপ্পাদা। আমার আস্তানার ঠিকানাটা জেনে নাও। কাল নিশ্চয় করে যেতে হবে। না না। ভয় পেও না, 'খেতে হবে' এমন কথা বলছি না, শুধু যেও। অনেক খবর দেবার আছে বাপ্পাদা। অনেক কথা জানাবার আছে।

তখনই বাপ্পা স্থির করে ফেলেছিলো, নাঃ। যাওয়া-টাওয়া নয়।

যাওয়া নিজের ওপর একটা কঠোরতার আবরণ দিয়ে নিজেকে আর সকলের থেকে অন্যরকম ভাবতে অভ্যস্ত হয়, তাদের মধ্যে সর্বদাই ভয়, ওই বুঝি শিথিল হয়ে গেল সেই কঠোর আবরণ।

অতএব মনের মধ্যে একটু কোমলতা উঁকি মারলেই চটপট সাবধান হতে চেষ্টা করে সে। বাড়িতেও তো--মায়ের সঙ্গে অমন মমতাশূন্য ব্যবহার করতো কেন বাপ্পা ?.....বাবার সঙ্গে অতো নির্লিপ্ত আচরণ। আর টুসকি ? মমতায় পড়ে তাকে একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেই সামলে নিত নিজেকে। তক্ষুণি কঠিন ভাব দেখাতো !

এখনো তাই হলো।

মনটা যখন একান্তভাবে সেই ঠিকানায় পৌঁছে যেতে চাইল, তক্ষুণি ঠিক করে ফেলল, নাঃ! 'হৃদয়' নামক বস্তুটাকে কঠোর করতে হবে।

কিন্তু পাপিয়ার তো কঠোরতার সাধনা নয়।

পাপিয়ার সাধনা এখন শুধু নিজেকে সামলানোর। তাই পাপিয়া পরদিন সকালটা কোনোমতে অপেক্ষা করেই বেরিয়ে পড়েছিলো তারকের দেখিয়ে দেওয়া তাদের দুজনের সেই আস্তানাটার উদ্দেশে। রামচন্দ্র আর হনুমানের যেখানে অবস্থান, সেটা প্রায় হনুমানজনোচিতই।....পাবনার গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলের নয়।

দেহাতিদের যেমন কুঁড়েঘর থাকে, তেমনি একখানা কুঁড়েঘর। মাটির দেওয়াল, খেজুরপাতা না তালপাতা পানপাতা কিসের যেন ছাউনি। তবু তারকের 'গৃহিণীপনায়' তার মধ্যে পরিপাটি। এবং রান্নাবান্নারও ব্যবস্থা।

বাপ্পা জানে না কোথা থেকে খাবার জল নিয়ে এসে মাটির কলসীতে ভরে ঠাণ্ডা রাখে তারক। এবং আহারের আয়োজনটাই বা কী ভাবে হয়!

আচ্ছা তারক। এই খাওয়া-দাওয়াটা কী ভাবে চলছে বল তো? আমি তো ভেবে পাই না।

রামচন্দ্রের প্রশ্নে হনুমান অবজ্ঞায় ঠোঁট উল্টে বলে, খাওয়া-দাওয়া। হ্যাৎ! দুবেলা দুটো করে চাল সেদ্ধ করা। তাও চালের কী ছিরি। আর তরকারির মধ্যে শুধু কুমড়ো আর ধুঁধুঁল। দেখলে ঘেন্না করে। হাতে করে ধরে দিতে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। থাক বাবা, কেটে ফেলিস না। তাহলেই গেছি। তবু দুবেলা ওই চালই বা আসে কোথা থেকে?

তা আসে। হনুমান ছাড়াও আরো ভক্ত আছে বৈকি রামচন্দ্রের। কাঠ বেড়ালীটাও। তাদের পরম ভক্তিতে নিবেদন করা নৈবেদ্যতেই চলে যাচ্ছে এখানে এসে পর্যন্ত।

কেমন করেই যে এমন ঘটনাটা ঘটে গেছে!

এই দেহাতি বস্তিতে বাপ্পা প্রায় ভগবানের পোস্টটা পেয়ে গেছে। তাদের ভালোবাসার দানও তো এই কুঁড়ে।

রুদ্ধ একটা অভিমান ভিতরে ভরে রেখেও পাপিয়া সাবলীলভাবে জোর গলায় বলে উঠল, খুব তো গেলে বাপ্পাদা। সকাল থেকে হাঁ করে বসে থেকে—

তারক জল আনতে যাচ্ছিল, পাপিয়াকে দেখেই থমকে বলে উঠল, হলো তো! দেখলেন তো বড়দাবাবু? তারক বলে নাই, না যাওয়াটা খারাপ দেখাবে বড়দাবাবু। পাপিয়াদি অতো করে বলে গ্যালো। কলকাতায় ফিরে গিয়ে তো উনি তোমার কথা প্রকাশ করে দেবেনই, তবে আর একটু ভদ্দরতা করতে দোষ কী? যাক, বসেন পাপিয়াদি। জলটা নিয়ে আসি।

পাপিয়া চারিদিক তাকিয়ে বলেছিলো, এই ঘর!

বাপ্পা তার অভদ্রতা সম্পর্কে সমস্ত অভিযোগটি হাস্যবদনে হজম করেই হাসিমুখে বলেছিলো, কেন খারাপটাই বা কী? আমাদের শহর কলকাতায়ও তো সকলের ভাগ্যে এমন একটা ঘর জোটে না। ফুটপাথে পড়ে থেকে 'স্টোনম্যানের' শিকার হতে হয়।

বাপ্পাদা। কথামালার গল্প সকলেরই পড়া আছে। খলের ছলের অভাব হয় না। যারা ফুটপাথে পড়ে থাকতে বাধ্য হয়ে স্টোনম্যানের শিকার হয় তারা তাদের প্রাসাদ ছেড়ে এসে ফুটপাথে শুতে আসে না। অভাবে পড়েই পড়ে থাকে। কিন্তু তুমি?

হ্যাঁ। পাপিয়া অবশ্যই তার অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছে! পাপিয়া বাপ্পাকে এভাবে অভিযুক্ত

করতে পারে, এমন সম্পর্ক নয়। কিন্তু গঙ্গায় যখন জোয়ার আসে? নদীতে যখন বান ডাকে? সে কী ভাবতে বসে সে তার সীমা লঙ্ঘন করছে?

করে না।

তাই পাপিয়াও তা করছে না। তাই সে রুষ্ট ক্ষুব্ধ মুখে চোখের মধ্যে আগুন আর জল দুটোর সঞ্চয় রেখেই বলে চলেছে, কিন্তু তুমি? তুমি কী জন্যে? কী রাজকার্য করছো তুমি এই পাতার কুঁড়েয় লুকিয়ে বসে থেকে?

বাপ্পাও একটু চড়ে ওঠে, লুকিয়ে আবার কী? আমি কী ফেরারি আসামী? যে লুকিয়ে?

আচরণটা তো ফেরারি আসামীর মতোই বাপ্পাদা। লোকে তো তেমন সন্দেহ করতে শুরু করছেও। তো এখানে কী ব্রত? মহান একটা ব্রত না নিলে তো কেউ এতোখানি কৃচ্ছ্রসাধন করতে পারে না। এই শান্ত নিরীহ অবোধ আর সুখী প্রাণীগুলোর মধ্যে বুঝি বিপ্লবের স্বপ্ন জাগিয়ে তুলছো? তাদের শান্তি আর সুখটুকু কেড়ে নিতে চাইছো?

আর কেউ হলে, অন্তত নিজের বোন হলে বাপ্পা নিশ্চয় তাকে একটা কঠোর নির্মম অবহেলার কথা বলে, এক মিনিটে থামিয়ে দিত, কিন্তু এ তো তা নয়। এ পরের বাড়ির মেয়ে।

আর? আর এর মোমে গড়া মসৃণশুভ্র মুখ... বাড়তি রক্তোচ্ছ্বাসে লাল লাল, এর বরাবরের শান্ত আয়ত দুটো চোখে এখন একই সঙ্গে জল আর আগুন।

তাই বাপ্পা নিজেকে সংবরণ করে ব্যঙ্গের সুরে বলে, সুখ! শান্তি! তা অবোধেরাও একরকম সুখ শান্তিতে থাকে বটে। ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়ে থাকলেও শান্তিতে থাকে।

বেশ তো, তাই যদি হয়, থাক না সেই ঘুমন্ত শান্তিতেই। তোমার হাতে কে এই 'ভুবনের ভার' দিয়ে রেখেছে বাপ্পাদা? তোমাদেরও তো একসময় বিপ্লবের বাণী শুনিয়ে, নতুন জগৎ গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখিয়ে দেখিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে ছন্নছাড়া করে দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু তারপর? এই এক যুগের এক্সপিরিয়েন্সে ভেবে দেখেছো কোনোদিন, তারপর কী পেলে?

যারা সবসময় টাকা আনা পাইয়েব হিসেব কষে দেখে—'কী দিলাম, আর তার বদলে কী পেলাম' তাদের সঙ্গে সকলের মত নাও মিলতে পারে।

ইঙ্গিতটা অপমানজনক।

তাই লাল লাল মুখটা আরো লাল হয়ে ওঠে, সে হিসেব কষার কথা হয়তো মনে আসতো না বাপ্পাদা, যদি না চোখের ওপর দেখতে হতো 'কুমির কুমির' খেলা করতে, অবোধ দলটাকে জলে নামিয়ে কুমিরের মুখে ছেড়ে দিয়ে, বুদ্ধিমানেরা নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে, নিজেদের জন্যে পাথরের দুর্গ বানিয়ে বসে আমীরী চাল চালতো। বাপ্পাদা। তোমাদের না স্লোগান ছিলো, 'বড়লোকের চামড়া ছাড়িয়ে গরীবের জুতো বানানো হবে।'....চোরাকারবারী কালোবাজারী আর ঘুষখোরদের 'শেষের সেদিন' দেখিয়ে দেবে। নেহাৎ ছোট ছিলাম না তখন। কানে এসেছে বৈকি। আর এখনো বোধহয় কৌটো বাজানোর শব্দটা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কী অবস্থা দেখছো তোমার নেতাদের? জনদরদী গরীবের বন্ধু সর্বহারাদের নেতাদের?

কেউ কেউ আদর্শচ্যুত হয়, সবাইকেই তাই হতে হবে?

হয়তো তা হবে না। কিন্তু আসলে যদি দেখা যায় সেই আদর্শের ভেতরটা স্রেফ ফাঁপা? গদির মোহ সব আদর্শ আর তত্ত্বকে জলাঞ্জলি পাঠিয়ে দিয়েছে। তাহলে?

তাহলেও যে যার নিজের মতবাদে বিশ্বাসী থাকতে পারে।

তার মানে, সে উটপাখির মতবাদে বিশ্বাসী। পাপিয়া যেন হাঁপিয়ে গেছে। যেমন হাঁপিয়ে যায় লোকে পাহাড়ি পথে চড়াই ভাঙতে হলে।

পাপিয়া কী হঠাৎ অসতর্কে একটা পাহাড়ি পথে এগিয়ে এসেছে ? এখন দেখছে সামনে 'চড়াই'। দেখছে যখন, তখন সেই চড়াই তো ভাঙতেই হবে তাকে। তাই পাপিয়া বলে ওঠে, তার মানে সে উটপাখির মতবাদে বিশ্বাসী ! কিন্তু বাপ্পাদা, সবাই তো সে মতবাদে বিশ্বাসী নয়। তারা চড়া রোদে আলোটা দেখতে পায়। তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করতে রাজী হয় না। সবাইকে শোনানো হয়েছিলো, এ বিপ্লবে সবাই সমান মর্যাদায় বাঁচতে পাবে। রাজ্য থেকে নিরক্ষরতা দূর করা হবে। অভাগা জনগণকে দারিদ্র্যসীমার ওপরে তুলে আনা হবে। বঞ্চিত শোষিত শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ দেখতে বাধ্য করতে হবে মালিককে। এমনি আরো কত কত আশ্বাসের কথা। কিন্তু বাপ্পাদা ! তুমিই বলো, রাজ্যের প্রজারা এই এক যুগ ধরে ক্রমশঃ কী দেখছে ? বলো বলতেই হবে তোমায়, যা দেখছে তা কি ওইসব 'প্রমিসের' সঙ্গে ঠিকঠাক মিলেছে ?... সবাই সমান মর্যাদায় বাঁচতে পারার নমুনা হচ্ছে ? নেতাদের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স এতো বেশী বেড়ে যাচ্ছে যে, আর দেশের ব্যাঙ্কে কুলোচ্ছে না। তাই বিদেশী ব্যাঙ্কের শরণ নিতে হচ্ছে অনেক লুকোচুরির কৌশল অবলম্বন করে। কিন্তু গরীবরা ? যে তিমিরে সেই তিমিরেই। তবে যারা নেতাদের হাত শক্ত করবার কাজে লাগবে, তাদের কথা আলাদা। তারা ক্ষমতা আর অর্থের অহঙ্কারে রাজ্যে 'জগাই মাধাই'য়ের ভূমিকা নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা যত খারাপ কাজই করে চলুক, কোনো শাস্তি নেই। পুলিশ পর্যন্ত তাদের ভয় পায়। কারণ তারা নেতাদের ছাতার তলায় আছে। আর পুলিশ ? তারাও তো—

কথার মাঝখানে বাপ্পা তার ভারী ভারী গম্ভীর গলাতেও একটু ব্যঙ্গের ছুরির ধার মিশিয়ে বলে ওঠে, শুনলাম তো এতোদিন পড়াশুনো নিয়েই ছিলে। ডাক্তারি পাশ করেও বেরিয়েছো। তো বাংলা খবরের কাগজগুলো এতো মুখস্থ করবার সময় পেয়েছো কখন ?

বাপ্পাদা !

পাপিয়া আহতভাবে বলে, তোমার কাছ থেকে অন্ততঃ এরকম কথা শোনবার আশা করিনি। এসব অভিযোগ শুধু 'খবরের কাগজের' ? তোমাদের নিজেদের দৃষ্টিশক্তি বিচারবুদ্ধি কিছুই নেই ? নাকি তোমাদের সেই 'ব্রেন ওয়াশের' পদ্ধতির ফল ? না হলে এমন চোখ বুজে 'হরিনাম' করে চলার অভ্যাস জন্মায় ?....তোমার ওপর বরাবর—

পাপিয়া হঠাৎ থেমে যায়।

তারপর গলাটা ঝেড়ে নিয়ে বলে, দেখতে পাও না দেশে এ রাজ্যে নিরক্ষরতার সংখ্যাই বাড়বৃদ্ধির পথে। নতুন নতুন কলকারখানা খোলা তো দূরের কথা, গাদা-গাদা কারখানা লকআউট হয়ে পড়ে থাকার ফলে বহু শ্রমিকদের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। অভাবে অনাহারে আত্মহত্যা করছে। আর নেতারা কোটিপতি শিল্পপতিদের সঙ্গে, মানে যাদের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে গরীবের জুতো বানানোর স্লোগান দেওয়া হতো, তাদের সঙ্গে পাঁচতারা হোটেলে লাঞ্চ খাচ্ছেন, ডিনার খাচ্ছেন আর কনটেসা গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছেন। এগুলোর কিছুই চোখে পড়ে না তোমাদের বাপ্পাদা ? চোখে পড়ে না নেতাদের বিলাসিতার আর আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাত্রা ? তোমাদের সেই আগেকার নেতারা ভাবতে পারতেন, এতো বিলাসিতা, এতো আড়ম্বরের কথা ? ভাবতে পারতেন, নেতারা এমনভাবে গুছিয়ে নেবেন, যাতে সাত প্রজন্ম বসে খেতে পারবে। নেতাদের আত্মীয়জনেরা রাতারাতি লাখপতি কোটিপতি হয়ে যাবে। আর—রাজ্যের মানুষদের সত্যিকার ভালো করবার চিন্তা না করে শুধু 'পাইয়ে' দেওয়া আর 'খাইয়ে' দেওয়ার পথে, দলে টেনে রাখার পথটাই শ্রেয় হবে ! এসবই খবরের কাগজের কথা মুখস্থ করা ? নিজেদের মধ্যে কোনো চিন্তাভাবনা থাকে না কারুর ? বাপ্পাদা ! তোমরা আরামকে হারাম করে, আপনজনেদের সঙ্গে মায়ামমতা ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন করে কোন লক্ষ্যে পৌঁছতে যাচ্ছো, তোমরাই জানো। তোমাদের নেতা কর্তারা তো বেশ স্ত্রীপুত্র পরিবার শালা শালী নাতিনাতনী

নিয়ে জমজমাটি সংসার করতে অস্বস্তি পাচ্ছেন না! এঁদের সম্পর্কে তোমাদের এখনো মোহভঙ্গ হয়নি বাপ্পাদা?

বাপ্পা প্রশ্নকারিণীর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। হঠাৎ এই মেয়েটা এতো সাহসী হয়ে উঠল কখন? এতো সাহস যে বাপ্পাকে এ হেন প্রশ্ন করে বসে? আর কেউ হলে অবশ্যই বাপ্পা একটা তাচ্ছিল্যসূচক কড়া উত্তরে তাকে নস্যাৎ করে দিত। কিন্তু এখন ঠিক তেমনটা ইচ্ছে হলো না। দীর্ঘদিন পরে একটা আত্মীয় সম্পর্কিত মেয়েকে দেখেই কী কঠোর চিত্ত আদর্শবাদীর এই কোমলতাটুকু? তাছাড়া—শুধুই তো আত্মীয় ঘরের একটা মেয়ে মাত্র নয়। বিদূষী মেয়ে এবং ফুলের মতো দেখতে মেয়ে। পাপিয়াকে দেখলে বোঝবার উপায় নেই, ও এতোটা পথ পার হয়ে এসেছে। মনে হয় সবে স্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে বুঝি।

বাপ্পা তাই শুধু একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলে, ওইসব ফালতু কথা রেখে অন্য কথা বলবার থাকে তো বলো।

অন্য কথা?

হ্যাঁ। তোমার নিজের কথাই বলো না। কী রকম কাজকর্ম করলে—কোথায় কী রকম লোকজন দেখলে—

কী রকম কাজকর্ম করলাম?

পাপিয়া একটু হেসে বলে ওঠে, সর্বত্রই তো একই ইতিহাস বাপ্পাদা! 'দোয়াত আছে কালি নাই।'

মানে?

মানে? মানে স্কুল আছে মাস্টার নেই, হসপিটাল আছে ওষুধ নেই। আউটডোর আছে, পেশেণ্ট দেখতে ডাক্তার নেই। অতি দৈন্যদশাগ্রস্ত যে কটা বেড আছে হসপিটালে সেখানে জমাদার সাহেবের ফ্যামিলি বাস করেন, উইথ তাঁর পোষা জন্তুজানোয়ার। যেমন, মুরগী ছাগল শুয়োর কাজেই বেড-এ পেশেণ্ট নেই। এটা কিন্তু খবরের কাগজ পড়া খবর নয় বাপ্পাদা। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ।

বাপ্পা একটু রেগে গিয়ে বলে, অনেক জায়গায় গ্রাম পঞ্চায়েতে অঞ্চল সমিতিতে এই রকম কতকগুলো বাজে লোক ঢুকে এসে—

রাজ্যের যেখানে যা কিছু কর্মযজ্ঞের ব্যবস্থা রয়েছে সর্বত্রই ওইরকম বাজে লোকের ভিড় বাপ্পাদা! কাজের পরিবেশ কোথাও নেই। শুনলাম ঝালদা না কোথায় যেন অঞ্চল প্রধানের বিরাট সম্পত্তি, বাড়ি-বাগান, তাছাড়া কিছু ব্যবসাপত্র। এখানেও বেশ কিছু রয়েছে আর গ্রামের জন্যে বরাদ্দ ডিপ টিউবওয়েলটি তাঁর বাড়িতেই বসানো হয়েছে।

বাপ্পা রীতিমত অস্বস্তিবোধ করতে থাকে। এই মেয়েটা কী আর কোনো কথা বলবে না? বাপ্পাকে অ্যাটাক করতেই এসেছে? তারকটাই বা এতো দেরি করছে কেন? তৃতীয় ব্যক্তি থাকলে আলাপ-আলোচনার অনেক সুবিধে হয়।

হঠাৎ আঘাত দেওয়ার মনোভঙ্গীতে ব্যঙ্গে বলে ওঠে বাপ্পা, অনেকের এমন অভ্যাস আছে, যারা ভালো কিছু দেখতে পায় না, শুধু খারাপগুলোই দেখতে পায়।

কিন্তু পাপিয়া?

মোটেই আহতের ভঙ্গি নেই তার। এই তীব্র মন্তব্যের পর হেসে বলে ওঠে, ওঃ। বলছো 'মক্ষিকাব্রণমিচ্ছন্তি'। তাই হবে হয়তো। আচ্ছা বাপ্পাদা, একটা অন্য কথাই জিগ্যেস করি—একবারও তো কই তুমি তোমার বাড়ির খবর জানতে চাইলে না?

বাপ্পা চেষ্টা করেই হয়তো নিরাসক্ত গলায় বলে, বাড়ির খবর তো তুমি নিজে থেকেই জানালে।

শুধু ওইটুকু জানালেই হবে? তার বেশী কিছু না? তোমার একটা ছোট ভাই আছে, একটা

ছোট বোন আছে, নেহাৎ ভালোমানুষ বুড়োমানুষ দাদু-দিদা আছেন, যাঁরা রাতদিন তোমার জন্যে চোখের জল ফেলছেন, তাঁদের কথা একটুও জানতে ইচ্ছে হলো না?

এতো বেশী ইচ্ছের অধীন হলে জীবনে কোনো কাজ করা যায় না।

ঠিক। খুব ঠিক। কিন্তু সেই 'কাজ'টা সঠিক কিনা সেটা তো একটু ভেবে দেখা উচিত। মানবসেবাব্রত নাও, খুব ভালো। দুঃখী গরীব নিরুপায় নিরাশ্রয়দের জন্যে কাজ করো, নিশ্চয়ই সেটা মহৎ ব্রত। কিন্তু তুমি যে পথ বেছে এগিয়েছিলে, সেই প্রথটাই যে কাঁটাবনে গিয়ে হারিয়ে গেছে বাপ্পাদা। এই যে এতোদিন ধরে তোমরা যাদের নিয়ে কাজ করলে, তাদের চিরকালীন সরল গ্রাম্য মনের মধ্যে দুর্নীতির শিক্ষা আর ঔদ্ধত্যের শিক্ষা ছাড়া আর কী শিক্ষা দিতে পেরেছো? আবারও এখন নিজের জীবন ক্ষয় করে এই 'বন্য'দের শিক্ষা দিতে এসেছো! বেশ আছে এরা নিজেদের কুসংস্কার সুসংস্কার, ভালোমন্দ, গাঁও বুড়োর উপদেশ আর জড়িবুটির বিশ্বাস নিয়ে। ওদের এই চিরকালীন সন্তোষের মনটা, এমনকি ভালোবাসার মনটাও কেড়ে নিয়ে কী দিতে পারবে? কোন সত্য বিশ্বাস? মানুষ ক্রমশঃই ভালোবাসতে ভুলে যাচ্ছে। আর তোমাদের মতনরা? ভাবছে 'ভালোবাসা' জিনিসটা স্রেফ একটা দুর্বলতা। ওটাকে জীবন থেকে নির্বাসন দাও। কিন্তু জীবন তো একটাই বাপ্পাদা। সেই ভালোবাসাশূন্য জীবনটাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া কী সহজ?

বাপ্পাদের সাধনার মূলমন্ত্রটিই তো ছিলো স্নেহ-প্রেম-মমতা-মাধুর্য চিরন্তন সংস্কার চিরকালীন মূল্যবোধ আর ঈশ্বর-বিশ্বাস নামক বোকাটে জিনিসটাকে জীবন থেকে নির্বাসন দিয়ে সৈনিকের জীবন!

বাপ্পা সেই মূলমন্ত্রটিই হয়তো এখনো আঁকড়ে ধরে আছে, চোখের সামনে অনেক পটপরিবর্তন দেখেও! হয়তো সে পরিবর্তন তাকেও নাড়া দিয়েছিলো। তাই অন্যত্র সরে এসে আবার নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আত্মনিয়োগ করতে চাইছে।

হাজার হাজার মাইল দূর থেকে চলে আসা ধর্মযাজকরাও তো আপন অভ্যস্ত সভ্য জীবনযাত্রার আকাশ পাতাল জীবনে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে চলেন আপন ধর্মমত প্রচারকল্পে।

কিন্তু 'ধর্মমত' আর 'রাজনৈতিক মত' এ দুটোয় তফাৎ আছে বৈকি! একটা মত প্রচার করে থাকে সহিষ্ণুতার শিক্ষা, আর অপরটায় থাকে অসহিষ্ণুতার দীক্ষা।

বাপ্পা তো সেই দীক্ষাতেই দীক্ষিত।

বাপ্পাও তো ছেলেবেলায় কত সুন্দর ভালোবাসা-ভরা প্রাণ ছেলে ছিলো। সেই মমতা ভালোবাসার ফলশ্রুতিতেই তো 'তারক' নামের ছেলেটা চিরদিনের মতো নিজেকে 'বড়দাবাবুর' কাছে বিকিয়ে দিয়ে রেখেছে।

তা শুধু—এইখানটাতেই বোধহয় বাপ্পার 'দীক্ষা'জনিত শিক্ষাটা তেমন কাজে লাগেনি। তা ব্যতীত আর সব ক্ষেত্রেই বাপ্পা সেই দীক্ষাকে কাজে লাগিয়েছে।

বাপ্পা তাহলে আর কতক্ষণ পিসির বাড়ির ওই মেয়েটার বাচালতা সহ্য করবে?

বাপ্পা অতএব শক্ত গলায় বলে ওঠে, আচ্ছা তোমার সঙ্গে তো আমার এমন কিছু চেনাজানা নেই, হঠাৎ আমাকে নিয়ে মাথা ঘামাতে বসার কী দরকার পড়ল?

গলাটা শক্তই, তবে কথাগুলো বাপ্পার পক্ষে যতটা সম্ভব মোলায়েমই করেছে বলতে হবে।

এ প্রশ্নে পাপিয়া হঠাৎ খুব শান্ত আর স্থির হয়ে গেল। এবং প্রশ্নকারীর চোখের দিকে স্পষ্ট চোখে তাকিয়ে থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, যদি বলি 'আছে দরকার'!

সর্বনাশ। এ আবার কী কথা!

না না। এসব বলতে দেওয়া চলে না। বাপ্পা প্রায় ছটফটিয়ে ওঠে। আর সেই ছটফটে গলায় বলে ওঠে, না না। যতোসব অ্যাবসার্ড কথা! আমার ব্যাপারে কারো কোনো দরকার থাকতে পারে

না। আশ্চর্য! কোনো মানে হয় না।

তা আশ্চর্যই বৈকি। কোনো মানে না হবারই কথা। পাপিয়া এই হঠাৎ দেখা হয়ে যাবার আগে পর্যন্ত নিজেই কি জানতো ওই দীর্ণশীর্ণ রং জ্বলে-যাওয়া রুক্ষ শুকনো চেহারার লোকটাকে নিয়ে 'মাথাব্যথার' দরকার আছে তার? অথচ দেখে পর্যন্তই ভিতর থেকে উথলে উঠছে সেই দরকারটা।

পাপিয়া যেন এখন ভাবতেই পারছে না, একে এখানে এই পরিবেশে আর এই অবস্থায় ফেলে রেখে কালই ফিরে যাওয়া সম্ভব!

হ্যাঁ, ঠিক হয়ে গেছে আগামীকালই। যে দিনটা হাতে থেকে যাচ্ছিল, সেই দিনটাকে কাজে লাগাতে চাইছে, ওই অভিযাত্রী দল। একদিনের জন্যে রাঁচী বেড়িয়ে আসা স্থির করে ফেলেছে তোটক বিভাস শৌভনিকরা।

নাঃ। পাপিয়া যাবে না। পাপিয়া তো ওদের দলের মধ্যে নেইও। পাপিয়া তো গোপীমোহনের হেফাজতে। পাপিয়া কোনো ছুতো করে বেড়ানোটা অ্যাভয়েড করবে।

কিন্তু তাতেই বা কী? তার পরের দিন?

পাপিয়া নিজের মনের মধ্যেটা দেখে অবাক হয়ে যাচ্ছে। পাপিয়া কী এতোদিন ঘুমিয়ে ছিলো?

যোগাযোগও বটে।

তারক ঠিক এই সময়ই জল আনতে গেল। আর গেল তো গেলই।

পাপিয়া যতোই তর্কের জাল বুনে সময়টাকে ঠেলে দেবার চেষ্টা করে চলুক, পাপিয়ার মনের মধ্যে যে ঝড় বইছে, রক্তস্রোতের মধ্যে বেজে চলেছে ঘুঙুরের ধ্বনি।

তবু সামলে চলছিলো। কিন্তু ওই জোরালো নির্দেশটা। না না, আমার ব্যাপারে কারো কোনো 'দরকার' থাকতে পারে না।

রাতের আকাশ থেকে ঝড়ে পড়া শিশিরকণারা জমে থাকে গাছের পাতায় পাতায়, ঘাসের আগায় আগায়, ছোটো ছোটো মুক্তোবিন্দুর মতো, সকালে রোদের তাপে শুকিয়ে ওঠার আগেই হঠাৎ কোনো সময় একটা হাওয়ার ধাক্কায় ঝরঝরিয়ে ঝরে পড়ে।

ঝরে পড়ল পাতার কানায় কানায় জমে থাকা সেই শিশিরকণারা।

'রোদের তাপের' চেষ্টাতেই এতোক্ষণ চালিয়ে চলেছিলো লড়াকুর ভূমিকা।

সব গুবলেট হয়ে গেল!

আর ভয়ানকভাবে অপ্রস্তুত হয়ে গেল দুজনেই। যার গালের ওপর ঝরে পড়ল সেই মুক্তোবিন্দু কটি, সে তো হবেই। কিন্তু তার দর্শকটি? সেও বোধকরি তার থেকেও বেশী।

তবু মান বজায় রাখার ব্যর্থ চেষ্টাটা করতে হবে বৈকি। তাই মুখটাকে হঠাৎ অন্যদিকে ফেরায় পাপিয়া।

আর সেই শিশিরবিন্দুগুলো ঝরে পড়ার দর্শকটি? সেও ভয়ানকভাবে বিচলিত হওয়া অবস্থাকে সামাল দিতে চট করে দাঁড়িয়ে উঠে কুঁড়েঘরের 'দরজা' নামক জায়গাটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলে ওঠে, 'তারকটা করছে কী? কত দেরি করছে।'

তা ভয়ঙ্কর মুহূর্তটাকে সামাল দেওয়া গিয়েছিলো।

দুজনেরই মনোবলটা যথেষ্ট বেশী বলতে হবে। তাই তারক এসে দাঁড়াতেই পাপিয়া বলে ওঠে, কী তারকদা, এতো দেরি? আমার তো ভাবনা হচ্ছিল, জল আনতে গিয়ে জলে ডুবে গেলে না কী?

ঘর্মাক্ত তারক মাটির কলসীটাকে সাবধানে 'বিঁড়ের' ওপর বসিয়ে বলে ওঠে, হায়রে কপাল।

ডুবে মরার মতো জল থাকলে কী আর মুখ্যু তারকটা এতোদিনে সে পথটা নিয়ে রেহাই পাবার চেষ্টা না করতো ?...জল না 'সোনা'। ওই কলসীটুকু ভরতেই হুঁঃ। তো এমন অভাগার মতোন হাল যে, আপনাকে একটু চা বানিয়ে খেতে দেবো তারও উপায় নাই। চায়ের মুখ দেখি নাই কতকাল।

পাপিয়া হঠাৎ যেন চমকে যায়।

তার চোখের সামনে যেন একটা অজানা জগতের দরজা খুলে যায়। কেবলমাত্র প্রভুভক্তির শক্তিতে এই নিরক্ষর গ্রাম্য লোকটা এই ক্লেশ বহন করে চলেছে। করে চলেছে এই কৃচ্ছ্রসাধন।

ওর প্রভুও হয়তো তাই। একটা জোরালো শক্তির বশেই শুধু। তার শক্তিটা হচ্ছে আত্মপ্রেমের শক্তি। নিজের কাছে ও নিজের যে ভাবমূর্তিটি গড়ে রেখেছে, তা থেকে বিচ্যুত হবার মনোবল নেই ওর।

তৃতীয় ব্যক্তি।

তৃতীয় ব্যক্তিও একটি বিশেষ ব্যাপার। সময় বিশেষে তেমনি পরিত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। আপাতত তৃতীয় ব্যক্তি ওই 'তারক', যে নাকি ভৃত্যমাত্র, সে এদের ত্রাণ করল।

কীভাবে যেন এই প্রায়ান্ধকার কুঁড়ে ঘরটার মধ্যে যে অভাবিত ভয়ের ভার জমাট হয়ে উঠেছিল, সেই ভারটা কোথায় উড়ে গেল।

এদের মনে হলো, ঘরটা হঠাৎ আলো আলোও হয়ে গেছে।

কলসীটা নামিয়ে রাখার পর তারক তার পিঠে ফেলা গামছার কোণে বেঁধে আনা দুটো ডিম গিঁট খুলে বার করে নামিয়ে বলে উঠল, এই হাভাতে গাঁয়ে তো আর একটা মিষ্টিও জুটবে না। তো না করতে পাবেন না পাপিয়াদি, এই ডিম দুটো সেদ্ধ করছি, আপনাকে খেতে হবে।

আকাশ থেকে পড়ার মতো কথা।

এখন ওই ডিম দুটো খেতে হবে ? কী যা তা বলছো তারকদা ? পাগল না কী ?

তারক আত্মস্থভাবে এককোণে সরে গিয়ে দুচারটে কাঠিকুটি জ্বেলে ফেলতে ফেলতে গম্ভীর গলায় বলে, না খেলে তারক মনে খুব বেদনা পাবে।

কী মুস্কিল ! এই ভরদুপুরে—

ওইটুকুনই সাহস তারকের। তেমন সাহস থাকলে বলতো, দুটো ভাত খেতে হবে ওই সঙ্গে। তো সে সাহস নাই।

পাপিয়া হঠাৎ বেশ কৌতুক অনুভব করে তারকের ভাবভঙ্গিতে। তাই হালকা গলায় বলে ওঠে, তা তাতেই বা এতো সাহসের অভাব কেন ?

তারক উনুনে জ্বালটা ঠেলে দিয়ে তার প্রভুর দিকে একটি দৃষ্টি হেনে বলে, পরে গঞ্জনা খাওয়ার ভয়ে। নির্ঘাৎ শুনতে হবে, ওই মোটা মোটা লাল চালের ভাত তুই কুটুমবাড়ির মেয়ের সামনে বার করলি কোন লজ্জায় ? তার মানে হাটে হাঁড়িভাঙা তো ! কী খেয়ে উনি দিনযাপন করছেন, একজনা তার সাক্ষী হয়ে যাবে তো !

তারক, তোর কথাবার্তা আজকাল খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এতোই যদি সব খারাপ তো যা না বাবা ওই কুটুমবাড়ির মেয়ের সঙ্গে। আমি ঠিক চালিয়ে নিতে পারবো।

তা আর পারবে না কেন ? ওই ভূতগুলোর ঘরে আশ্রয় নিতে যাবে। তবে বেশীদিন ওদের সাথে মিশলে নিয্যস 'হাঁড়িয়া' ধরবে তুমি। ওদের মতন হতে হবে তো ! এই নিন, ধরেন।

একটা কাঁচা শালপাতার ওপর ধরে দেয় ডিম সেদ্ধ দুটো। পাশে শুধু একটু নুন।

তারক আর একবার বলে, মরিচগুঁড়ো ব্যতীত ডিম সেদ্ধ খেয়েছেন কখনো ? দেখুন ! তায় আবার

শালপাতে।

দেখেছি। কিন্তু দুটো? অসম্ভব। একটা তোমার জন্যে রাখো।

দুটো আবার এতো কী বেশী?

খুব বেশী। তোলো একটা।

ঠিক আছে। তো রাখারাখিতে কাজ নাই। বলে তারক আর একটু একটু পাত ছিঁড়ে একটা ডিমকেই খুন্তির কোণ দিয়ে দু ভাগ করে একটা বাপ্পার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে, খেয়ে নাও। রাখলেই তো পিঁপড়ে।

ভীষণ অস্বস্তিবোধ করে বাপ্পা। বলে, আঃ। আমা" আবার কী? তুই খা না!

হঠাৎ তারককে খুব হিংসে করতে ইচ্ছে করে পাপিয়া্র।

একা খাবে তারক?

আঃ। কী এক জিনিস। তোর যতো—

ঠিক আছে, তারকও খাবে না। পিঁপড়েরাই খা।

বাপ্পা অগত্যা পাতাটা হাতে তুলে নিয়ে বোধহয় লজ্জা অস্বস্তি কাটাতেই বলে, দেখছো তো পাপিয়া, কী সাংঘাতিক জব্দর মধ্যে থাকতে হয় আমায়। সত্যি সত্যিই তুমি ওটাকে নিয়ে যাও।

পাপিয়া। আর একবার সেই অনুভূতি!

দেহমন সব কিছুর মধ্যে একটা উত্তাল প্রবাহ। তা হোক। তবু মান বজায় রেখেই চলতে হবে।

কী তারকদা? যাবে না কী?

গেলে আপনার সঙ্গ ধরতে হবে না কী? যেদিন ইচ্ছা জাগবে, যেদিকে চক্ষু যায় চলে যাবে তারক।

তোর ওই 'ইচ্ছেটা' জাগলে আমি বাঁচি।

হ্যাঁ। তাহলে সাপের পাঁচ পা দেখার সুবিধে হয়। হাড় ক'খানা আছে এখনো, সে ক'খানাও যাবে, এই আর কী।

ও তারকদা, তোমার মায়ের খবর কী?

মায়ের খবর? অতি উত্তম। বড়মানুষ নেতার বাড়িতে চাকরি। গিন্নীর নেকনজরে পড়ে গিয়ে মনিববাড়ির ভাঁড়ারে গিন্নীর হয়ে বসে তোয়াজেই আছে। মায়ের তুকতাকে কর্তা ভোটে জিতেছে, তাই মায়ের খুব খাতির।

তুকতাক!

ওই হলো আর কী, দৈব ওষুধ। মাদুলী। তো উনিও পার্টি করে। তবে বড়দাবাবুর মতন তো অবোধ না। বিচক্ষণ বেক্তি। দুধও খায়, তামাকও খায়। মা বড় গাছেই নৌকো বেঁধেছে। আর এই তারককে সংসারী করবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, দেশের জমিজমাটুকুন জ্যাঠার কাছে বেচে, তারকের হিস্যেটা বুঝিয়ে তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে কেঁদেকেটে বলে গেছে, 'তারক রে—মরে গেলে যেন তোর হাতের আগুনটুকুন পাই।'

তারকের বলার ভঙ্গিতে এরা হেসে ওঠে।

আর তারকের প্রভু পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে বলে, এই রোদের মধ্যে যেতে তোমার খুব কষ্ট হবে।

পাপিয়া। তোমার কী মনে হচ্ছে? বরফ গলতে শুরু করেছে? নাকি করুণা? ভিক্ষুককে একমুষ্টি ভিক্ষা দেওয়া?

যদি তাকে ধরে নিয়ে আসবো ভেবে অবুঝ আশা পোষণ করে তার জন্যে ঘর গোছাতে বসে? তার থেকে বলে কাজ নেই।

হ্যাঁ, এই রকম অনেক কিছুই ভাবতে ভাবতে এসেছিলো পাপিয়া! এসেও ভেবেছে। তাই যেটা স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিলো সেটা হয়নি। এসেই বলে উঠতে পারেনি, 'ও বড়মা গো! তোমার নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া ভাইপোটার উদ্দেশ পেয়ে এলাম।'

শুধু নানা চিন্তাও নয়, যেন সেটি বলে ফেললেই পাপিয়ার একান্ত নিজস্ব একটি সম্পদ পাঁচজনের হয়ে যাবে।

কিন্তু পাপিয়া তো কখনো এমন স্বার্থপর ছিলো না। পাপিয়া, নিজের লুকোনো সম্পদ আগলে রাখার চিন্তা করছে? আশ্চর্য বৈকি। না, বোধহয় ওই চিন্তার সঙ্গে একটা ভয়ও কাজ করছিলো।....সেই প্রসঙ্গ তুলতে হলে কীভাবে তুলবে পাপিয়া? যদি কেউ বুঝে ফেলে? যদি কেউ পাপিয়ার মুখের চেহারার মধ্যে দিয়ে ভিতরের লেখাগুলো পড়ে ফেলে?

চিরসরল দ্বন্দ্বহীন চিত্ত এই মেয়েটার মধ্যে চলেছিলো অনেক চিন্তার টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব।

তবু শেষ পর্যন্ত বিবেকের জয় হলো।

পাপিয়া যদি নীরব থাকে, বিবেকের কাছে কী জবাব দেবে?

নয়নতারা পাপিয়ার হাতটা চেপে ধরে ডুকরে উঠলেন, তুই তারে দেখে অ্যালি? আপন চোক্ষে? অ্যাঁ?

পাপিয়া একটু হাসবার চেষ্টা করে বলে, তো কী আর করা? জানা তো ছিলো না দিদা। থাকলে আপনার চোখ দুটো ব্যাগে ভরে নিয়ে যেতাম।

সত্যব্রত বললেন, তুমি তার কাছে আমাদের অবস্থা বোঝাতে পেরে উঠলে না দিদিভাই?

কই আর পারলাম দাদা?

পারবে কী করে? চিরকেলে নির্মায়িক যে। সন্ন্যাসীর নির্মমতা।

ডুকরে উঠেছিলো নীহারিকাও। বলেছিলো, পাপিয়া! তুমি তাকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে আসতে পারলে না? কটকট করে শুনিয়ে দিতে পারলে না? বলতে পারলে না যে লোক নিজের মা-বাপের দুঃখু বোঝবার ক্ষমতা ধরে না, সে আবার কোন মুখে পরের দুঃখু দেখবার ভান করতে বসে?

আদিত্য বললেন, আমি জানতাম। ওই হাড়হারামজাদা তারকটাই নাটের গুরু। ওর সহায়তা না পেলে এতোটা দূর এগোতে পারতো না হতভাগা ছেলে।

বলেছে জনে জনেই।

শিলাদিত্য বললো, আমি এখুনি সেখানে চলে যেতে পারি পাপিয়া তোমার কাছে ডিরেকশান নিয়ে। তবে নিয়ে আসতে পারবো, এমন আত্মবিশ্বাস নেই। হয়তো ইচ্ছে করেই আমাকে ভাগাবার জন্যে খানিকটা অপমান করে বসবে। 'হৃদয়' বলে তো কিছু নেই।

শিলাদিত্যের মধ্যে যে হৃদয়' নামক বস্তুটা আছে, এটা একসময় এই মেয়েটার কাছে ব্যক্ত করবার খুবই চেষ্টা করেছিলো শিলাদিত্য। সেই অর্বাচীন যুগ পার হয়ে গেছে। এখন শিলাদিত্য বেশ একখানা মজবুত গাছে নৌকো বেঁধেছে। কাজেই বেশ সহজভাবেই কথা কয় পাপিয়ার সঙ্গে।

আর এ বাড়ির শেষতম সদস্যটি? অথবা সদস্যাটি? মেখলা? অথবা টুসকি? সে পাপিয়ার মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে আস্তে বলে, মনের পাপ ব্যক্ত করে ফেলছি পাপিয়া, তোকে একসময় প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে দারুণ হিংসেয় জ্বলেপুড়ে মরেছি। এখন দেখছি দারুণ হয়েছিলো ভুলটাই।

তুই যে এই গাঙ্গুলীদের ঘরেই মরে পড়ে আছিস, তখন তা বুঝতে পারিনি।

পাপিয়া চমকে উঠে বলে, তার মানে?

মানে না বোঝবার মতো বোকা তুই নস বাবা! তায় আবার এখন ডাক্তার হয়েছিস! শরীরের রোগ নির্ণয়ের সঙ্গে মনের রোগও ধরা পড়ে ডাক্তারদের কাছে। ছেলেবেলার মতো আবার তোকে 'তুই' করেই কথা বলছি ভাই। হঠাৎ তোকে খুব আপনজন বলে মনে হচ্ছে বলেই।

পাপিয়া মুখ নীচু করে বসে থাকে চুপচাপ!

টুসকি আবার বলে, ভাবতাম দাদাকে জব্দ করতে প'রে হয়তো এই একমাত্র জিনিসটি। একটা মেয়ের ভালোবাসা অনেক কিছু ওলট-পালট করে দিতে প'রে। জানি না—জব্দ হবে কিনা। জানি না তোর কতটা শক্তি।

আমার এক কণাও শক্তি নেই টুসকি! পাপিয়া বলে, কিন্তু তুমি কী করে? মানে কী করে এমন অদ্ভুতভাবে—

বুঝে ফেললাম? এই তো? দ্যাখ পাপিয়া, একটা মেয়ে-মনের কাছে অন্য মেয়ের মন ধরা পড়বেই। এ জিনিস অধরা থাকে না। তোর মুখ-চোখ দেখে তো বুঝে ফেললাম সত্যিই মরে বসে আছিস! এখন কী করা যায় বল তো?

আমি কী বলবো?

তুই-ই তো বলবি। তোকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে, আমার ওই দাদাটাকে এলোমেলো পথ থেকে টেনে নিয়ে আসবি।....ওরা জানে না, ওদেরকে যারা পথ দেখাবার ছলনা করে দিশেহারা করেছে, তারা কী পরিমাণ সেয়ানা। তারা ভণ্ড, ধাপ্পাবাজ, স্বার্থপর। সরল-বিশ্বাসী ছেলেমেয়েগুলোকে একখানা মহৎ আদর্শের লক্ষের ফাঁকে ফেলে তাদের দিয়ে কাজ বাগায় আর নিজের আখের গোছায়। আর যদি ওই বেচারাগুলোর কখনো চোখ ফোটে, যদি এ পথ থেকে বীতস্পৃহ হয়ে সরে যেতে চায়, তাহলে তার গর্দান।

পাপিয়া চমকে বলে, গর্দান মানে?

'গর্দান' মানে গর্দান! ওর আর আলাদা কোনো মানে নেই। তুমি যতোক্ষণ আমার ছাতার তলায়, ততোক্ষণ আমি তোমার রক্ষক। কিন্তু তুমি যদি আমার ছাতার তলার ছায়াটাকে অপছন্দ করে সেখান থেকে বেরিয়ে পড়ে আলোর সন্ধান করতে যাও, ব্যস, এ পৃথিবীতে থাকবার অধিকারটি তুমি হারাবে। কারণ—তুমি আমার দলের মধ্যে থেকে কাজ করে, আমার অনেক গোপন রহস্য জেনে ফেলে বসেছো। এরপর আর তোমায় পৃথিবীতে রাখা সেফ্? তখন—যে আমি একদা তোমায় ঘর বানিয়ে দিয়েছি, সেই আমি তোমার ঘর জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবো।'

পাপিয়া আস্তে বলে, তুমি এইসব নিয়ে এতো ভাবো টুসকি?

টুসকি একটা গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, দাদাই আমায় ভাবিয়েছে। দাদা ছিলো এ সংসারের কাছে আশা ভরসা ভবিষ্যৎ। সেই দাদা এইভাবে সংসারছাড়া হয়ে গেল! প্রথম দিকে ভাবতাম, আদর্শের জন্যে তো এমন করেই থাকে। সেটা সংসারকে মেনে নিতেই হয়। কিন্তু যখন চোখে পড়তে থাকলো, ওই 'আদর্শ'টা হচ্ছে একটা ফাঁকা বুলি, ভেক, তখন থেকেই ভাবতে শুরু করেছি, আর আদর্শদাতা নেতাদের রীতিনীতি দেখে দেখে—

চুপ করে যায় টুসকি।

বাড়ি ফিরে যাবার সময় নীহারিকা বলে, তোমাকে আর কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো পাপিয়া। জানাবার ভাষা নেই। তুমি আমার বাপ্পার খবরটাও তো এনে দিলে।

বাপ্পার পিসি সন্ধ্যাতারা বলেছিলো, তোকে যে কী বলে আশীর্বাদ করবো রে পাপিয়া, ভাষায় কুলোবে না।

বাপ্পার মা বললো, কী বলে কৃতজ্ঞতা জানাবো!

পিসির বাক্যের উত্তর দেয়নি পাপিয়া। দেবার কিছু ছিলো না। মায়ের বাক্যের উত্তর দিলো। বললো, 'কৃতজ্ঞতা' বলছেন কে মামীমা? এতে আমি দুঃখ পেলাম। আমাকে আপনি কৃতজ্ঞতা জানাবেন?

নীহারিকা একটু অপ্রতিভ হয়। বলে, না, মানে—মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছো?

পাপিয়া বললো, তা তো নিশ্চয়ই পাচ্ছি মামীমা, কিন্তু কৃতজ্ঞতা কেন? এতে আর আমার কৃতিত্ব কী? দৈবাৎই দেখা হয়ে গেল এই মাত্র!

চলে এসেছিলো!

তা জীবনের অনেক কিছুই তো দৈবাৎ ঘটে!

না হলে মেখলা গাঙ্গুলী যখন তার সদ্যলব্ধ একটু দীনহীন চাকরির দৈনিক কর্তব্য সেরে বাসের রাস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন হঠাৎ একখানা গাড়ি থেকে একটি বিধবা মহিলা মুখ বাড়িয়ে মেখলাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবেন কেন?

এটা দৈবেরই কারসাজি।

মেখলা অবাক হয়ে কাছে যেতেই মহিলা বলে ওঠেন, যা কিছু কথা পরে হবে মেখলা। সব আগে গাড়িতে উঠে পড়ো।

মেখলা তো হতভম্ব।

কে ইনি? কথা বললেন যেন পরিচিতের মতো।....মেখলারও মনে হচ্ছে মুখটা বেশ যেন চেনাচেনা। অথচ চট করে মাথায় আসছে না, কোথায় দেখেছে।

অতো ভাবনা করছো কেন গো মা? আমায় দেখে কী মনে হচ্ছে একটা চোর ডাকাত? বলে একটু হাসলেন আর সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতাঘাতের মতো মনে পড়ে যায়। আর মনে পড়ে মাথাটা হেঁট হয়ে যায়। ছি ছি, যুধাজিতের মাকে টুসকি চিনতে পারলো না?

আস্তে গাড়িতে উঠে, হেঁট হয়ে গাড়ির মধ্যেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল। করতে অবশ্য পারলো না। কারণ বনছায়া তার হাতটা চেপে ধরে থাক থাক বলে, পাশে বসিয়ে নিয়ে আবারও একটু হেসে বলেন, এখনো যেন ঠিক চিনতে পারোনি মনে হচ্ছে—

টুসকি তখন বলে ওঠে, বাঃ। চিনতে পারবো না? আপনার নতুন বাড়ির গৃহপ্রবেশ উৎসবে নেমন্তন্ন গেলাম—

যাক। তাহলে চিনেছো। কিন্তু নেমন্তন্ন গেলে ঠিকই, কিন্তু 'খেলে' কী? সেইদিনই তোমার হঠাৎ কী রকম শরীর খারাপ হলো মনে আছে তো? না খেয়ে চলে এলে। আমি তো দুঃখে মরি।....তো সেই অবধি ছেলেটাকে কত বলেছি, 'আর একদিন ডাক না বাবা তোর ওই বন্ধুদের।' তো বলে কী, পাগল হয়েছো? বিনা উপলক্ষ্যে আসতে যাবে কেন?...আচ্ছা বাপু, তুমিই বলো, উপলক্ষ্য আমি পাচ্ছি কোথায়? তাতে তো তুই-ই বাদ সেধে বসে আছিস। তো দুষ্টু ছেলেটা বলে কিনা—পাঁজিপুঁথি খুলে দেখো না যদি তেমন কোনো ব্রতট্রত পেয়ে যাও। জম্পেস করে তাহলে ওই একখানা ব্রত ঘটা করো। সেকালে তো বুড়িরা এইসব করতো শুনেছি।

মেখলা একটু জোরালো গলায় বলে ওঠে, আপনাকে 'বুড়ি' বলা হয়?

তা বাছা, বুড়ি ছাড়া আর কী? পঞ্চাশ পার করতে চললাম।

মেখলার কেন কে জানে মনে পড়ে গেল, তার মা পঞ্চাশ পার করেই বসে আছেন। কিন্তু তিনি কী নিজের সম্পর্কে ওই 'বুড়ি' শব্দটা প্রয়োগ করার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন? তারপরেই অবশ্য মনে এলো, আমাদের অভ্যস্ত মানসিকতায় থানপরা মহিলাকে বুড়ি ভাবা হয়।

বনছায়া বলেন, তা বাপু বুড়ি হলেও ওই সব পাঁজি-পুঁথির ব্রত-ট্রত বুঝি না। তাই এখন একটি চালাকি খেলেছে। এই একখানা ড্রাইভারওলা গাড়ি ধরিয়ে দিয়েছে, বলে যতো ইচ্ছে মন্দির দেখে বেড়াও। আর একে রাস্তা চিনিয়ে চিনিয়ে যতো ইচ্ছে আত্মীয় বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বেড়াও। তা হলে সারাক্ষণ একা থাকার কষ্ট হবে না।

গাড়ি চলতে থাকে। মেখলা অবাক হয়ে বলে, বাড়িতে আর কেউ নেই?

আর কে থাকবে? ছেলে তো সারাদিন কাজের ধান্দায়। ওই যা দুটো কাজের মেয়ে আছে। তো, তারা তো আর 'সঙ্গ' হয় না!

মেখলা আস্তে বলে, কিন্তু আপনার আরো ছেলেমেয়ে আছেন না?

বনছায়া একটা নিঃশ্বাস ফেলেন, তা আছে। তো তাদেরও তো নিজস্ব সংসার আছে। বড়ছেলে দুর্গাপুরে থাকে। আর মেয়ের সংসারে সেও একা!

বলেন, তবু নিঃশ্বাসটা চাপতে পারেন না।

মেয়ে যে কী অদ্ভুত একবগ্‌গা। সপ্তাহে সপ্তাহে তাদের সকলকে নেমন্তন্ন করে পাঠায় বটে যুধাজিৎ। তারাও যে না আসে তা নয়। খাওয়াদাওয়া, কী সব ক্যাসেট টেনে বার করে করে গান শোনা, সিনেমা দেখা সবই করে বর আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে, কিন্তু ভাবটা এমন দেখায়, যেন নেহাৎ মার চিত্ত-বিনোদনের জন্যেই তার এই আসা সংসারের শত অসুবিধে করে। এই দেড় দিন এখানে পড়ে থাকার জন্যে তার কী কী অসুবিধে হয় তা শোনাতে থাকে।

জামাইটি অবশ্য ঠিক ওরকম নয়। তার কথাবার্তা বেশ দরাজমার্কা। মাঝে মাঝে বৌকে থামায়। বলে, কেন মিথ্যে টেনেবুনে সমস্যা জোটাচ্ছো বাবা। দিব্যি মুফতে গাড়ি চড়ে আসছো যাচ্ছো, ভালোমন্দ খাচ্ছো-দাচ্ছো, সংসারের খাটুনি খাটতে হচ্ছে না। পয়সা বাঁচছে দুদিনের, তোফাই তো লাগা উচিত।....বৌ ঝঙ্কার দেয়, হ্যাঁ, তোমার মতো পেটুকের উপযুক্তই কথা!

মোট কথা, 'মেয়ে আসার' যে আনন্দ, সেটা উপভোগ করতে পারেন না বনছায়া, সবসময় তটস্থ থাকেন, পাছে কিছু এদিক ওদিক হয়ে যায়। মেয়ের মানের কানা খসে যায়। এবং বলে বসে, 'আর কখনো আসবো না'।

হ্যাঁ, এই আশঙ্কা বনছায়ার সর্বদা।

ছেলেবেলা থেকেই মেয়েটা ওইরকম। অকারণ মান-অভিমান। বাপ মারা যাওয়ার পর আরো ধারণা হয়েছে, মা তলে তলে ছেলের সঙ্গে পরামর্শ করে মেয়েকে বঞ্চিত করছে। কারণ মা মেয়ের থেকে ছেলেকে বেশী ভালোবাসে।

সন্দেহটা হয়তো অমূলক নয়। কিন্তু তার কারণটা 'মেয়ে' এবং 'ছেলে'র মূল্যবোধের তারতম্যে নয়, ছেলের গুণের জন্যে।

বনছায়া নিজেকে সামলে নেন। তাড়াতাড়ি বলেন, আসল কথাটাই জিগ্যেস করা হয়নি। তোমার দাদার কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি?

টুসকি আস্তে বলে, খোঁজ পাওয়া গেছে। তবে ফিরে আসা সম্পর্কে কোনো ভরসা নেই।

বনছায়াও আস্তে সন্তর্পণে বলেন, কোথাও কোনো ভুলভাল বিয়ে করে ফেলে সংসার পেতেছে বুঝি?

মেখলা এখন হেসে ওঠে।

হায়। হায়। তা হলেও তো একরকম ভালো হতো। মনে হতো সে নিজে অন্তত সুখে আছে।....একদম উল্টো।....কোথায় কোনখানে আদিবাসীদের উন্নতি ঘটাবে বলে, তাদের সঙ্গে পড়ে আছে। তাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছে।

আদিবাসী! বনছায়া বলেন, তার মানে ভালো কাজই করছে মনে হচ্ছে।

টুসকি বলে, ভাবতে গেলে অবশ্যই তাই। তাবে আমাদের দিক থেকে ভাবতে গেলে—মানে আমরা তো সবাই স্বার্থপরই।

বনছায়া হঠাৎ টুসকির একটা হাত চেপে ধরে যেন ব্যাকুলভাবেই বলে ওঠেন, ঠিক বলেছো মা। আমরা সবাই স্বার্থপর। আমরা আমাদের সন্তানকে তার নিজের মতন করে বাঁচতে দিতে চাই না। আমার মনের মতো করে চালাতে চাই তাকে। জিতু তাই বলে আমায়। বলে, 'মা, তোমাদের মেয়েদের মনের জগতে জীবনের একটাই ছাঁচ আছে। সেটা হচ্ছে ছেলেমেয়ে হবে, তাদের যতোটা সাধ্য ভালোভাবে খাইয়ে পরিয়ে বড় করে তুলে, নিজেদের বাছাই করা এক একটা বর কী কনে জুটিয়ে বিয়ে দিয়ে, শেষ জীবনে ছেলেপুলে নাতি-নাতনী ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়ে সুখে আরামে ঘরকন্না করবো। ব্যস। এই হলো জীবনের চরম লক্ষ্য, পরম আদর্শ!' ধিক্কার দিয়ে দিয়েই বলে; তবু মনে কী মানে?

এসব কথার আর কী উত্তর আছে?

অন্তত টুসকির কাছে নেই। টুসকির মনের সামনে ভেসে উঠছে সেই 'ধিক্কার দেওয়া' মুখটা। তবে অবশ্যই ঘৃণায় তিক্ত নয়, কৌতুকে উজ্জ্বল। পুরু লেনসের চশমার কাঁচের মধ্য থেকে যে দৃষ্টি ঝিকঝিকিয়ে ওঠে।

টুসকির হাতটা যে ওই মহিলার হাতের মধ্যেই ধরা আছে তা মনে পড়ে না টুসকির। হঠাৎ উনি বলে ওঠেন, তা তোমার বড়দা তো ওইরকম হয়ে বসে আছে? কিন্তু ছোড়দা? আমার জিতুর যেটি বন্ধু? তার বিয়ে-থাওয়ার কথা বলেন না তোমার মা? পাত্রীটাত্রী দেখেন না?

টুসকি একটু হেসে বলে, মা বলবার অপেক্ষা রাখেনি ছোড়দা, নিজেই পাত্রী ঠিক করে ফেলেছে। একদিন হয়তো হঠাৎ আমাদের নেমন্তন্ন করতে আসবে।

বনছায়া প্রথমটা বোধহয় একটু আহতভাবে ঘাবড়ে যান। বলেন, তাই? তারপরই আবার হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, আমার বাউণ্ডুলে ছেলেটা যদি এরকমও করতো, তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারতাম।

এ মা! এক্ষুণি আপনার মরার কথা কেন?

আহা, মরবো তো একদিন। তখন ওকে কে দেখবে বলো তো? নিজের কথা যে কিছু ভাবতে জানে না।

এই অতি সরল আবেগময় মুখের সামনে হেসে ওঠা সম্ভব নয় বলেই হেসে ওঠে না টুসকি। অন্য কেউ হলে হেসে উঠতো। হয়তো বা বলে বসতো, 'তাহলে মরবার আগে ডজন ডজন 'ফীডিং বটল'-এ দুধ ভরে রেখে যাবেন।'.....

এঁর সামনে এমন অভব্যতা সম্ভব নয়। তাই কথায় জোর দিয়ে বলে, এখন ওসব মরাটরার চিন্তা করবেন না। আপনার স্বাস্থ্য তো খুব সুন্দর।

বনছায়া অবশ্য এতে হেসে ফেলেন। বলেন, তা সত্যি। ঠাকুরের ইচ্ছেয় স্বাস্থ্য শরীর খুবই ভালো। সেটাও এক হিসেবে আমার বিপক্ষে বাছা। বলতে পারি না, 'ঘরে একটা বৌ না থাকলে, আমায় রোগে অসুখে কে দেখবে?'

টুসকি যেন আচ্ছন্নের মতোই এই মহিলার কথার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিলো। হঠাৎ চকিত হয়ে বলে, আচ্ছা আমরা কোনদিকে যাচ্ছি?

কেন, আমার বাড়িতে? এই তো এসে গেলাম।

সে কী? সেখানে কেন?

কেন মা, আমার বাড়িতে একবার গেলে কী হয়? বোধহয় অফিস থেকে ফিরছিলে? দেখে তাই মনে হলো। তো মাসিমার কাছে না হয় একটু চা জলখাবার খেয়েই বাড়ি ফিরবে। খুব অনিচ্ছে হচ্ছে?

টুসকি অপ্রতিভভাবে বলে, না, মানে, ফিরতে দেরি হলে, বাড়িতে ভাবনা করবেন।

তা ঠিক। তবে এখনকার দিনে রাস্তায় ওই তোমাদের কী বলে 'জ্যাম জেলি' হয়েও তো, হেসে ওঠেন, কত সময় দেরি হয়ে যায়। তা ছাড়া এই গাড়িটাই আবার তোমায় পৌঁছে দেবে। বেশী দেরি হবে না।

টুসকিকে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

তবু একবার বলে, শুধু শুধু আপনার কষ্ট।

কষ্ট? শোনো কথা। বলে কতদিনের জলে থাকা মনোকষ্ট দূর হবে। সেই তুমি না খেয়ে চলে যাওয়া পর্যন্তই ইচ্ছে হয়েছে—তো রাস্তায় হঠাৎ তোমায় দেখেই না, যেন হাতে চাঁদ পেয়ে গেলাম। ব্যস! লুঠ করে নিয়ে যাচ্ছি। তাহলে এক হিসেবে হচ্ছি হাফ ছিনতাইবাজ মেয়ে। বলে হেসে ওঠেন।

তেমন সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে জানেন না বনছায়া, তবে প্রকাশভঙ্গী অত্যন্ত সরল আর প্রাঞ্জল। মনের তারে ঘা দেয়। টুসকির মনে হয় 'মাতৃমূর্তি' শব্দটি যেন এঁর কাছে এসে ধরা দিয়েছে।

কথাটা বলে খোলা হাসি হেসে উঠলেও বনছায়ার মুখে সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা করুণ ছায়া নামে। আস্তে বলেন, এইটুকু পর্যন্তই দৌড়। তার বেশী তো হাত বাড়ানোর সাহস নেই। এই যে—এসে গেলাম।

ড্রাইভার নেমে পড়ে দরজা খুলে ধরে একপাশে দাঁড়ায়। নেমে পড়ে টুসকি। কিন্তু যেন অন্যমনভাবে। মহিলার ওই বিষণ্ণ বিষণ্ণ ভাবের কথাটার মানে কী?

সেই অনেকদিন আগে আসা জায়গাটায়। সেদিন এসেছিল অন্য পরিবেশে। উৎসবের সাজে সাজা জায়গা। খোলা জমিটা ছিলো প্যাণ্ডেলে ঢাকা। তার মধ্যে অতিথি আপ্যায়নের বিরাট প্রস্তুতির চিহ্ন।

আজ গেট ঠেলে ঢুকতেই যা চোখে পড়লো তা হচ্ছে অনেকখানিটা সবুজের সমারোহ।.... গেট-এর মধ্যে ঢুকতেই দুপাশে গাছের সারি, বাড়ির বারান্দায় উঠতে সিঁড়ির দুপাশে টবের সারি, আর ওই বারান্দাটায় উঠে পড়ে কোনাচেভাবে বাঁ দিকে তাকালে যেটা প্রকৃতপক্ষে বাড়ির পিছন, সেখানে অগাধ সবুজ। যাকে যুধাজিৎ বলে মার 'কিচেন গার্ডেন'।.... কখনো বা বলে, 'মার তরকারির বাজার'।

টুসকির যেন চোখটা জুড়িয়ে যায়। তাদের বাড়ির বা পাড়ার ত্রিসীমানায় কারো বাড়িতে এমন দৃশ্য কল্পনা করাও যায় না। অজান্তেই বলে ওঠে, বাঃ! তারপর বলে, আপনার বুঝি খুব বাগানের শখ?

বনছায়া মাথা নেড়ে সত্য কবুল করেন, আগে তেমন কিছু ছিলো না বাছা। জমিই বা ছিলো কোথায়? এখানে—ছেলের তাড়নায় আর জমি পেয়ে—শুরু করে ক্রমশঃ নেশা লেগে গেছে। এখন তো সন্ধ্যে হয়ে এলো। সময় থাকলে দেখাতাম। কত জিনিস কিনতে হয় না।... বাগান থেকেই পেয়ে যাই। জিতু বলে, 'মার এখন বাজার করা হচ্ছে!'

বলতে বলতে বারান্দায় উঠে পড়ে একটু এগিয়েই উল্লাসে চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, ওমা। তুই এসে

গেছিস ? আজ আমার কী ভাগ্যি। দ্যাখ কাকে ধরে নিয়ে এসেছি !

টুসকি তাকিয়ে দেখে—সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে যুধাজিৎ ! ধবধবে পায়জামা আর পাঞ্জাবি পরা। চেহারায় একটি সদ্যস্নানের নির্মল ছাপ।

॥ কুড়ি ॥

পাবনার হরষিত ডাক্তারকে বাড়িতে এনে সম্যক যত্ন করতে না পারায় একটু মনমরা হয়ে থেকেছেন সত্যব্রত। আর কোনোদিন তাঁদের প্রসঙ্গ বিশেষ তোলেননি। আজ যেন হঠাৎ উথলে উঠলেন।

বাড়িতে তেমন জুতসই কাজের লোক না থাকায়, এখন আর নয়নতারা সত্যব্রতর তিনতলার নির্বাসিত জীবন নয়। কে বয়ে বয়ে দিয়ে আসবে তাঁদের খাবার ?.... তাছাড়া সত্যব্রতও তো আর ঘরবন্দী বেকার নন। তিনি তো নিয়মিত কোর্টকাছারি করছেনই। তাই খাওয়াদাওয়া এখন দোতলাতেই।

চা খেতে বসেই কথাটা পাড়লেন। টুসকি সামনে থাকায় সুবিধেই হলো। বলে উঠলেন, সেই যে সেদিন এসেছিল যে ভদ্রলোক আমাদের পাবনার ? মনে আছে তো রে টুসকি ?

টুসকি বলে ওঠে, মনে আবার থাকবে না ? তোমায় দেখে তো মনে হচ্ছিল লোকটা কী নিধি। কেন, কী হয়েছে তেনার ?

সত্যব্রত স্বভাববহির্ভূত উচ্ছ্বসিত গলায় বলে ওঠেন, তার কিছু হয়নি। তার ভাগ্যে তো যে ঘাসজল সেই ঘাসজল। তবে হয়েছে তার সেই পাজী ছোট ভাইটার ! মুখের মতন জব্দ।....বেচারী বড় ভাইটা, ব্যাচিলার একটা মানুষ, তাঁকে ঠকিয়ে—বাপের বিষয়-সম্পত্তি সব একা নিয়ে নিয়েছিলো। এমন কী দাদা তার বাড়িতে একখানা ছোট্ট ঘরে থাকতে চেয়েছিলো, 'সুবিধে হবে না' বলে ভাগিয়ে দিয়েছিলো, এখন ভুগছেন বাবু তার ফল।

চায়ের কাপটা হাতে তুলেও নামিয়ে রেখে বলে ওঠেন সত্যব্রত, মুখ্যু। মুখ্যু। দাদার তো স্ত্রী-পুত্র নেই, তার ভাগ তো তোরই হতো পরে। তা বুঝলি না। দাদাকে ঠকাবার তালে বাড়িঘর যেখানে যা ছিল, সব স্ত্রীর নামে করে রেখেছিলো।....এখন সেই স্ত্রী ওকে ডিভোর্স দিয়ে বাড়ি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে !

অ্যাঁ।

একসঙ্গে তিনটে গলা থেকে একই শব্দ ওঠে।

অ্যাঁ !

পাবনার লোকের গল্প বলে নীহারিকা তেমন কান দেয়নি, টুসকিও অগ্রাহ্যভরে শুনছিলো। নয়নতারাও নির্লিপ্তই ছিলেন, হঠাৎ এমন একটা অভূতপূর্ব কথা শুনে তিনজনেই সচকিত হলো।

অ্যাঁ। ডিভোর্স দিয়েছে মানে ? বুড়ো-বুড়ি তো ?

না না ! ছোট ভাইটা বুড়ো নয়। দেশভাগের সময় বোধহয় মাত্র বছর পাঁচ ছয় ছিলো। দুই ভাইয়ের বয়েসের অনেকটা তফাৎ।.....তাছাড়া বিয়েও করেছে বয়েস হয়ে। বৌ ওর পক্ষে কমবয়সী !...তবে তেমন কমও কিছু না। বললো তো বিয়ে হয়েছে বছর কুড়ি। ছেলেমেয়ে আছে দু-তিনটে। বড় ছেলেটা তো কলেজে পড়ে। তাদের মার এই প্রবৃত্তি !

নয়নতারা বলে ওঠেন, ত তোমাগেরে চুলার আইনে, সেই পরিবারই সর্বেসর্বা হইলো ?

তা 'হইব না' ক্যানো ?

হাসলেন সত্যব্রত, বোকাটা তো নিজেই তাকে সর্বেসর্বা করে দিয়েছিলো দাদাকে ফাঁকি দেবার

জন্যে। ভাবেনি তো নিজের গলায় কোপ দেবার খাঁড়াখানা নিজেই বানিয়ে রাখছে।

ত, বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে?

দেবে না? ডিভোর্স হয়ে গেলে তার সঙ্গে আর সম্পর্ক কী? আইনের মতে পরপুরুষ।

নুড়া জ্বালি তোমাদের আইনের মুখে।....নয়নতারা বলেন, সেই ধিঙ্গী পরিবারটি আবার বে' করবে না কী?

তা কী করে বলবো? সে কথা তো আদালত জানে না। এই স্বামীর সঙ্গে বনে না, লোকটা নাকি বোকা মুখ্যু গাঁইয়া বদরাগী, নেশাখোর, এটা সেটা একশো দোষ দেখিয়ে ছাড়ানটা তো করে নিলো। তারপর তার মনে যা আছে।

নীহারিকা পারতপক্ষে শ্বশুরের গল্পের শরিক হয় না। অবহেলাভরে নিজের কাজই করে। এখন হঠাৎ বলে ওঠে, তা তাদের ছেলেমেয়েরা আপত্তি করলো না? বললেন তো, বেশ বড় হয়েছে।

নাঃ। শুনলাম তিনটে ছেলেমেয়েই মায়ের দিকে। সাক্ষী দিয়েছে নাকি, বাবা মাকে নির্যাতন করে, অত্যাচার করে।

আশ্চর্য।

সত্যব্রত একটু হাসেন। বলেন, আমাদের যে রাজ্যে ঘোরাঘুরি, সেখানে 'আশ্চর্য' বলে কিছু নেই বৌমা।

নয়নতারা বলে ওঠেন, ত' সে লক্ষ্মীছাড়া এখন করছেটা কী?

সত্যব্রত হেসে ওঠেন, ওইখানেই তো মজা! এখন দাদার কাছে এসে আছড়ে পড়ে মাপ চাইছে। বলছে, নিজের পাপের ফলে এই অবস্থা, কাউকে দোষ দেবার নেই। নিজের হাতে খাল কেটে কুমির এনে ঘরে ঢুকিয়েছে এখন। তো এখন দাদার সঙ্গে একসঙ্গে থাকতে চায়।

দাদার সাথে? দাদার তো সংসার নেই

তা নেই। ওই একখানা ঘরের একটু ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকে বেচারা। 'পাইস হোটেলে'র মতো কোথায় যেন খেয়ে আসে, ভাই তার মধ্যেই মাথা গুঁজে ঢুকে পড়তে চায়। বলে, দাদা, তোমার যা ব্যবস্থা, আমারও সেই ব্যবস্থা হবে।

টুসকি বলে ওঠে, তার মানে একখানি পয়লা নম্বরের ঘোড়েল!

'ঘোড়েল' কী নির্বোধ তা জানি না। তবে এখন নাকি দেখে মনে হয় কৃতকর্মের ফলে অনুতাপের জ্বালায় জ্বলছে।..

তা হতে পারে অবশ্য। তো ব্যাঙ্কের টাকাফাকাও নেই?

সবই স্ত্রীর নামে।

চমৎকার। ত দাদা কী বলেছে?

কী আর বলবে? যতোই হোক ছোট ভাই। কষ্টে অপমানে লজ্জায় ঘেন্নায় সারা, তাকে সান্ত্বনা না দিয়ে পারে?

অর্থাৎ সিনেমার গল্পের মতো দুই ভাইয়ে—অতঃপর গলাগলি? হেসে ওঠে টুসকি।

সত্যব্রত বলেন, হেসেই বলেন, গল্পটল্প তো আর আকাশ থেকে পড়ে না রে? জীবন থেকেই নেওয়া হয়। তবে আমায় তোরা যাই বলিস বাপু, ওই ছোট হতভাগাটার এই পরিণতিতে আমার খুব খুশী লেগেছে। বেশ হয়েছে। 'ধর্ম' বলে একটা জিনিস যে জগতে আছে, সেটা অন্তত একটু প্রমাণিত হলো।

আদিত্যর ঘরের সামনেই দালানে এই চায়ের টেবিল। ইচ্ছে করলে সে এই টেবিলে এসে বসতে

আর ওই দুই বুড়োবুড়ি, যারা এখন আবার নীহারিকার দুঃসময়ের সুযোগ নিয়ে, নতুন করে 'নবজীবন' লাভ করে বসেছে, তারা তখন স্রেফ বাতিলের দরে ছাতের ঘরে নির্বাসিত!

সর্বোপরি নীলুদার পোজিশান তখন এ বাড়িতে রাজার মতো। নীহারিকার অকৃতজ্ঞ ছেলেমেয়েরা তখনো এমন দৃষ্টিকটুভাবে ওই পরম হিতৈষী লোকটাকে অবজ্ঞা করতে শুরু করেনি।

নীহারিকা ছিলো এ সংসারের মধ্যমণি।

নীহারিকা ছিলো ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

নীহারিকাই ছিলো সর্বেসর্বা।

নীহারিকার সেই জীবনটা যেন হঠাৎ তাসের প্রাসাদের মতো ভাগ্যের এক ফুঁয়ে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেছে। নীহারিকাই কী তবে ঘুমের বড়ি যোগাড় করবে? অথবা আদি-অন্তকালের সেই অতি সহজ পদ্ধতিটাই গ্রহণ করবে? যা যোগাড় করতে কাঠ খড় পোড়াতে হয় না।...

ভাবতে ভাবতে যে কখন নিজের শোকেই নিজে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছে তা খেয়াল করেনি নীহারিকা। খেয়াল করেনি, রান্নাঘরে এসে এক ইঞ্চি কাজও এগোতে পারেনি।

হঠাৎ চমক ভাঙলো একটা জোর হাতের কড়া নাড়ার শব্দে।....

কে? কে? এখন কে? এ ভাবে কে?

এতো বেশী 'কড়া' করে কড়া নাড়লো কে? এতো যেন মনটা বিরূপ হয়ে যায়। নিশ্চয় কোনো অভব্য লোক। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গেই যাঁর চেহারাটি দেখতে পাওয়া গেলো, ভারী শান্ত আর কোমল সেটি। তার সঙ্গে যেন একটু অপরাধীর কুণ্ঠিত ভাব। নরম হয়ে গেল মন।

কে ইনি?

নীহারিকা একটু চকিত হয়েই অবাক চোখে তাকালো। বেশ যেন দেখাদেখাই মনে হচ্ছে। অবাক হয়ে তাকানোর ফলে নমস্কার করতেই ভুলে গেলো। তবে যিনি এলেন, তিনি ভুলে যাননি। তিনি নিরাভরণ নিটোল মসৃণ দুখানি হাত তুলে নমস্কার করে বলে ওঠেন, চিনতে পারছেন না নিশ্চয়। পারার কথাও নয়। সেই তো মাত্র একদিন। তো প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি ভাই, অসময়ে হঠাৎ এসে পড়ে বিরক্ত করার জন্যে। আমার ওই ড্রাইভার ছেলেটি, এমন বেতালা জোরে কড়া নাড়লো! আমি তো হাত চেপে ধরলাম, দুবার নাড়াতে দিইনি। পরিচয় দিই, আমি—

নীহারিকার ভাগ্যক্রম, হঠাৎ নীহারিকাকে স্মৃতি-বিস্মৃতির আবছায়া থেকে আলোয় সরিয়ে এনে তার মুখরক্ষা করলো! তাই নীহারিকাই আগন্তুক ভদ্রমহিলার বক্তব্যটি শেষ করলো, হ্যাঁ! যুধাজিতের মা। তাই তো?

খুব খুশী হলেন বনছায়া। বললেন, চিনতে পারলেন? মাত্র তো সেই একদিনই দেখা। তাও দশজনের ভিড়ের মধ্যে!

দশজনের ভিড়ে হলেও গৃহকর্ত্রী যে হারিয়ে যাবার নয়, সেটা বনছায়া খেয়াল করলেন না। নীহারিকা আগ্রহ প্রকাশ করে বললো, 'আসুন আসুন।'

নিপাট বৈধব্যের বেশ বনছায়ার। পরনে দুধসাদা থান, দুধসাদা ব্লাউস এবং সাদা রঙের চটিও। সর্বাঙ্গের কোনোখানেই অলঙ্কারের ছিটেমাত্র নেই। তবু এই মহিলার চেহারাটিতে একটি সম্ভ্রান্ত আভিজাত্যের ছাপ।

মুখের কাটুনিতে যুধাজিতের সাদৃশ্য স্পষ্ট। তবে যুধাজিৎ ঈষৎ শ্যামলা, ইনি গৌরাঙ্গী।

যার জন্যে যুধাজিতের বাবা দেবজিৎ কখনো সময় হেসে হেসে আক্ষেপ করে বলেছেন, 'তোমার মতো এমন সুন্দর একটি মেয়েকে কী করে যে প্রাণ ধরে তোমার গার্জেনরা একটা দোজবরে বুড়োর

হাতে ধরে দিয়েছেন !'

বনছায়া কথায় কখনোই খুব চৌকস নয়, তবু সে কথার উত্তরে তেমনি কিছু না বলে হেসে বলেছিলেন, গিরিরাজ তো তাঁর উমাকেও একটা দোজবরে বুড়োর হাতে ধরে দিয়েছিলেন। তাও তো সতীনটি জলজ্যান্ত থাকতে।

দেবজিৎ অবাক হয়েছিলেন, সে কী? মা দুর্গার আবার সতীন কে?

কেন, মা গঙ্গা! জানো না সে কথা? মহাদেব তো তার 'প্রথম পক্ষ'টিকে চিরকাল মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছেন।'

ও বাবা, এ গল্প তো জানা ছিল না।

পুরাণে-টুরাণে যে কতো রকম গল্প আছে।

তুমি ওই সব শাস্ত্র পুরাণ-টুরাণ পড়ো বুঝি? 'পণ্ডিত ব্যক্তি' তাহলে।

আহা! মহাপণ্ডিত। আসলে পড়ার নেশা তো। যখন যা পাই, তাই পড়ি। কিছু না পেলে পাঁজীও পড়ি। বিদ্যের দৌড় তো মাতৃভাষার মধ্যেই।

দেবজিৎ বনছায়ার জন্যে দু-দুটো লাইব্রেরী থেকে বই আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। কী স্নেহময় স্বামীই ছিলেন।

বনছায়া বললেন, আপনার ছেলেমেয়েদের দেখছি না।

ছেলেমেয়েদের!

হঠাৎ এ প্রশ্নে কেন কে জানে নীহারিকার ভিতরে একটা আবেগ উথলে উঠলো। মনে হলো এই মহিলা পুত্র-সৌভাগ্যে কতো সৌভাগ্যবতী। শুনেছিলেন তো শিলাদিত্যর মুখে ওঁর ছেলের বাড়ি বানাবার ইতিহাস। কেবলমাত্র মায়ের একটু সেন্টিমেন্টের দায়ে, অকারণ একটা মস্ত তিনতলা বাড়ি বানিয়েছে যুধাজিৎ। মা ছেলে দুজনে মাত্র থাকে। ভাড়াটে বসাবার প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া বাড়ির নামকরণও নাকি মহিলার দুঃসময়ে বিক্রী হয়ে যাওয়া বাড়িটির নামে। শুধু মায়ের দুঃখ নিবারণের জন্যই নাকি যুধাজিতের এতো উপার্জনের চেষ্টাও। এমন একখানা ছেলের মা উনি। আর নীহারিকার?

একটা গভীর নিঃশ্বাসকে সংবরণ করতে হলো। সংক্ষেপে বললো, বড়ছেলে তো এখানে থাকে না। দেশটাকে উদ্ধারের সব দায় তার ঘাড়ে। এরা দুজন বাড়ি নেই।

কিন্তু সেই দুজনের মধ্যেও যে একজন প্রায় বাড়ি ছেড়েই শ্বশুরের আওতায় গিয়ে বাস করছে, সেই কথাটা কী মুখ দিয়ে বার করা যায়?

বনছায়া ঈষৎ ইতস্তত করে বললেন, আমি কিন্তু ভাই আজ আপনার কাছে বিনা উদ্দেশ্যে আসিনি।....হাসলেন একটু, মানুষের যা স্বভাব। গরজ না পড়লে আর সহজে কোথাও যাওয়া আসা হয়ে ওঠে না।

নীহারিকার হঠাৎ যেন হৃৎস্পন্দনটা একটুক্ষণের জন্যে থেমে যায়। বিনা উদ্দেশ্যে নয়, তা সে নিজেই বুঝেছিল। কিন্তু কী সেই উদ্দেশ্য? তবু নিজেকে একটু সামলে নিয়ে বলে, আচ্ছা, তাহলে আগে একটু চা নিয়ে আসি আপনার জন্যে। তারপর গুছিয়ে বসে কথা হবে।

না না, চা দরকার নেই। অসময়ে চা খাই না ভাই।

এ আর এমন কী অসময়? বরং তো সময়ই। তবে যদি আপনার বিচার-আচারের ব্যাপারে বিশেষ কোনো বাধা থাকে।

বনছায়া ব্যস্ত হয়ে বলেন, না না। সে কী! সে এমন কিছু না। হিন্দু বাঙালীর ঘরে এ অবস্থায়

যতোটুকু যা মানতে হয় তার বেশী আর কিছু না। বেশী কিছুর 'জো'ই কী আছে? যা ছেলেটি আমার। ঝগড়া করতে শুরু করবে না? আর না হয় তো বলে বসবে, ঠিক আছে, আমিও আর কাল থেকে—নিরামিষ। কী বলবো, আমার বয়েস হচ্ছে, দুদিকে রান্না করতে হবে, এই বলে, নিজেও নিরিমিষ চালাতে শুরু করেছিল। শেষে এই দুটো মানুষের জন্যেও রান্নার লোক রাখতে হয়েছে।

এবার যেন নীহারিকার কেমন একটা অপমানের জ্বালা আসে মনের মধ্যে। মহিলাটি কী নিজের ভাগ্যগৌরবের বিজ্ঞাপন দিতেই এসেছেন?...নীহারিকার ছেলেরা যে মায়ের সম্পর্কে কতো উদাসীন, মমতাহীন, তা বুঝি জেনে রাখা হয়েছে? কিন্তু মহিলার মুখে বড় নির্মল স্নিগ্ধ ভাব। কাউকে আঘাত দেবার বা অহঙ্কার দেখাবার মতো ভাব নয়। আস্তে বলে নীহারিকা, তাহলে না হয় একটু ঠাণ্ডা কিছু—

এই তো আবারও মুশকিলে ফেললেন! এখন যদি বলি 'ঠাণ্ডা' আমার একদম সহ্য হয় না। একটা ডাবের জল খেলেও হাঁচতে কাসতে শুরু করি, তাহলেও হয়তো ভাববেন 'বিচার-আচার'। তবে বরং চা-ই দেবেন একটু। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ির কী আছে? আমি তো ভাই সহজে পালাচ্ছি না। একটি আর্জি নিয়ে এসেছি। যদি সে আর্জি সফল হয়, সেই আশায় ধর্না তো দেবই কিছুক্ষণ। নেহাৎ না হলে আর কী করবো।

নীহারিকা আস্তে বলে, আমি কিন্তু আপনার কথাটা ঠিক ধরতে পারছি না।

বনছায়া বলেন, ধরতে পারা শক্ত। আমার যে 'বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার সাধ'। কিন্তু সাধটা এতো প্রবল যে—

একটু থামলেন। তারপর বললেন, আমার ওই ক্ষ্যাপা ছেলেটার জন্যে আমি আপনার মেয়েটিকে ভিক্ষে চাইতে এসেছি ভাই।

চোখের সামনে থেকে একটা কুয়াশার জাল সরে যায়। ছায়াছায়াভাবে এইরকম কী একটা অনুমান করছিল না নীহারিকা? কিন্তু কে 'বামন', কে 'চাঁদ'?....

নীহারিকা আর নিজস্ব অস্মিকার খোলসটা বজায় রেখে উঠতে পারে না, হঠাৎ বনছায়ার হাতটা চেপে ধরে রুদ্ধকণ্ঠে বলে, এ কথা কেন বলছেন? আমার মেয়েরই তো পরমভাগ্য—

আর বনছায়াকে পায় কে?

তিনি তো নীহারিকাকে প্রায় জড়িয়েই ধরেন। তারপর হাসিকান্না মেশানো গলায় বলেন, উঃ, যা ভয়ে ভয়ে এসেছি। মনে তো জানি এ আমার অন্যায় আবদার। আপনারা কতো উঁচু ব্রাহ্মণ বংশ। আমরা তো—

জানি।

নীহারিকা মৃদু হয়, এখনকার দিনে কে আর অতো জাতপাত নিয়ে মাথা ঘামায়। তাছাড়া অমন ছেলে আপনার। তবে—

তবে বলতেই হলো। আদিত্যর এখনকার সর্বদা বিরক্ত-খিঁচোনো মুখটা মনে পড়ে গেলো। তার কাছে এ প্রস্তাব কী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সে কথা ভগবানই জানেন। নীহারিকার সব সাধে বাদ দেওয়াই তো তার জীবনের ব্রত হয়েছে এখন।.....ভাবটা যেন সংসারে যা কিছু ঘটছে, সবএর জন্যে নীহারিকাই দায়ী। তাই 'তবে' যে বলতেই হলো। বনছায়া কিন্তু ও সন্দেহে গেলেন না, বললেন, হ্যাঁ, তা জানি ভাই। মাথার ওপর আপনার শ্বশুর-শাশুড়ী আছেন। সেকালের লোক। তাঁদের মত হবে কিনা। তো আমি তো ভেবে ঠিক করে রেখেছি--আপনাদের দুজনের যদি আপত্তি না থাকে, আর আপনাদের মেয়ে যদি অরাজী না হয়, আমি হাতে-পায়ে পড়ে ওনাদের মত আদায় করে

ছাড়বো।

মুখটা উদ্ভাসিত দেখায় বনছায়ার।

নীহারিকার অবশ্য মনের মধ্যে একটা বিদ্বেষ আর বিদ্রোহের হাওয়া বয়ে যায়।...ওঃ। আমাদের মেয়ে, আমরা যদি ঠিক করি, ওনারা ওনাদের সেকেলে প্রেজুডিশ নিয়ে তার এদিক ওদিক করতে পারবেন ? এতো সস্তা নয়। তবে এখন আর একটা বুদ্ধির হাওয়া মাথায় এলো। আদিত্যকে কিছু বলার আগে যদি ওই বুড়োবুড়ি যুগলকে কব্জা করে ফেলা যায়, তাহলে নীহারিকার পৃষ্ঠবল বাড়ে। কব্জা করা যে শক্ত নয়, সে কথা নীহারিকা ভালোই জানে। জানে, ওই দুটি মানুষের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধটি প্রবলই আছে। যেখানে নিজেদের অধিকার নেই, এবং জানেন তাঁদের মতামতের কোনো মূল্যই নেই, সেখানে মত প্রকাশ করতে আসবেন না। এবং নিজের মতের বিরুদ্ধে হলেও, সেই ভাবটি প্রকাশও করবেন না। দেখছে তো অনেকদিন নীহারিকা। আসলে হিসেব করে দেখলে, দেখেছে যে মাথার ওপর দু-দুটো ভারী মানুষ থাকাটাই নীহারিকার অসহ্য। মানুষ দুটোর স্বভাবের জন্য নয়। 'ভারী' তো বটেই। আত্মমর্যাদা জ্ঞানসম্পন্ন লোক একটা অধস্তন হলেও ভারী হয়। আর এ তো সমাজজীবনের দায়ে পরম উর্ধ্বতনই।....

নয়নতারা যদি আর পাঁচটা 'শাশুড়ী'র মতো বৌয়ের ওপর দাপট চালাতে আসতেন অথবা সংসারের হলুদ পাঁচফোড়নের অধিকার নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বসতেন, হয়তো সেটা বরং অনেক সহনীয় হতো নীহারিকার পক্ষে।

সে যাক, আজ এখন নীহারিকার বরের কাছে সুপারিশ করতে যাবার আগে এনাদেরকে বেশ উপকারী বলে মনে করলো। তাই বললো, হ্যাঁ, ওই আর কী। লোক ওঁরা খারাপ নয়, ভালোই। তবে 'পাবনার গাঙ্গুলী' বলে বেশ একটি গর্বভাব আছে তো। তা হলেও—ওর জন্যে ভাববেন না। চলুন—আমার সঙ্গে। অবশ্য একটু কষ্ট করে তিনতলায় উঠতে হবে। ওঁরা নিরিবিলি পছন্দ করেন।

ভারী ভক্তিমতী বৌয়ের মতোই কথাটা বললো নীহারিকা।

কিন্তু পাবনার গাঙ্গুলীকর্তা সত্যব্রত ?

তিনি কী ওই 'সরকার' বাড়িতে মেয়ে দেবার প্রস্তাবে ফস করে জ্বলে উঠলেন ? নাঃ, এমন অবুঝ তিনি নন। নীহারিকা যখন বনছায়াকে একেবারে তাঁর কাছে নিয়ে এসে পরিচয় করে দেবার সঙ্গে সঙ্গই বনছায়ার আসার উদ্দেশ্যটি এবং তাঁর পদবীটিও যোগ করে বলে ফেললো, খুবই সমীহ আর স্নেহভাবেই বললেন সত্যব্রত, বসুন বসুন। এ তো বেশ ভালো খবর।

আমায় 'আপনি' করে বলবেন না—বলে উঠলেন বনছায়া। এবং সঙ্গে সঙ্গেই সত্যব্রতর আর নয়নতারার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললেন, খুবই দুঃসাহসের সঙ্গেই এসেছি, মেসোমশাই। এখন যদি আপনাদের দয়া হয়।

ছেলের মায়ের এই ভাষা। তাও গাড়ি-বাড়িওয়ালা মা।

নয়নতারা হেসে ফেলে বলে উঠলেন, এ কী কও মেয়ে ? এটা কী ছেলের মায়ের কহনের কথা ? এ কথা কইবে মেয়ের মা। তবে আজকাল আর মেয়েরা অমন নত হতে চায় না। আর তুমি যে দেখি উলটা। এতো নত ভাব ?

বনছায়া বিনীতভাবে বলেন, আমার যে অন্যায় আবদার মাসিমা। আপনাদের ঘরের মেয়ে আমার ঘরে নিয়ে যাবার সাহস তো বামনের চাঁদে হাত বাড়ানো।

নয়নতারা ফস করে বলে ফেলেন, ওসব কথা ছাড়ান দাও মা, এখন আবার ওকথা কে মানতে বসে ? আমার নিজের মেয়ের পুত্তুর রত্নটিইতো কুণ্ডু না মুণ্ডু কোন ঘরের মেয়েকে ঘরে এনে তুলেছে !

তোমার আকৃতি-প্রকৃতি তো উচ্চকুলের পরিচয়। বুড়াবুড়ির কাছে আর্জি জানাতে আসা—এই আবার এখন কেউ করে না কী? সেকেলে সভ্যতা জ্ঞান আছে বলেই—

নীহারিকার অবশ্য ঠিক এ ধরনের কথা তেমন পছন্দ হলো না, আরো মেপেজুপে কথা বললে ভালো শোনাতো। তবে নীহারিকার ছেলে যাদের পায়ে মাথা মুড়োতে গেছে, তাদের সম্পর্কে যে কিছু জানা নেই নয়নতারার, এই ভাগ্য নীহারিকার।

মেপেজুপে কথা অবশ্য সত্যব্রত বললেন। বললেন, চিরদিন কী আর 'সংস্কারের' ছোট গণ্ডীর মধ্যে আটকে থাকা উচিত? তাহলে সমাজেরও তো কোনো 'সংস্কার' হয় না। তা ছাড়া বিবাহ ব্যাপারটা তো কতকটা ঈশ্বর নির্দিষ্টও বটে। নাতির ব্যাপারে তোমার এই মাসিমাটিকে বোঝাতে সময় লেগেছে সেকথা।

যুধাজিৎকে তিনি দেখেছেন, আদিত্যর বেশী বাড়াবাড়ি অসুখের সময় খবর নিতে এসেছে। তাঁর খুব ভালোই লেগেছে ছেলেটিকে, সেকথাও জানালেন।

ওনাদের বার কয়েক প্রণাম করে আর নীহারিকাকে অশেষবিধ কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দোতলায় নেমে এসে বনছায়া বললেন, মেয়ের বাবা তো শুনেছি এখনো অসুস্থ। আমি আর তাঁকে ব্যস্ত করতে যাব না এখন। ওঁকে রাজী করানোর ভার আপনার ওপর দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখনি চলে যেতেও তো মন সায় দিচ্ছে না। মেয়েকে একটিবার দেখে যেতাম। তো তাহলে আসুন দুজনে বসে একটু চা-ই খাওয়া যাক।

তা প্রার্থিত ফল ফলে, বাসনা পূর্ণ হয়। মেখলা এসে পড়ে।

বনছায়া তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠেন, ভগবান আমার ওপর বড় সদয় মা।

তারপর হাসিকান্না মেশানো গলায় বলেন, আমার ক্ষ্যাপা বাউণ্ডুলে উদোমাদা ছেলেটার ভার তোমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে ছুটি নেবো বলে, তোমায় এবাড়ি থেকে ভিক্ষে করে নিয়ে যেতে এসেছিলাম মা। মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে। কার্যসিদ্ধি করে ফেলে, আপাতত বিদায় নিচ্ছি। এখন কেবল কেবল আসবো, যতোক্ষণ না তোমায় নিয়ে সটকান দিতে পারছি।

বলে নিজের আহ্লাদেই হেসে বিহ্বল হন।

এই আবেগপ্রবণতাই বনছায়ার স্বভাব। আর আজ তো একটি ভয়ঙ্কর অভিযানের নায়িকা হয়ে অসাধ্যসাধন করে ফেলার গৌরবে অস্থির হয়ে উঠেছেন। কতোক্ষণে এই 'অভিযান কাহিনী আর তার ফলাফল ছেলের কাছে গিয়ে বলবেন..... '

তা বনছায়া তো তাঁর বিহ্বলতা ঢাকবার চেষ্টা করলেন না।

কিন্তু মেখলা?

তার বিহ্বলতা সে ঢাকবে কোন উপায়ে? কোন পত্রাবরণে?

কোনোমতে নিজের ঘরে ফিরে এসে বসে ভাবতে থাকে, সারাদিনের পরিশ্রমের পরিশ্রান্তিতে কী মেখলা ঘুমিয়ে পড়েছিল? তাই একটা অভাবিত স্বপ্ন দেখল?

ঠিক কী বললেন উনি? মেখলা কী যথাযথ শুনতে পেয়েছে? যা বললেন তার মানে কী? যেভাবে বললেন, তাতে তো মনে হলো—

নাঃ। টুসকি আর ভাবতে পারছে না।

নীহারিকা অনেক কিছু ভাবছে। ভেবে চলেছে তার নিজস্ব মনের গড়ন অনুযায়ী। ওই মহিলার এই আসাটি কী কেবলমাত্র নিজস্ব আগ্রহে? তাই কী আর সম্ভব? তলে তলে অনেক দূরই এগিয়েছে

নির্ঘাৎ। নেহাৎ লোক-দেখানো সৌষ্ঠবে নিজে এলেন প্রস্তাব দিতে। জানেনই তো এ পক্ষ রাজী না হলেও বিয়ে আটকাবে না। ছেলে আর মেয়ে নাবালক তো নয়। তবে হয়তো সংঘর্ষের পথে না গিয়েও ঘটনাটা ঘটানো যায় কিনা সেটা একবার বেয়ে-চেয়ে দেখতে এলো। মুখে মধুঢালা। অভিনয়টা ভালোই জানেন।

তার মানে মেয়েটি আমার 'কাজে'র চেষ্টায় ঘুরে বেড়ানোর ছুতোয় তলায় তলায় প্রেম চালিয়ে চলেছেন। না হলে এতোটা এগোয় ?

কিন্তু বাড়িতে যখন ফেরে মেয়েটাকে খুবই শুকনো দেখায়।

কি জানি, সেই ভাবটা দেখানো কিনা!

তবে বিনা চেষ্টায় বিনা চিন্তায় এবং বিনা খরচে মেয়ের বিয়েটা যদি হয়ে যায়, তার থেকে ভালো আর কী আছে ? ওই যুধাজিৎকে দেখে তো নীহারিকার প্রথম থেকেই এ স্বপ্ন ছিলো মনের মধ্যে, তবে এ বাড়ির কট্টরপনায় স্বপ্ন সফল হবে না সেটাই জানা ছিলো।.....অবশ্য 'এ বাড়ি' বলতে সে 'তিনতলার' ওনাদের ধর্তব্যের মধ্যে আনেনি, মাথায় আছে আদিত্য। আদিত্যকে যেন আজকাল অদ্ভুত একটা সর্বনাশা বুদ্ধিতে পেয়েছে। হিত বুঝেও সেটাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করবে, অপছন্দ ভাব দেখাবে। ওই করে করে নীলুদাকেও তো প্রায় বিমুখ করে তুলেছে লোকটা। নীলুদা আদিত্যর নানারকম চিকিৎসার কথা তুলেছে, তার সব দায়ভার গ্রহণ করবে সে, এমন ইঙ্গিতও দিয়েছে। কিন্তু আদিত্য সে সব প্রস্তাব নস্যাৎ করে দিয়েছে। বলেছে, কেন হে বাপু আর এই মরা গরুটাকে টেনে ভাগাড়ে ফেলে দিয়ে আসার বদলে ঘাসজল দিয়ে জীইয়ে তোলার চেষ্টা ? আদিত্য গাঙ্গুলী মরলে কী এমন রাজ্য রসাতলে যাবে ? কিস্যু হবে না। কারু কিস্যু হবে না। বরং বুকের ওপর থেকে পাথর নামবে।....ছেলেমেয়ে ? ধ্যুস। 'কা তব পুত্র, কা তব কান্তা' ?...আমার বিহনে কেউই শোকে কাতর হবে না হে 'নীলুদা'।

তবু বলতে তো হবে লোকটাকে। সময় বুঝে বলতে হবে।

আশ্চর্য। চাকা কীভাবে ঘুরে গেলো। নীহারিকা ভয় করছে আদিত্যকে। তার মুড বুঝে কথা বলবার জন্যে অপেক্ষা করছে। কী বাবদ ? শুধু একটা অসুখ বাধিয়ে লোকটার সাহস এতো বেড়ে গেলো ? নীহারিকার ওপর টেক্কা দিতে বসলো ? দিতে বসলো কেন, দিয়েই তো চলেছে।

নীহারিকার যদি 'উপযুক্ত' দুই ছেলে, ছেলের মতো হতো ? যদি ওই মহিলার মতো পুত্রগরবে গরবিনী হতে পারতো ? তাহলে আজ তাকে আদিত্য গাঙ্গুলীকে এমন সময়ে চলতে হতো ?

রোগ। রোগ তাহলে একটা হাতিয়ার ?

কিন্তু ব্যাপারটা যদি পালটে যেতো ? 'ছেলে হারানোর' খবরে নীহারিকারই যদি স্ট্রোক হতো ? তাহলে নীহারিকাই আজ ওই জায়গায় চড়ে বসতে পারতো। তা হলো না। হলো যার না হবার। নীহারিকার ভাগ্যই চিরদিন বাদী।

তবু কিছুকাল আগেও নীহারিকার জীবনটি কতো সমৃদ্ধ ছিল!

সেই 'সময়'টাকে ভাবতে চেষ্টা করে নীহারিকা।

যখন বাপ্পা পার্টিভুক্ত হলেও বাড়িতে থাকতো। হামেহাল থাকতো তারকের মতো একটা করিৎকর্মা লোক। তার সঙ্গে রান্নাঘর আলো করে থাকতো কাজল! নীলুদার আবির্ভাবে বাড়িতে একটা আহ্লাদের হাওয়া বইতো। কেউ যে তার ওপর অপ্রসন্ন, এমন সন্দেহের ছায়া উঁকি মারেনি তখন।....তিনতলার দুজনকে গণ্য না করলেও চলতো। কী সুখের জীবন ছিলো তখন নীহারিকার! অবশ্য তখন তা ভাবতো না নীহারিকা। চিরকালই নিজেকে দুঃখী ভেবে অসুখী হওয়াই নীহারিকার

স্বভাবধর্ম। তখন নিজের আর্থিক অবস্থাটাকে খুব অবজ্ঞার চোখে দেখতো নীহারিকা। ভাবতো বেশ একটু পয়সাওলা হতে না পারলে আর জীবন ! সে জীবন নীহারিকাকে কী তার ছেলেরা এনে দিতে পারবে ?

আর এখন ? এখন তো সকল স্বপ্নের সমাধি !

হঠাৎ যুধাজিতের বাড়ির গৃহপ্রবেশের নেমন্তন্নর দিনের দৃশ্যটা চোখে ভেসে উঠলো। উৎসবের সাজে সাজা সেই বাড়িখানা ! চোখে ভেসে উঠলো যুধাজিতের মাকে গাড়িতে উঠিয়ে দিতে গিয়ে গাড়িখানার চেহারা। অনেকদিন আগে দেখা সেই মারুতিখানা নয়। অনেক ভালো দামী গাড়ি। গাড়িও ধবধবে সাদা !

সহসা নিজের মেয়ের ওপর কেমন একধরনের ঈর্ষা অনুভব করলো নীহারিকা। টুসকি ওই সবের মালিক হতে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, সত্যিই ঈর্ষা আসছে। সবাই নীহারিকাকে টেক্কা দিয়ে ওপরে উঠে যাবে। না হলে আজ কিনা নয়নতারা এ সংসারের একজন উপার্জনশীল ব্যক্তির স্ত্রী !....তা দিক টেক্কা, তবু নীহারিকা এমন কথা অবশ্য ভাবতে বসলো না এই বিয়েটা না হলেই বা ক্ষতি কী ? ভাবতে গিয়েও শিউরেছে।

সজ্ঞানে নয়, হয়তো অবচেতনেই একবার ভেবে ফেলেছিলো, আদিত্য বেঁকে বসলে কী অরা বিয়েটা হতে পারবে ? পরক্ষণেই অনভ্যস্ত চিত্তেও মনে মনে বললো, দুর্গা দুর্গা।

তা 'দুর্গা' নামের সুফল ফললো !

আদিত্য গাঙ্গুলী নামের লোকটা মুখখানা বাঁকালো বটে, তবে নেহাৎ বেঁকে বসলো না।

কথাটা পাড়বার সুবিধেও সেই করে দিয়েছিল নীহারিকাকে।

কোন মহাশয়া এসেছিলেন ? যাঁকে নিয়ে এতোক্ষণ কাটাতে আবার রাজদরবারেও নিয়ে যাওয়া হলো মনে হলো।

দরজায় মোটা কাপড়ের পর্দা ফেলা। তবু বিছানায় শুয়ে থাকা আদিত্যর চোখে কানে কিছুই এড়ায় না। তা এমনভাবে সর্বদা বিছানায় শুয়ে থাকাটাও যে তার ইচ্ছাকৃত, সেটা ডাক্তারদের মতে স্বীকৃত। তাঁদের মতে, এ একধরনের মানসিক ব্যধি। নিজেকে 'রোগমুক্ত' দেখাতে রাজী না হবার ইচ্ছে।

নীহারিকা সুবিধে পেলো।

এবং যতোটা সম্ভব সংক্ষেপে অথচ প্রাঞ্জলভাবে পুরো ঘটনাটি বিবৃত করলো, নিজেকে নির্লিপ্ত রেখে। এ ব্যাপারে তার নিজস্ব ইচ্ছে অনিচ্ছে প্রকাশ পেলো না বিবৃতির মধ্যে। একটা মানসিক রোগগ্রস্তর সঙ্গে ঘর করতে করতে 'মনস্তত্ত্ব' সম্পর্কে ক্রমশঃই ওয়াকিবহাল হয়ে উঠছে নীহারিকা।

আদিত্য মুখ বাঁকিয়ে বললো, তাই না কী ? পাবনার গাঙ্গুলীকর্তাও গাড়িবাড়ি দেখে মোহিত ? শুদ্দুরের ঘরে কন্যে দিতে আপত্তি করলেন না ? বরং ড্যাম গ্ল্যাড ? বাহবা ! বাহবা ! তবে আর কী, বসিয়ে দাও সানাই !....বহুকাল একটা বে'বাড়ির নেমন্তন্ন খাওয়া হয়নি ! মন্দ হবে না !

নীহারিকা শুধু বললো, তোমার কী নেমন্তন্ন খাবার সম্পর্ক ?

সম্পর্ক ? সম্পর্ক নিয়ে আবার দুনিয়া চলে না কী ? গাড়ির চাকাখানা যাতে গড়গড়িয়ে চলে, সেটাই দেখে। তো হতভাগা আদিত্য গাঙ্গুলী তো আর কন্যে সম্প্রদান করতে বসতে যাবে না। নেমন্তন্ন খেতে বাধা কী ?

নীহারিকা জোর দিয়ে বললো, 'সম্প্রদান' করতে বসবেই বা না কেন ? তোমার টুসকিকে অন্য ঘরে পাঠাবার আগে মনের জোর করে এটুকু পারবে না ?

আদিত্য আরো বাঁকা গলায় বললো, আমার টুসকী ? সেটা আবার কী ব্যাপার ? এই দুনিয়ায় 'আমার' বলে কিছু নেই, বুঝলে ? আমিও কারো নই।

নীহারিকার স্বরটা রুদ্ধ হয়ে আসে, বলে, 'তুমি' কারো নয়, সেটা ঠিকই। তবে তোমার বলে সবই আছে। দায়িত্ব এড়াবার জন্যে যদি ইচ্ছে করে উড়িয়ে দিতে চাও, আলাদা কথা ! তবে একটি কথা সাফ বলে রাখছি, তুমি যদি এই সময় বেগড়বাঁই করে ধাষ্টামো করো, নীহারিকা গাঙ্গুলীও তার শোধ নিয়ে ছাড়বে। একগাছা দড়ির অভাব তার হবে না।

যুধাজিৎ কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে উঠলো, মাই গড্ হে আমার মহাশক্তিধারিণী জননী, এই সব্বনেশে কার্য করে এলে তুমি ?

এলুমই তো। এখন কী বলবি বল ? অনধিকার চর্চার অপরাধে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাস তো দাঁড় করা।

তোমায় কাঠগড়ায় ? আমার বাবার বাবা এলেও পারবে না মা ! তব চরণে কোটি কোটি দণ্ডবৎ।

বনছায়া কী ছেলের মুখের দীপ্তি আর কৃতজ্ঞতার ছাপটি দেখতে পাচ্ছেন না ? অবোধ হলেও এতো অবোধ নন। তাই বলে ওঠেন, আমার পায়ে কোটি কোটি দণ্ডবৎ করবি, সেটা তো বাহুল্য কিছু নয়। সহস্র কোটি করলেও করতে পারিস। তবে সর্বনেশে কাণ্ড বলছিস যে ?

যেটা যথার্থ, তাই বলছি।

বনছায়া রাগের ভঙ্গীতে বলেন, তো এখানে সর্বনাশটা কার হচ্ছে ? তোর ?

যুধাজিৎ তাড়াতাড়ি দুহাতে দুটো কান ধরে বলে, আমার কথা হচ্ছে না জননী, বলছি তোমারই কথা। তোমার তো সর্বস্বই যাবে। খাল কেটে কুমির আনলে যা হয়।

বনছায়া এবার একটু গম্ভীর হয়ে বলেন, আমার 'সর্বস্ব' বলতে তো তুই। তা তুই যদি নিজে মনে করিস এইটুকুতেই সেটা যেতে পারে, তাহলে গেলেও দুঃখু করবো না।

ওরে বাস ! অ্যাঁ ! কী দারুণ ডায়লগ !

যুধাজিৎ হঠাৎ মাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলে ওঠে, তোমায় আমি এ যাবৎ বোকাসোকা ভালোমানুষ ভেবে এসেছি।

বনছায়া একটু হেসে বলেন, বোকাসোকা তো নিশ্চয়ই, আর যদি ভালোমানুষ বলতে চাস তো বলবি, তবে বোকাসোকা ভালোমানুষদেরও একটা ভগবানদত্ত বুদ্ধি থাকেরে জিতু ! তুই যদি কুমিরের কামড়ে নিজেকে ছেড়ে না দিস, কার সাধ্যি আমার সর্বস্ব নাশ করতে পারে ? তবে—মিথ্যে অপবাদ দিসনে বাবা, ও মেয়ে তেমন নয়। ভালো মেয়ে, ভদ্র মেয়ে।

যুধাজিৎও হাসে। একটু গভীরভাবে হাসে। বলে, তবে আর কিছু বলার নেই। তোমার ভগবানদত্ত ক্ষমতাই তোমার সর্বস্ব রক্ষা করবে। তা করেও তো রেখে আসছে এ যাবৎ।

বলেই চট করে নিজের ভঙ্গীতে ফিরে এসে বলে, কিন্তু মা, কবে থেকে মনে মনে এই প্যাঁচটি কষছিলে ?

কবে থেকে ? সেই যেদিন মেয়েটাকে প্রথম দেখেছিলাম, তবে থেকে। দেখামাত্রই চোখে বড় ভালো লেগে গিয়েছিলো রে। তবে যখন জানলাম স্বজাতির মেয়ে নয়, চুপ করেই গেলাম।...কিন্তু ক্রমেই তো দেখছি, আজকাল আর এসব কেউ গ্রাহ্যই করছে না, তবে আর বিনা চেষ্টায় চুপ করে বসে থাকি কেন ? তাই সাহস সঞ্চয় করেছি। ভুল করিনিরে বাবা। আমি তোকে গ্যারাণ্টি দিচ্ছি !

যুধাজিৎ আর একটু হাসে, ভগবানের বরপুত্রী কী আর ভুল করতে পারে ? ভগবানদত্ত শক্তির বলেই, সব 'ভুল'কেই পরিপাক করে ঠিক করে ফেলে জয়ী হতে পারে। তোমার বড়ছেলের ব্যাপারেও

তো—

বনছায়া তাড়াতাড়ি সেকথার মাঝখানেই বলে ওঠেন, ওরে, ভাগ্যিস বললি। এক্ষুণিই তো দেবুকে জানাতে হবে। জানাতে মানে আর কী একটু জিগ্যেসই করতে হবে।....তা নইলে অভিমান হবে, বলবে, 'মা আমার সঙ্গে একটু পরামর্শ না করেই একেবারে পাকা কথা কয়ে এলো।'

যুধাজিৎ দুহাত জড়ো করে কপালে ঠেকিয়ে বলে, আর কিছু বলার নেই মা। যাও তোমার বড়ছেলে বৌয়ের, তোমার মেয়ে-জামাইয়ের, তোমার আরো যদি কেউ থাকে অভিমান ভাঙাওগে গলবস্ত্র হয়ে। চোরদায়ে ধরা পড়েছো যখন।

বনছায়া বলেন, আমার জামাই অন্য রকমরে। সে আমার খাঁটি সোনা, তাতে ময়লা ধরে না। তো একটু নীচু হতে দোষই বা কী বাবা? তাতে তো আর আমি সত্যি 'নীচু' হয়ে যাচ্ছি না?

যুধাজিৎ গম্ভীরভাবে বলে, তার মানে এটি একরকম অভিনয়?

অভিনয়? তা যদি বলতে হয় বল। তবে অভিনয় না করে কে আর কবে সংসার করতে পারে বল? শান্তি বজায় রাখতে করতেই হয়। তবে আপনমনে ভেবে দেখেছি অনেক সময়, তাতে দোষ কী? এতে তো কারুর অনিষ্ট হচ্ছে না। একটু সভ্যতা সৌজন্য করবে না মানুষ? তাহলে তো মানুষের জামা-কাপড় পরাও একরকম অভিনয়। কেউ একেবারে কিছুটি না পরে মাথা সোজা করে পথে বেরিয়ে পড়ে বলুক তাহলে, 'কেন কিছু পরতে যাবো? আমি 'যা' তাই দেখুক সবাই!' বলুক না....হি হি! লোকে বলবে, 'চলো তোমায় হি হি পাগলা গারদ দেখিয়ে দিইগে।'

বলে নিজের কথায় নিজেই হেসে কুটিকুটি হন। যুধাজিৎ মার এই ছেলেমানুষের মতো হেসে কুটিকুটি হওয়া দেখে খুব গভীরে একটা নিঃশ্বাস ফেলে। এই মানুষটাকে কী সবাই ঠিক এস্টিমেট করতে পারবে? পেরেছেই কী কেউ?

তারপর ভাবলো হয়তো বাবা পেরেছিলেন। এখন ভেবে দেখলে, তাই মনে হয়। অনেকদিন পরে হঠাৎ বাবার কথা মনে পড়লো যুধাজিতের।

পাপিয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই শৌভনিকের সঙ্গে দেখা। অনেকদিন যেন দেখা হয়নি। ওঃ, সেই পুরুলিয়া থেকে আসার পর, কর্মকর্তাদের কাছে নিজেদের অভিযানের রিপোর্ট দিয়ে আসার পর বোধহয় আর নয়। বলে উঠলো, কী রে? কোথায় ডুব মেরেছিলি এতোদিন? আর দেখাই পাই না।

আসলে সত্যি ডুবই মারতে হয়েছিলো কিছুদিন শৌভনিককে। শিলিগুড়িতে তার এক মামা আছেন, হঠাৎ তাঁর ভারী অসুখ শুনে মাকে নিয়ে চলে যেতে হয়েছিল। অকৃতদার মানুষ, শিলিগুড়িতে নিজের ব্যবসা নিয়ে আছেন। সময় অসময়ে তাঁকে দ্যাখ্ভাল করতো বোনেরাই। তবে যেহেতু শৌভনিকের মা বোনেদের মধ্যে বড়ো, তাঁর দায়িত্বটি বেশী। এর ওপর আবার তাঁর পুত্ররত্ন ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে। দায়িত্ব স্বভাবতঃই বাড়তে বাধ্য। ডাক্তার আত্মীয়কে কেউ তাদের কারো বিয়েবাড়িতে না দেখতে পেলে ততোটা হতাশ হয় না, যতটা হতাশ হয় রোগীবাড়িতে না দেখতে পেলে। অলিখিত আইনে বিশেষ একটু প্রত্যাশাই থাকে তার সম্পর্কে।

তবে শৌভনিক এখন তার ডুবমারার কারণটি বলতে না বসে, বললো, তুই কী আর এখন এই মর্ত্যলোকের কাউকে দেখতে পাস?

তার মানে?

শৌভনিক পাপিয়ার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে বলে, মানেটা নিজেকেই জিগ্যেস করো চাঁদু। ওঃ। আবাল্য একটা স্বপ্ন বুকে ভরে লালন করে চলছিলাম, হঠাৎ কিনা মঙ্গল গ্রহের একটা জীব এসে

পড়ে সে স্বপ্ন ভেঙে চুরমার করে দিলো।

কী বকছিস বাজে বাজে ?

'বাজে বাজে' যে নয় সেটা তুমি ভালোই জানো মানিক। ওঃ ! হৃদয় একদম চূর্ণ হয়ে গেছে।

দুজনের গন্তব্যস্থল একই। অর্থাৎ বাসস্ট্যান্ড। কাজেই হাঁটতে থাকে একসঙ্গে।

শৌভনিকের কথার ভঙ্গীই চিরদিন এইরকম, তবে যখন যে প্রসঙ্গ পড়ে। গতকালই শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পর তোটকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আর তোটক অন্য কথার মাঝখানে হেসে বলে বসেছিলো, যাক, আপনাকে দেখে বাঁচা গেলো। আপনার হাতের মোয়াটি তো মশাই চিলে ছোঁ দিয়ে মেরে নিলো দেখলাম। সেই অবধি আর দেখা নেই। ভাবছিলাম হৃদয়ভঙ্গে বিবাগী হয়ে গেলেন না তো '......

সেই কথাটা মনে করেই শৌভনিক পাপিয়ার দিকে একটু তাকিয়ে বলে, সেদিন যা অবস্থা দেখেছিলাম তোর ! সেদিনই স্বপ্নের সমাধি। আমিই তো বরং তোকে না দেখতে পেয়ে ভেবে রেখেছি, বোধহয় মঙ্গল গ্রহেই রয়ে গেছিস ! ফিরতে পারিসনি।

ভ্যাট। মারবো এক চাঁটি। খালি ফাজলামো।

ফাজলামো ! তুই ভাবছিস স্বপ্নটপ্ন আমার বানানো কথা ?

বিলকুল ! কোনোকালেও তুমি ওসবের ধার দিয়েও যাওনি ?

কে বললে যাইনি ?

আমিই বলছি। মেয়েরা ওসব খুব বুঝতে পারে।

তার মানে ওই মঙ্গল গ্রহের জীবটি, যে নাকি তোর 'ভাইপোর বড়মা' না কী যেন হয়, সেই ভাগ্যবান ব্যক্তিটিই তোকে নিয়ে স্বপ্ন দেখেছে ?

কী বললি, হি হি, 'ভাইপোর বড়মা' ? উঃ ! রাস্তার মাঝখানে পেটে খিল ধরিয়ে দিলি যে !

আচ্ছা এবা না হয় ভুলই হয়েছে ? ওইরকম কী একটা বললি না সেদিন ? তো যাক, সেই আজব জীবটা তো বটেই।

তার দায় পড়েছে ! তুচ্ছ একটা মেয়েকে নিয়ে স্বপ্ন দেখবারই ছেলে যে সে ! তার স্বপ্ন অনেক বিরাট। গোটা দেশটায় সে বিপ্লব এনে ছাড়বে। দেশটাকে একদম আমূল বদলে দেবে। উঁচু-নীচুর ভেদ-এর হিসেবকে তছনছ করে দেবে।

শৌভনিক গম্ভীর গলায় বলে, হুঁ। জানি, 'পা' আর 'মাথা' এই দুটোয় ফারাক রাখবে না। পায়ে মাথায় এক করে ছাড়বে, এই তো ? কিন্তু পায়ে মাথায় এক হয়, মানে পা আর মাথা তখনি একই লেভেলে আসে যখন সে মাটিতে লম্বা হয়। তাই না ? তা লম্বা হওয়াটা দুভাবে হতে পারে। হয় আরামে লম্বা, নয় তো চিরবিরামে লম্বা ! সমাজজীবনে সেটিকে নিয়ে আসতে হলে—অবশ্য ওই বিপ্লবই আনতে হবে। ধড়াধড় একধার থেকে সটান লম্বা।

এসব কথা যেখানে সেখানে বলিস না। ওই বাস এসে গেলো—

হ্যাঁ, এরা ততক্ষণে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে এসেছে। বাস একখানা এলো বটে স্ট্যান্ডে, তবে ওদের প্রার্থিত নম্বর নয়। ওরা দুজনে তো একই পথের যাত্রী।

ব্যাগ থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে পাপিয়া বললো, এই গাছের ছায়াটায় এসে দাঁড়া।

ক্ষণকালের জন্যে আর দুজনে একই ছায়াতলে দাঁড়িয়ে কী হবে ?

তোর আজ হয়েছেটা কী ? ভূতে পেয়েছে ?

ভূতে ? নাঃ, বোধহয় পেত্নীতে ! কিন্তু সে কী আজ ? সেই কোন কাল থেকে। সেই পেয়ে-বসা পেত্নীটিকে ছাড়তে হবে বলে, প্রাণের মধ্যে ইঞ্জিন চলছে রে !

পাপিয়া গম্ভীর হবার চেষ্টা করে বলে, কী আর করবি ? আর একটা শাঁখচূর্ণী পেতনী কিছু খুঁজেপেতে যোগাড় করে নে। বাঁশবনের তো অভাব নেই।

বাঁশবন ? সেখানে তো আবার শুনছি ডোম গিয়ে কানা হয়ে যায়।

তুই তো আর ডোম নয়। পেয়ে যাবি একটা—

তা হয়তো পেয়ে যাবো !....শৌভনিক উদাস উদাস গলা করে বলে, খেঁদি গাবদা কালোকেলো যা হোক। খুঁজতে হবে না। আশেপাশে অজস্র। তবে স্বপ্নভঙ্গের জ্বালা ! বুঝবি না ! ওঃ !

দ্যাখ্ শৌভনিক, বেশী বাকতাল্লা মারবি না। কবে আবার স্বপ্ন গড়লি, তাই ভাব ? তুই আমার থেকে বয়েসে ছ মাসের না দশ মাসের কতো যেন ছোট, সে হিসেব নেই ?

ভ্যাট। ওটা আবার একটা ব্যাপার না কী ? যাকগে—কী আর করা। বিয়ের দিন নেমন্তন্ন করবো, বেশ দামী গোছের একটা প্রেজেনটেশান নিয়ে যাস। বৌয়ের কাছে পরিচয় দিতে হবে তো 'বাল্যবান্ধবী' বলে ?

ঠিক আছে, এখন থেকে টাকা জমাবো।

বাসটা এসে যায়।

পাপিয়া তাকিয়ে বললো, উঃ। কী রাক্ষুসে ভিড় ! ওঠা যাবে না।

ভিড়বিহীন বাসে উঠতে চাস তুই ? তাহলে আগামী জন্মের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। আয়। আয় চলে আয়। তুই আগে উঠে যা চটপট, আমি পিছনে আছি।

না রে। অসম্ভব।

আরে বাবা, কবে আবার—ওই যাঃ। ছেড়ে গেলো।

যাকগে। আর একখানা কী আর না আসবে ?

সেটা জনশূন্য হবে আশা করছিস ?

আশা করতে দোষ কী ?

শৌভনিক আবার উদাস ভাব দেখিয়ে বলে, নাঃ, দোষ আর কী ? শুধু আশাভঙ্গের দুঃখটা পাওয়া। যাকগে, সব যখন চুকেই গেছে, আর ভেবে কী হবে ? তবে সেই ভাইপোর বড়মাটিকে যা দেখলাম, তাতে তোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো আশা রাখি না। ওই 'মঙ্গল গ্রহের' জীবটাকে নিয়ে ঘর করা—

ওঃ। একেবারে ঘর-করা পর্যন্ত পৌঁছে গেছিস ?

তা কী করবো ? ওইটাই সার সত্য, এইটাই বুঝি। তুই সুখে আছিস দেখলেও সুখ পাবো। নিজে খেঁদি গাবদা যাকে পাই তাকে নিয়েই সুখে ঘর করতে চেষ্টা করবো।

কেন, দেবদাস হয়ে যেতে পারবি না ?

দেবদাস ? নাঃ রে। সে পথেও কাঁটা। সরকারি অর্ডার, নতুন ডাক্তারদের গ্রামে যেতে বাধ্য করা হবে।......

তবে আর হলো না ?

নাঃ। দেবদাসের বাপের টাকা ছিলো, এ হতভাগার তো আর তা নেই।

তা গ্রামে যাওয়াটা তো আমাদের উচিত রে শৌভনিক। গ্রামের অবস্থা তো দেখেই এলি ? কী অভাগা সব।

জানি। তবে গ্রামের ব্যবস্থাও তো দেখা হলো। শুধু ডাক্তার গিয়ে পড়লেই সব হবে ? হাসপাতালে শুয়োর চরবে, জমাদারনী পেশেন্টহীন বেড-এ মেয়ের চুলের পোকা বাছবে, একটা মাথাফাটা রোগী এসে পড়লে, একটু আইডিন জুটবে না, তুলো জুটবে না-

গিয়ে পড়ে আন্দোলন করতে হবে।

ওঃ। তা তুমিই তাহলে আগে যেও ম্যাডাম। গিয়ে পড়ে আন্দোলন করে 'ব্যবস্থা'র ব্যবস্থা করোগে। মেয়ে ডাক্তারবাবু বলে একটু বেশী খাতির পেতে পারিস। তবে সেই সঙ্গে একটা—মানে নিজের জন্যই একটা মনিষ্যির মতো বাথরুমের জন্যেও আন্দোলন কোরো। যা এক্সপিরিয়েন্স হয়েছে—

পুরুলিয়ার সেই আরসা গ্রামের হেডমাস্টারমশাইয়ের বাড়ির অভিজ্ঞতার গল্পটি তো করেছিলো পাপিয়া হেসে হেসে।

পাপিয়া একটু হেসে বলে, ওই একটা বিচ্ছিরী ব্যাপার। আর সব মানিয়ে নেওয়া যায়, কিন্তু—

শৌভনিক হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলে, না। আর সবই মানিয়ে নেওয়া যায় না। ডাক্তারী করতে গিয়ে সরকারের হাসপাতালের স্টকে এক বোতল ফিনাইল পর্যন্ত থাকে না, এটা মেনে নেওয়া যায় না। পেশেন্টের ঘরে কুকুর চরে বেড়ানো মেনে নেওয়া যায় না। শেয়ালে পেশেন্টের কোল থেকে বাচ্চা টেনে নিয়ে যাচ্ছে এটা মানিয়ে নেওয়া যায় না।

এই বাবা। তুই যে দেখছি বড্ড রেগে গেলি? এটা তো তোর স্বভাব নয়।

ওঃ। স্বভাব। জানিস না 'অভাবে স্বভাব নষ্ট হয়'।....ওই অভাবগুলো ভেবে মথায় রক্ত চড়ে যায়। বলি ম্যাডাম, যদি মাঠের মাঝখানে কোথাও একখানা উনুন জ্বালিয়ে দিয়ে স্বয়ং দ্রৌপদীকে বলা হয়, 'ব্যস লেগে পড়ো। যজ্ঞিবাড়ির রান্নাটি সেরে ফেলো', পারবে? দ্রৌপদীর ঠাকুমা এলেও পারবে না।

পাপিয়া হেসে ফেলে বলে, তোর কথা বলার ধরনটা ঠিক তোর ঠাকুমার মতো। বেশ গোছালো, মেয়েলি মেয়েলি।

ঠাকুমার হাতেই তো মানুষ।

হুঁ। জানি।

বুড়ি বলে, মরেও আমার সুখ হবে নারে শুভো, তোকে কার হাতে গচ্ছিত করে যাবো ভেবে।

অ্যাঁ? এই কথা বলেন? তুই তাহলে বাড়িতে একটা খোকাতুল্য?

বাঃ। তা কেন? মূল্যবান জিনিস। সেই যে পদাবলীতে আছে, 'কানু হেন গুণনিধি কারে দিয়ে যাবো?' সেই আর কী। তো কানু হেন গুণনিধির কপাল মন্দ.....এই আসছে আর একটা। আরো ভিড়।

ওরে সর্বনাশ।

থাম, ন্যাকামি করতে হবে না। বাসে ভিড় আজ নতুন দেখছিস? আয় চলে আয়—

বলে পাপিয়ার একটা হাত চেপে ধরে টেনে নিয়ে যায়। জমাট পাথরের দেয়ালের মতো ভিড়ের মধ্যে সেঁধিয়ে যেতে চেষ্টা করে। উঠেও পড়ে। কিন্তু একাই। পাপিয়ার হাতটা ভিড়ের ধাক্কায় ছেড়ে যায়।

বাসও ছেড়ে যায়। আর দেখা যায় না শৌভনিককে।

শৌভনিকও নিশ্চয় বুঝতে পারে না পাপিয়া উঠতে পারলো না।.. হয়তো অনবরতই চোখ ফেলতে থাকবে, খুঁজবে। নামার সময়ের আগে পর্যন্ত টের পাবে না।

পাপিয়া যেন হঠাৎ আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়ে রইলো। কী ভাবছে নিজেই জানে না।....ও হ্যাঁ, ভাবছে শৌভনিকের কথাই।....ও যতই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মোড়কে ভরে কথাগুলো বললো, তবু পাপিয়া জানে, সবটাই ঠাট্টা নয়। আবাল্যই ও পাপিয়াকে—

মেয়েদের চোখ বড় সজাগ। পাপিয়ার মতো অন্যমনস্ক স্বভাবের মেয়েও অনুভব করেছে। তবে এও বুঝেছে, 'গভীর সুরে গভীর কথা' শোনাতে বসার স্বভাব ওর নয়। আজ শুধু এইভাবেই জানিয়ে

গেল।

মনটা বিষণ্ণ হয়ে গেলো একটু।

কিন্তু কোনো মমতার বশেই তার আর 'হৃদয়বতী' হওয়া সম্ভব নয়। নিজের বিধিলিপি বুঝতে পারলেও! পাপিয়ার জীবনটাকে সেই এক হৃদয়হীনের কাছে বিকিয়ে দিয়ে বসে আছে পাপিয়া।.....

টুসকিদের বাড়ি যেন হঠাৎ একটা স্বর্গীয় হাওয়া এসে পড়েছে। যেন বাতাস ঢোকার মুখটায় এতোদিন একটা পাথর চাপানো ছিলো, সেটা কেউ সরিয়ে দিয়েছে। না কী পাথরটা নিজেই?

অবাক হয়ে যাচ্ছে নীহারিকা। আদিত্য নিজে থেকে বলছে, কই, কী হলো? বিয়েবাড়ির তোড়জোড় দেখছি না যে? আসল লোকটিরই যে টিকি দেখা যাচ্ছে না? সেই যা দুবার উঁকি দিয়ে গেলেন।

নীহারিকা কথাটার মানে ধরতে পারে না। অথবা হয়তো অন্য অর্থ ধরে ভিতরে ফস করে আগুন জ্বলে ওঠে। তবু কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলে, 'আসল লোক' মানে? কে?

বাঃ। এর আবার মানে কী? নীলুদা ছাড়া আবার কে? নীলুদাই তো চিরদিন আমাদের সকল কাজের কাণ্ডারী। নীলুদা এসে হাঁকডাক করবে, ছুটোছুটি করে কাজ করবে, যেদিকে জল দেখবে ছাতি ধরবে, এ ছাড়া বিয়েবাড়ি মানায়?

কন্যাদায়টা নীলুদার?

আহা, তাই কী বলছি? তবে ভাগ্নীদায় তো বটে। তো বাপব্যাটা অক্ষম হলে, মামার ঘাড়েই দায় পড়ে। না না, ডাকাও ডাকাও তাকে। বলে দেবে আমি বলে দিয়েছি নীলুদার ডাকহাঁক ছাড়া বিয়েবাড়ি জমছে না।

নীহারিকার মুখে আসছিলো, কেন? খরচের দায়টার সবটাই তার ঘাড়ে চাপাবার জন্যে? বললো না। যদি বা পরিস্থিতি একটু ভালো হয়েছে, নিজে আর নষ্ট করতে চায় না। অনেক দুঃখের আগুনে পোড় খেয়ে নিজেকে একটু সামলাতে শিখেছে নীহারিকা। আর ভাবছে, এটাও আদিত্যর একটা নতুন প্যাঁচ।

কিন্তু আসলে হয়তো তা নয়। ব্যাপারটা হয়তো অন্য। দীর্ঘদিন একটা বুকচাপা গুমোটের মধ্যে থেকে থেকে কী ওই অহঙ্কারী আদিত্য গাঙ্গুলীর প্রাণটা হাঁফিয়ে উঠেছিলো? তাই এই একটা ছুতো পেয়ে নিজের হাতে জড়িয়ে বসে থাকা সেই গুমোটের ভারী কম্বলখানা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে চাইছে? এই ছুতোয় আদিত্য আবার সহজ হতে চায়? মানুষের সমাজে মিশতে চায়?

যার যা কারণ থাকুক, টুসকির বিয়ের ছুতোয় নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে নিয়েছে শিলাদিত্যও। অথবা বলতে পারা যায়, হঠাৎ 'সম্পূর্ণ বদলে যাওয়া' নিজেকে আবার পুরনো চেহারায় ফিরিয়ে আনছে শিলাদিত্য। প্রথম দু-একদিন একটু আড়ষ্টভাবে খোঁজখবর নিচ্ছিলো, কিন্তু বিয়ের পাত্রটি যেহেতু তারই বন্ধু, তখন 'সহজ' হয়ে পড়াটা সহজ হয়ে যেতে দেরী লাগলো না।

এখন শিলাদিত্য সম্পূর্ণ বাড়ির ছেলে বনে গেছে। সেই আগের ছেলে। টুসকির সঙ্গে খুনসুড়ি করছে, মাকে ক্ষ্যাপাতে চেষ্টা করছে, দাদু-দিদার সঙ্গে গল্প জমাচ্ছে এবং বলতে কী নীলুমামার সঙ্গেও বিয়ের ব্যাপারে পরামর্শপ্রার্থীর রূপ ধরে সম্পর্কটা ঝালিয়ে নিয়ে দিব্যি আলোচনা চালাতে পারছে। আর খুব একটা আনন্দবোধ করছে এই সবে।

এবং মজা এই, এক একসময় নিজেই ভেবে অবাক হয়ে যাচ্ছে, এই আনন্দটিকে সে এতোদিন হারিয়ে বসেছিলো। শিলাদিত্যের উচ্চাভিলাষী চিত্তের দায়ে যে দায়বদ্ধতার মধ্যে কাটাতে হচ্ছিলো

শিলাদিত্যকে তার মধ্যে কী কোথাও ছিটেফোঁটা 'আনন্দ' ছিলো?

হ্যাঁ, প্রিয়াকে নিয়ে ঘোরাঘুরি করেছে, তার সন্তুষ্টিবিধানের জন্যে তার বাপের বশংবদের ভূমিকা নিয়ে গদগদ হয়েছে, তার মায়ের কাছে আদরস্নেহ কাড়িয়ে, আদরও পেয়েছে কিছু। কিন্তু তার মধ্যে শুধু যেন একটা উদ্দেশ্যসিদ্ধির, সাফল্যের 'সুখ'ই ছিলো, আনন্দ নয়। আনন্দ আর কোথা থেকে থাকবে? ভিতরে ভিতরে যে একটা তীব্র অপরাধবোধ কুরে কুরে খেয়েছে। আপন সংসার আপন পরিজনের সঙ্গে যতোই দূরত্ব রচনা করেছে, ততোই যেন ওই একটা অপরাধবোধের পাষাণ ভার বুকের মধ্যে চেপে বসেছে। আর সেই 'ভারটা'কে ঠেলে সরিয়ে ফেলবার চেষ্টায় অবিরত যুক্তি খাড়া করতে বসেছে, আর—ও পক্ষের 'অন্যায়'গুলোকে বড়ো করে ধরার চেষ্টা করেছে। কেউ মুখে কিছুই বলেনি, তবু শিলাদিত্য ভাবতে বসেছে, ওঃ। বাড়ীসুদ্ধ সবার মুখ হাঁড়ি। কেন শিলাদিত্যর অপরাধটা কী? একটা মেয়েকে ভালোবেসে ফেলা? আর তাকে পাবার জন্যে, তার 'উপযুক্ত' হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছি। এতে অপরাধটা কোথায়?

সংসার সম্পর্কে দায়িত্ববোধ থাকা উচিত ছিলো? কেন হে বাবা শালা শিলাদিত্যটাই চোরদায়ে ধরা পড়েছে? 'বড়বাবু' চিরদিন সেই দায়িত্বর ধার না ধরে স্বেচ্ছাচার চালিয়ে আসছেন না, দেশোদ্ধার করছেন। তাহলেই সাত খুন মাপ। এই দেশকে উদ্ধার করবি তুই? মশার ইচ্ছে হিমালয় পাহাড়টাকে মাথায় তুলে ওড়ার। সেই বৃথা সাধনাটি, সে তো তোর নিজের শখ। নিজের ভালোলাগার ব্যাপারে নিজেকে সমর্পণ করা। তার বেলায় দোষ নেই? আমি শালাও নিজের ভালোলাগার পিছনেই ছুটছি।....

এইসব যুক্তি সে অবিরত নিজের মধ্যে আউড়েছে। কিন্তু স্বস্তি পেয়েছে কী? ক্রমেই যেন 'এদের কাছে ছোট হয়ে যাচ্ছি, মনে হয়েছে। তাই এদের সঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়েছে। আর আত্মরক্ষার্থেই যেন ক্রমশঃ রুক্ষ কঠোর আর কটুভাষী হয়ে উঠেছে। এদের কাছে নিজের ত্রুটি স্বীকার করতে বসবে? নিজের অপরাধী ভাবটা দেখিয়ে ফেলবে? পাগল না কী? তার থেকে কটু আর রুক্ষতার প্রলেপে বরং বুঝিয়ে ছাড়ো অপরাধী তোমরাই। তোমরা তোমাদের ছেলেটাকে প্রতিষ্ঠিত করে তুলতে পেরে ওঠোনি।

হ্যাঁ। সর্বদা নিজরচিত এই একক প্রশ্নোত্তরে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে শিলাদিত্য নামের একদা গানপ্রেমী স্ফূর্তিবাজ হালকা স্বভাবের 'ভলি' ছেলেটা।

তা অনেক 'ভলি' ছেলেরই এমন পারিপার্শ্বিকতার চাপে আর একটা ভুল ধারণার বশে অপঘাত মৃত্যু ঘটে। ঘটেছিলো শিলাদিত্যরও। কি জানি হঠাৎ কোন মন্ত্রে সে তার পুরনো স্বভাবে ফিরে এসে পড়েছে। প্রথমটা হয়তো চেষ্টাকৃতই ছিলো, কিন্তু আড়ষ্টতার প্রাচীরটা ভেঙে যেতেই যেন দেখতে পেলো, কী আশ্চর্য, তার বাগানের সবই ঠিকঠাক আছে। যেমনটি ছিলো।

এখন তাই শিলাদিত্য অনায়াসে টুসকির বেণীটায় টান মেরে বলে, দেখালি বটে টুসকি। একেই বলে ওস্তাদের মার শেষ রাত্রে। হন্যে হয়ে চাকরী খুঁজছি, রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে; মুখ শুকনো চোখ বসা।....এদিকে তলে তলে প্রেম চালাচ্ছো।

টুসকিও বলে ওঠে, এই ছোড়দা, ভালো হবে না বলছি। কক্ষনো ওসব নয়। ওর সঙ্গে আমার দেখাই হতো না কখনো।

হ্যাঁ, ওকথা বলে তিনতলার অবোধ সরল বুড়োবুড়িকে ভোলাগে যা। শাহানশাটি হচ্ছেন ঘোড়েল নম্বর ওয়ান। নিজে গ্রীনরুমে থেকে স্টেজে নামিয়ে দিলেন নিপাট ভালোমানুষ মাটিকে।

টুসকি রেগে বলেছে, বল। বলে নে। বলার সুযোগ পেয়েছিস যখন।

কিন্তু সে রাগটা কী সত্যিই রাগ?

সেও কী ভাবেনি, মায়ের আসাটা আকস্মিক হতেই পারে না। পিছনে পুত্রের প্রেরণা!

শিলাদিত্য দেখছে যতো সহজ হতে পারছে, ততোই যেন একটা 'আনন্দে'র মন্দির খুলে যাচ্ছে তার সামনে। তাই সে অনায়াসে তিনতলার জনেদের কাছে এসে বলতে পারে, আচ্ছা দিদা, পিসির বিয়েতে তোমরা খুব ঘটা করেছিলে, তাই না? কী কী হয়েছিল বল তো? আমার তো আর মনে নেই। বল না শুনি।

আবার মায়ের কাছে এসে বলে, মুফতে বিনা খরচে একখানা বড়লোক জামাই পেয়ে যাচ্ছো, তবু নীহারিকা গাঙ্গুলীর মুখে আহ্লাদ নেই কেন? অ্যাঁ। হাসো হাসো।...আবার হয়তো বলে, মা, এখনো তোমার শাগরেদটা হাতে রয়েছে, এইবেলা একদিন তোমার সেই স্পেশাল খাবার-টাবারগুলো বানাও না। নীলুমামাও আসে। সবসময় কেবল দোকানের কেনা খাবার।

হ্যাঁ, আসছেন নীলুমামা এখন, ঘনঘনই।

বিয়ের ঠিক হয়ে গেছে, অথচ বিয়ের 'মাস' আসতে মাসখানেক দেরী, কাজেই অগাধ অবসর গজালি করবার। বনছায়া হাতজোড় করে গেছেন 'কিছু দেবেন না' বলে, কাজেই সেদিকে ভার নেই, দায় নেই। নিষেধটি অমান্য করে যেটুকু যা করতে মন চায় তারই আয়োজন মাত্র।

শিলাদিত্য বলে, নীলুমামা, আপনার কী মনে হয় আলাদা একটা বিয়েবাড়ি ভাড়াকরার দরকার হবে? পাশেই ওই লাইব্রেরীর মাঠটাকে একটু বাগিয়ে নিয়ে প্যান্ডেল করে হয়ে যাবে না?

নীলুমামা, কেটারার সম্পর্কে আপনার থেকে আর কে বেশী বুঝবে? ওসব ভার আপনার।

হয়তো এরই অন্তরালে পরবর্তী আর একটি 'উৎসব রাত্রি'র স্বপ্নও দেখে। এই উৎসবের ছোঁয়া লেগে যদি এমনি সহজ হয়ে যায়।

'খেয়ালি' অবশ্য বলে রেখেছে, আলাদা ফ্ল্যাট না করা পর্যন্ত বিয়ের নাম মুখে এনো না। যেমন চলছে চলুক। তোমাদের ওই গোয়ালে গিয়ে ঢুকতে পারবো না আমি।...তবু একটি উৎসব রজনীর স্বপ্ন বড়ো আবেগময়।

এরই মধ্যে আদিত্য হঠাৎ একদিন বলে উঠলেন, ওহে নীলুদা, শুনেছিলাম তো নাকি এ বাড়ির নিরুদ্দেশ বড়বাবুর উদ্দেশ মিলেছে, তো তবে এই ছুতোয় একবারের জন্যও তাঁকে আনা যায় না?

ওঃ। এ সাধ তো নীহারিকার মর্মেমর্মে। নিরুচ্চার সেই বাসনা প্রকাশ করবার সাহস কোথায় নীহারিকার? কাকে বলবে? কে যাবে তাকে লটকাতে?

নীলু বললেন, সেকথা তো আমিই ভাবছি গাঙ্গুলীমশাই, কিন্তু টেনে আনতে যাবে কে? আমি ব্যাটা গেলে হয়তো নাকের ওপর দরজা বন্ধ করে দেবে। 'মামা' বলে ভক্তির বহর তো দেখি না। ছোটবাবু গেলেও যে পাত্তা দেবে এমন মনে হয় না।

আদিত্য বলে, সেই তো। ব্যাপারটা যে অক্ষম নাচার। তো একেবারে সে ব্যাটার জননীটিকে নিয়ে গিয়ে হাজির হলে কেমন হয়?

নীহারিকা এখন আর অবাকও হয় না আদিত্যর কথায়। ভাবে এ আবার হয়তো নতুন এক পাগলামি। তবে জনান্তিকে নীলুদাকে বলে, মামার সঙ্গে মাকে একসঙ্গে গাড়ি থেকে নামতে দেখলে, যে সেই একই অবস্থা হবে না তার গ্যারাণ্টি আছে?

নাঃ। সে গ্যারাণ্টি নেই বটে।

মস্ত একখানা মহৎ চিন্তার ধারকবাহক হলেও ব্যক্তিগত বিদ্বেষ বিরাগ তিক্ততার উর্ধ্বে ওঠা সহজ নয়।

শিলাদিত্য প্রশ্ন তুললো, কিন্তু এখনো যে সেইখানেই থেকে গেছে দাদা, তারই বা গ্যারাণ্টি কী? সন্ধানটা কে দেবে?

টুসকি বললো, পাপিয়াকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারিস ছোড়দা।

পাপিয়া। এর মধ্যে আবার পাপিয়া আসছে কোথা থেকে?

হাঁদামি করিস না। খবরটা এনেছিলো কে?

আহা, সে তো শুনেছি নিজের কাজে গিয়ে 'দৈবাৎ দে'া'।

দৈবাৎ 'দৈব' হয়ে যেতে পারে ছোড়দা।

শিলাদিত্য বোনের মুখের দিকে একটু তাকিয়ে বলে—যাক্ বাবা! তলে তলে সবাই খেল চালিয়ে চলেছে, শালা শিলাদিত্যটাই ফাঁসির আসামী!.......

॥ একুশ ॥

এককথায় সমস্যার সমাধান করে দিলো যুধাজিৎ। অবলীলায় বলে উঠলো, পুরুলিয়া? সে আর এমন কী ব্যাপার? 'বাই কার'—এই তো চলে গেলে হয়। আর সকলে মিলেই চলে যাওয়া যায়।

'বাই কার?' শিলাদিত্য বলে ওঠে, সে তো অনেক সময় লাগবে?

এমন বেশী কিছু না। তাতে অন্য একটা সুবিধে, সেখানে গিয়ে পড়ে 'আসামী'কে খুঁজে বার করতে, যানবাহন কী পাওয়া যায় না যায়, এটা নিজের হাতের মুঠোয় থাকবে।

শিলাদিত্য আর একবার মনে মনে ঈষৎ ঈর্ষাবোধ করে। এতো সহজেই এমন বলতে পারা ঈর্ষার ব্যাপার বৈকি। শিলাদিত্য পারবে কোনোদিন?.....হঠাৎ যেন ছোটবোনটার ওপরও একটু হিংসে হিংসে ভাব এসে গেল। টুসকি এখন ওই উচ্চস্তরে পৌঁছে যাচ্ছে। 'পৌঁছে যাচ্ছেই' বা কেন, সর্বেসর্বাই হতে যাচ্ছে। একেই বলে কপাল। এই তো সেদিনও ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছিল।

তা টুসকিও এই কথাটাই ভেবে চলেছে ক'দিন ধরে। কেমন একটা আচ্ছন্নের মতো। এই তো সেদিনও আমি 'ফ্যা ফ্যা' করে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম, কিছু রুজিরোজগারের চেষ্টায়। সেদিন—হ্যাঁ, সেই পরম দিনটিতে যদি রাস্তায় ওই দেবীমূর্তিটির সঙ্গে দেখা হয়ে না যেতো, তাহলে আরো কতোকাল ঘুরতে হতো কে জানে! হয়তো চিরকালই। কে আসতো টুসকিকে একটা সুন্দর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে? বাবা? দাদারা? হুঁঃ। শেষ পর্যন্ত হয়তো ওদের সংসারের রথের অচল চাকাখানাকে সচল করবার চেষ্টা করতে বুড়িয়ে যেতে হতো।

হ্যাঁ, সেই দিন টুসকিকে আক্ষরিকভাবেই পথ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই মহিমময়ী দেবী তাকে নিয়ে গেলেন স্বর্গের বারান্দায়। যেখানে সেই স্বর্গভূমিতে অনায়াসে প্রবেশের জন্যে রয়েছে দুহাট করে খোলা একটি দরজা।

যুধাজিৎ অবশ্য প্রথমটা বলে উঠেছিলো, কাব্যিক কথাটথা আমার আসে না টুসকি সে তো বুঝেই গেছো। তবে বলতেই হয় সাহসেরও অভাব দস্তুরমতো! ওই বনছায়া দেবীটির সাহসের সিকিও যদি তাঁর পুত্রটির থাকতো, তাহলে অবস্থা এতোদিনে অন্য চেহারা নিতে পারতো! 'রাস্তা থেকে গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে নিজের বাড়িতে এনে ঢুকিয়ে ফেলা।' উঃ। ভাবলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে!

টুসকি বলেছিলো, কেবলমাত্র একটু সাহসের অভাবেই কতো জীবন বেহাল হয়ে যায়, বরবাদ হয়ে যায়।

আমার কিন্তু সাহসের অভাব ছিলো, তোমাদের বাড়ির ওই কট্টর বংশাভিমানের বহর দেখে! একটা সিডিউল কাস্ট হয়ে কী করে—

থামুন তো! বাজে কথা বলবেন না! 'সিডিউল কাস্ট' আবার কী?

কট্টর ব্রাহ্মণদের কাছে কুলীন ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাকি সকলেই তাই!

হঠাৎ টুসকি বলে ওঠে, আমরা কী তাহলে এখন জাতপাতের তর্ক নিয়ে সময়টা খরচ করবো? মাসিমা কিন্তু এক্ষুণি তাঁর চা-জলখাবারের সম্ভার নিয়ে হানা দেবেন।

যুধাজিৎ একবার তাকিয়ে দেখেছিলো। তারপর একটু হেসে বলেছিলো, সত্যি আমি কী বোকা! চলো দুজনে একসঙ্গে মাকে প্রণাম করিগে!

যেতে হবে না। মা এলেন বলে।

টুসকি!

না মেখলা বলতে হবে।

বয়ে গেছে! মেখলা আবার একটা নাম না কী? টুসকি টুসকি টুসকি!....টুসকি, সেই যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছিলাম, সেইদিনই বোধহয় আমার ভাগ্যনির্ণয় হয়ে গিয়েছিলো।

তোমার, না আমার?

তোমারটা তুমিই জানো। ভাগ্য না 'দুর্ভাগ্য'। আমারটা জানি। এখন যেন অনুভব করছি, সেই প্রেরণাতেই তদবধি এমন ভূতের মতো খেটে চলবার শক্তি পেয়েছিলাম। মনের মধ্যে অদৃশ্য একটা প্রতিজ্ঞা, যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।

ধ্যাৎ! আমি আবার একটা 'কিছু'? তাই আমার জন্যে এই দৃঢ়সংকল্প?

কে যে কার কাছে 'কিছু' তা কী সে জানে?

শুনে হেসো না, আমি কিন্তু পাপিয়াকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতাম!

কী আশ্চর্য! তুমি তো ওকে ছেলেবেলা থেকেই দেখছো?

জন্মাবধিই।

টের পাওনি ও কোথায় বাঁধা পড়ে আছে?

নাঃ। কোনোদিনও না। দাদার মতো ওইরকম একটা কাঠখোট্টা লোক, যে না কী মেয়েদের দিকে তাকিয়েও দেখে না, কিংবা দেখলে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে তাকায়, তাকে যে কোনো মেয়ে—

সেই কথাই তো বলছিলাম। কে যে কার কাছে 'কী' তা সে নিজেও সবসময় চট করে বুঝে উঠতে পারে না। হয়তো এখন দেখবে তোমার সেই কাঠখোট্টা দাদাটির মধ্যেও ফল্গুধারা প্রবাহিত!

টুসকি আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো, দরজার বাইরে বনছায়ার গলা শোনা গেল, হ্যাঁ, খাবারের ট্রে-টা রেখে দিয়েই ছুটে চা নিয়ে আয়। দেরী করবি না। তুই তো সকল কাজেই বাঘের মাসি।

অর্থাৎ কাজের মেয়েটাকে নির্দেশ দিচ্ছেন।

মেয়েটা ঢুকে এসে সামনে টেবিলে সেই ট্রে-টা নামিয়ে রেখে চলে গেল। চটপটই গেল।

আর যুধাজিৎ বলে উঠলো, মা, তোমার 'বাঘের মাসি'র আপাততঃ তো খরগোশের ভূমিকা দেখছি। ও আসবার আগেই চটপট একটা কাজ সেরে নিই। টুসকি! কুইক। একসঙ্গে দুজনে চরণ ছোঁওয়া চাই।

বনছায়া?

বনছায়া কোনো কথাবার্তার দিকে গেলেন না। একসঙ্গে দুহাতে দুজনেকে ধরে, স্রেফ যাকে বলে 'ভ্যাঁক' করে কেঁদে ফেললেন।

এই সেরেছে। মা, তোমার বাঘের মাসি এলো বলে। চোখ মোছো।.....চোখ মোছো। টুসকি বোঝো ! কী ফাঁদে পড়ে বসলে। এই ছিঁচকাঁদুনি খুকিটিকে নিয়ে সারাজীবন ঘর করতে হবে তোমায় !

হ্যাঁ, সেই দিনটি। যেন টুসকির জীবনের চাকাখানায় কে একটা পাক দিয়ে মোড় ঘুরিয়ে দিলো।

এখন টুসকির ছোড়দা টুসকিকে মনে মনে হিংসে করছে।

নীহারিকার মনের মধ্যে অনেক ভাবের উথালপাথাল। যাবো তো ? যদি সেই হৃদয়ের বালাইহীন ছেলেটা তার মার মান না রাখে ? তাও ওই পরের ছেলেটার সামনে। যে ছেলেটার কাছে 'মা' নামক আবেগটি সত্যিই 'স্বর্গাদপি গরিয়সী'। সে বড়ো লজ্জা ! সে বড়ো অপমান ! তাই নীহারিকা বলে ওঠে, আমি নাই গেলাম। তোমরাই যাও না।

যুধাজিৎ সবলে সে প্রস্তাব উড়িয়ে দেয়। কী যে বলেন মাসিমা ! আপনিই তো আসল ! আপনি যাবেন না, এ হয় না।

নীহারিকা দুর্বলভাবে বলে, বাঃ ! আমি আসল কেন ? বিয়ের বরকনেই যখন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছে—

যুধাজিৎ বললো, সেটা না হয় বিয়ের নেমন্তন্ন ; আর ছোটবোনটার বিয়েটার দায়-দায়িত্ব নেবার জন্যে তাকে তলব দিতে যাবার জন্যে ? কে সেই জোরটি খাটাবে ? বলতে হবে না, 'কনের বাবা অসুস্থ হলে তাঁর বড়ছেলেই সব ভার নিতে বাধ্য।' সেটা কে বলবে ?

চিরঅহঙ্কারী নীহারিকা গাঙ্গুলীও কী সেই ভ্যাবলা বনছায়া সরকারের মতো ভ্যাঁক করে কেঁদে ফেলবে ?

নাঃ। সেটা ফেললো না। তার চোখের স্নায়ুরা কেঁদে ফেলায় অনভ্যস্ত। জ্বলে উঠতে, আগুন ঠিকরোতেই অভ্যস্ত। তাই এ হেন মোক্ষম মুহূর্তেও সামলে গেল।

নীহারিকার সেই জোর কোথায় ? যে জোরে ছেলেকে বলা যায় 'এটা তুমি করতে বাধ্য'। নীহারিকার সে আশ্বাস কোথায় যে আশ্বাস সাহসের জোগানদার। যে আশ্বাস বিশ্বাস এনে দিতে পারে ও আমার কথা রাখবেই।

কিন্তু নীহারিকাই কী কোনোদিন তার সন্তানদের মধ্যে সেই 'মাতৃমূর্তিটি' স্থাপন করবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলো ? নীহারিকা জানতো না, সন্তান কখনোই তার মাকে 'নায়িকা'রূপা দেখতে ভালোবাসে না।

অতি স্মার্ট অতি তীক্ষ্ণ। 'আপন ভালো লাগা না লাগার' মনোভাব উত্তাল একটি 'যুবতী নারী'কে শিশুও 'মা' হিসেবে পছন্দ করে না। সে তার মার সবটা মনোযোগ চায়। তা সেই 'মন'টা ভোঁতাই হোক, আর জবড়জং সেকেলেই হোক।

তাছাড়া—অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত নারী।

সে তার সন্তানদের প্রতি যতো স্নেহময়ীই হোক, তাদের কাছে পাশমার্ক পাবে না। সে হিসেবে সব সন্তানই 'মনু'র কালের ! আর নীহারিকা তো তেমন বিগলিতকরুণা স্নেহময়ীও নয়। যেমন তার শাশুড়ী নয়নতারা, বা ননদ সন্ধ্যাতারা ! যেমন ওই বনছায়া সরকার।

ছেলেরা মায়ের কাছে বোধহয় এইরকম মূর্তিটিই চায়।

এ এক অবচেতনের অন্তর্নিহিত রহস্য। এখানে সমস্ত আধুনিকতাই 'ফেল'।

মা অবশ্যই বন্ধুর মতো হবে, তবে তার মাতৃমহিমাটি পূর্ণ বিকশিত রেখে।

নীহারিকা চিরকাল তার নিজের মনকে বুঝিয়েছে, আমি কি কখনো কোনো গর্হিত কিছু করেছি ? অন্যায় কিছু করেছি ?

কিন্তু তাতে তার সন্তানদের মনকে বোঝাতে পারেনি। তারা তাদের মাকে ভাল হয়তো বাসতে পেরেছে, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারেনি!

শ্রদ্ধাহীন ভালোবাসার মূল্য কতোটুকু?

নীহারিকার তার শ্বশুর-শাশুড়ী সম্পর্কে ব্যবহারও কী তার ছেলেমেয়ের কাছে তাকে ছোট করে দেয় না? ছেলেবেলা থেকেই তো দেখে আসছে তারা ওই গুরুজন দুটির প্রতি মায়ের কীরকম একধরনের বিদ্বেষ, যার থেকে জন্ম নিয়েছে অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য। এবং সেটা খানিকটা জোর করেই। 'ওনাদের প্রাধান্য দেব না' এই সংকল্পে।

তবে আর নীহারিকা তার সন্তানদের কাছে একটি 'সশ্রদ্ধ' প্রাধান্য প্রত্যাশা করবে কোন ভরসায়?

কার্যকারণ খতিয়ে দেখবার বোধ নেই, তবে অভিমানবোধটি তো আছে? তাই নীহারিকা আজ তার ছেলেকে ডাকতে যাবার প্রস্তাবে বলে, আমার কথাই কী শুনবে?

যুধাজিৎ ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলে, যাতে শোনে তেমন জোরের সঙ্গে বলবেন।...না না, চলুন। চলুন। আপনিই আসল।

নীহারিকা চুপ করে যায়। মনের মধ্যেকার ঢেউকে সংহত করে।

তা শিলাদিত্যও একবার বলে, আমারই বা যাবার দরকার কি, বলতে গেলে একটা ফালতু ম্যান। শুধু গাড়িতে জায়গা জোড়া করা।

যুধাজিৎ প্রায় ধমকের গলায় বলে ওঠে, মেয়েলি ন্যাকামি রাখ্ তো। মনে রাখতে হবে তিন তিনটি 'অবলা' যাচ্ছেন সঙ্গে। একটি গার্ডের দরকার নেই?

তুই-ই তো আছিস?

ধ্যাৎ। আমি তো ড্রাইভার মাত্র!

কী, তুই সঙ্গে ড্রাইভার নিবি না?

নাঃ! কী দুঃখে একটা বাইরের লোককে আমাদের এই দারুণ ঘরোয়া অভিযানের মধ্যে ঢোকাবো? এই তো কিছুদিন আগে দিদি আর তস্য পরিবারকে নিয়ে টাটায় ঘুরিয়ে আনলাম। দিদির শ্বশুরবাড়ির কার যেন বিয়ে উপলক্ষে—এরকম ক্ষেত্রে ড্রাইভারকে নেওয়া মানে ঘরোয়া গল্পে বাধা। এবং একটা সিট নষ্ট।

তাহলে যাচ্ছে কে কে?

যুধাজিৎ চটপট জবাব দেয়, কেন, মাসিমা, তাঁর পুত্রকন্যা ও ভাবী জামাতা, এবং অভিযানকারী দলের গাইড 'মেয়ে ডাক্তারবাবু'!

পাপিয়া বলে ওঠে, আঃ। আপনিও এই সব শুরু করলেন?

বাঃ। 'যস্মিন দেশে যদভাষা'! সেখানে আপনার অভিধাটি কী ছিলো?

আহা। একবার শুনে নিয়ে ভারী বাহাদুরি। আমায় ক্ষ্যাপালে কিন্তু ডিউটি দেব না।

পাপিয়ার মুখে রক্তিম আভা!

তবু এখন আর টুসকির তা দেখে গা জ্বলে যায় না।

টুসকি এখন সিংহাসনে উঠে বসেছে।

যাত্রাকালে নয়নতারা আঁচলে চোখ মুছে বললেন, দুর্গা দুর্গা। দারোগা পুলিশ সবাই মিলে গিয়ে আসামীডারে ধর্‌র্যা আন তো দেখি এবার। ছাড়ান-ছোড়ন দিবা না!

সত্যব্রত একটু হাসলেন, গিয়ে পেলে তবে তো? সেটা তো সত্যিই আসামীর মতো পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

আর আদিত্য ?

আদিত্য হঠাৎ এক অদ্ভুত কাজ করে বসলো। অর্থাৎ অদ্ভুত কথা বলে বসে ! যাত্রাকালে সবাই তো তাঁর কাছে বলে যেতে এসেছে। প্রণাম নিতে চায় না, তাই কেউ সে চেষ্টা করে না। এমনি 'যাচ্ছি তাহলে ?' বলা !

আদিত্য হঠাৎ তার বাবার কথার পরই হাত বাড়িয়ে পাপিয়ার পিঠটা একটু ছুঁয়ে বলে ওঠে, দেখবো তুমি কেমন বাহাদুর মেয়ে !

সকলেই একটু চমকালো।

এ কথার অর্থ ? পথ চিনিয়ে নিয়ে যাবার বাহাদুরি ?

কিন্তু সেই কথাটার মধ্যে অমন একটা গভীর ব্যঞ্জনা কেন ?

যাক, নিহিতার্থ পরে ভাবা যাবে। এখন আর দেরী করা নয়।

সকলের মধ্যেই অনিশ্চয়তার একটা উদ্বেগ ছিল, তবে যাকে 'বাহাদুরি' দেখাবার চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ। তবু অভিযানটা যেন একটা প্রমোদ ভ্রমণের মতোই করে তুললো যুধাজিৎ, শিলাদিত্যকে দলে টেনে।

মাঝে মাঝে গাড়িকে থামিয়ে চা খাওয়া, গ্রাম্য দোকানের জিলিপি খাওয়া ! সবসময় হাসি-গল্পের মেজাজ দেখানো। এবং মাঝে মাঝেই পাপিয়ার প্রতি কটাক্ষপাত, কী ? চিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তো ডাক্তারবাবু ? হঠাৎ বলে বসবেন না তো—এইরকমই তো দেখেছিলাম জায়গাটা ! ঠিকানাহীনের ঠিকানা বার করা তো সহজ কাজ নয়।

তো একেবারে যে খুব সহজ হলো তা নয়।

না, জায়গাটায় পৌঁছানো অত সহজ হয়নি। কিন্তু পৌঁছে যাবার পর ? প্রথম তো 'তারক' নামের ছেলেটার অপার বিস্ময়ের বিহ্বলতা। অ্যাঁ, আপনারা ! সব্বাই ! মাসিমাসুদ্ধু ? মেসোমশাই কেমন আছেন ? দাদু-দিদা ? পাপিয়াদি আপনি আবার ? অ্যাঁ ? স্বপ্ন না তো ! তারপর মাথা চাপড়ে বললো, আপনারা এখন এলেন ! এই ক'ঘণ্টা আগে বড়দাবাবু কোথায় যেন মীটিং করতে গেল।

মীটিং করতে ?

ওই যা বলেন। সাঁওতাল বস্তিতে গিয়ে গিয়ে বাদ্যিবুলি ঝাড়া, এই আর কী ? আমি তো মীটিংই বলি।

পাপিয়া আস্তে বলে, তুমি যে বলেছিলে, তোমার বড়দাকে কোথাও একা ছাড়ো না। বারণ করলেও সঙ্গে যাও।

তো সে কী আর বলতে কসুর করেছিলুম গো ! তো অ্যাইসা এক ধমক, তুই রান্নাটান্না করে রাখ্। এসে দারুণ খিদে পাবে, তা মনে রাখিস ! এসেই খেতে না পেলে তোকেই খেয়ে ফেলবো !

শিলাদিত্য বলে, তাহলে তোর বড়দাবাবুর সাধারণ মানুষের মতো ক্ষিদেটিদে পায় ?

তারক হেসে ফেলে বলে, ওই অ্যাকটা জায়গায় একটুখানি কাঁচা রয়ে গেছে। বেশী খিদে পেলে যেন চোখে অন্ধকার দেখে। তো যা না খাদ্যর ছিরি ! রান্না ! রান্না দেখলে আপনাদের কান্না পাবে।

নাঃ ! হঠাৎ একটা ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে গেল। নীহারিকা হঠাৎ যুধাজিতের বোকাটে মা-টির মতো ডুকরে কেঁদে উঠলো।

ছেলের আস্তানাটা দেখে পর্যন্ত তার মনের মধ্যে যে কান্নার ঢেউ উঠেছিল, তাকে আর সামলাতে পারলো না।

এ হেন অবস্থায় যা যা হবার তাই হয়।

তারক আকুলতা করতে থাকে, কী করে তার এইসব প্রাণের জনদের আতিথ্য আপ্যায়ন করবে! অতিথিরা আশ্বাস দিতে থাকে, কোনো ভাবনা নেই, তাদের সঙ্গে প্রচুর জিনিস আছে। দেদার ফল কিনে সঙ্গে নিয়েছিল যুধাজিৎ। দেদার খাবার জলের ব্যবস্থাও ছিল। তাছাড়া নীহারিকার অবদানও ছিলো বেশ কিছু। সারা রাস্তা খেতে খেতে এসেও রয়ে গেছে প্রচুর। অতএব 'হে বাবা তারকনাথ ঠাকুর, আপনি নিশ্চিন্ত হন'।

নীহারিকার আজ বাঁধ ভেঙেছে। তাই তারকের হাত ধরেও কেঁদে ফেলে বলে, ওই পাগলটার সঙ্গে তুইও এই কষ্ট করে চলেছিস তারক?

যুধাজিৎ বলে ওঠে, ভালোবাসায় কী না হয়। প্রায় প্রভুভক্ত সারমেয়। যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান যাত্রায় সেই সঙ্গী বেচারীর কী হাল হয়েছিল? তবু ব্যাটা সঙ্গ ছেড়েছিলো? ছাড়েনি।

শিলাদিত্য বলে, তার তো জানা ছিল, শেষ পর্যন্ত স্বর্গে পৌঁছনো যাবে। এর কী?

যুধাজিৎ বলে, ওর বোধহয় আলাদা কোনো স্বর্গ নেই। ওই বড়দাবাবুই ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ-চতুর্বর্গ!

টুসকি হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পাপিয়ার কাঁধে একটা সূক্ষ্ম চিমটি কেটে ভালোমানুষের মতো গলায় বলে, এ ধরনের লোক কিন্তু অন্যের পক্ষে বেশ ডেঞ্জারাস হয়।

নীহারিকা সেই কেঁদে ফেলার পর চুপচাপ হয়ে গিয়েছিলো, এখন একটু চকিত হয়ে বললো, কেন? ডেঞ্জারাস কেন?

টুসকি আরো নিরীহভাবে বললো, না, মানে ওর মারও তো তোমার মতোই অবস্থা। তায় আবার ওর মারও একমাত্র ছেলে।

কথাটা মোড় ঘুরিয়ে নেওয়ায় পাপিয়া মনে মনে কৃতজ্ঞ হলো।

এরা বেরিয়েছিলো একেবারে কাকভোরে। এখন পৌঁছনোর পর আরো এতোক্ষণ গেল। এখন বেলা গড়িয়ে বিকেলে পৌঁছে গেছে। কেউই আর বাপ্পার সেই অপরূপ ঘরের মধ্যে বসে নেই। বাইরে খানিকটা মাঠমতো আছে, সেখানেই বসছে, ঘোরাঘুরি করছে, গাড়ি থেকে জল এনে খাচ্ছে।

শিলাদিত্য একবার বলে উঠলো, এই তারক, দাদা তোকে কোন বেলার জন্যে রান্না করতে বলেছিলো?

কোন বেলা আবার? দুপুরবেলা।

তো এখনো তো এলো না, কখন খাবে?

সেটা তারকের জানার রাইট নাই। বেলা পার করে ফিরলে, সেই ভাত সন্ধ্যেয় খেয়ে নেয়।

চমৎকার! তো কই রাঁধতে তো দেখলাম না তোকে?

রাঁধার দরকার আছে মনে হলো না! আপনারা তো বললেন, সাথে অনেক খাবার, অনেক ফলটল আছে!

কথাটা বলার পর একটু ঘাড় চুলকে বলে তারক, তাছাড়া আপনাদের সামনে সেই লাল লাল বুকড়ি চালের ভাত। রাঁধি বা কোন লজ্জায়? ব্যান্নের মধ্যে তো কাঁকুড় আর করলা!

নীহারিকা হঠাৎ দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বলে ওঠে, তুই থামবি? বিশ্বাসঘাতক নেমকহারাম।

নীহারিকার মুখে এই ভাষা? তাও কিনা ভাবী জামাইয়ের সামনে!

কিন্তু তারক কী এই গালাগালে জ্বলে উঠলো?

তা উঠলো না। শুধু একটু দার্শনিক হাসি হেসে ঠাণ্ডা গলায় কথাটার জবাব দিলো, হ্যাঁ, সেটা বলতে পারেন। কিন্তু তারক হতভাগার যে ডাইনে গেলেও পাতক, বাঁয়ে গেলেও পাতক? কার

কাছে বিশ্বাসের মর্যেদাটি রাখা উচিত তাই তো ভেবে পাই না। মায়ের চিন্তায় তো জলাঞ্জলি দিয়ে বসে আছি। বলতে গেলে সেখানেও এক প্রকার বেইমানি, নেমকহারামি করা হয়েছে। সারাজীবন বুড়ি মনে মনে ভেবে এসেছে তার একদিন 'দিন' আসবে। তো সে আশায় তো ছাই পড়ে বসে আছে। তবে বুড়িকে সাফ জবাব দিয়ে রেখেছি, তারকের আশা ছাড়ো।

নীহারিকা তীক্ষ্ণ স্বরে বলে ওঠে, সাফ জবাব? তা দিবি বৈকি! কেমন গরুর চ্যালা!

সঙ্গে সঙ্গে তারক বলে ওঠে, অন্যকে কী দোষ দেবেন, গুরুখানা তো আপনারই ছিষ্টি মাসিমা! তো—আরে। ওই যে আসতেছেন 'ম্যাস্টোরবাবু'! প্রায় লাফিয়ে এগিয়ে যায়।

শিলাদিত্য আর যুধাজিৎ এদিক ওদিক ঘুরছিলো, ওদের দেখা গেল না এখন।

বাপ্পা বলে উঠলো, এ কী? এর মানে? তোমরা? এভাবে? মা! কী হয়েছে বাড়িতে? ওঃ। পাপিয়ার ষড়যন্ত্র!

টুসকি এগিয়ে এসে বাপ্পার একটা হাত চেপে ধরে বলে, খবরদার, পরের মেয়েকে দোষ দিতে বসবি না বলছি দাদা। এসেছি আমিই। আমার বিয়েতে তোকে নিয়ে যেতে। এক ইঞ্চি ওজর করবি না! চল্ আমাদের সঙ্গে!

তা বলে টুসকির ওই দুঃসাহসিক আর নাটকীয় ঘোষণাটুকুতেই কাজ হয়েছিলো না কী?

অতো সহজ নয়। ফুঁ দিয়ে কী পাহাড় নড়ানো যায়? যায় না। যায়ওনি।

সমবেত শক্তি প্রয়োগ করতে হয়েছিলো।

'বাপ্পা' নামক অনড় পাহাড়তুল্য জনকে সপ্তরথী বেষ্টিত হতে হয়েছিলো। আর বিপাককালে যা হয়। চিরকালীন নিয়ম, একান্ত অনুগত জনও বিরোধী শিবিরে গিয়ে ওঠে। তাই হয়েছিলো। তারক যে সব মন্তব্য করছিলো, তাতে এই বিরোধী পক্ষেরই হাত শক্ত হয়েছিলো।

প্রথমটা অবশ্য বাপ্পা আচমকা এদের একসঙ্গে দেখে একটু হতচকিত হয়ে গিয়েছিলো। চমকে ভেবেছিলো, বাড়িতে কী ভয়ানক একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটে গেছে? তাই এভাবে সকলে মিলে—

কে? কে? কে সেই দুর্ঘটনার নায়ক? বাবা! দাদু! দিদা! শিলু। শিলু ভাবতেই মনটা যেন অসাড় হয়ে গেল।.....ঠিক। ঠিক! তাই হবে। মায়ের কপালে সিঁথিতে সিঁদুরের লেখা বাবার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত করে দিয়েছিলো। আর দাদু দিদা? ওঁদের জন্যে শোকবার্তা বয়ে নিয়ে আসবেন মা? এমন মনে হয় না। শিলু! শিলু! বুকের মধ্যে ভয়ানক একটা মোচড় দিয়ে উঠলো, কিন্তু সেই বোকাটে কাজটাকে লজ্জা দিয়েই যেন হঠাৎ পিছন থেকে সেই পরিচিত কণ্ঠটি বেজে উঠলো, এই যে এসে গেলি তাহলে? ভাবনা হচ্ছিলো কোনো সূত্রে পুলিশের হানার খবর পেয়ে হয়তো আসামী ভাগলবা!.....চেহারাখানা তো ফাইন বাগিয়েছিস। করেছিস কী? অ্যাঁ? চেনবার উপায় রাখিসনি একেবারে।

বাপ্পার বুকের মোচড়টা হাস্যকর হওয়ায় বাপ্পা অবজ্ঞাভরে বলেছিলো, তবু তো চিনলিও।

আর সেই মুহূর্তেই টুসকি এগিয়ে এসে ওই নাটকীয় ভঙ্গীর উক্তিটি করে বসেছিলো!

বিয়ে। টুসকরি।

এতেও অবশ্য আবার একটু থমকে ছিলো বাপ্পা। তাকিয়ে দেখেছিলো তার অনেকদিন অদেখা ছোট বোনটার মুখের দিকে। বরাবরই যাকে দেখলে মনটা স্নেহে ভালোবাসায় ভরে উঠতে চাইলেও, সেন্টিমেন্ট প্রকাশের ভয়ে, সাবধান হতে গিয়ে কঠোর হয়েছে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ভাব দেখিয়েছে।

এখন সেই মেয়ের মুখটা যেন আলাদা একটা লাবণ্য! দেখে—আর একবার দেখতে ইচ্ছে করে। যদিও সারাদিনের অভিযানের ফলে মুখের রং বদলেছে, চুলের স্টাইল ঘুচে গেছে, জামাকাপড় লাট মোচড়া। তবু ভিতর থেকে যেন একটা আলোর আভাস।

তবু বাপ্পা নিজ স্বভাবে বলেছিলো, বিয়ে! তাই না কী? যেতেই হবে? তো খুবই দুঃখিত। এখন তো আমার পক্ষে যাওয়া একদম অসম্ভব!

সঙ্গে সঙ্গে মা ঠিকরে উঠে বলেছিল, ওঃ। তাহলে কী ঘটলে তোমার যাওয়া সম্ভব হবে বাবা? মা মরলে শ্রাদ্ধ করতে যেতে? তাই বা কী? তোমরা তো আবার 'ছেরাদ্দ পিণ্ডি' মানোই না। ইচ্ছে করে ভাষাটা খারাপ করে বলেছিলো নীহারিকা।

আশ্চর্য! মনে মনে তো সারাক্ষণ ভেবে এসেছে, ছেলেটাকে দেখলেই তার ওপর আছড়ে পড়ে কেঁদেকেটে বলে উঠবে—এতো নিষ্ঠুর কেন রে তুই? কেন? কেন? তোর মনটা কী লোহা পাথর দিয়ে গড়া? মা বলে একটু দয়ামায়া ভালোবাসা নেই?

কিন্তু তেমন হলো না। ছেলের ওই হতশ্রী চেহারা আর হতশ্রী বেশবাস দেখে বুকের মধ্যে যে রাগ দুঃখ ক্ষোভ অভিমান কষ্ট উথলে উঠেছিলো, তার প্রতিক্রিয়াতেই সেই তার চির-অভ্যস্ত ব্যঙ্গের সুরই বেরিয়ে এসেছিলো।

কিন্তু দোষ দেওয়াটা উচিত হয় না নীহারিকাকে। তার সর্বদা হাহাকার করা মাতৃহৃদয়ের মধ্যে একটু প্রত্যাশা থাকা কি খুব বেশী প্রত্যাশা যে মাকে এভাবে দেখে ছেলেটা একটু বিহ্বল হবে, বিচলিত হবে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠবে, 'মা! তুমি! তুমি চলে এসেছো?'

ছেলের মধ্যে সে আবেগ দেখা গেল কই?

প্রথমটা একটু বিহ্বলমতো ভাবে সবাইয়ের দিকে তাকিয়েছিলো। তারপর কিনা বলে উঠেছিলো, 'ওঃ। পাপিয়ার ষড়যন্ত্র।' তার মানে মায়ের দিকে চোখ পড়বার আগেই চোখ অন্যত্র চলে গিয়েছিলো।

আশাহত ক্ষুব্ধ হৃদয় এমন কতো কী ভেবে বসে!

অতঃপর অবশ্য বল গড়িয়ে চলেছিলো এ কোর্ট থেকে ও কোর্টে।....শিলাদিত্য ব্যঙ্গ করে বলেছিলো, তোদের নেতারা তো বাবা স্বজন-বাৎসল্যে রেকর্ড করে। তোরই বা এমন উল্টো মতি কেন?

পাপিয়া বলেছিলো, ষড়যন্ত্রের নায়িকা হতে পারার গৌরবটির দাবি করতে পারলে তো বর্তে যেতাম বাপ্পাদা! সে দাবি কই? ব্যাপার অন্য। আমার শুধু গাইডের ভূমিকা।

অন্য সকলের সামনে সহজ হতে চেষ্টা করে সে। বুকের মধ্যে দামামা পিটলেও, রক্তের মধ্যে ঘুঙুর বাজলেও, নিজেকে ঠিক রাখতে পারছে। এর নামই বোধহয় 'লোকবল'। লোকবলই বুকের বল বাড়ায়।

সপ্তরথীর মধ্যে তো আবার বাপ্পার মতে, 'একটা উটকো ছেলে। ওটা আবার কী করতে এসেছে সঙ্গে?'

অথচ মা কিনা ওর সামনেই বিচ্ছিরি রকমের একটা সীন ক্রিয়েট করে বসলো। বাপ্পা যখন কিছুতেই হেললো দুললো না, সকলের শত নির্বেদেও একইভাবে বলে চলেছে, বলছি তো আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়।...তখন মা কি না হঠাৎ চীৎকার করে বলে উঠলো, ঠিক আছে। তোরা ফিরে যা। আমি যাবো না। আমি এই নিষ্ঠুর ছোটলোকটার সামনে না খেয়ে পড়ে থেকে তিলে তিলে মরবো! ওর সামনে শাড়ির আঁচল গলায় ফাঁস লাগিয়ে ওই গাছটার ডালে ঝুলে পড়বো! আমি—আমি—

আর ওই রাস্কেলটা কিনা তাই শুনে হেসে বলে উঠেছিলো, 'ও মাসিমা, কোনটা আগে কোনটা

পরে? দুবার মরা তো কোনো শাস্ত্রে লেখে না।'

রাগে মাথা জ্বলে উঠেছিলো বাপ্পার।

তবু শেষ পর্যন্ত নীহারিকা যখন সত্যিই বাপ্পার কুঠুরিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে অনড় হয়ে বসে থেকেছিলো, 'কিছুতেই আমি হেরে গিয়ে একা ফিরবো না' বলে এবং রাত্রি নেমে এসেছিলো এই বেয়াড়া বিশ্রী একটা জায়গায়, বাকিজনেরা গাড়িখানার ধারেপাশে দাঁড়িয়ে থেকেছিলো 'শেষ রায়'-এর আশায়, তখন বাপ্পা বলে উঠেছিলো, ঠিক আছে যাচ্ছি তোমাদের সঙ্গে, কিন্তু গিয়েই ফিরে আসবো, থাকা চলবে না!

টুসকি তখন বলে উঠেছিলো, বেশ তাই যদি তোর ধর্ম হয়, তাই করিস। দেখিস না আমায় বিয়ে। কিন্তু মাকে তো এখানে ফেলে রেখে চলে যেতে পারি না। মাকে বাদ দিয়ে কী আমি বিয়ের পিঁড়িতে—

বলে সেও লজ্জার মাথা খেয়ে ডুকরে কেঁদে উঠেছিলো।

তারপরও অবশ্য বিস্তর কথার চাষ চলেছে। বাপ্পার হাড়জ্বালানো সেই উটকো লোকটা শেষ পর্যন্ত বলেছে—নিয়মের ফাঁস এড়ানো যায় না দেখছি। 'এককথায়' বিয়েটা হতে চলেছিলো, কিন্তু হবে কেন? 'লাখ কথা ভিন্ন বিয়ে হয় না' সে ট্র্যাডিশানটা তো বজায় থাকতেই হবে।...

আবার তারপরও বলেছিলো, কিন্তু মাসিমা, আপনি আপনার ওই সারাদিনের অস্নাত অভুক্ত ছেলেটাকে একটু জল পর্যন্ত খেতে না দিয়ে যা শাসানিটি দিলেন, সেটি কিন্তু খুব একখানা স্নেহময়ী জননীতুল্য হয়নি। বলতে হয়, 'সব কথা পরে হবে, আগে তুই হাতমুখ ধুয়ে একটু খা তো!' কী বলুন? ঠিক কিনা?

যতোক্ষণ না ছেলে গাড়িতে উঠছে, নীহারিকা পাথরপ্রতিমা। এখন কাঠ কাঠ গলায় বলে, ওদের এইরকম হৃদয়হীন মা দেখাই অভ্যাস।

তবুও তো আপনার কন্যেটি এখন থেকেই কান্না শুরু করেছে মাকে ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবে বলে।

বাপ্পা সেই সময় রাগ চেপে বলে উঠেছিলো, আচ্ছা, আপনি কে বলুন তো? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

রাগ তো হচ্ছিলোই। মার ওপর এতো ওর ফড়ফড়ানি কিসের? একেই তো চিরগার্জেন নীলুমামার ফড়ফড়ানি চিরকাল অসহ্য ছিলো, আবার এই নতুন গার্জেনটি জোটালেন মা কোথা থেকে?

তা কথা তো দেখছি বেপরোয়া আর গায়ে-পড়া।

বলে কিনা, সেরেছে। 'আমি কে?' এর উত্তর তো আমি নিজেই জানি না দাদা! আর চেনা? সেটাই কী সহজ? কে কাকে চিনতে পারে? চিনতে জীবন কেটে যায়।...তো যাক, হবে সে চেষ্টা পরে। এখন যথাবিহিত কাজগুলো হয়ে যাক। এই যে 'বাবা তারকনাথ', তুমি তোমার বড়দাবাবুর চান-এর ব্যবস্থাটি করে দাও, এবং নিজেও ঠিক হয়ে নাও। মায়ের স্টকে যা কিছু আছে দুজনে মিলে তার সদ্ব্যবহার করে নিয়ে গাড়িতে ওঠা যাক। চটপট করতে হবে। যদিও চাঁদের আলো রয়েছে তবু রাত করা ঠিক নয়।

তারক মনে মনে ভাবে, এটি তো দেখছি, ছোড়দাবাবুর সেই গাড়িবান বন্ধুটি। তো ইতিমধ্যে খুব জমিয়ে নিয়েছে দেখছি। ওর গাড়িতেই আসা হয়েছে দেখা যাচ্ছে। গাড়িবান লোকেদের এই একটা মস্ত সুবিধে। চট করে জমিয়ে নিতে পারে। যে কারণে এনাদের নীলুমামাটি সর্বঘটে কাঁঠালি

কলা হয়ে থেকেছেন। তো সেই পোস্টটা কী এখন ইনিই নিয়েছেন ? গাড়িখানা তো বৃহৎ আর মারকাটারি ! নীলুমামার গাড়ির মতো ঘুণধরা নয়।

মনের কথা মনে রেখে প্রশ্ন করেছিলো, তো তারক না হয় পড়ে থাকলো। এতো জনাই কী গাড়িতে ধরবে ?

কী সর্বনাশ ! তারক পড়ে থাকবে কী ?

এখন শিলাদিত্য বলে উঠলো, তুই না গেলে তোর বড়দাবাবুর ধাক্কা ধরবে কে ? 'এতো জনা' আবার কী ? বড় গাড়ি ! এই তো পাঁচজনে তো এসেইছি। বাড়তি তুই আর দাদা। তো দাদা না হয় তোর কোলে চেপেই যাবে।

এ কথাটা অবশ্য দাদার আড়ালে। বাপ্পা যখন ফ্রেশ হতে গেছে।

পুরুলিয়া থেকে গাড়িতে রাঁচী যেতে কোনখানে যেন 'রাঁচী রোড রেস্টহাউস' নামে পথিকদের জন্যে একটি মনোরম ঠাঁই আছে, আগে থেকে সেখানে তিনখানা ঘর বুক করে রেখেছে যুধাজিৎ।

ভাবী বরকে যতো দেখছে টুসকি, আপন 'ভাগ্যের' মহিমায় মোহিত হচ্ছে। নীহারিকাও মোহিত হচ্ছে ভাবী জামাইয়ের কর্মদক্ষতায়। ঠিক নীলুদার মতোই চৌকস, আর সবদিকে নজর !

শিলাদিত্য অবশ্য মোহিত হচ্ছে না। বলতে গেলে যেন বেজারই হচ্ছে। হলেও বন্ধু, কোন পুরুষটি আবার অপর এক পুরুষের কর্মদক্ষতা দর্শনে মোহিত হয় ? তাহলে আদিত্য নামের লোকটা চিরকাল অমন উল্টোপাল্টামি করে এলো কেন ? এখন তো আবার খেঁকি হয়ে উঠেছে। কেবলমাত্র হীনমন্যতায় ভুগে ভুগেই তো ? আমি যা পারি না ও তা পারে। আর সেই 'পারার' মহিমায় আমারই আপনজনেরা বিগলিত হয়। ছিঃ।

বাপ্পার মধ্যেও কী সেইরকম একটা হীনমন্যতা বোধ আসছে ? যে বাপ্পা তার আশপাশের সবাইকে 'মানুষ' বলে ধর্তব্যই করেনি কোনোদিন, প্রায় সকলকেই 'নীচু' চক্ষে দেখে এসেছে, আরাম আয়েস বিলাসিতাকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেছে, সেই বাপ্পা আজ ঘুমোতে যাবার আগে, 'রেস্ট হাউসের' ঘরের অ্যাটাচড্ বাথরুমে প্রাণভরে স্নান করে এসে আর তার আয়েসি বিছানায় গা গড়িয়ে শুয়ে পড়ে কিছুতেই যেন নিজেকে সকলের থেকে উচ্চস্তরের ভেবে আত্মপ্রসাদ অনুভব করতে পেরে উঠছে না।

ঘুম আসছে না। টুকরো টুকরো কিছু কথা যেন ছুরির মতো বিঁধছে।

তোর মোহ অঞ্জনটুকু চোখ থেকে মুছে ফেলে একবার স্পষ্ট চোখে দেখতে চেষ্টা কর দাদা ! ভেবে দ্যাখ তুই কিসের জন্যে জীবনটাকে বিকিয়ে দিয়েছিস ?

যার যা আদর্শ সে সেই মতোই চলবে।

কিন্তু আদর্শটারই যে গোড়ায় গলদ ! তোদের 'গুরুধামে'র অবস্থাটি দেখছি তো ? সত্তর বছরেই একটা লোহার প্রাসাদে মরচে ধরে গেল, একখানা বিশাল পাথরের প্রাসাদ, যাকে তোরা 'অবিনশ্বর' বলে মনে করে রেখেছিলি, সেটা বিশ্বজনের চোখের সামনে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়লো।

এ নিয়ে আমি কারো সঙ্গে তর্ক করতে চাই না।

কিন্তু বাপ্পদা, তর্কে নারাজ হয় তারাই, যারা জানে সে তর্কে জিততে পারবে না।

তুমি আবার এসব কথায় কেন ? ডাক্তার মানুষ রোগীর চিন্তায় থাকো না !

'ডাক্তারের কাজ শুধু দেহের চিকিৎসারই নয়, মনের চিকিৎসারও বাপ্পাদা ! তুমি তোমার ওই নিরক্ষর আদিবাসী ছাত্রদের 'সমাজতন্ত্র' শেখাতে বসে তাদের কী দিতে পারবে ? যেটা তোমাদের আদি আশ্বাস, সকলকে অন্ততঃ 'ভাতকপড় আর মাথার ওপর আচ্ছাদন। তাই কী এদেশে সম্ভব করতে পারবে ? এখনো ভাবো তোমরা ? লোভ আর দুর্নীতি হাত ধরাধরি করে নিজেদের মধ্যে

দিব্যি একটি সমঝোতা করে নিয়েছে এখানে। তার বাইরে বেরিয়ে পড়বার ক্ষমতা, ক্ষমতাবানেদের মধ্যে নেই। কাজেই অক্ষমদের হচ্ছে শুধু স্বপ্ন দেখা আর স্বপ্নভঙ্গের দুঃখ বহন করা। বড়ো বড়ো কথা শুধু কথাতেই থেকে যায় বাপ্পাদা, কাজে লাগে না, তা তো চিরকালের পৃথিবীই দেখে আসছে! লোভই হচ্ছে মানুষের প্রধান মৌলিক বৃত্তি! টাকাই চিরকালের পৃথিবীর চাকা ঘুরিয়ে আসছে। এবং তাই ঘুরিয়ে চলবে।

চমৎকার। পৃথিবী সম্পর্কে শেষ রায় দেওয়ার ক্ষমতা রাখো তাহলে? এও তোমাদের ডাক্তারী শাস্ত্রে আছে না কী?

ঠাট্টা করে লাভ নেই বাপ্পাদা। কতকগুলো ব্যাপারে, নিরপেক্ষ চোখে দেখতে পারলে, শেষ রায় দেবার ক্ষমতা সকলেরই থাকে।

বাপ্পার মধ্যে এখন যেন অহঙ্কারের বদলে একটা হেরে যাওয়ার গ্লানি।

কারণ বাপ্পার দীক্ষাদাতা নেতারা বড় গোহারা হেরে ভূত হয়ে বসে আছেন। হেরে বসে আছেন লোভের কাছে, বাসনার কাছে, উচ্চাভিলাষের কাছে!

তারকটা পর্যন্ত বলছে, ছাড়ান দ্যান ওনাদের কথা বড়দাবাবু। এই তো মায়ের মনিববাড়ির ঘটনা দেখে এলুম সেবার। ওনারা আপনাদের মতোন কতকগুলান ছেলেপেলেকে 'সগ্‌গোলাভের পথ দেখাচ্ছি' বলে চোখ বেঁধে কাঁটাবেন ছেড়ে দিয়ে, নিজেরা 'মচ্ছিমূলো' খাচ্ছে-দাচ্ছে, আয়েস করছে, ভোঁ বাজিয়ে লাল আলো জ্বালিয়ে ইয়া মটরগাড়ি চেপে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে আর যে যেখানে যতো আত্মজন আছে তাদের বাড়বিদ্ধি ঘটাচ্ছে। আবার শুনি নাকি লুকিয়ে বিদেশের ব্যাঙ্কে টাকা জমিয়ে জমিয়ে রেখে আসছে। আর আপনাদের? লবডঙ্কা। মা-বাপ ভাই-বন্ধু সব্বাইকার থেকে কেড়ে নিয়ে ভুলভুলিয়ায় ছেড়ে দিচ্ছে। আত্মজনের চোখে জল ঝরাচ্ছো আপনারা। আপনি তো বলতে, 'ওরে তারক, দেখিস দেশে আর গরীব বড়লোক এতো ভেদ থাকবে না, সবাই সমান খাবে, সমান পরবে। সমান স্টাইলে থাকবে।' হচ্ছে তাই? হি হি।

নাঃ। এতো আরামের বিছানাতেও ঘুম আসছে না। কারণ—ওইসব জ্বালাভরা কথাগুলোর মাঝখানে মাঝখানে, আবার একজোড়া মায়াময় ভালোবাসাভরা চোখ যেন বাপ্পা নামক কাঠ-পাথর ছেলেটাকেও বিচলিত করে চলেছে। নীরবে বলে চলেছে, বাপ্পাদা 'জীবন'কে গ্রহণ করায় কী অন্যায় থাকে? বাপ্পাদা, 'ভালোবাসাকে' অস্বীকার করা জীবনকে নিয়ে কী মানুষের ভালো করা যায়?....

শেষরাত্রির দিকে একটু ঘুম এসেছিলো, ভেঙে গেল শিলাদিত্যর ডাকে, দাদা, চটপট সেরে নে। ব্রেকফাস্ট করেই বেরিয়ে পড়তে হবে। রোদটা যতো অ্যাভয়েড করা যায়।

রাত্রে বলেই রেখেছিলো আমি তোর ঘরে থাকলে সারারাত বকবক করে তোর ঘুমের ডিসটার্ব করবো। দারুণ টায়ার্ড আছিস, মস্ত লম্বা একটা ঘুম দিয়ে নিবি দাদা। ভোরে উঠতে হবে!

সেই সঙ্গে নিজের শেভিং সেটটা আর একপ্রস্থ পোশাক দিয়ে রেখে বলে গিয়েছিলো, আগে আমার জামা তোর গায়ে আঁটতো না, এখন বোধহয় ঢলঢল করবে। একস্ট্রা একসেট সঙ্গে ছিলো, রেখে গেলাম। তোকে দেখে মনে হচ্ছে লম্বাতেও বুঝি ছোট হয়ে গেছিস। যাক, একটু ফ্রেশ হয়ে না গেলে বাবার পক্ষে 'দেখা' ক্ষতিকর হতে পারে। জানিস তো ভদ্রলোক এখন হার্টের রোগী। এদের বাথরুমে নতুন সাবান তোওয়ালে আছে। দেখে রেখেছি।

তো সেই হার্টের রোগী বাবার কথা ভেবেই কী বাপ্পা ফ্রেশ হতে গিয়েছিলো? না ওই শাওয়ারটা তাকে টানছিলো?

'আঃ, নিজেকে উন্মুক্ত করে অঝোরধারা শাওয়ারের তলে সঁপে দেওয়ার যে কী আরাম, তা

কি আগে কখনো খেয়াল করেছে বাপ্পা? কতোদিন এমন করে স্নান করতে পায়নি সে!

এখন মনে হচ্ছে যেন শরীরের প্রতিটি কোষ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলো! জল পেয়ে বেঁচে উঠলো।

আচ্ছা এতোদিন তো বাপ্পা এই অভাবটা এমন করে অনুভব করেনি। তারকের বয়ে নিয়ে আসা সামান্য জলের সঞ্চয়েই তো কাজ মিটিয়ে নিয়েছে। বরং বেচারার কষ্ট হবে বলে, সাধ্যপক্ষে কম খরচে চালিয়েছে। মনে হয়নি মস্ত একটা অভাব রয়েছে। অথচ এখন মনে হচ্ছে কতোদিন ধরে কী বঞ্চিতই ছিলাম!

তাদের নলিন সরকার স্ট্রীটের পুরনো প্যাটার্নের বাড়িটাতেও নীহারিকা নীলুদার সহায়ে অনেক আধুনিকতার ছাঁচ এনেছিলো। প্রধানতঃ বাথরুম আর রান্নাঘরে। নীচের তলার সাবেকি রান্নাঘরটা তো ত্যাগই করে দোতলায় বানিয়ে নিয়েছিলো। নীচেতলার সবটাই প্রায় বাপ্পার নামে উৎসর্গ করা ছিলো। বসবার ঘর স্নানের ঘর। হ্যাঁ, স্নানটাই ছিলো বাপ্পার একমাত্র বিলাস। রাত এগারোটা বারোটায় ফিরেও ঘণ্টাখানেক ধরে স্নান করেছে।...সেটা কবে থেকে যেন ঘুচে গেছলো? ওঃ। সেই মাথা ফাটার পর থেকে। মাথার সেই ক্ষতটার জায়গায় এখনো হাত লাগলে চিনচিন করে ওঠে।

কিন্তু আর কোথাও কী কখনো চিনচিন করে উঠতো না? শৈশবে বাল্যের কোনো স্মৃতি মনে পড়ে গেলে? কী মধুর সুন্দর ছিলো সেই সময়টা? দাদু দিদার ঘরের সামনের সেই ছোট্ট ছাতটায় লাট্টু ঘোরাচ্ছে দুটো ছোট ছেলে! একজন পারছে, একজন তেমন ভালো পারছে না। অথচ সেই ছেলেটাই বড়ো। ......দাদু-দিদা হাসছেন, হাততালি দিচ্ছেন। একটা কথা প্রায়ই মনে পড়ে, দিদা বলে উঠলেন, আমার বড় খোকারে দ্যাখচ, যেন দেবদূতটি। রোদ লেগে কপালে ঘাম ফোঁটাতেও কী জেল্লা।

দাদু বললেন, দেবদূত তো? সে আর ওই লাট্টু ঘোরানোর মতো তুচ্ছ খেলায় জিতবে কী করে? হা-হা-হা। কেনই যে এই কথাটা মনে পড়ে বাপ্পার।

বেসিনের সামনের দেয়ালে টাঙানো ঝকঝকে আর্শিটার ওপর চোখ ফেললো বাপ্পা। কতোদিন এরকম একখানা বড় আর্শিতে নিজেকে দেখেনি বাপ্পা। দেখলো। দেখে যেন অবাক হলো। আমার মুখের চেহারাটা এই রকম হয়ে গেছে না কী? গায়ের ভিতরের রংটা হয়তো পুরনোর নমুনা ধরে রেখেছে একটু, কিন্তু মুখের চামড়াটা? যেন রোদে ঝলসানো কোনো একটা পাকা ফলের মতো। নাকি পুরনো ব্রোঞ্জের কোনো মূর্তির মতো।

এতোটা বদলে গেছে বাপ্পা, টের পায়নি তো।

আচ্ছা তারকটা তো কই....?

নাঃ, হয়তো সেও গেছে বদলে। তবে নিকষকালোর বদলটা অতো ধরা পড়ে না। হয়তো তারকের মা তাকে দেখে ডুকরে উঠে বলবে, এ কী চেহারা হয়েছে রে তোর তারক?

যে ডুকরে ওঠাটা বাপ্পা তার নিজজনেদের কাছ থেকে এক একবার দেখলো। সেই প্রথম একদিন, পাপিয়াও তো প্রায় ডুকরেই উঠেছিলো, এ কী চেহারা হয়েছে আপনার বাপ্পাদা।

বাপ্পার মনে পড়ছে বাপ্পা তখন ভাবতে চেষ্টা করছিলো পিসির বাড়ির এই মেয়েটা তাকে 'আপনি' বলতো কিনা। সেই কবে যেন হাসপাতালে তো দেখতেও এসেছিলো পিসিকে সঙ্গে নিয়ে।

তো তখন কী বাপ্পা কিছু কথা কয়েছিলো? মনে পড়েনি।

তবু বলে উঠেছিলো, আবার 'আপনি' কেন?

এবারে অবশ্য টুসকির সঙ্গে মিশে গিয়ে 'তুমি তুমিই' করছে। যেন টুসকিরই মতো একজন। অথচ—দুটো গভীর আবেশময় চোখ জানিয়ে দিয়ে চলেছে, আমি তা বলে টুসকির মতো কেউ একজন নয়। আমি বিশেষ একজন। ওর মুখে কী অনির্বচনীয় লাবণ্য। ও তো দেখা যাচ্ছে রীতিমত সুন্দরী!

আচ্ছা ওর হঠাৎ আমার মতো একটা বাউণ্ডুলেকে ভালোবাসতে আসবার কী দরকার পড়েছিলো? আশ্চর্য!

এবারে একসময় বলে ফেলেছিলো, আচ্ছা বাপ্পাদা, নিজের জিনিসকে তো লোকে যত্নই করে, ধরে আছড়ে মারে কী? তো শরীরটা তো তোমার নিজের জিনিসই?

এখানে জামাটা ছাড়বার সময় শিল্পটা দেখে বলে উঠেছিলো, কী রে দাদা, আহার্যের অভাবে কোনো কোনো সময় নিজের পাঁজরের খাঁজ থেকে মাংস কেটে নিয়ে চালিয়ে নিস না কী? পাঁজরে কখানা হাড় তা তো একনজরেই গোনা হয়ে গেল।

মা বলেছিলো, তোর চোহারা দেখে আমার মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করছে যে রে বাপ্পা।

তবু এখনো বাকি আছেন বাবা দাদু দিদা।

আচ্ছা আছেন তো সবাই ঠিকঠাক? না না, আছেন নিশ্চয়ই?

তবে সেই সর্বঘটে নীলুমামাই বা অনুপস্থিত কেন? পৃথিবী থেকে কেটে পড়েননি তো? আশ্চর্য, হঠাৎ এমন কথাটা মনে আসতে যেন একটা কষ্ট ভাব এলো।

আর্শিতে নিজের ছায়া! অথচ এখন সেখানে কেবলই অন্যের ছায়া। পিসি? পিসির কথাও মনে পড়ে গেল। আচ্ছা—এতো সব্বাইকে একসঙ্গে মনে পড়ে গেল কেন?....ওঃ। কারণটা এখন গিয়ে এই সব্বাইয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হবে ভেবে এই আতঙ্কে!

অনুভব করছে, সেই মুখোমুখি হওয়া মাত্রই প্রথম শব্দ উচ্চারিত হবে, 'ইস। এ কী চেহারা হয়েছে?'

অনুভব করছে। কারণ আর্শির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেই শব্দটা তার নিজের মধ্যেই ধ্বনিত হয়েছিলো!

তবু তবু কেন পিসির বাড়ির ওই মেয়েটা বাপ্পার মনের মধ্যে এমন একটা অস্বস্তি ভরে দিয়ে বসলো? ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করেও পেরে উঠছে না। লেগেই থাকছে।

নাঃ। মনের এই দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। বাপ্পা মনে মনে কঠিন হবার চেষ্টা করে।

কিন্তু, মজা এই, কাঠিন্যটা হঠাৎ হঠাৎ অন্যত্র বাজে খরচ হয়ে যাচ্ছে।

ব্রেকফাস্ট করতে বসে হঠাৎ বলে উঠলো, এতো লাকসারির কোনো মানে হয় না। সাধারণ কোনো ডাকবাংলোয় উঠলেও—

শিলাদিত্য বলে উঠলো, 'সাধারণ'? সাধারণ কিছু তুই পাচ্ছিস কোথায়? অসাধারণকে তবু আগে থেকে কব্জা করে রাখলে—

সপক্ষে কিছু যুক্তি তো থাকবেই! বলে ডিমসেদ্ধ দুটো ঠেলে রেখে খেতে লাগলো।

বসেছে সকলেই একসঙ্গে। তারকও আছে একধারে। গম্ভীরভাবে বলে উঠলো, ঠেলে দিচ্ছেন তো, আমায় দ্যান। অনেককাল ভালোমন্দ খাই নাই। ফেলে দিলে তো আর বিল থেকে দামটা বাদ দেবে না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই একদিনের কথা মনে পড়ে গেল, তিনটে মানুষেরই। বাপ্পার সেই পাতার কুঁড়েয় দুটো ডিমসেদ্ধ তিনজনে ভাগ করে খাওয়া।

পাপিয়া অজানিতেই তাকালো সেই দুটো মানুষের মুখের দিকে। আরো কঠিন হলো বাপ্পা। বলে উঠলো, ঠিক আছে, এবারে আর আমার সঙ্গে আসবি না। খবরদার। ভালোমন্দ খাবার জন্যে থেকে যাবি 'মাসিমার' কাছে।

মাসিমা অবশ্যই নীহারিকা।

তিনি আশায় বুক বেঁধে বলে উঠলেন, সে তো থাকবেই। তোকেই কি আর ওই অখদ্যে জায়গায় ফিরে যেতে দেবো।

ওই আনন্দেই থাকো। বলে উঠে পড়লো।

আবার গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগে গাড়ির চালক যখন বলে উঠলো, দাদা তো বোনের বিয়েতে বোনের নেমন্তন্নয় যাচ্ছেন, এই হতভাগা লোকটারও ওই একই আর্জি! তার বিয়েটাতেও যাওয়া চাই।

তার মানে?

বাপ্পার তো ওর ওপর মেজাজ খাপ্পাই হয়ে আছে, তাই রুক্ষস্বরে বলে ওঠে, তার মানে? আপনাকে চিনি না জানি না—

বাঃ। এই তো কাল থেকে চিনলেন জানলেন। গিয়ে অবশ্য যথারীতি নেমন্তন্নপত্তরও দেওয়া হবে। যেতেই হবে কিন্তু।

আশ্চর্য! খামোকা অন্য একজনের বিয়েতে—কবে সেটা তাই শুনি.?

যুধাজিৎ মাথা চুলকে বলে, আজ্ঞে বিয়ের তারিখ লগ্ন সবই ওই একই সঙ্গে পড়ছে।

উপস্থিত সকলের মুখেই চাপা হাসি। কিন্তু বাপ্পার সেটা চোখে পড়ে না।

বাপ্পা প্রায় ব্যঙ্গের গলায় বলে ওঠে, চমৎকার। নিজের বোনের বিয়ে ফেলে আমি কার না কার বিয়েতে—

চাপা হাসিরা ফেটে পড়ে।

আর পাজী তারকটা কিনা, দাঁত বার করে বলে ওঠে, ওই কাঠফাটা রোদে, ঘুরে ঘুরে আর সাঁওতালগুলার সঙ্গে মিশে মিশে আপনার মগজটা শুকিয়ে ঘুঁটে হয়ে গেছে দেখছি বড়দাবাবু! বলি বিয়েটা তো একটা পার্টনারশিপ বেবসা তাই না? কাজেই ওই একটা বিয়েতে যোগ দিলেই আপনার দুটোর কাজ মিটে যাবে।

থাম, বোকার মতো বাজে বাজে হাসিসনি। মা, এর মানেটা কী?

মা কিছু বলার আগে পাপিয়া চাপা হাসির আলো মুখে ছড়িয়ে বলে ওঠে, কাল থেকে দেখছো বাপ্পাদা, বুঝতে পারোনি বাপ্পাদা, টুসকি আর ইনি দুজনে ওই একটা বিয়েরই দুই শরিক।

ওঃ। তাই।

বাপ্পা কটুগলায় বলে ওঠে, ওঃ। তাই। তা বোঝা একটু শক্ত বৈকি। কী করে জানবো বিয়ের আগেই জামাই শ্বশুরবাড়ির লোকের ওপর এতো সর্দারি করে বেড়াচ্ছে!

জ্বলন্ত দৃষ্টিটাকে অন্য দিকে ফিরিয়ে গাড়িতে উঠে বসে।

দৃষ্টিটা তো জ্বলবেই। তখনো যে সমবেত হাসির রেশ বাতাসে ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তার মানে সবাই মিলে বাপ্পাকে নিয়ে মজা দেখছে।......

॥ বাইশ ॥

কলকাতায় এসে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্পার মনের মধ্যে যেন ভয়ঙ্কর একটা যন্ত্রণায় মোচড় পাক খেতে থাকে। কতদিন এই কলকাতাটাকে দেখেনি সে। এটা সে তার এতোখানি ভালোবাসার জায়গা ছিল, তা তো কোনোদিন খেয়াল করেনি।

অনুভূতিটা অদ্ভুত একটা বিপরীতধর্মী।

এক একবার মনে হচ্ছে, আশর্য, সব ঠিক যেমন ছিলো তেমনই রয়েছে। বাপ্পা যে এদের সর্বদা দেখছিলো না, তা কারো মনে পড়ছে না, আবার হঠাৎ হঠাৎ মনে হচ্ছে, সবকিছু বুঝি বদলে গেছে!

আচ্ছা কতদিন এইসব চেনা চেনা রাস্তাঘাট দোকান টোকান দেখেনি বাপ্পা? হিসেব করে দেখতে চেষ্টা করলো। ধরতে হলে, সেই কোন একটা পচা গ্রাম থেকে মাথাটা ফাটিয়ে আসার পর থেকেই ধরতে হয়। হাসপাতালের সময়টা আর হাসপাতাল থেকে পালিয়ে গিয়ে ফেরারি আসামীর মতো আত্মগোপন পদ্ধতিতে কাটানোর সময়টা মিলিয়ে, হিসেব করে দেখলো, প্রায় আড়াই বছর।......

হঠাৎ একটা তুলনা মনে এলো বাপ্পার। কেউ যদি এতোগুলো দিন জেল খেটে এসে বাইরের চেনা জগতে পা ফেলে, পরিচিত গৃহে ফিরে আসে? তার কী এইরকম অনুভূতি হয়? লজ্জা, অস্বস্তি, নিজেকে গুটিয়ে রাখার ইচ্ছে।....এমন তুলনা মনে হলো বোধহয় নিজের মানসিক অবস্থায়। অথচ এমন হবার কথা নয়। বাপ্পা কী কোন গর্হিত কাজ করে ফেরার হয়েছিল? বাপ্পা তো শুধু—

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে ওঠে। ইস, সব ঠিক তেমনি। বাড়িখানা? সেও তো প্রায় একই। হয়তো আর একটু বিবর্ণ, হয়তো বা আর একটু জীর্ণ। সে এমন কিছু না। ধারে পাশে আরও যে সব বাড়ি রয়েছে, কেউই তো ঝকঝকে চকচকে নতুন নয়। এদের সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে বলেই ওই জীর্ণতা বিবর্ণতা তেমন চোখে ঠেকে না। কাজেই মনে হলো, বাপ্পা এতোদিন না থাকাতেও, কোথাও বিশেষ কিছু রেখাপাত করেনি। তার মানে কারো জন্যেই কিছু আটকায় না।

আর আশ্চর্য, হঠাৎ ওই সত্যটুকু অনুভব করে বাপ্পা নামের চিরউদাসীন ছেলেটা যেন রীতিমত ক্ষুব্ধই হলো। আশ্চর্য অন্য ব্যাপারেও। অথচ বাড়ির পথে আসবার সময় বাপ্পা মা-বোনকে অবহিত করিয়ে দিতে দিতে এসেছে, তাকে দেখে যেন বাড়িতে কোনোরকম হৈচৈ শোরগোল না ওঠে। কেউ যেন না 'তোর কী চেহারা হয়েছে রে—' বলে ডুকরে ওঠে। আর সকলে মিলে যেন 'অধিক যত্নের' জ্বালায় তাকে ব্যস্ত না করে। তাহলে কিন্তু সে তক্ষুণি পালাবে।

শুনে টুসকি বলেছিলো, এখন বাড়িতে থাকার মধ্যে তো বিছানায় শোওয়া বাবা, আর তিনতলায় বুড়োবুড়ি দুটো। তো আগেই তাহলে কেউ নেমে পড়ে, সাবধান করে দেওয়া হোক। ছোড়দা, তুই ঝটপট গাড়ি থেকে নেমে পড়ে দরজা খুলিয়ে এই নিষেধাজ্ঞাটি জারি করে দিস। না হলে, বুড়ি নির্ঘাৎ নাতিকে দেখেই 'আরে আমার বড় খোকা রে। অ্যাতোদিনে কেমন করে বুড়িরে ভুলে বসেছিলি দাদা—' বলে কান্নায় উথলোবে।

তা সেইমতো কিছু করা হলো।

অতএব বাপ্পাকে দেখে তার বাপ ঠাকুর্দা ঠাকুমা কেউই ডুকরে উঠলেন না, উথলে উঠলেন না। খুবই সংযত ভঙ্গীতে স্বাগত জানালেন।

অথচ সেই জিনিসটার অভাবেই বাপ্পার নিজেকে একটা মূল্যহীন ফালতু মনে হলো।

বাস্তবিকই যখন বাপ নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন, এবার শরীরটার দিকে একটু নজর দিলে ভালো

হয়। সামনে একটা বড়ো কাজ আসছে। দায়িত্বটা তো তোমাদের ঘাড়েই পড়ছে এখন। আমার তো এই দেখছো—টুসকির বিয়ের কথা বলছি।

তখন বাপ্পার মনে হলো, এই বাবারই না কী বাপ্পার আকস্মিক অন্তর্ধানে স্ট্রোক হয়েছিলো।....হুঁঃ। সম্পূর্ণ কাকতালীয়। সেটাই ভাঙিয়ে খাওয়া হয়েছে। সেন্টিমেন্ট সৃষ্টি করতে একটা জোরদার ব্যাপার পাওয়া গিয়েছিলো তো।

আবার যখন প্রথম দর্শনেই পিতামহ অতি সহজভাবেই, বলতে গেলে এখন অপ্রাসঙ্গিকই একটা কথা বলে উঠলেন, 'ওদের যে কী খেয়াল চাপলো ট্রেন-এর বদলে 'বাই কার'। আমার তো মনে হচ্ছে এতেই জার্নির কষ্টটা বেশী—' আর পিতামহী (হয়তো অতিকষ্টেই) সহজ গলায় বললেন, 'বনেবাদাড়ে ঘুরে রংটা অ্যাক্কেবারে খুইয়ে এয়েচে বড় খোকা—' তখন বাপ্পার মনে হলো, না এলেই বা কার এমন কী এসে যেতো?.....মনে হচ্ছিলো যেন ভয়ানক কী একটা ঘটনা ঘটিয়ে চলেছিলো সে।

এই রকমই হয়। নিষেধের সঙ্গেও থাকে প্রত্যাশা। যেটা বাড়তি, যেটা বিশেষ।

তবে হ্যাঁ, ওই প্রত্যাশাটি পূরণ করে দিলেন পিসি সন্ধ্যাতারা.....তিনি বাপ্পার প্রত্যাবর্তন সংবাদটি পাপিয়া বাহিত হয়ে জেনে ফেলা মাত্রই তদ্দণ্ডে চলে এলেন, বলতে কী শ্বশুর ঠাকুরের অসুখ সত্ত্বেও। অবশ্য সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিটি নিজেই বললেন, মনটা ছটফট করছে বুঝতেই পারছি বড় বৌমা, তুমি এখনি একবার ঘুরে এসো। আমার জন্যে ভেবো না। সবাই রয়েছে। আর—একটু হেসে বললেন, মস্ত ভরসা 'ডাক্তারবাবু'ই তো এসে গেছেন।

অতএব এ বাড়ির বড় বৌমা সন্ধ্যাতারা ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই ওবাড়ির 'টুনি' হয়ে গিয়ে আসামীটার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলে উঠলেন, বাপ্পারে, তোর মনপ্রাণ বলে কী কিছুই নেই বাবা?

প্রত্যাশার পূরণেই কী বাপ্পা সহজ হতে পারলো?

অথবা এই আবেগের ধাক্কায়? এটাই দরকার ছিলো তার অপরাধবোধের আড়ষ্টতা ঘোচাতে।....হ্যাঁ, এতোক্ষণ যেন বোকার মতো আড়ষ্ট হয়েই বেশী কথা না বলে চলে গিয়েছিলো স্নান সারতে।

এখন পিসিরর অভিযোগে হেসে বলে উঠতে পারলো, 'মন'? সেটা ছিল কিনা, আদৌ আর সকলের থাকে কিনা জানা নেই, তবে 'প্রাণ'টি ছিলো বৈকি পিসি। না হলে কী আর সশরীরে এসে দাঁড়াতে পারি?

আর সাহস পেয়ে এখন নয়নতারা বলে উঠলেন, তুই শুধোলি তাই। সাহস করে তো বলতেও পারি নাই, 'পাষাণপ্রাণ ছেলে, এইটাই কী তোর ধর্মে হয়েছে?.....একবার বাড়ির কারো কথা ভাবিস নাই?....তখন সত্যব্রতও বলেন একটু শান্তভাবে, সকলে যে কীভাবে কাটিয়েছি!

এখন আশেপাশে সবাই এসে জড়ো হয়েছে। কারণ সন্ধ্যাতারা তার অভ্যস্ত বাঁধভাঙা আবেগের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে অন্যের পথের সামনের ঢিলপাটকেলের বাধাগুলো।

বাপ্পা বোনের দিকে তাকিয়ে একটু সরস গলায় বলে, খুব বেশী খারাপ ভাবেও যে ছিলে, তা তো মনে হচ্ছে না দাদু। বাড়িতে তো উৎসবের ঘটা পড়ে গেছে দেখছি।... আর তোমাকে দেখেও তো মনে হচ্ছে বেশ একটু ইয়াং হয়ে গেছো। শুনলাম আবার কোট প্যান্ট পরে কোর্টে যাওয়া আসা করছো।

সন্ধ্যাতারা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সেটা মনপ্রাণের হাহাকার ঘোচাতেই বাবা!

অর্থাৎ প্রয়োজনের প্রশ্নটা তুলে আদিত্যকে লজ্জিত করতে চায় না।

তাহলে তো বলতে হবে, আমার দ্বারা একটা ভালো কাজই হয়েছে। কী বলো দিদা?

তা যা কইতে সাদ হয়, তাই ক ভাই।... তবে টুনিরে—তর পাপিয়ারে বড় একখান 'পেরাইজ' দেবার দরকার লাগছে। ওই মেয়েই তো আমার বড় খোকারে এনে ফেলাতে পারলো।

টুসকি মুচকি হেসে বলে, বড়ো একখান প্রাইজ তো তোমার হাতের মুঠোতেই মজুত দিদা। তবে মুঠোটা একটু শক্ত করো, যেন আবার ফসকে না পালায়।

নয়নতারা বলেন, আর অরে ফসকে পালাতে দিচ্ছি? বলে রাকছি, আবার পালালে, দিদাকে আত্মহত্যের পাপে পাপী করতে হবে। তো পেরাইজটার কতা কী কইলি, ঠিক বুঝলুম না।

টুসকি সেইভাবে বলে, বুঝবে কোথা থেকে? চিরকাল নি.রেট মগজ। যে বোঝবার সে ঠিকই বুঝেছে।....

এই মহামুহূর্তে এসে পড়েন নীলুমামা। নিজস্ব ভঙ্গীতে হৈ হৈ করেই। তবু যেন কিছুটা সন্ত্রস্তভাবে। যেন বেশী লাগাম ছাড়া না হয়ে যায় বাবা।......তাছাড়া সরাসরি বাপ্পার সঙ্গে কথা না বলে, বলতে থাকেন অন্যদের উদ্দেশে।

কী মাসিমা, এইবার প্রাণে শান্তি পেলেন তো?....কী মেসোমশাই, কেমন লাগছে?....ওরে নীরু, তোর এখন দেখছি মণিকাঞ্চন যোগ এসেছে। ওদিকে জামাই আসছে, এদিকে উড়ো পাখি পুত্তুর এসে হাজির হয়েছে।....তোরা যতই বলিস—বিয়েতে সানাই ফানাই সেকেলে হয়ে গেছে, আমি কিন্তু এক সানাইশিল্পীর সঙ্গে বাৎচিৎ করে এসেছি। বিয়ের সকালে এসে পোঁ ধরবে। সানাই না হলে বিয়েবাড়ি মানায়?

এই তো—কও তো ছেলে।

নয়নতারা বলে ওঠেন, সাদে বলি, আমার নীলমাধব ছেলেখানা বুক-জুড়নো ছেলে। নীলুকে উনি নীলমাধব বলেন। এমন বুঝদার। আমার তো মনের মদ্যে কথাটা উথাল-পাথাল করছিলো, তো বলতে সাহস করি নাই।

কী আশ্চর্য। আপনার সাহসের অভাব কী জন্যে? আপনি বাড়ির হেড, আপনার নাতনীর বিয়ে—

নীহারিকা ঘর থেকে ডাক দেয়, নীলুদা, এই এ ঘরে একটু এসো তো। ইয়ের ফর্দটা একটু দেখে, হিসেবটা করে দিয়ে যাও তো।

নীলু এগিয়ে যেতেই নীহারিকা চাপা গলায় বলে, ওঃ নীলুদা, মোসাহেবীটা বেশ রপ্ত করে ফেলেছো তো? তো আর কত তোল্লা দেবে?

নীলু একটু হেসে তেমনি গলার স্বর নামিয়ে বলে, দ্যাখ্ সামান্য দুটো কথায় যদি কাউকে একটু খুশী করা যায়, সেটুকু করতে অসুবিধে কী? তা'ছাড়া আইনতঃ তো বাড়ির হেডই। নয়?

নীহারিকা অভিমানের গলায় বলে, সেই তো। তবে তুমি যে এতো আইনজ্ঞ তা জানা ছিলো না নীলুদা। তবে জেনো বুড়ো বয়সের ধর্ম হচ্ছে, একটু প্রশ্রয় পেলেই, ব্যবহারে ভারসাম্য বজায় রেখে উঠতে পারে না।

আচ্ছা, আচ্ছা...দেখি তোর কী ফর্দ—

এ কথাটা উচ্চগ্রামে।

নীহারিকা বলেছিল, বুড়ো হলে লোকে ব্যবহারে ভারসাম্য রাখতে পারে না। কিন্তু বনছায়া কী বুড়ো? বনছায়া তো আহ্লাদের আতিশয্যে অনবরতই ব্যবহারে ভারসাম্য হারিয়ে বসছেন।

অরিন্দম অফিস থেকে ফেরামাত্রই শুভশ্রী ওরফে টিঙ্কু ঝঙ্কারের সুরে বলে ওঠে, ছেলের বিয়ে

দিতে মা-টি আমার একেবারে আত্মহারা। কী বলেছেন জানো? জিতুর বিয়েতে—

অরিন্দম টাই খুলতে খুলতে বলে, এসেছিলেন না কী?

না না। আসবার খাটুনি কমিয়ে দিয়েছেন তালেবর ছেলে। ফোন এসে গেছে। আজই—পেয়েই আমার সঙ্গে ঘণ্টা খানেক কথা—

ফোন পেয়ে গেল?....অরিন্দম বলে ওঠে, 'শালা'র এলেম আছে বটে।

টিঙ্কু তেমনি ঝঙ্কারের সুরেই বলে, তা থাকবে না কেন? ঘুষ দিতে পারলে সবাই এলেম দেখাতে পারে।

অরিন্দম হেসে ফেলে বলে, তোমার কথাবার্তা শুনলে মনে হয়, দুটো ভাই-ই বোধহয় তোমার বৈমাত্রেয়। অথচ এটি তো একদম পিওর সহোদর।

থামো। সবসময় ঢং। মার বাড়াবাড়ির জ্বালাতেই! দেখছি তো চিরকাল। ছেলে হেঁটে গেলে বুকে বাজে।....

অরিন্দম স্বভাবগতভাবে উচ্চহাস্য করে বলে, তোমার মতে অবশ্য ওটা খুবই বাজে ব্যাপার? তা মায়ের স্বভাবটির যৎসামান্য পেলেও, আমার ছেলেটা একটু হেসেখেলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতো!

কী? ওঃ। তোমার ছেলেকে আমি হাসতে খেলতে দিই না? হাঁফ ফেলতে দিই না? বটে!

আরে বাবা! তোমার সঙ্গে একটু ঠাট্টা করবারও জো নেই। করলেই একদম গাঁট্টা।.....তো যাক, সদ্যলব্ধ ফোনে তোমার জননী বললেনটা কী?

বললেন? বললেন, আমি ভিন্ন আর কে আছে ওনার সাহায্য করতে, বড় বৌয়ের এসে থাকা তার পতিদেবতার ছুটিনির্ভর। অতএব আমাকে সপরিবারে, দিন পনেরোর মতো মায়ের কাছে গিয়ে থাকতে হবে।....যুক্তি অকাট্য। ছেলেমেয়ের পরীক্ষা হয়ে গিয়ে গরমের ছুটি পড়ে যাচ্ছে। আর তাঁর জামাই শাশুড়ীর স্নেহছায়া থেকেই অনায়াসে অফিস যেতে পারবে। দরকার হলে শালাবাবু একটা গাড়ির ব্যবস্থাও করে দিতে পারে। গাড়ি বাড়ি কেনাবেচারই তো ব্যবসা।

অরিন্দম ইত্যবসরে ধড়াচূড়া ছেড়ে বাড়ির সাজ করে ফেলেছে। এবং অভ্যাসগতভাবেই ঘরে বসবার মতো আসন থাকতেও বিছানায় বসে পড়েছে। শুনেই লাফিয়ে উঠে বলে, এ্যাঁ? এই প্রস্তাব দিয়েছেন? মার্ভেলাস। এর থেকে আহ্লাদের ব্যাপার আর কী আছে?

এটা তোমার খুব মনের মতো হলো?

অফ কোর্স। কেন নয়? দিন পনেরো ধরে ভি. আই. পি.র পোস্ট, সংসারের ঝক্কি-ঝামেলা নেই। আধমাসের বাজারখরচ বাঁচছে, অথচ নিত্য চারবেলা 'ভালো মন্দ'। আহা। বলে দিয়েছো তো খুব রাজী!

দেখো, রাগিও না বলছি, 'খুব রাজী'। পনেরো দিন ধরে শ্বশুরবাড়ি থাকতে যাবে?

এই দ্যাখো। দোষটা কী? তোমরা মেয়েরা সারাজীবন থাকতে পারো, আর আমরা দু-দশ দিন থাকতে পারবো না? এতোই অপদার্থ ভাবো?

লোকে গায়ে ধুলো দেবে।

ধুলো? কার গায়ে?

কার আবার? হ্যাংলা জামাইটারই গায়ে।

নো। প্রবলেম! স্ফটিক পাত্রে ধুলো লাগে না।.....তুমি যে এতো এতো চটে যাচ্ছো কেন বুঝছি না। অন্য মেয়ে হলে তো আহ্লাদে নাচতো। তোমার প্রাণের দাদা বৌদিই বা কী করেন? মাসখানেকও থাকেন না শ্বশুরবাড়ি অথবা বাপের বাড়ি।

টিঙ্কু গোঁজ হয়ে বলে, সে আলাদা। ওরা বিদেশে থাকে। ছুটির সময় চলে আসবে না?

অরিন্দম এখন একটু গম্ভীর হয়ে বলে, টিঙ্কু। তখন বলেছিলাম না মনে হয় দুটো ভাই-ই তোমার বৈমাত্রেয়। একটু ভুল বলেছিলাম। একটাই। শুধু একটু পাল্টে নেওয়া!

টিঙ্কু আরো গোঁজ হয়ে বলে, মার বাড়াবাড়ি আদিখ্যেতার জন্যেই—আর যেন কারো ছেলের বিয়ে হয় না। যা করছে, বলার নয়। সব যদি শোনো—তত্ত্ব-টত্ত্ব নিয়ে যা করছেন—

থাক, সব শোনার এখন সময় নেই। সেটা গভীর রাত্রের প্রেমালাপের সময় শোনা যাবে। ছেলেমেয়ের মাস্টারমশাই বোধহয় উঠলেন। ওরা চলে আসছে। তো যাক, তোমার মার ফোন নম্বর পেয়েছো?

পাবো না কেন? আগেই তো শুনিয়েছেন। তো এক্ষুণি ফোন করতে বসবে না কী?

বাঃ। করবো না? এই দণ্ডে জানাতে হবে না, 'মাদার, আপনার প্রস্তাবে দারুণ রাজী।' কী জানি বাবা পরে যদি মন ঘুরে যায়। হা হা হা....

এমন হ্যাংলা জামাই বলেই—

অরিন্দম আরো একটু হেসে কৌতুকের গলায় বলে, আরে আসল ব্যাপারটা মনে নিচ্ছো না কেন? এ তো মাছের তেলেই মাছভাজা যাকে।

তার মানে?

মানে তো অতি সরল। হাজার হোক তোমার তো মাত্র একটা ভাইবৌ হচ্ছে? তাকে তো—ইয়ে, ভালোমতো একটু প্রেজেনটেশন দিতে হবে? তো আধমাসের সংসারখরচা বেঁচে গেলে তাতেই খানিকটা উসুল হয়ে যাবে।

টিঙ্কু জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে বলে, তোমার মতন এমন বেহেড ছোটলোকের সঙ্গে যে কী করে এতোদিন ঘর করছি তাই ভাবি।

অরিন্দম নিশ্চিতভাবে বলে, আমিও তো তাই ভাবি।

মনে মনে অবশ্য নিশ্চিন্ত থাকে, এখন থেকেই বৌ ভাঁজতে শুরু করেছে দিন পনেরো যাবৎ বিয়েবাড়িতে থাকতে হলে কী পরিমাণ শাড়ি নিতে হবে। স্বভাবটা তো জানা। যে কোনো ব্যাপারেই পাছে বর আপত্তি তোলে, আর তাকে খেলো হতে হয়, তাই নিজেই সে আগেভাগে শোরগোল তুলে নিজের অনিচ্ছে ঘোষণা করে। অতঃপর যেন দায়ে পড়েই করতে বাধ্য হচ্ছে, এইভাবে সেটা করে। ছুটিতে বেড়াতে যেতেও।

হঠাৎ হঠাৎ মনে হয় অরিন্দমের, অমন সোজা সরল মহিলাটির কন্যেখানির মধ্যে এমন জটিলতা কেন?

এই 'কেন'টা হয়তো চিরন্তন কালের পৃথিবীর সৃষ্টির একটা অজ্ঞাত রহস্য।

মায়ের আকুলতায় বিয়ের কাজকর্মের জন্যে মাঝখানে একবার কী একটা ছুটির সঙ্গে রবিবার জুড়ে যাওয়ায়, সুরজিৎ কর্মক্ষেত্র থেকে চলে এসেছিল। সেই কাজের ধুয়োতেই মায়ের কাছে এসে বলে ওঠে মা, বিয়ের নেমন্তন্নপত্রের কার্ডের নমুনা কী তুমি পছন্দ করবে?

বনছায়া বলে ওঠেন, ওমা। তুই এসে গেছিস, আমি আবার কী করতে? তুই যা বুঝবি।

ঠিক আছে। আজকাল দোকানে বাজারে দারুণ সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের কার্ড পাওয়া যায়। যাক, তোমার নামে 'দেবী' লেখা হবে না 'সরকার' লেখা হবে?

বনছায়া অবাক গলায় বলেন, আমার নামে? আমার নাম নিয়ে কী হবে?

বাঃ। বাবা নেই, চিঠি তো তোমার নামেই ছাপা হবে।

বনছায়া বলে ওঠেন, কী যে বলিস। একেবারে অনাছিষ্টি কথা। আমাদের তিন কুলে কখনো মেয়েমানুষের নামে বিয়ের চিঠি ছাপা হয় না'।...পুরুষের মধ্যে বংশে যে হেড থাকবে তার নামেই হয়। তা সে—তিন পুরুষের জ্ঞাতি, জ্যাঠা, কাকার নামেও হয়। আর তোদের তো নিজের কাকাই রয়েছে। তার নামেই হবে।

সুরজিৎ আকাশ থেকে পড়ে, 'কাকা'।

এমনভাবে কথাটা উচ্চারণ করে, যেন একটা দুর্বোধ্য ভাষা শুনেছে।.....তারপর উড়িয়ে দেওয়া সুরে বলে, কাকার নামে চিঠি। তুমিই যে একটা অদ্ভুত সৃষ্টিছাড়া কথা বললে মা! কাকাকে তুমি পাচ্ছো কোথায়? কোথায় আছেন, কেমন আছেন, আদৌ আছেনই কিনা—

ষাট, ষাট। দুর্গা, দুর্গা। বনছায়া শিউরে উঠে বলেন, আছে বাবা! সেই আমেরিকাতেই আছে, তবে মাঝে মাঝে ঠিকানা বদল করে। এখনের ঠিকানা জেনে নিয়েছি।

সুরজিতের মুখ দেখে মনে হয়, ও যেন মঙ্গল গ্রহের কোনো বাসিন্দার কথা শুনছে। হতভম্বের মতোই বলে--

কাকার সঙ্গে যোগাযোগ আছে না কী? চিঠিপত্র চলে? তা সেটা তুমিই করো বোধহয়? লক্ষ্মণ দেবর।

বনছায়া বলেন, জিতুও ওই নিয়ে হাসে, আমায় ঠাট্টা করে। ঠিকানা-টিকানা তো ওকেই লিখে দিতে হয়। তো হ্যাঁরে, ন'মাসে ছ'মাসে এক একবার যোগাযোগ করে খোঁজ নেব না? বাড়ির একটা আসল মানুষ তো'

সুরজিৎ বলে ওঠে, জিতু যে যখন তখন বলে ওঠে, মা, তুমি নমস্য' ঠিকই বলে। বলতে গেলে যে কাকার জন্যে বাবা--

বনছায়া সরল সাদাসিধে। বনছায়ার মন নির্মল। তবু বনছায়ার মনের মধ্যে যেন একটা প্রতিবাদ মুচড়ে উঠলো।....সে প্রতিবাদটাকে ভাষা দিলে এই দাঁড়ায়, হ্যাঁ, ভাইয়ের নিষ্ঠুরতায় আর দুর্ব্যবহারে তোদের বাবার মৃত্যুটা ত্বরান্বিত হয়েছিলো, কিন্তু তার অংশীদার কী তুইও ছিলি না বাবা?....বাড়িটা বিক্রী করে দেওয়ার জন্যে তাঁর ওপর যে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিলো, সেটা তো তোমার সহায়তাতেই বেশী জোরদার হয়েছিলো...না, ওটা ভাষায় রূপায়িত হলো না। শুধু ভাবটুকু মনে ভেসে উঠল। তাই বনছায়া বিষণ্ণভাবে বললেন, সে যার যা নিয়তি।....তবু জিতু একখানা বাড়ি করেছে আর সে বাড়ির নামটাও সেই তোদের ঠাকুমার নামেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এই আহ্লাদের কথাটুকু জানাব না?

সুরজিতের হঠাৎ মনে হয়, ওঃ! তাই! বাহাদুরিটা প্রকাশ করা! বিনয়ের ছলে অহমিকা। তবে সেটা সামলে নিয়ে বেজার গলায় বলে, শুনে তিনি কী আর আহ্লাদে অধীর হবেন? হয়তো মনে মনে হেসে ভাববেন, তুমি অহঙ্কার দেখাতেই—

বনছায়া আহত হন।

আস্তে বলেন, ওভাবে মানুষকে বিচার করতে নেই রে, সুরো।....অসময়ে মা-বাপহারা ছেলেটা তো শুনেছি চিরদিনই খামখেয়ালি, খাপছাড়া, একবগ্গা। ওর দাদাও মায়ায় পড়ে কোনো শাসন না করে বাড়িয়েছিলেন। আসলে মনটা নীচু নয়। শুনে আহ্লাদ করে চিঠি দিয়েছিলো। তবে যা করে, ইংরিজিতে। বাংলা লিখতে ভুলে গেছে নাকি কে জানে। জিতু পড়ে আমায় বুঝিয়ে দিলো।...যাক—চিঠি ওর নামেই ছাপা হবে বাবা! চিরকালই এমন হয়। দূরে ভিটেয় বসে থাকা দূর-সম্পর্কের জ্ঞাতির নামেও হয়।

তো এই পর্যন্ত ভো হয়েছিলো একরকম।

কিন্তু ওই! আবেগের অতিশয্যে, ভারসাম্য হারিয়ে ফেলা বনছায়া সরকার যে তলে তলে আরো

কী করে বসেছিলেন, তা কী তখন কেউ জেনেছিলো ? না ভেবেছিলো ?

তারক বলেছিলো, দিদির বিয়ের আগেই একবার মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি মাসিমা। নচেৎ বিয়েবাড়িতে আটকা পড়ে যাবো। ফিরে এসে দেখা করি নাই জানতে পারলে, বুড়ি কুরুক্ষেত্তর করবে।

নীহারিকা হাসল। তোর মা কী বুড়ি ?

তা বৈ আর কী ? 'মা' শব্দটাই বুড়িতুল্য, আমি তো এই সার বুঝি। কলকেতার মধ্যেই তো। একটা বেলার জন্যে যাচ্ছি।

নীহারিকা কী ভেবে বলে ওঠে, তো তাহলে আমার হয়ে মাকে বিয়েতে নেমন্তন্ন করে আয়। বলিস, আমি বিশেষ করে বলেছি। যতই হোক পুরনো লোক তো।

আচ্ছা বলে দেখবো। বড় মানুষের বাড়ির দাসী হয়েছে। মায়ের এখন ফুরসৎ হয় কিনা দেখি। বড় মানুষের হাওয়া গায়ে লাগলেই মানুষের মেজাজ বদলে যায়।

টুসকি শুনতে পেয়ে হেসে উঠে বলে, তারক, তুমি বড়মানুষদের দুচক্ষে দেখতে পারো না বোধহয় ওই বড়দাবাবুর সঙ্গে থেকে থেকে।

তা হতে পারে। তো তারক আবার 'তুমি' হতে গেলো কোন অপরাধে ? অ্যাঁ ? 'তুই' না ডাকলে মনে হয় রেগে আছেন।

হেসে ওঠে টুসকি। তারপর গলা নামিয়ে বলে, আর কিছুতেই দাদাকে যেতে দিবি না। বুঝলি ?

তারক কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে, আমি যেতে দেওয়া না দেওয়ার মালিক ?

তুই সঙ্গে সঙ্গে তলপি বয়ে না গেলে, দাদার সাধ্য হবে একা কোথাও থাকতে ?

তারক তার উঁচু দাঁতের পাটিটি বিকশিত করে বলে ওঠে, তা পারবে কিনা ভগবান জানে, তবে তারকের তো তেমন ক্ষেত্রে না গিয়ে বসে থাকবার সাধ্য নাই দিদি।

ও বাবা। এ যে একেবারে ভক্ত হনুমান। আমি তো ঠিক করছি দাদাকে বিয়ে দিয়ে ছাড়বো।

তারক অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলে, তেমন ক্ষ্যামতা হলে বলতে হবে বাহাদুর।

'বড়দাবাবু বিয়ে করবে' এমন অধঃপতনের কথা ভাবতেই পারে না তারক। তারকের জীবনও তো তাহলে সেই তালে নিয়ন্ত্রিত হবে ? তা হোক। তবে বড়দাবাবুর অমন বাউন্ডুলে জীবনও অবশ্য আর চায় না-সে। কেন, যে-থা না করা লোকও কী শহরে ভদ্দরলোকের মতন থাকে না ? এই তো কবে যেন কে বলেছিলো, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রেথম প্রেথম এই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের বে করার রেওয়াজ ছিলো না। তাই হওয়া উচিত। বৌ ছেলেপুলেই হচ্ছে কাজের বিঘ্ন। স্বার্থচিন্তার মূল। দেশের ভালো করতে চাও তো মঠ-মন্দিরের, সাধু-সন্নিসীদের মতো হও বাবা।

তারকের এই মনোভঙ্গী অবশ্য তারক কাউকে খুলে বলে না। তবে তাতেই সে ধারণাবদ্ধ।

টুসকি আবার বলে, হ্যাঁরে তারক, কাজলের সন্ধান জানিস ?

আশ্চর্য ! টুসকির কিনা মনে হচ্ছে, তার বিয়েতে কালজকেও নেমন্তন্ন করতে পারলে ভালো হতো।

কাজল যদি পালিয়ে গিয়ে হারিয়ে যেতো, তার জন্যে ঘৃণার আর রাগের সঞ্চয় ছাড়া আর কিছু থাকতো না।....কিন্তু কাজল তার সুখী সম্পূর্ণ জীবনের ছবিটি দেখিয়ে গেছে।

সকল জীবনকে অবহেলা করতে বাধে মানুষের। তাকে সম্মান না দিয়ে পারে না। তা সে যতো তুচ্ছই হোক।

তারক বললো, আমি আর কোথা থেকে সন্ধান জানবো দিদি ? কোনখেনে বাস করা চলছিলো,

সে তো দেখেই এসেছেন। তবে বলেন তো এখন খোঁজ করতে পারি। মনে হচ্ছে 'গণেশ অপেরা' না কী যেন নামটা ছিলো ওর কোম্পানীর। যাত্রাপাড়ায় খোঁজ করতে পারি। তবে এতোকাল টিঁকে আছে কিনা কে জানে!

টুসকি লজ্জা পায়।

তাড়াতাড়ি বলে, না রে বাবা, অতো কিছু করতে হবে না। এমনি বলছিলাম।

তারক মাতৃসন্নিধানে যেতে যেতে বাসে বসে ভাবে, পিসির বাড়ির ওই ডাক্তার মেয়েটাকে নিয়েই আমার একটু সন্দ। ওর লেগেই না বড়দাবাবু ফেঁসে বসে। মেয়েখানা যে দারুণ! যেমন রূপের আধার তেমন গুণের আধার।....বিয়েতে তো আসবে যাবেও। কী ঘটে বসে কে জানে! মুনি না মতিভ্রম না কী যেন বলে।

তারকের 'সন্দ'টা বোধহয় একেবারে অমূলক নয়।.....সেদিন থেকেই বাপ্পা নামের সেই ছেলেটার মাথার মধ্যে থেকে যেন সেই কথাটা কিছুতেই বিদায় হচ্ছে না। অবিরাম পাক খেয়ে চলেছে। টুসকির সেই কথাটা।

'প্রাইজ তো তোমার হাতের মধ্যেই মজুত দিদা।....প্রাইজ তো তোমার হাতের মধ্যেই—'

কী সেই প্রাইজ?

অনুক্তই তো ছিলো। তবু যেন শরীরী হয়ে উঠে বাপ্পাকে অস্থিরতায় ফেলে রেখেছে।....ওই মেয়েটা বাপ্পার চোখে চোখ পড়লেই অমন গভীর দৃষ্টিতে তাকায় কেন?

অগ্রাহ্য করে উড়িয়ে দিতে চাইলেও, কিছুতেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না কেন?....একেবারে মর্মমূলে কেটে বসে থাকে কেন?

বাপ্পা কী আবার পালাবে?

কিন্তু এখন এই পরিস্থিতিতে সেটা কী অতিশয় একটা অমানবিকতা হবে না....

নাঃ। সেটা-এ সংসারের সকলের ওপর ভীষণ একটা বিশ্বাসঘাতকতার মতোই হবে।....টুসকির বিয়েটা পর্যন্ত তাকে থাকতেই হবে।

টুসকির বিয়ে উপলক্ষেই হরদম আসছে পাপিয়া। কারণ সে ভিন্ন তার 'বড়মা' অচল। আর তার বড়মা'টি তাঁর পূজনীয় শ্বশুরঠাকুরের শরীর খারাপের চিন্তায় নিশ্চিন্ত হয়ে মা ভাই-এর বাড়িতে থাকতেও পারছেন না। কেবলই যাওয়া আসা চলছে। তার মানে রোজ একবার করে ধাক্কা।

তার ওই চলাচলের কাণ্ডারী তো ওই সর্বনেশে মেয়েটাই।...

বাপ্পাই বা বাড়ি ছেড়ে কোথায় যাবে?

এখানে ওর ঠিক এখন কোনো 'কাজের' প্রশ্ন নেই। পার্টির সঙ্গে কতোদিন যেন প্রায় বিচ্ছিন্ন। বড় গোলমেলে সময় পড়ে গেছে বাপ্পার।

তারকের মা তার পুরনো মনিবানীর আমন্ত্রণের মর্যাদা রক্ষায় সেই দিনই তারকের সঙ্গে চলে এলো দেখা করতে। অথবা 'ত্রুটি মার্জনীয়'র আবেদন জানাতে।

আমার কপাল বৌদিদি ওই তারিখেই আবার এখনের মনিববাড়ির কাজ পড়ছে। আসার উপায় নাই। তাই একবার দেখা করতে এলুম। আপনাদের জন্যে এখনো মনটা কেমন করে। দেশ থেকে চলে এসে প্রেথম তো আপনাদের ঘরেই কাজে লেগেছিলুম।...তো মাসিমা কই? মাসিমা

মেসোমশাই।...তারকের মুকে শুনলুম আচেন দুজনাই। আহা ভালো থাক। বড়ো ভালো মানুষ।

তারকের মার পরনে এখন আর সরু কালোপাড় কাপড় নয়, অকেনখানি চওড়া পাড় জরির দাঁতের সারি, ফুলপাড় ধনেখালি শাড়ি। গায়ে রঙিন ব্লাউস। হাতে দুগাছা করে নকল সোনার চুড়ি, গলায় সেই জাতেরই বিছেহার। পায়ে চটি।

রোগা কালো দাঁত উঁচু তারকের মা-টির যে তার ছেলের থেকে বিশেষ তফাৎ ছিলো তা নয়, কিন্তু এখন ছেলের সঙ্গে মায়ের আকাশপাতাল তফাৎ। আকৃতিতে প্রকৃতিতে।

তারকের মায়ের কালো রঙে দিব্যি চেকনাই, শরীরে মেদবাহুল্যের রীতিমত প্রকাশ। আর তারকের মায়ের ভঙ্গীতে যেন আভিজাত্যবোধের, আর বেশ একটু মদগর্বের ভাব।...চলনে বলনে 'আমি একজন' ভাবের ঘোষণা।

শুধু বড়লোকের বাড়ি বলেই নয়, বড় লোক সমাগমের বাড়ি বলেও। এবং সেই বড় মানুষের গিন্নীর বিশেষ পেয়ারের লোক বলেই সর্বদা তার কাছে কাছে থাকার সুবিধেয় বুদ্ধি চতুরতা অনেক বেড়েছে। গিন্নীর কর্তাটি তো শুধু পয়সার বড় মানুষই নয়, ক্ষমতার বড় মানুষ যে। তার অনুভূতিই আলাদা। এতে নিজেকেও আর পাঁচজন 'হেঁজিপেঁজি হারিপারির' থেকে অনেক উঁচু জগতের লোক বলে মনে হয়।

তারকের মা হাতের ভ্যানিটি বটুয়া ব্যাগটি পাশে নামিয়ে রেখে চেয়ারে বসেই গল্প করতে থাকে। চেয়ারে বসবার আগে ইতস্তত মাত্র করেনি।

স্টীলের ছোট্ট কৌটোটি বটুয়া থেকে বার করে একটিপ জর্দা নিয়ে মুখে ফেলে তারকের মা বলে, এই। এই আবার এক বালাইয়ের বদভ্যেস হয়ে বসেছে, গিন্নীর খাতিরে। 'খা না একটু, খেয়ে দেখ না একটু' বলে বলে, হাতে ধরিয়ে দিয়ে—তো বলবো কী, এখন আবার ওনার থেকে আমার নেশাটি হয়ে গেছে বেশী। ওনার যদি বা দু-এক ঘণ্টা না হলে চলে, আমার মিনিটে মিনিটে চাই।...

নীহারিকা কী ওই চেয়ার আরোহণীকে দেখে মনে মনে হাসে? তা তো মনে হচ্ছে না, বরং যেন বেশ একটু সমীহবোধই করে। বলে, আমার ভাগ্যে ঠিক সেইদিনই তোমার মনিবগিন্নীর বোনঝির বিয়ে লাগলো?

তারকের মা গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা, সে কী গো। সে তো বাচ্চা মেয়ে। ইস্কুলে পড়ে। জনমোদিন। তারই ঘটা।

জন্মদিন। ও মা। তাতে আবার তোমার কী বাধা? ঘটা হলে তো ওরাই যাবে সেখানে নেমন্তন্ন খেতে। তোমাদের কী? বরং রান্নার ছুটি।

আ আমার কপাল। তবে আর বলছি কী!

তারকের মা আর এক টিপ জর্দা মুখে ফেলে বলে, ঘটাপটা তো সবই এ বাড়িতে। কর্তার খুব পেয়ারের শালী যে। ওদের যা কিছু সবই এ বাড়ি থেকেই। এই তো বছর—বছর মেয়ের এই 'জনমোদিন'। তাছাড়া মেয়ের মা-বাপের 'বের দিন'। সেও খুব উৎসব।...আদিখ্যেতা দেখে হাসবো না কাঁদবো! বুড়ো বয়সে সক্কলের সামনে ফুলের মালা গলায় ঝুলিয়ে বেড়ানো। ফটো তোলা। আবার সত্যি বে'র মতন সবাই পেজেনটেশান আনছে। যতো দেখছি ততোই তাজ্জব বনছি।

গিন্নীর তো বোনঅন্ত প্রাণ, কর্তারও আদিখ্যেতার শেষ নাই। ওই শালীর সুবাদেই ভায়েরাকেও কী তোল্লা দেওয়া গো বৌদি! ওনাদের পাটি কর্তাদের বলে কয়ে ভায়রার কী গোলবোলাও। গাড়ি বাড়ি বিজনেস করে দেওয়া। নিজেরা যেখেনে যাবে সেখেনেই সঙ্গে ওই শালী, ভায়রার গুষ্ঠি লেজুড়।...আগে এতোটা দেখিনি, যতো দিন যাচ্ছে ততো বাড়াবাড়ির মাত্রা বাড়ছে।...আসলে পয়সার বাড়বিদ্ধি ঘটলে যা হয়। এই চার-পাঁচ বছর কাজ করছি, এই ক'বছরের মধ্যে যেন 'আঙুল

ফুলে কলাগাছ।...এবারের ভোটের পর থেকে তো আরো।...গিন্নী বলে, এর পরের ভোটে কর্তার মন্ত্রী হবার চান্স আছে। তখন তো তালে সোনায় সোহাগা।...তো সত্যি বলতে, আমায় যা মান্যি দেয়, তা বলবার নয়। সকল গল্প আমার সঙ্গে।... আসলে সেই যে ভোটের আগে আমাদের গেরামের 'মা পাষাণকালীর' ফুল এনে দিছলুম, আর কর্তা খুব বেশী ভোটে জিতেছিলো, সেই অবধি, 'মা পাষাণকালী'র ওপর যতো ভক্তি, এই অধম তারকের মার ওপরও ততো ভালোবাসা।...বলেছে সামনের ভোটের সময় আবার ওই ফুল এনে দিতে হবে। জিৎ হলে, আমায় সোনার বিছেহার গড়িয়ে দেবে।...নিজেদের তো যাবার উপায় নাই, লোক জানাজানি হলে না কী খবরের কাগজে উঠে যাবে। লোকে হাসিঠাট্টা করবে। বলবে, অমুক 'ন্যাতা'র পরিবার এই গাঁইয়াপনা করেছে। ন্যাতা হওয়ার জ্বালাও কম না বাবা। খপর-কাগজওয়ালারা না কী মুকিয়ে থাকে। হবে হ্যাঁ, মধু খেতে হলে হুলটিও খেতে হয়। হি হি।....

বিয়েতে আসতে পারবে না বলে নীহারিকা তরকের মাকে তোয়াজ করে চা-টা খাওয়ায়, যাত্রাকালে আরো একবার দুঃখ প্রকাশ করে, আসতে পারবে না বলে, এবং সিঁড়ি অবধি পৌঁছে দেয়।

বাপ্পা নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছিলো।

টুসকি ঘরে এসে দেখলো, বইটা মুখের ওপর চাপা। উঠে আলোটা নেভায়নি আলস্য করে। তবে, ঘুমোচ্ছে এমন মনে হলো না।

এসেই বইটা আস্তে সরিয়ে বললো, দাদা, শুনলি ?

বাপ্পা চোখ কুঁচকে বললো, কী শুনবো ?

ওই যে তারকের মায়ের ভাষণ।

তারকের মা।

বাপ্পা বিরক্তির গলায় বলে, তারকের মার ভাষণ শোনবার জন্যে কান খাড়া করে বসেছিলাম বুঝি ? রাবিশ।

টুসকির এখন সাহস বেড়ে গেছে অনেক। আজ বাদে কাল পরের ঘরে চলে যাবে।.... তাই সাহসে ভর করে বলে ওঠে, তাহা, ওই 'সানাইকণ্ঠী' মহিলার কথা শোনবার জন্যে কী আর কান খাড়া করে থাকতে হয় রে ? বরং শুনতে শুনতে মাথার চুল খাড়া হয়ে যায়। চার বছরের মধ্যে 'আঙুল ফুলে কলাগাছ'।... ভয়রা-ভাইয়ের অবধি বোলবোলাও। গাড়ি বাড়ি বিজনেস। নিজের একখানার ওপর আরো একখানা গাড়ি। এবার ভোটে নির্ঘাৎ মন্ত্রী হবে।

হবে তো তোর এতো আহ্লাদ কিসের ?

আহ্লাদ ? আহ্লদ কী রে ? বরং দুঃখে প্রাণ ফেটে যাচ্ছে। কী মাকাল ফলের পিছনে ছুটে মরে নিজের জীবনটা বরবাদ দিলি তুই। ওই—তারকের মার মনিবকর্তার কাছেই তো যাওয়া আসা ছিলো তোর। ছিলো না ?....তোদের সবাই আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছেরে। শুধু তোর মতো দু-দশটা বোকাই বোধহয় এখনো সর্বহারার ভূমিকায় রয়ে গেছে।

এ প্রসঙ্গে থামাবি ?

তা তুই রেগে গেলে থামাতেই হবে। তবে মনের দুঃখেই বলি রে। অন্ধকার পথে আলেয়াটাকে জ্যোতির্ময় আলো ভেবে তার পিছনে ছুটতে ছুটতে পুরো বয়েসটাই বৃথা ফুরিয়ে গেল।

বাপ্পা বিদ্রূপের গলায় বলে, ও। তাহলে সার্থকটা হতো কিসে ? আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে ?

মোটেই তা বলছি না দাদা। বলছি ভ্রান্ত পথে এগোতে এগোতে অনেকখানি সময় বৃথা চলে

গেলো। এখন তো দেখছিস, মানে যদি এখনো অন্ধ না থাকিস, তোদের মতোদের চলার পথে আর কোনো সঙ্গী থাকছে না। জীবনের সবচেয়ে ক্ষতি কী হয়েছে জানিস? 'মানুষের ভালো করবো' সংকল্পে মানুষ শব্দটার অর্থই হারিয়ে ফেলেছিস তোরা!...মাঝখান থেকে পদ্ধতির ভ্রান্তিতে ভালোবাসতেই ভুল গেছিস তোরা। শুধু পদ্ধতির মাধ্যমে কারো ভালো করে যায় না দাদা। সব আগে তাকে ভালোবাসতে হয়।.....তো তোদের অভিধানে তো মায়া-মমতা-ভালোবাসা এইসব শব্দগুলো অবান্তর, বাতিল।...মানে তোদের মতো কট্টরদের।...হিহি—যারা অতো শুচিবাইয়ের ধার ধারে না তারা শালীপতিকেও ভালোবেসে তার আখের গুছিয়ে দিতে পারে।

হুঁ। এতো সব কথা বুঝি তোর নতুন গুরুদেবের কাছে শিখেছিস?....

একটু ব্যঙ্গের গলায় কথাটা বলে বাপ্পা।

টুসকি জোর গলায় বলে ওঠে, মোটেই না। আমি তোদের মতো 'গুরুভজা' নই। বিদ্যেবুদ্ধির বালাই না থাকুক, নিজস্ব বোধবুদ্ধি তো আছে একটা।....আর তোর জন্যেই, এইসব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে মরে চলেছি। এখন আবার সেই মেয়েটার জন্যে ঘামিয়ে মরছি।

বাপ্পার ভুরুটা আবার কুঁচকে ওঠে, মেয়েটা? মানে?

মানে? সেটুকু বোঝবার অনুভূতিটুকুও কী বজায় নেই রে দাদা? সত্যিই কী তোদের সাধন পদ্ধতিতে শুধু মগজ ধোলাইয়েরই প্রেসক্রিপশান নয়, হৃদয় ধোলাইয়ের প্রেসক্রিপশান থাকে? যে মেয়েটা তোর জন্যে মরছে, তাকে দেখতে পাস না?

সানাই বাজছে। এখন উৎসব-সন্ধ্যার প্রাণমাতানো সুর।

এই সানাই থেকেই যে আগামী সকালে 'কন্যাবিদায়ের' সেই চিরপরিচিত বুকমোচড়ানো করুণ সুরটি উঠবে, এখন সেটা মনে আসছে না।

এখন চারদিকে আলোর সমারোহ, সৌরভের সমারোহ, সুঘ্রাণেরও সমারোহ। সমারোহ, সুসজ্জিত নরনারী বালক-বালিকা শিশু-বৃদ্ধেরও। বাঙালি ঘরের মেয়ের বাপ হচ্ছে একদিনের রাজা। সারাজীবন টানাকষা করে কাটিয়ে আসারও এই একটি দিন, মেজাজে রাজার মেজাজ।

আদিত্য গাঙ্গুলী আর নীহারিকা গাঙ্গুলীর আবার বাড়তি একটা কারণ যোগ হয়েছে। মেয়ের বিয়েতে পাত্রপক্ষের যে শুধু চাহিদাই নেই তা নয় উল্টে করজোড় মিনতি, অহেতুক বেশী কিছু দিতে বসবেন না।

কনের মায়ের কাছে বনছায়ার নম্র বিনয়ী ভাষণ, আপনার একটি মাত্র মেয়ে, আপনি আপনার সাধ শখ মেটাবেন, আমি বারণ করতে আসবো, সাহস করছি না ভাই, তবে এখন তো আত্মীয়জনই হয়ে গেছি, তাই বলছি, মেঘলার বাবার শরীর ভালো নয়, ওনাকে চাপ না দেওয়াই উচিত আমাদের, তাই নয় কী ভাই? আমার ওই খেয়ালি বাউণ্ডুলে ছেলেটা যে বিয়েয় রাজী হয়েছে, এই আহ্লাদে আমিই বেআন্দাজী অনেক কিছু কিনে জমিয়ে বসেছি! আবার তার ওপর—বাহুল্য হয়ে যাবে।....মেয়ে-জামাই, তাদের দেওয়াদিয়ি তো পালিয়ে যাচ্ছে না, পরে যখন যা-ইচ্ছে দিতে মন চাইলে দেবেন। এখন একসঙ্গে ঘাড়ে অনেক পড়ে গেলে অসুবিধে তো! এমনিতেই বরযাত্রীর সংখ্যা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে বলেই ছেলেটা আমায় খুব ঠাট্টা করছিলো। বলে কিনা, 'নারদের নেমন্তন্ন'টি করে এক নিরীহ ভদ্রলোকের দেউড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে দায়টি সেরে নিচ্ছো কমন?

নীহারিকা অবশ্য তাতে 'না না, সে কি? পঞ্চাশ-ষাটজন আবার বেশী কী' বলে তাঁকে থামিয়েছেন। তবে ওই 'কিছু দেবেন না' শব্দটির প্রেরণাতেই উৎসবে অবস্থার অধিক আতিশয্য এসে গেছে।

তাছাড়া—বাপ্পা ফিরে আসার আহ্লাদটিও বুকে বল জোগাচ্ছে। আর বিয়ের সময় তো দেখা যাচ্ছে টুসকি শুধু একা নীহারিকারই নয়, সে তার ঠাকুমা-ঠাকুর্দারও। তার পিসিরও তার চির যোগীন নীলুমামারও।

আমন্ত্রিতদের জন্যে আসর বসানো হয়েছে কাছের 'স্কুলমাঠটায়'। যেখানে ছেলেরা খেলে। তবে এখন গ্রীষ্মের ছুটি, তাই মাঠটা সহজে মিলেছে।.....

ডেকরেটারদের নিপুণ শিল্পকৃতি 'তোরণ'টার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে পাপিয়া এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল। জানে তাদের বাড়ির সব্বাই এসে গেছে। বড়মাকে লীডার করে। তারই একটু কাজ ছিলো, তাই এখন এলো বাবার সঙ্গে। অথচ বাবা গাড়ি থেকে নেমেই যে কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন।

পাপিয়ার 'কারো সঙ্গে আসা'টা শুনতে অবশ্য নতুন। তার সঙ্গেই রোজ আসা যাওয়া করছেন তার 'বড়মা' এ বাড়ির কন্যে টুনি। কিন্তু আজ পরিস্থিতি আলাদা। আজ পাপিয়ার অঙ্গে বিশেষ সাজপোশাক।

টুসকি বলে রেখেছিলো, এই তোমাকে কিন্তু আমার বায়েতে ভীষণ সেজে আসতে হবে তা বলে রাখছি। না হলে—জন্মের আড়ি।

পাপিয়া যে সাজগোজে একেবারে নারাজ, বিয়েবাড়িতে ও সাদাসিধেভাবে যেতে যায়, তার বড়মার এই আক্ষেপ থেকেই টুসকির এই ঘোষণা।

পাপিয়া হেসে ফেলে বলেছিলো, 'ভী-ষ-ণ' সাজতে হবে? ও বাবা। তো প্যাটার্নটি কী? তাড়কা? না পূতনা?

এই, বাজে বকবে না বলছি।

বলে টুসকি ওর হাত ধরে বলেছিলো, না ভাই, সত্যি, খুব সুন্দর করে সেজে আসবি আমার বিয়েতে।

বাঃ। তোমার বিয়েতে, তুমিই তো সাজবে। অন্যরা কী করেছে না করেছে সেটা দেখবারই কী সময় পাবে তুমি?

পাবো। পাবো।...সুন্দর জরিদার একটা লাল শাড়ি পরবি—আর—

লাল। সর্বনাশ! আমায় কাটলেও হবে না ভাই।

বাঃ। এখানে তো আর তুমি 'ডাক্তারবাবু' নও?

না হোক। লাল জামা, লাল শাড়ি আমি কক্ষণো পরি না বাবা।

টুসকি কৌতুকের হাসি হেসে বলেছিলো, কেন? একেবারে সেই মহামোক্ষম দিনটির জন্যে রিজার্ভ রেখে দিয়েছো? ঠিক আছে, তাহলে সবুজই সই। অথবা চকোলেট কালার। তবে সিল্ক আর জরিদার হওয়া চাই। তুই যা ফর্সা, যে কোনো রংই গায়ে ঝলসে উঠবে।

হলদে সবুজ ওরাং ওটাং জাতীয় শাড়িই নেই আমার।

বলে হেসেছিলো পাপিয়া।

টুসকি অবশ্য সেকথা গায়ে মাখেনি। বলেছিলো, দরকারের সময় 'লোন' নেওয়ার নিয়ম আছে। তোদের বাড়ি হাতড়ালে অমন দশ-কুড়িখানা পেয়ে যেতে পারিস। তোর কাকীদের দিদিদের বৌদির—লক্ষ্মীটি ভাই।

ঠিক আছে, তোমার যখন এতোই সাধ। তবে সাধটার মর্ম বুঝছি না। আর ওই স্পেশাল শাড়ির সঙ্গে 'সর্বালঙ্কার ভূষিতা'ও হতে হবে এমন সাধ নেই তো বাবা।

না না, সে তুই যা ভালো বুঝবি। তবে খোঁপায় একটা ফুলের মালা কম্পালসারি। ব্যস। নড়চড়

চলবে না। যদি দেখি সেটার অভাব নিজের মালা বদলের মালাটাই নিয়ে জড়িয়ে দেব তা বলে রাখছি। একটা সীন ক্রিয়েট হোক এটা চাস না নিশ্চয় ?

কখনো 'তুমি', কখনো 'তুই'।

টুসকি যে দীর্ঘদিন ধরে পাপিয়াকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিনী ভেবে বিদ্বেষ চোখে দেখে এসেছে, সে সন্দেহের নিরসন ঘটায় টুসকির যেন এখন বিরূপতা গিয়ে প্রায়শ্চিত্তের মনোভাব। তাই এতো ভালোবাসতে ইচ্ছে করে তাকে। তা ছাড়া-এখন ভিতরে অন্য এক অভিসন্ধি।....দাদাটাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দিতে চায়।

কী সুন্দর লাবণ্যময়ী মেয়ে ! মুখে যেন একটি দেবী দেবী ভাব। প্রকৃতিও আকৃতির মতোই সুন্দর। তাছাড়া—'বিদ্যে' বলতে গেলে একটি দুর্লভ রত্ন।... বোকা বুদ্ধু দাদাটা অন্ধের মতো এ হেন রত্নটির দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে কাঁটাবনে ঘুরে বেড়িয়ে জীবনটা বরবাদ দেবে ?....মানুষের ভালো করতে চাস কর না বাবা। তার জন্যে—একটা মার্কামারা খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকতে হবে তার কী মানে আছে ? যারা তোদের মতো বোকাদের বিরাট একখানা বিপ্লবের স্বপ্ন দেখিয়ে, শক্তিবৃদ্ধি করে নিজেদের আখেরটি ভালোমতো গুছিয়ে নিচ্ছে, এখনো তাদের কাছে বিশ্বস্তার প্রশ্ন কেন ? তাঁরা গজদন্তমিনারে উঠে গেছেন, আর তোরা এখনো কাঁটাবনে পাক খাচ্ছিস।... বুঝতে পারছিস না সেই একদা 'বিপ্লব' নামের ধোঁকার ডালনার বালতিটি দেখিয়ে দেখিয়ে পরিবেশনের ভান করে তোদের আকৃষ্ট করেছেন।....পাপিয়ার মতো একটা ভালা মেয়েকে জীবনের সঙ্গিনী করতে পারলে, তোর মানুষের ভালো করার ব্রতটা ব্যাহত হবে না। বরং পূর্ণতাই পাবে। তায় আবার ও ডাক্তার। একজন সত্যিকার সেবাব্রতী ডাক্তারকে কাছে পাওয়া কী কম সৌভাগ্য আর সুবিধে।

অবিরত এইসব ভেবে চলেছে আজকাল মেখলা।

আসলে—বাপ্পার জীবন থেকেই তার মধ্যে এই ধরনের চিন্তাভাবনার উদ্ভব। এখন—নিজে তার ঈপ্সিত জীবনটি পেতে চলেছে বলেই বুঝি ভিতরে এসেছে একটি দায়বদ্ধতা।....

দাদার জীবনটা সহজখাতে বইছে দেখলেই যেন স্বস্তি পায় টুসকি। ছোড়দা তো যা ভালো বুঝেছে করছে। তার জন্যে ভাবনাচিন্তার প্রশ্ন নেই। কিন্তু দাদার কথা আলাদা। পাপিয়ার হৃদয়ের খবরটি জানা পর্যন্তই টুসকির মধ্যে এই আকুলতা। যেন একটা অবোধ লোক পথে চলতে পথের ধারে পড়ে থাকা একটা পরম মূল্যবান বস্তুকে পায়ে ঠেলে চলে যাচ্ছে অন্যমনস্কভাবে, ছুটে গিয়ে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে তার দামটা কী।

অতএব আর কী ?

চিরন্তন নারীহৃদয়ের গোপনতম রহস্য।

মোহিনী মায়া।

হ্যাঁ। চিরকালীন মেয়েমন জানে ওইখানেই তাদের সাফল্যের চাবিকাঠি। আজকের মেয়েরাও বিদ্যায়-বুদ্ধিতে দক্ষতায় কর্মকুশলতায় মেধায় প্রতিভায় যতোই স্বাক্ষর রেখে চলুক, ভিতরে ভিতরে কিন্তু শেষ আস্থাটি রাখে অনাদ্যনন্তকালের সেই ব্রহ্মাস্ত্রটির ওপর। জয় করে নেবার মোক্ষম হাতিয়ার।

কেনই বা নয় ? সে কী জানে না—কার কাছে—'মুনিগণ ধ্যান ভাঙি, দেয় পদে তপস্যার ফল'।....

সে কী গুণের কাছে ?

টুসকি নামের সেই চিরকালীন মেয়েমনের মেয়েটা ভেবে ঠিক করেছে, রোসো না, বেখেয়ালি বুদ্ধু দাদাটার মুন্ডু ঘুরিয়ে দিয়ে ছাড়ছি।

এদিকে টুসকির গোপন অস্ত্র পাপিয়া নামের সেই মেয়েটা, এই গরমের সময় অনভ্যস্ত সাজে সেজে এসে হঠাৎ বোকার মতো একা দাঁড়িয়ে পড়ে ঘেমে অস্থির।

কী মুশকিল। প্যাণ্ডেলের কোন দিকটা দিয়ে ঢুকতে হবে? বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে, ভিতরে কাপড়ের ঘের দিয়ে ভাগ গোছের একটা হয়েছে। যার একদিকে শুধুই বসবার, অপর দিকে খেতে বসবার ব্যবস্থা।

হঠাৎ ঢুকে পড়ে যদি সাজানো টেবিলের সামনে গিয়ে পড়ে? এ মা। ছি ছি।...ফুলের আর পারফিউমের সৌরভ-সারটি আসছে কোনদিক থেকে আর কোনদিক থেকেই বা রসনাতৃপ্তিকর খাদ্যসম্ভারের সুঘ্রাণের, তা বোঝা যাচ্ছে না। সম্মিলিত সুগন্ধভার, ভিতরে ঘূর্ণ্যমান পাখাগুলোয় বাহিত আর তাড়িত হওয়া বাতাসকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে।....

নাঃ। বাবার যে এখন কোনদিকে কী কাজ পড়লো।

বিষণ্ণ মুখ পাপিয়া এদিক ওদিক তাকাতেই হঠাৎ সামনে তাকিয়ে প্রায় কেঁপে উঠলো। কী লজ্জা। কী লজ্জা! ওর সামনে এই সাজে।

কিন্তু যার জন্যে এই লজ্জা সে কী ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে তাকালো?

না! হঠাৎ অদ্ভুত একটা দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। হয়তো মুহূর্ত মাত্রই।

তারপর বোধহয় অজ্ঞাতসারেই বলে উঠলো, 'আরে। দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমায়।

আরে দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমায়।.....

দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে তো তোমায়।.... দারুণ সুন্দর.....দারুণ সুন্দর....।

কথাটা কী পাপিয়ার কানের পর্দায় ধ্বনিত হলো? আর সেটা প্রতিধ্বনিত হয়ে চললো।......

নাকি পাপিয়ার মনের পর্দায়? সেখানেই ধ্বনিত হয়েছে, আর ধ্বনিত হয়ে চলেছে? 'দারুণ সুন্দর।' দারুণ সুন্দর। দারুণ....'

মা-ঠাকুমা-বোনের একান্ত নির্বেদে বাধ্য হয়েই আজ বাপ্পাকে বিয়েবাড়ির উপযুক্ত সাজে সাজতে হয়েছে। ফাইন কল্কাদার মুগার পাঞ্জাবি, আর আলিগড়ি পায়জামা। নিখুঁতভাবে কামানো নির্মল মুখ, চুলে পড়েছে চিরুনির স্পর্শ।....পাবনার সত্যব্রত উকিলের ডাকসাইটে চেহারার খানিকটা উত্তরাধিকারী তাঁর বড় নাতিটিকে এখন দেখাচ্ছে যেন রাহুমুক্ত শশী। বেশ কয়েকদিন বাড়ির মধ্যে বিশ্রামে থাকায় বাপ্পার চামড়ার ওপর স্থায়িভাবে পড়ে যাওয়া তামাটে কোটিংটাও যেন অনেকটাই বিলীন।....

ওই দীর্ঘোন্নত উজ্জ্বল মূর্তিটির দিকে চেয়ে, পাপিয়ার ভিতরও ওই শব্দটাই ধ্বনিত হতে চাইছিল, 'দারুণ সুন্দর দেখাচ্ছে তোমায়।'

তাই বুঝি পাপিয়ার বুঝে উঠতে একটু সময় লাগলো, ধ্বনিটা কানের পর্দায় ধাক্কা দিলো, না মনের পর্দায়! তবে সামলে নিতেও দেরী হলো না। বলে উঠলো, এদিকে অবস্থাটি নিদারুণ। উঃ। এই গরমে মানুষ এতো সাজতে পারে? এদিকে বিয়ের কনে ভয় দেখিয়ে রেখেছে দারুণ একখানা সাজ না করে বিয়েবাড়িতে এলে ঢুকতে দেওয়া হবে না। তাই অন্যের কাছে ধার-কর্জ করেও কাজ চালাতে হলো!

একসঙ্গে এতোগুলো কথা কী বলে পাপিয়া? অথবা বলতো কী এখন? যদি না ওই মুগ্ধ মন্তব্যের মুখে পড়তে হতো। লজ্জা ঢাকতেই কথার চাষ!

বাপ্পা অবশ্য বলে ফেলে খেয়াল করেনি, এটা হচ্ছে মুগ্ধতার উচ্ছ্বাস!.... তবে বুঝতে পারলো পাপিয়া লজ্জা পেয়েছে। না বোঝবারও কারণ নেই অবশ্য! পাপিয়ার দেহের সমস্তটুকু রক্তই যে তার মুখের চামড়ায় এসে আছড়ে পড়েছে।

তাই বাপ্পা মুখে আসা কথাটা বলতে পারলো না 'আসলে ভীষণ মার্ভেলাস লাগছে কিন্তু, চুলের

খোঁপা না কিসে ওই মোটা ফুলের মালাটায়।'

বললো না। তার বদলে বললো, দেখো না আমার ওপরও ওই হুকুম চালানো হয়েছে! শুধু একবার মাত্র পরবার জন্যে মা এতোগুলো টাকা খরচা করে এইসব—

পাপিয়া এখন সহজভাবে বলে উঠতে পারলো, বাঃ! একদিনের জন্যে কেন? এ তো সবসময়ই পরে ছেলেরা।....আমাদের মেয়েদের শাড়ির মতো তো আর জরিটরি নেই।... কিন্তু বাবাকে দেখেছো বাপ্পাদা?

বাবাকে? মানে—তোমার? কেন অনেকক্ষণ আগেই তো মনে হলো পিসেমশাইরা—সবাই—

হ্যাঁ, আর সবাই তো বোধহয় সেই কখন! আমি আর বাবাই এখন—তো হঠাৎ যে কোনদিকে—আমি তো ভেবেই পাচ্ছি না কোন দিক দিয়ে ঢুকবো!

বাপ্পার হঠাৎ এ কী দশা হলো?

বাপ্পার কেন আরো একটু কথা বলতে ইচ্ছে করছে? যেটা চিরকাল তার স্বভাবের বিপরীত। বাপ্পার দৃষ্টিটা যেন ওই লাবণ্যময়ী মেয়েটার লাবণ্যে আটকে গেছে।

তাই বাপ্পা বলে ওঠে, আমার অবস্থাও প্রায় তাই। শিলুটা তো হরদমই ঘুরছে, অথচ আমি—বাবাঃ। একটা বিয়েয় এতো ভয়ঙ্কর সব কাণ্ড!

পাপিয়া আস্তে একটু হেসে বললো, এক হিসেবে বিয়েটাও তো একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড! একটা মেয়েকে তার আজীবনের মাটি থেকে শিকড়সুদ্ধ উপড়ে নিয়ে অন্য মাটিতে পুঁতে দেওয়ার ব্যবস্থা!

বাপ্পা তার সহজাত ভঙ্গীতে খপ করে বলে ওঠে, তবু তো মেয়েগুলো বিয়ের জন্যে মরে—

হ্যাঁ, এমনি দুমদাম একটা কথা বলে বসাও মূলতঃ স্বল্পভাষী ছেলেটার চিরকেলে স্বভাব।....ছেলেবেলায় ওর কথার ফলে নীহারিকাকে কী হঠাৎ হঠাৎ কম অপদস্থ হতে হয়েছে? অতিবাল্যেই অবশ্য ও অনায়াসে বলে বসতো, 'হ্যাঁ, এখন তো বাবাকে বেশ ভক্তি হচ্ছে, আর যখন বাবা থাকেন না, তখন কেবল নিন্দে।'....বলে বসতো, 'দিদার ওপর কথা বলছো যে? দিদা তোমার গুরুজন না? আর আমি একটু তোমার ওপর কথা বললেই যতো দোষ।'....আবার যখন তারকের মা এ বাড়িতে বাসনমাজুনি ছিল, তখন হয়তো তার কামাইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বলে উঠতো, 'তারকের মা, তোমার তো সত্যি জ্বর হয়েছিল? হয়নি? আর মা বলেন কিনা, জ্বর না হাতী! ইচ্ছে করে আসেনি।'

তা এতো বড়ো হয়েও স্বভাবটা নির্মূল হয়নি। তাই ফট করে বলে বসে, তবু তো মেয়েগুলো বিয়ের জন্যে মরে—

তবে এখন বলে অপ্রতিভ হয়ে যায় নিজেই! কারণ একজোড়া মর্মভেদী দৃষ্টি তার মুখের ওপর স্থির হয়ে গেছে তার কথায়।

মেয়েমাত্রই বিয়ের জন্যে মরে! তোমার বুঝি তাই ধারণা বাপ্পাদা?

বাপ্পা যেন কেঁপে ওঠে। এই মেয়েটার দৃষ্টিটা হঠাৎ হঠাৎ এমন গভীর আর স্থির হয়ে যায় কেন? মনে হয় কেন, ওই স্থির দৃষ্টির অন্তরালে সর্বদাই থাকে একটা ক্ষুব্ধ ভর্ৎসনা।

বাপ্পা অনায়াসেই অবজ্ঞার সুরে বলে উঠতে পারতো, 'তাছাড়া আবার কী? তাই তো দেখি।' এমন বলাটাই তো তার স্বভাবে খাপ খেতো। কিন্তু বাপ্পা তখন আর তার স্বভাব অনুযায়ী কথা বলতে পারলো না। একজোড়া ক্ষুব্ধ চোখ কোনখানে যেন কেটে বসে গেছে। বসে রয়েছে।

বাপ্পা তাই তাড়াতাড়ি বললো, মানে সব্বাই কী আর? মানে—এই রে—আবার কারা এলো মনে হচ্ছে। গাড়ি দাঁড়ালো একটা।

বাপ্পা তার পরিত্রাতা গাড়িখানার দিকে এগিয়ে গেল।

অনেক আহ্লাদ অনেক বিষাদ, অনেক প্রাপ্তি অনেক হতাশা, অনেক উজ্জ্বল হাসি অনেক গোপন অশ্রুর বিচিত্র সুতোর টানাপোড়েনে বোনা তাঁর বহুদিন লালিত 'উৎসব'মুখর দিনগুলি পার করে বনছায়া সবেমাত্র যখন তাঁর স্বপ্নের ছাঁচে গড়ে ওঠা সংসারটিকে হাতের মধ্যে পেতে চলেছেন, যখন বাড়িতে শুধু বনছায়া আর তাঁর সদ্যবিবাহিত ছেলে-বৌ, ঠিক সেই মহামুহূর্তে সেই বোমাটি ফাটলো। যেটিকে বনছায়া নিতান্তই খেলার বল ভেবে নিশ্চিন্তে ফেলে রেখেছিলেন!

বোমাটার আপাত চেহারা নিরীহ একখানা চিঠি। যার আধারে দূর বিদেশের ডাকটিকিট আর ডাকের ছাপ! যেটা পেয়ে বনছায়া হেসে হেসে বলেছিলেন, 'ওরে জিতু, দ্যাখ, ভাবি যে তোর কাকা বুঝি বাংলা লিখতে ভুলেই গেছে। ভোলেনি, তবে হাতের লেখাটি এখন দেখছি প্রায় সদ্য লিখতে শেখা ছোট ছেলের মতো। লাইন আঁকাবাঁকা, অক্ষরগুলো গোটা গোটা বড় বড় আর নানান সাইজের। বাংলা না লিখে লিখেই—'

যুধাজিৎ একবার তাকিয়ে দেখে হেসে বলেছিল, ভাষাও তো প্রায় বালসুলভ।....তো তুমি কাকাকে তোমার ছেলের বিয়েতে আসতে বলেছিলে নাকি?

বনছায়া অপ্রতিভভাবে বলেন, সে কী আর সত্যি বলা? একটু তো বলতেই হয়। শুধু বিয়ের খবরটি দিয়ে, আর 'তোমার নামে চিঠি ছাপতে দেওয়া হয়েছে' বলেই দায়সারাটা ভালো দেখায়? লিখেছিলাম 'সেই যে দেশ ছাড়লে, সত্যিই একেবারে বিদেশী হয়ে গেলে। বিয়েতে যদি আসতে কতো আনন্দ হতো!'

যুধাজিৎ হেসে উঠে বলেছিল, সাধে বলি, জননী তুমি নমস্য! সেই কাকাকে! পারোও বা।

বনছায়া কুণ্ঠিত হাস্যে বলেছিলেন, তা যতোই হোক বাপু, আপনজন তো বটে।

ঠাট্টার হাসি হেসেছিল যুধাজিৎ, 'আপনজন'। তা বটে। খুবই আপনজন! তবে আমার তো সে ভদ্রলোকের চেহারাখানাও আর এখন ভালো করে মনে পড়ে না। তোমার মনে আছে?

বনছায়া তখন লজ্জা ত্যাগ করে সজোরেই বলেছিলেন, কী যে বলিস! মনে থাকবে না? বিয়ে হয়ে যখন তোদের বাড়িতে এলাম তখন একমাত্র ওই ছেলেটাই তো ছিলো আমার সঙ্গী! তোর দাদা তো সর্বদা ঘ্যানঘেনে রুগ্ন একটা দু বছরের মাত্র ছেলে। তাকে নিয়েও তো— থেমে গিয়েছিলেন বনছায়া।

কোনোভাবে যদি এমন প্রসঙ্গ এসে পড়ে, যাতে প্রকাশ পায় 'বড় ছেলে'টি তাঁর আপন গর্ভজাত নয়, তাহলেই থেমে যান।

যুধাজিৎও সেটা বোঝে। তাই কথায় তেমন প্রসঙ্গ আনে না। বরং সবসময় 'তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্তুরটি' বলে উল্লেখ করে। এখন মাকে অপ্রতিভ হতে দেখে তাড়াতাড়ি হেসে উঠে বলে, বিয়ে হয়ে তুমি 'আমাদের বাড়িতে' এলে? হো-হো-হো! আমি তখন কোথায় মা?

তুই? তুই তো—বনছায়া একটু কৌতুকের হাসি হেসে বলেন, তখন 'ইচ্ছে' হয়ে ছিলি মনের মাঝারে।... তা হলেও বাড়িটা তো তোদেরই বাড়ি। সরকার বাড়ি!

যুধাজিৎ চিঠিটায় আর একবার চোখ ফেলেছিল। সত্যি বলতে—ভাব-ভাষা দুটোই বালসুলভ।

'...আপনি যে আমায় মনে রাখিয়াছেন, ইহাতে আমি যারপরনাই সুখী হইয়া আছি। আর পুত্রের বিবাহে আমি যাইলে খুশী হইতেন জানিয়া প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। আপনি একজন মহতী দেবী! আপনি আমার নমস্কার নিবেন। ক্ষমতা থাকিলে যাইতাম। অর্থ সামর্থ্য কোনো ক্ষমতাই নাই। ইতি— হতভাগ্য দিব্যজিৎ।'

বনছায়া বলেছিলেন, চিঠিতে আবার 'আপনি' করে লিখতে গেছে কেন? 'তুমি' করেই তো বলতো।

যুধাজিৎ হেসে উঠে বলেছিল, এখন বোধহয় আপনি যে একজন 'মহতী দেবী' সেটা অনুভব করে।

ওই পর্যন্তই। চিঠিখানা মেয়েকে আর বড় ছেলেকে একটু দেখাবার ইচ্ছে হলেও, দেখাতে তেমন সাহস করেননি। হয়তো ওই থেকেই আবার নতুন করে কটু তিক্ত সমালোচনা হতে থাকবে লোকটার নামে। সুরজিৎ তো আবার নিজের সে সময়কার ব্যবহারের ব্যাপারটি ঢাকতে বেশী করেই ধিক্কার দিতে বসবে। যুধাজিৎও বলে বটে, তবে হেসে হেসে। ওদের মতো কাকা সম্বন্ধে মনে অতো বিদ্বেষ নেই ওর। মনে হয় আসলে 'বিদ্বেষ' জিনিসটাই তেমন নেই যুধাজিতের মধ্যে। হয়তো বা যেটুকু দেখা যায় সেটুকু সাময়িক। তা সে যে কোনো ক্ষেত্রে, য কারো সম্পর্কে।

বনছায়ার প্রকৃতির কিছুটা পেয়েছে ছেলে যুধাজিৎই, মেয়ে শুভশ্রী নয়। মেয়ে যেন সর্বদাই সকলের প্রতি বিদ্বিষ্ট। ভারী আশ্চর্য লাগে বনছায়ার। ভগবান তো ওকে কোনো বিষয়েই বঞ্চিত করেননি, তবু কেন ভিতরে ভিতরে বিশ্বসংসারের প্রতি বিদ্বেষ বিরূপ ভাব। 'মেয়ে আসছে' বলে উৎফুল্ল হন, কিন্তু এলে যেন কাঁটা হয়ে থাকেন, কখন কী কারণে তার মেজাজ খচে যায়। নেহাৎ তুচ্ছ কারণেই যায়।

ওই চিঠিখানা তাই দেখাবো ভেবেও আর কাউকে দেখাতে যাননি বনছায়া। শুধু যত্ন করে তুলে রেখেছিলেন। যত্নের কারণ নেহাৎই তুচ্ছ। এ যাবৎ বাংলায় কিছু লেখেনি লোকটা তাই। কিন্তু সেই নিশ্চিন্তে তুলে রাখা বস্তুটাই বোমা ফাটিয়ে বনছায়াকে হতভম্ব করে দিলো।

যুধাজিতের মুখের দিকে তাকিয়ে অপরাধীর মতো ভয়ে ভয়ে বললেন, কী হবে তাহলে জিতু?

যুধাজিৎ কষ্টে আত্মসংবরণ করে বলে, কী আর হবে, পূজনীয় খুড়োমশাইকে সসম্মানে রিসিভ করে নিয়ে আসতে এখনি এয়ারপোর্টে ছুটতে হবে।

হাতের টেলিগ্রামখানায় আর একবার চোখ ফেলে বলে, যা দেখছি, তাতে তো এক্ষুণিই যাওয়া দরকার। প্লেন এসে পড়বার টাইম হয়ে গেছে।... তবে ভেবে পাচ্ছি না, অবস্থাটা কী দাঁড়াবে। বলে চলে যায়।

ছেলেকে এতো বিচলিত হতে আর কখনো দেখেননি বনছায়া।...তাই নিজেও ভীষণভাবে ভীত আর বিচলিত হচ্ছেন। বেচারী তিনি। কী করে ভাববেন, তাঁর সেই 'সামান্য সৌজন্য'টুকুর ফলটি এমনভাবে তাঁর ওপর গদা হয়ে এসে পড়তে চাইবে।

দিল্লী থেকে প্রেরিত ওই গদাতুল্য দীর্ঘ টেলিগ্রামখানির সারাংশ এই, 'জীবনযুদ্ধে পরাজিত আর বহুভাবে বহুজনের কাছে প্রতারিত হতভাগ্য 'ডি. সরকার' নামের লোকটা এখন আপন ভুলের জন্য একান্ত অনুতপ্ত, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই সে এখন তার পরিত্যক্ত মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চায়। নানা ব্যাধিতে জীর্ণ জীবনের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তাই সেই সংক্ষিপ্ত শেষটুকুকে নিয়ে চলে আসছে দেশের মাটিতে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে—তার 'শেষ আশ্রয়' দেবীসদৃশ বৌদির কাছে।... অবস্থা—কপর্দকশূন্য। কোনোমতে ওয়াশিংটন থেকে দিল্লীতে এসে পৌঁছে, একটি পরিচিতজনের বাড়ি উঠে, তার কাছ থেকে দিল্লী থেকে কলকাতা আসার রাহাখরচটি 'ভিক্ষা' করে অমুক ফ্লাইটে যাত্রা করছে। বনছায়া দেবী যেন নিশ্চিতভাবে তাঁকে এয়ারপোর্ট থেকে উদ্ধার করে আনার ব্যবস্থা করেন। অন্যথায় তাঁকে পথে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

সদ্য হাতে ধরা রঙিন পানপাত্রখানিকে কে যেন নির্মমভাবে হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হাত বাড়িয়েছে।

মেখলা তার মাত্র সাত দিন পাওয়া সুখের জীবনের দিকে তাকিয়ে সেই সুখদাতার মুখের দিকে

তাকায়। আস্তে বলে, এয়ারপোর্টে যাচ্ছো? নিয়ে আসতে? এখানেই থাকবেন?

যুধাজিতের ভিতরেও কী ভয়ঙ্কর একটা আলোড়ন উঠছে না? তার মধ্যেও কী এমন একটি আর্তনাদ উঠছে না, যাঃ। 'সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'। কী মধুরছন্দে কাটছিল এই দিন কটি? বনছায়া যেন হাওয়ায় ভাসছিলেন। মেখলার মুখে স্বপ্নের মদিরতা! সাতটা দিন, না সাতটা মুহূর্ত?

আসলে বহিরাগতরা বিদায় নেওয়ার পরই, বনছায়ার বাসনাবদ্ধ 'সংসারখানির' চেহারাটি দেখতে পেতে শুরু করেছিলেন।

মেখলা ক্ষণে ক্ষণে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে, বাবাঃ। এতো বড়ো বাড়িটায় মাত্র তিনজন। কোন জায়গাটা কখন উপভোগ করা হবে? সব জায়গাগুলোই তো ছবির মতো। তিনতলায় উঠে এলে আর নেমে যেতে ইচ্ছে করে না, আবার বাগানে গিয়ে বসলেও মনে হয় সেইখানেই পড়ে থাকি।....অথচ ওদিকে মার সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর পুজোর ঘরেও থাকতে ভালো লাগে!

যুধাজিৎ কৌতুক হাস্যে বলেছে, এতো সব ভালো লাগার মধ্যে থেকে কিন্তু এই হতভাগাটা বাদ পড়ছে।

তার উত্তরে মেখলা ভুরু তুলেছে, 'হতভাগা' মানে? নিজেকে তাহলে তুমি এখন থেকেই 'হতভাগা' ভাবতে শুরু করেছো? তার মানে—ভাগ্য তোমায় ঠকিয়েছে!

সর্বনাশ! ওই কথার এই মানে? সাংঘাতিক মহিলা! তোমার সঙ্গে কথা বলতে তো দেখি নিক্তি হাতে রাখতে হবে। আমি বাবা একটা আলাভোলা লোক, যখন যা মুখে আসে বলে ফেলি। ইস, ভাবনায় ফেলে দিলে তো।

অবশ্যই অতঃপর উপযুক্ত আচরণে ওই কপট ভাবনাটি দূর করে ফেলে বলেছে, ঠিক আছে মশাই, ওই ভালো। তোমায় আর নিক্তি ধরে মেপে কথা বলতে হবে না।

আমার মাকে কেমন লাগছে?

মেখলা চোখ তুলে বলেছে, সব কথা মুখে বলতে নেই। বাইরের বাতাস লেগে হালকা হয়ে যায়।

টুসকি!

এই আবার ওই নাম? কী বলেছি?

ওই নামটাই যে বেশী ভালো লাগে।

কেন? শুনি? ওটা কী একটা নাম? শুনলেই মনে হয় টুসকি মারলেই পাকা টোমাটোর মতো গলে যাবো।

আরে ঠিক। কারেক্ট। সেইজন্যেই তো নামটা এতো ক্যাচি! কাছে এসে ডাকতে গেলেই গালে একটি টুসকি মারতে ইচ্ছে করে।

এই খবরদার।

কেন হে? কে দেখছে?

সেই তো মুশকিল। কেউ কোথাও থেকে দেখতে পাচ্ছে ভাবলে বোধহয় আলাদা একটা রোমাঞ্চ আসে। সত্যিই এতো বড়ো বাড়ি যেন মাত্র তিনজনের জন্যে 'এনাফ'।

সর্বনাশ। এখুনি কী জনসংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা—

এই! অসভ্য। ইস। আঁ-আঁ-আঁ! রোসো, গুনে গুনে পাঁচটা কীল মারবো। পিঠ পাতো।

হ্যাঁ, এইভাবেই সাতটা দিন সাতটি মুহূর্ত! আলোয় উজ্জ্বল, বাতাসের মতো হালকা!....হঠাৎ তার উপরে যেন পাথরের চাঁই এসে পড়লো। শকুনির ছায়া!.....

কিন্তু কী আশ্চর্য ! অনেকখানি বাড়তি জায়গার অগাধ পরিবেশে, বাড়তে আসছে তো একটা মাত্র মানুষ ! তবে এমন হাঁফধরা ভাব আসছে কেন ?

এই একই কথা ভাবছে সংসারের তিনটে মানুষ।

সত্যি ভেবে এতো দমবন্ধ ভাব আসছে কেন ? একটাই তো মানুষ বাড়ছে। তাও বীরদর্পে কোনো দাবির ভঙ্গীতে নিজেকে বিস্তার করতে নয়। দাবি-দাওয়াহীন একটা আশ্রয়প্রার্থী মাত্র।.....কী আর করবে ?

কী করবে ? অনুভূতির গভীরে ধ্বনিত হয়, অনেক কিছুই করবে হয়তো। প্রথমেই তো তোমাদের এই সুখ ফুলের পাপড়ি দিয়ে সাজানো সংসারটির ছন্দ ভাঙবে।.. .তারপর কে জানে আর কী ভাঙবে।

বড় ভয় করছে মেখলার।

বড় ভাবনা হচ্ছে যুধাজিতের।

আর বড় বেশী ভয়-ভাবনা হচ্ছে বনছায়ার আপন অপরাধবোধে।

একেই তো চিরকালই বিদঘুটে স্বভাবের ছিল। স্বেচ্ছাচারী, আত্মকেন্দ্রিক, অন্যের সুবিধে-অসুবিধে সম্পর্কে সম্পূর্ণ চেতনাবিহীন। তাছাড়া এই দীর্ঘদিন কী ধরনের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে এসেছে তা কে জানে।.......ওর বক্তব্যের ভাব শুনে তো মনে হয়েছে—এই বয়েসে জীবনের শেষদিন গোনবার কারণ নিজের প্রতি অত্যাচার অবহেলা আর ফ্রাস্ট্রেশান।

বেরোবার সময় যুধাজিৎ বললো, মা, তাহলে চলছি—অজানা সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে। জানি না কতোক্ষণে ফিরতে পারবো। প্লেনও তো হরদমই লেট করে।

বনছায়া বললেন, এসো বাবা। দুর্গা, দুর্গা। আহা, যেন বেশী 'লেট' হয়ে ভুগতে না হয় ঠাকুর।

যুধাজিৎ হেসে ওঠে, তোমার ঠাকুরটি বেশ বাধ্য ছেলে, তাই না মা ? যখন যা বলো, তাই শোনেন।

বনছায়া ক্ষীণভাবে বলেন, এ সময় আর ঠাকুরকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতে বসিসনে বাছা ! দুর্গা বলে এগিয়ে পড়।

এগিয়ে তো পড়ছিই তবে 'দুর্গা' বলে বোধহয় নয়। তো তোমার লক্ষ্মণ দেবরের জন্যে খাবার-টাবারের কী ব্যবস্থা করেছো জানি না। তবে ভাবছি, সাদা জল কী চলে ? না জলের বদলে বোতলবাহিনী। আবার সেই ব্যবস্থায় না ছুটতে হয়.....

হাসির ভানটা দেখিয়ে চলে যায় বটে, তবে ভিতরে হাসির মেজাজ নেই। কী ভাবে অভ্যর্থনা করতে হবে সেই প্রায় অচেনা হয়ে যাওয়া মার ভাষায় 'আপনজন'টিকে।

'বোতল' সম্পর্কীয় উক্তিটি দিদির টেলিফোনে ঝঙ্কারের ফল ! খবরটা টেলিফোনে শুনলো রিঙ্কু, আর সঙ্গে সঙ্গে কঠোরকণ্ঠে বলে উঠলো, মাকে একবার দে তো। দিই একবার আচ্ছা করে শুনিয়ে।

শুনিয়ে আর কী করবি ? এখন তো আর কোনো প্রতিরোধের উপায় নেই।

তাই বলে, তাঁকে বাড়িতে এনে তুলবি ? বোকামিরও একটা শেষ থাকে।

না তুলে ?

টাকার মায়া যখন নেই, তখন একটা হোটেলে-টোটেলে নিয়ে গিয়ে তুললেই হতো ! তোর জামাইবাবুও তো তাই বলছিলো। বলছিলো, কে জানে ব্রাদার ইন-ল'কে এবার বাড়িতে বোতল আমদানী করতে হবে কিনা। হয়তো জলের বদলে বিয়ারই চলে তাঁর। কই মাকে দেনা একবার।

যুধাজিৎ বলেছিলো, থাক বাবা। একেই তো বেচারী নিজেই মরমে মরে আছেন। আর সেই

যে কী বলে, 'মরার ওপর খাঁড়া।' না কী, তাই কেন?

তা সে সময় অরিন্দম এসে ধরেছিলো। বলেছিলো ব্যাপারটা বেশ রিস্কই। ওনার যা হিস্ট্রী, তাতে মনে তো হয় না, এযাবৎ সাধুসন্তের মতো জীবন-যাপন করে এসেছেন। কীরকম প্রকৃতি কে জানে!

যুধাজিৎ বলেছিলো, সব কিছুর জন্যেই প্রস্তুত থাকতে হবে।

আমি অবশ্য ভাবছিলাম কোনো হোটেলে একটা রুম নিয়ে, মানে তাতে হয়তো একটু স্বস্তি থাকতো।

যুধাজিৎ বলেছিলো, তা হয়তো থাকতো জামাইবাবু! তবে তাতে বনছায়া দেবীর সম্মানটি কী অটুট থাকতো? একটা 'হতভাগ্য প্রাণী' দেবীর মন্দিরে আশ্রয় পাবার আশায় ভূগোলকের ওপিঠ থেকে এপিঠে ছুটে আসছে—

অরিন্দম বলেছিলো, কারেক্ট।....তবে আর কি? 'জয় মা কালী' বলে ঝুলে পড়গে ব্রাদার।

তো তাই পড়েছে এখন যুধাজিৎ।

তবু এয়ারপোর্টে যাবার পথে-যেটা ওর বাড়ি থেকে সামান্যই দূর, ভাবতে ভাবতে চলে, টুসকির মুখটা কী হঠাৎ বড্ড বেশী ক্ষুণ্ণ আর বিস্ময়াহত দেখাচ্ছিলো? টুসকি কী মনে মনে এটা সহজে মেনে নিতে পারবে না? যদি না চায়? আশ্চর্য! কে জানতো এতোদিন নয় ততোদিন নয়, যুধাজিতের জীবনের এই পরমক্ষণে এমন একটা অদ্ভুত আকস্মিকতার ধাক্কা এসে তার জীবনের সাজানো খুঁটিগুলো এলোমেলো করে দেবে!

আবার ভাবতে চেষ্টা করলো, ব্যাপারটাকে এতো বড়ো করেই বা ধরছি কেন? 'সামান্য' বলে ধরলেই তো হয়। অনেক দিনের একজন নিকটাত্মীয় আসতে চেয়েছেন। এই তো। তাও নিজে থেকে পরিকল্পনা বা কোনো অভিসন্ধির বশে নয়, আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে। সে আমন্ত্রণ বাড়ির খোদ গৃহকর্ত্রীর। আহূত ব্যক্তিটি তো সৌজন্য হিসেবেই আসতে চাইতে পারেন।

আর আমাদেরই বা কী এতো? এতো বড়ো বাড়িতে বাড়তি একটা মাত্র মানুষকে জায়গা দেওয়া যাবে না? তাতে আর সংসারের ছন্দ ভাঙাভাঙির কি আছে? তাও ব্যক্তিটি মহিলা নয়, প্রৌঢ় এক পুরুষ। রুগ্ন অভাবগ্রস্ত? তাতেই বা কী? নিঃসম্পর্কীয় জনকেও এমন ক্ষেত্রে সহানুভূতি দেখাতে হয়, আর এ তো একেবারে নিকটজন।

এও মনে হলো, সংসারক্ষেত্রে এমন ধরনের ঘটনা তো আকছার। হয়তো কোনো অভাবগ্রস্ত নিকট আত্মীয়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটলো! তাঁর পরিবারের বহন করার দায়িত্ব নিতে হয় না? শত অসুবিধেতেও নিতে হয়। সেক্ষেত্রে 'সংসারের ছন্দ ভেঙে যাবে' বলে উদাসীন হয়ে গা ঝাড়া দিলে 'জীবনের ছন্দ'টি কী ঠিক থাকে?

কিছুদিন আগে হলেও এতো কথা ভাবতে বসতো না যুধাজিৎ। নিজের স্বপক্ষে এতো যুক্তি খাড়া করতে বসতো না। কারণ যুধাজিতের জীবনে তখন এমন কেউ এসে দেখা দেয়নি, কোনো ব্যাপারে যার মুখের চেহারাটি কেমন হয়ে উঠলো তাই বিশ্লেষণ করতে বসতে হতো।

মা। কেবলমাত্র 'মা'ই ছিলো তার শেষ কথা।

এখন আবার দুটো পাল্লায় বাটখারা চাপিয়ে চাপিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। জীবনভোর! কী আশ্চর্যভাবে এসে যায় এই দায়বদ্ধতা।

কিন্তু সেই দায়বদ্ধতাটির দায় কী সকলের কাছে সমান হয়ে দেখা দেয়?

অনেক তার ধারও ধারে না। এবং সেই মানসিকতা যে কেবলমাত্র পারিবারিক শিক্ষাদীক্ষা বা পরিবেশ-নির্ভর হয়. তাও নয়। না হলে—বেলেঘাটার শুভ্রাঙ্ক মুখুয্যের বড় নাতি শঙ্খ মুখার্জি ওরফে খোকা ওরফে 'বাবু' কী করে অনায়াসে অতি সহজে, একটি শক্ত গাঁথুনি বড়সড় যৌথ পরিবারের মধ্য থেকে নিজেকে খসিয়ে নিয়ে বৌ নিয়ে আলাদা হয়ে যেতে পেরে উঠলো। যে নাকি সন্ধ্যাতারা নামের মহিলাটির গর্ভজাত।

যে সন্ধ্যাতারা জীবনসাধনাটিই হচ্ছে আত্মবিলোপী সাধনা। যে নাকি অপরের কোনোরকম ক্ষোভ দুঃখ বেদনা অভিমানের কারণ হতে পারার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারে না। সকলের সন্তুষ্টিবিধানই যার ধ্যানজ্ঞান। অথচ তার ছেলে শঙ্খ ওসবের তোয়াক্কা করেনি, বরং মা যখন সকাতরে ছেলের কাছে আবেদন জানাতে এসেছিলো, অন্তত বাবা যে কটা দিন আছেন এমন কাজ করিসনে বাবুসোনা।

বাবুসোনা তখন অনমনীয় তাচ্ছিল্যের গলায় বলেছিলো, তোমার পূজনীয় শ্বশুরঠাকুরের হেলথ্ বেশ ভালোই আছে মা।-তার ওপর তোমার সেবা-যত্ন ভক্তি। নিশ্চিন্ত থাকো, এখনো আরো দশ বিশ বছর দিব্য টিঁকে থাকবেন। তো আমি ব্যাটা কেন ওনার মরণ টাঁকতে বসবো? আমার অভাবে তো আর ওঁর ভোগপুজোর কোনো অভাব হবে না।

আহত সন্ধ্যাতারা বলেছিলো, তোর কথাবার্তাগুলো এমন বাড়িছাড়া মতো হলো কী করে রে 'বাবু'?

বাবু বলেছিলো, আশ্চর্যের কী আছে? মানুষ তো আর ছাঁচের পুতুল নয়।

ছেলেবেলা থেকেই অবশ্য 'বাবু' ঠাকুর্দার কাছে 'খোকা', একটু স্বার্থপর স্বতন্ত্রপ্রিয় একবগ্গা। তবে এতোটা বাকচাতুর্যে রপ্ত ছিল না। সেটা হয়েছে বোধহয় সংগগুণে। তার প্রেমঘটিত বিয়ের বৌ যখন প্রথমেই এসে বলেছিলো, বাবাঃ! এই দম আটকানো বাড়িতে আমায় থাকতে হবে? অসম্ভব! কই কোনোদিন তো বলোনি তোমাদের এমন একখানা রাবণের গুষ্ঠীর সংসার! স্রেফ চেপে গেছলে!

বৌ সাজে সজ্জায় অতি আধুনিক বটে। তো বাক্যবিন্যাসে পিতামহীর ধারা বহন করে।

শঙ্খের কণ্ঠ থেকে অবশ্য তখন প্রতিবাদের শঙ্খনিনাদ ধ্বনিত হয়নি। মিনমিন করে বলেছিলো, তখন অতো কথা বলার কী অবকাশ হতো। তোমায় দেখলেই তো সব ভুলে মেরে দিয়ে কেবল—

থামো! ওসব ঢং-এর কথা রাখো। আমার এই সাফকথা মাথার ওপর পাহাড় নিয়ে থাকতে পারবো না! এ বাড়িতে কারো এক ইঞ্চি স্বাধীনতা আছে? স্বাতন্ত্র্যসুখ বলে কিছু আছে? নিজস্ব ভাবে থাকার ব্যবস্থা আছে? সবই তো দেখি সর্বক্ষণ ওই এক ইজিচেয়ারে পড়ে থাকা অনড় বুড়ো ভদ্দরলোকের ইচ্ছের তালে চলে।

এই মনোভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে, তার প্রতিক্ষণের আচারে আচরণে, চলনে বচনে। নববিবাহিতের রোমান্স তার ধারেকাছে ঘেঁষতে পারেনি। আগে 'প্রেম নিবেদনের' উপযুক্ত জায়গার মালিক হও তবে ও সব করতে এসো। এই তার ঘোষণা।

তবু সন্ধ্যাতারার গর্ভজাত সন্তানের কণ্ঠ থেকে, কোনো একসময় মিউ মিউ করে উচ্চারিত হয়েছিলো, ঠাকুর্দা যে কটা দিন আছেন—ততোদিনই। তারপর কী আর—

বৌ কথা শেষ করবার আগেই সাফ জবাব দিয়েছিলো, তোমার ওই ঠাকুর্দাটি আরো দশ বছর থাকবেন না, তার গ্যারান্টি আছে? মানুষ একশো বছরও বাঁচতে পারে। তাও আবার সর্দার এতো ঠাকুরসেবা তুল্য তোয়াজি সেবা! বলেছিলো, জীবনটাকে উপভোগ করার সময়টিই যদি দম বন্ধ হয়ে গুড়ের নাগরীর মতো পড়ে থাকলুম, তো পরে বয়েস ফুরিয়ে গেলে স্বাধীনতা স্বাচ্ছন্দ্য পেলুম আর না পেলুম।....কিসের জন্যে জীবনের সেরা সময়টিই বিকিয়ে দেবো। নিরুপায়ের মতো? তোমার

ঠাকুর্দার এই 'রাজপ্রাসাদের' আধখানা ঘরের মালিকানার আশায় ? হ্যাৎ ! এই বিরাট গুষ্টির ভাগে, এই আধখানা বৈ একখানা আস্ত ঘর জুটবে বলে মনে হয় তোমার ? তবে জীবনটাকে বরবাদ দিয়ে ঠাকুর্দার ভিটের দুখানা নোনাধরা ইঁট কামড়ে বসে থাকতে হবে ? দায় পড়েছে।.....আমায় এই খাঁচা থেকে উদ্ধার করতে না পারো তো যেখানে ছিলাম, সেখানে ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

হ্যাঁ, এই রকমই ভাষা শঙ্খর বৌয়ের। জড়তাহীন, কঠোর, ধারালো। এর সামনে কী শঙ্খ মনে পড়িয়ে দিতে পারবে, যেখানে ছিল সেখান থেকে উদ্ধার করে আনার জন্যেও তো পাগল করে তুলেছিলে আমায়। তোমার সেই দিদি-জামাইবাবুর সংসারে যতোই বিলাসিতা আড়ম্বর সুখ স্বাচ্ছন্দ্য থাক, তোমার পোজিশানটি কী ছিলো ? ঘাড়ে পড়া একটা দস্যি আইবুড়ো শালী। এই তো ? তোমার জামাইবাবু যখন তখন হাসির ছলে বলতো না, 'লোকের থাকে মাতৃদায়, পিতৃদায়, কন্যেদায়, এ হতভাগার হলো শালীদায়।'.....বলতো, 'নিশ্চিন্তে কলকূজন প্রেম গুঞ্জনের জন্যে নিজের কোর্টে নিয়ে গিয়ে ফেলো না হে বৎস '....কেন পরের গোয়ালে ফেলে রাখা ?'

আর সেই শ্যালিকা 'সঞ্চারিনী' তখন সঞ্চারিনীলতার মতো হেসে গড়িয়ে পড়লেও আড়ালে হতভাগা প্রেমিকটার ওপর তর্জনগর্জন করতো না ? বলতো না, 'তুমি কী চাও একদিন গায়ে কেরোসিন ঢেলে নিজেকে নিকেশ করে দিই ?'

এখনো এ বাড়ি ছাড়বার তাড়নাতেও সেই কথাই বলে। তবে তার সঙ্গে এই নতুন বাক্যবাণটিও জুড়ে দেয়, যার কানাকড়ির মুরোদ নেই তার আবার প্রেম করতে আসার শখ কেন ?

অথচ এখানে 'বাবুর বৌ' নামক ভি. আই. পি. মহিলাটির জন্য আরাম আয়োজনের কোনো ত্রুটি ছিল না। তা হলে কী হবে ? ওই স্বাধীনতা ! সেখানেই যে ঘাটতি ! বৌ হঠাৎ নিজে একটু একা বেরিয়ে কিছু কেনাকাটা করে এনে দেখলো, বাড়িতে 'বৌ কোথায়' 'বৌ কোথায়' রবে হুলিয়া বেরিয়ে গেছে।....

ইজিচেয়ারে আসীন বৃদ্ধটি বলেন কিনা, এ বাড়িতে ঠিক এরকম রেওয়াজ নেই নাতবৌমা। কেনাকাটার দরকার হলে বাড়ির বেটাছেলেদের বলবে। আর নয়তো খোকার সঙ্গে বেরিয়ে—

রাগে মাথা গরম হয়ে গিয়েছিলো সেদিন। আর তারপর যখন শাশুড়ী ঠাকুরুণটি বলতে এসেছিলেন, 'তো একটু আধটু বেরোতে দরকার পড়লে বাড়িতে কাউকে বলে যেতে হয় মা। বাড়িতে কী ভাবনাই পড়ে গেছলো।'.....তখন কণ্ঠে সেই গরমটি ঢেলেছিলো, ভাবনার কী আছে ? দিন দুপুরে চুরি হয়ে যাবো ?

এই বৌকে আর কী বলতে যাবে সন্ধ্যাতারা ? চোখের জলটাকে সামলাতে হবে না ?

তা সেই প্রথমদিন শঙ্খও মৃদুকণ্ঠে বলেছিলো, একটু বলে গেলে আর ঝামেলা থাকে না।

কিছু বলেই বা যাবে কেন বৌ ? সে কী নজরবন্দী আসামী ? তাই নড়তে চড়তে 'হুকুম' নিতে হবে ?.....যে বাড়ির মেয়ে ডাক্তারী পড়ে (তখনো পড়ার স্টেজ চলছিলো) সে বাড়ির এমন সেকেলে গাঁইয়াপনা। তাজ্জব।.....বাড়ির পুরুষরাও যখন কোথাও বেরোয়, বাড়িতে কাউকে বলে যায় ?.....সেলাম বাবা সাত সেলাম এই বাড়ির খুরে।.....এ সেই তাসের দেশ না কী ? 'নি-য়-ম !' আমার দ্বারা হবে না ওসব।

অতএব পরবর্তী স্টেজে শঙ্খ-কণ্ঠেও নিনাদিত হতে শোনা গেলো, সবাইতো এ বাড়ির মতো পৌরাণিক পদ্ধতিতে মানুষ হয় না মা। আমাদের এ বাড়ির রীতিনীতি এ যুগে অচল। উঠতে বসতে সবকিছুর পারমিশান নেওয়া 'ওর' পক্ষে অসম্ভব। বুড়ো ভদ্রলোকটিরও তেমনি এক বদ অভ্যেস। সক্কলের সব ব্যাপারে নাক গলাতে আসা। বয়েস হয়েছে হরিনাম করুন না।

তা বলতে হয়, এতোটি বাকপটুতা ছিলো না শঙ্খর। সঙ্গগুণেই হয়েছিলো।

সে যাক। সে অধ্যায়ে যবনিকা পড়ে গেছে।

সন্ধ্যাতারা তার ছেলে বৌয়ের খাট পালঙ্কে শোভিত, যেগুলো সন্ধ্যাতারারই অবদান, ঘরটাকে দুবেলা ঝাড়ামোছা করায়, সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যা দেয়।

এসব জিনিস নিয়ে যায়নি কেন ছেলে বৌ?

সন্ধ্যাতারা তো কাতর অনুনয় করেছিলেন, না নিয়ে গেলে অসুবিধেয় পড়বে বলে। কিন্তু নিয়ে গিয়ে তুলবে কোথায়? আস্ত একখানা ফ্ল্যাট তো আর যোগাড় করে উঠতে পারেনি। আর যদিবা এক আধটা হাতছানি দিয়েছে, তো সে একেবারে নাগালের বাইরে। মস্ত একটা কেষ্টবিষ্টু তো আর নয় শঙ্খ মুখার্জী? ভায়রাভাইয়ের সুপারিশে যা হোক একটা চাকরি জুটেছে এই পর্যন্ত। বিদ্যেই বা কী? সাত তাড়াতাড়ি প্রেমে পড়ে তো গুবলেট হয়ে বসলো।

এখন আস্তানা হচ্ছে এক বন্ধুর তিনখানা ঘরের ফ্ল্যাটের একখানা। বন্ধুর বদান্যতায় অবশ্য নয়, রীতিমতো মূল্য ধরে। এবং তৎসত্ত্বেও শুনতে হয়েছিলো, অন্য কাউকে দিলে—মোটা টাকা সেলামী পেতো। তবে তার বদলে একটি শর্ত আরোপিত আছে, নোটিশ দিলে তিন মাসের মধ্যে উঠে যেতে হবে। বন্ধুর বক্তব্য তিন মাস এনাফ্। আগে লোকে পনেরো দিনের নোটিশ দিতো।

আর বন্ধুর বৌ হেসে গা পাতলা করে বলেছিলো, ভাড়া দিয়ে কিন্তু 'ভাউচার টাউচার' চাইতে বসবেন না মশাই। তাহলেই 'ভাড়াটে বাড়িওলা' আইনের প্যাঁচে পড়ে যেতে হবে আমাদের। আমার বাবা তো শুনে ভয় খেয়ে বললেন, ওরে বাবা—ভাড়াটে বসানো। ডেঞ্জারাস ব্যাপার। সেই যে কথায় বলে, 'ছেলে মরবে তবু ঘুনসি ছিঁড়বে না'—এও প্রায় তাই। বাড়িওয়ালা ঝামেলায় বাড়ি বেচে চলে যাবে—তবু ভাড়াটে নড়বে না। আর মামা বললো, ভাড়া দেওয়াও যা, হিহি দানপত্র লিখে দেওয়াও তা। ধরে নে সদব্রাহ্মণকে বাড়ির একটু অংশ দান করে দিচ্ছিস।

অতএব ওই শর্ত।

ভাড়াটে নয়। বন্ধু। বাড়ি খুঁজছে, যতোদিন না পায়, ততোদিনের জন্যে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তো আশ্রিতই যখন, তখন আবার ভাড়ার রসিদ কিসের?

টাকাটা যে বন্ধুর নিজেরই বিশেষ উপকারে লাগবে বলেই এই 'আশ্রয়' দেওয়ায় সম্মতি, তা কী না বুঝেছে এরা? তবে উপায় কী? তবু একটা স্বাধীন জীবন পাওয়া গেল! উপভোগের কালটা হাতছাড়া হয়ে গেল না।

কমন বাথরুম?

তা আর কী করা যাবে?

রান্নাঘর নেই, শোবার ঘরের সামনের ব্যালকনিটাতেই কেরোসিন স্টোভে রাঁধতে হবে? তা আর কী করা? সবদিনই যে দুবেলা রাঁধবে সপ্তারিণী, এমন কোনো কথা নেই। বাইরে কী খাদ্যবস্তুর অভাব আছে?

তবে রাত দশটার মধ্যে না ফিরলেই গেট-এ তালা পড়ে যায়। অনেক ডাকাডাকি করে সবিনয়ে আর্জি জানাতে হয়?

উপায় কী? যার বাড়ি, সে হচ্ছে দারুণ নিয়মী।

সকালে বেলা সাতটার আগে পাম্প খোলা হয় না? তাইতো দেখা যাচ্ছে। ওটাই বন্ধুর বাড়ির নিয়ম।

তা এ সব তো মেনে নিতেই হবে। বন্ধু যে রাজী হয়েছিল এই ঢের!

কত জনকেই তো বলা হয়েছিলো। কে রাজী হয়েছে? লজ্জার মাথা খেয়ে একবার বৌয়ের

দিদিকেও বলে বসেছিলো শঙ্খ। কিন্তু দিদি সে প্রস্তাব একেবারে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিলো। বললো, ভাড়া নেবো? তোমার কাছ থেকে? মাথাটা ঠিক আছে তো ভাই?

কিন্তু একেবারে আশ্রিত হয়ে তো আর থাকা যায় না!

তা তো নয়ই। অতএব অন্য পথ দেখো বাপু।

ভায়রাভাই বললো, ভাড়াটে বাড়িওলা সম্পর্কটা বড়ো খারাপ ভায়া। নিকটাত্মীয়ের মধ্যে ও সম্পর্ক পাতাতে না আসাই ভালো।

অর্থাৎ আশ্রয় না দিলেও বেশ একটু জ্ঞান দিলেন ওঁরা।

অতএব বেলেঘাটার শুভ্রাঙ্ক মুখার্জীর পৌত্র শঙ্খ মুখার্জী, নিরাশ্রয়ের ভূমিকায় সাত দরজায় টুঁ মেরে মেরে এই একখানি হৃদয়বান বন্ধুর সন্ধান পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে গেছে। মাইনের অধিকাংশই তার হাতে তুলে দিতে হচ্ছে বটে, তবু পায়ের তলায় মাটি, মাথার ওপর ছাত, এই কী সোজা প্রাপ্তি না কী?.....এখান থেকে তো কোনো কিছুতেই কারো পারমিশান নিতে হয় না। আর সেজেগুজে দিদির ছেলের জন্যে চকোলেট আর জামাইবাবুর জন্যে তাঁর প্রিয় কড়াপাকের সন্দেশের বাক্স হাতে নিয়ে গিয়ে গা ভাসিয়ে আড্ডা দেওয়া যায়। আর যেখানে আছে, সেখানে যে কী সুখে আছে তা গল্প করা যায়।

বেলেঘাটার পথে অবশ্য একবারও উঁকি দেওয়া হয় না।

হয় না, তার কারণ একজনের নিতান্তই অনীহা, অপরজনের হয়তো বা অবচেতনে একটু অপরাধবোধের সুপ্ত কামড়। যদিও মনের মধ্যে অবিরত যুক্তিও খাড়া করে চলে, 'কেন। এতো কী! লোকে এমন করে না?' অথচ—ও মুখো হতে যাবার সাহসও খুঁজে পায় না। যাকগে, সেই রাস্তাটা ভুলে গেলেই বা ক্ষতি কী!

এ বিশ্বভুবনে দিকে দিকে আরো কতো রাস্তা।

কিন্তু মুশকিল ওই শঙ্খর যে সব রাস্তার দিকে আগ্রহ তার বৌয়ের ঠিক সেই সব দিকেই অনীহা। তার মতে লোকের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কী হবে? শহরে এতো দর্শনীয়র পসরা!

তবে মুশকিল এই, সেই সব দর্শনীয়দের জন্যে টিকিট কাটতে হয়।

বৌ ঘৃণায় মুখ বাঁকিয়ে বলে, পয়সা খরচের ভয়ে হাত পা নিয়ে সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি বসে থাকতে হবে?......সারাদিন বাড়ির বাইরে কাটিয়ে আসা, চিরদিনের আয়েসী মার্কা ক্লান্ত বাবুর যখন মনপ্রাণ চাইছে আরাম করে গা গড়িয়ে চা সিগারেট নিয়ে নিজেকে এলিয়ে দেবার, তখন সারাদিন বাড়ি বসে থেকে হাঁফিয়ে ওঠা সঞ্চারিণীর প্রাণ-মন উন্মুখ হয়ে থাকে বাইরে বেরিয়ে পড়ার।

বিপরীতমুখী এই দুই 'ইচ্ছার' মধ্যে জয় অবশ্য প্রবল পক্ষেরই হয়! যদি সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি বসে গ্যাঁজাবে, তবে এতো কাঠখড় পুড়িয়ে, বাড়ির আওতা থেকে টেনে বার করে আনা কেন ওই কুড়ের বেহদ্দটাকে।

অতএব কাঁচপোকার জয়যাত্রা পিছনে তেলাপোকাকে নিয়ে।

তবে শুধুই কী ওইটুকু? অন্যের ফ্ল্যাটের একখানা ঘরে পড়ে থাকা জীবন থেকে উত্তরণ ঘটাতে হবে না? আর সেই ঘটনাটি ঘটাবার জন্যে সারাক্ষণ চলবে না চাপা গর্জন?

না রাবণের গুষ্টীর বাইশ জোড়ার চোখের আওতা থেকে বেরিয়ে এসে অবাধ 'প্রেমগুঞ্জন আর কলকূজন' কপালে জোটে না। জোটে ওই চাপা তর্জন গর্জন। এখানেই বা অবাধ কোথায় হে অকৃতী অধম পুরুষ? ঘাড়ের কাছে বন্ধুপত্নী। আর তাঁর কানও রীতিমতো তীক্ষ্ণ।

শঙ্খের কোনোদিন জানা ছিলো না, একজন পুরুষেরর বিয়ে করতে 'আম্বা' হবার আগে, প্রধান চিন্তা থাকা উচিত, সে তার স্ত্রীকে একটি 'নিভৃত নির্জন' আর আরামের উপকরণ সমৃদ্ধ 'ঘর' যোগাতে

পারবে কিনা!

শঙ্খর দেখা আর জানার জগতে এ চিন্তার চাষ দেখেনি কখনো। অথচ 'দেখেনি' বলেই অবিরত ধিক্কৃত হতে থাকে।

এ হেন অবস্থায় কিনা হঠাৎ দেখা গেলো বৌয়ের মাথা ঘুরতে শুরু করেছে, আহারে অনিচ্ছা এবং .আরো সব নানান উপসর্গ।

শঙ্খ মাথায় হাত দিয়ে বললে, সর্বনাশ! প্রিকশান নাওনি?

বৌ চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনে বললো, বাজে কথা বলো না। সাবধানের যেমন মার নেই, তেমনি 'মারের'ও সাবধান নেই। দৈবাৎ উল্টোপাল্টা ঘটে যাওয়ার ঘটনাও ঘে ে থাকে।

তাহলে? এখন উপায়? দিদির কাছে চলে যাবে?

বৌ তীব্র হলো, কী? দিদির কাছে? কেন? গলায় দিতে দড়ি জুটবে না?

কিন্তু এইভাবে—উপোস দিয়ে দিয়ে সংসারের কাজটাজ—

ন্যাকামি রাখো। কোন আমলে আছো? উপায় আবিষ্কার করতে বসলে 'দিদির' কাছে চলে যাবার। শহরের অলিতে গলিতে 'উপায়' ছড়ানো নেই।

ঠিক তো। অলিতে গলিতেই তো আজকাল উপায় ছড়ানো। যার নগ্ন নির্লজ্জ ভাষায় সোচ্চারে দুহাত বাড়িয়ে ডাকাডাকি করছে। বলছে, 'এসো এসো এক ঘণ্টায় অসুবিধা মুক্ত হও।'

তেমন একখানা গলিঘুঁজি আবিষ্কার করতে অসুবিধা হলো না। অতএব—বেলেঘাটার শুভ্রাঙ্ক মুখার্জীর এতাবৎ কালের নির্মল বংশধারার ধারা-রক্ষকের ভূমিকা নিয়ে যে প্রাণটুকু পৃথিবীর আলো দেখবার 'আম্বা' নিয়ে চলে আসছিলো, তাকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে, অসহায়ভাবে ফিরে যেতে বাধ্য হতে হলো অথচ অভাগা হতভাগার ছিলো একটি আলোকোজ্জ্বল সম্ভাবনা। তার পৃথিবীর আলো দেখামাত্রই শাঁখ বাজতো, উলু পড়তো, বাড়িতে আহ্লাদের বান ডাকতো।.....আর রাবণের গুষ্টীর তৃতীয় প্রজন্মের ধারক বাহকের ভূমিকা লাভের দৌলতে 'মুখ-দেখানির' অগাধ সম্ভারে ভরে উঠতো প্রাপ্যের ঝুলিটি।....'নামকরণের' ধুয়োর ঘটায় উৎসব বসে যেতো পরিবারের গন্ডি ছাড়িয়ে।....

হতে পেলো না বেচারা সেই পরম ভাগ্যের অধিকারী হতে। তাকে একটা নামহীন আলোহীন অন্ধকার জগতে তলিয়ে যেতে হলো। সে বাঁচতে পেলো না।

তা উপায় কী? তার জনক-জননীকে তো বাঁচতে হবে! বাঁচার মতো বাঁচতে।

তোমায় 'আহ্লাদ দিয়ে' বাঁচাতে বসলে তাদের সাধ-আহ্লাদের বারোটা বেজে যাবে না? অতএব সরে পড়ো বাছা। অসময়ে ঝামেলা করতে এসো না।

তোমার জনক-জননীর যখন সুবিধে সুসময় আসবে, তখন তোমায় ডাক দেবে, 'আয় আয় তু-তু! খেতে দেবো দুদু—' তখন এসো।

ক্লিনিকের ডাক্তার নাকি মুখে হাল্কা হাসির প্রলেপ বুলিয়ে বলেছিলেন, 'ফার্স্ট চাইল্ড, তাহলে রেখেই দিন না। আসবার জন্যে বায়না করে বসেছে যখন—'

তো যার ফার্স্ট, সেই জননীই তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলো, না না। এখন ঠিক সুবিধে নেই। ফরনাথিং খানিকটা প্রবলেম বাড়ানো।

তবে আর কী করা? তারা তো মুক্তিদাতা রূপেই আসরে অবতীর্ণ আছে।

আর যারা বুদ্ধিমান তারা কেনই বা জীবনে প্রবলেম বাড়াবে, অসুবিধে বাড়াবে!

বায়না করে বসেছে বলেই, সে বায়না রাখতে হবে? এ যুগ এতো বোকা নয়।

॥ তেইশ ॥

ভাবপ্রবণ বনছায়া তাঁর দীর্ঘদিন প্রবাসী প্রায় নিরুদ্দেশের খাতায় নাম লেখানো দেওরটির স্বদেশে ফিরে আসায় যতই পুলকিত বিগলিত হোন, বনছায়ার ছেলেটি কিন্তু এই অভাবনীয় আবির্ভাবে বেশ শঙ্কিতই হয়েছিলো! তার নিজের দিক থেকে অবশ্য এই আচমকা ঝঞ্ঝাটে তার দিদি দাদার মতো বিরাগ বিদ্বেষ অনুভব করেনি। বরং মার এই দুঃসাহসিক ছেলেমানুষীর বহর দেখে একটু কৌতুকই বোধ করেছিলো।

তবে বিপন্ন বোধ করেছিলো মেখলার কথা ভেবে!

মেখলা তার এই সদ্যবিবাহের রঙিন স্বপ্নময় পরিবেশের ওপর হঠাৎ এই 'বিদঘুটে জীবটির' আছড়ে এসে পড়াটা কী চক্ষে নেবে, সেটাই চিন্তা। খুব আগ্রহী হৃদয় নিয়ে 'স্বাগত' জানাতে বসবে এমন বাতুল কল্পনা অবশ্য করেনি, তবে ভাবনা হয়েছিলো—মেখলা চাপা বিরক্তিতে 'গুম' হয়ে যাবে না তো? যুধাজিতের সদ্যবিবাহের রঙিন দিনগুলোকে গুমখুন করতে।

টুসকির সেই পাখনা-মেলা প্রজাপতির হাওয়ায় ভাসার মতো মনটি, যেটি বিবাহ-পূর্ব কালটি পর্যন্ত দেখে উৎফুল্ল হচ্ছিলো যুধাজিৎ, সেই মনটি কী আর থাকবে মেখলার? যদি বেজার ভাব দেখায়? মা তো 'ঠাকুরপো' বলতে অজ্ঞান হচ্ছেন, ঠাকুরপোটিও তাঁর "হোলি গডেস" তুল্য 'বউদি'টিকে পেয়ে প্রায় শিশুসলভ আচরণ করছেন, সেটা কী মেখলার কাছে আহ্লাদের হওয়া সম্ভব?

কিন্তু অবাক হয়ে দেখছে যুধাজিৎ, কী জানি যুধাজিতের কোন শুভগ্রহের প্রভাবে, মেখলা তার এই বিদঘুটে খুড়শ্বশুরটিকে রীতিমত ভালোবেসেই বসেছে। যে ভালোবাসার মধ্যে থাকে একটু করুণা-ছোঁওয়া মমতা।

অবশ্য শ্বশুরজনোচিত শ্রদ্ধা-সমীহে দূরত্ব বজায় রাখা ব্যবহার সম্ভব নয় যুধাজিতের খুড়ো 'ডি সরকারের' সঙ্গে। কারণ তাঁর আচার-আচরণ তো প্রায় আধপাগলের মতো!

প্রথম দিনের সেই খেতে বসার দৃশ্যটি? রীতিমত মনে রাখার মতো।

বিয়েবাড়ির গোলমাল মিটে যাওয়ার পর, এবং বহিরাগতদের স্বস্থানে প্রস্থানের পর, সেই দিনই প্রথম বনছায়া গুছিয়ে বসে নিজের দিকে রান্না করেছেন, এবং দেবজিতের পাতে নিজের হেঁশেলের কিছু অবদান পরিবেশন করেছেন।

যুধাজিতের তো মনের মধ্যে একটি মধুর ছবি আঁকা ছিলো এই দিনটির জন্যে। যেদিন বিয়ের হৈ-হুল্লোড় মিটে যাবার পর, বাড়িতে হবে শুধু 'অরিজিন্যাল' তিন মেম্বারের আনন্দময় নতুন জীবনের যাত্রা শুরু। মা ছেলে আর বৌ। যেটি মায়েরও ছিলো এ যাবতের একান্ত স্বপ্ন।

তো সেটি তো ঘটলো না। তৃতীয় জনের মধ্যে চতুর্থ ব্যক্তির প্রবেশ ঘটলো। তা মাকে তাতে বিশেষ ক্ষুণ্ণ হতে দেখলো না দেখে যুধাজিৎই বরং একটু ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলো!

হঠাৎ দেখে কাকা পাতে সাজানো খাদ্যবস্তুগুলোর দিকে তাকিয়েই ডাক দিয়ে উঠলো, 'বউদি। বউদি! এই জিনিসটা কী হচ্ছে?'

বনছায়া সেই 'জিনিসটার' দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হেসে বললেন, কেন? চিনতে পারছো না? তোমার খুব পছন্দের জিনিস তো!

চিনতে পারছি। চিনতে পারছি। বাট নামটা ভুলে যচ্ছি!

উচ্চারণ বেশ আড়ষ্ট আকাট। তবে বাংলাটা বলছে! যদিও বোঝা যাচ্ছে-চেষ্টা করে। এমন

পরিবেশে থেকেছে লোকটা বাংলা শব্দ-টব্দগুলো ভুলে যাবারই কথা! তবু ভোলেনি।

বনছায়া বললেন, পোস্তর বড়া তো! মনে পড়লো না? অত ভালবাসতে?

সঙ্গে সঙ্গে হঠাৎ একটা অভাবিত ব্যাপার ঘটে গেলো। ওই আধবুড়ো লোকটা সহসা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে, নিজের কপালে হাত থাবড়ে বলতে থাকলো, 'রাস্কেল, রাস্কেল!'

কী? কী হলো?

অনেক সান্ত্বনাবাণী আর বিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম হলো!

ডি সরকার নামের পাষণ্ড পামর লোকটা কিনা এই 'দেবী'কে চিনতে পারেনি! একটা এই মমতার সমুদ্রকে অবহেলা করে তার সঙ্গে নিমকহারামের মতো ব্যবহার করে চলে গিয়েছিলো। ওই মমতাময়ী দেবী তথাপি কিনা এই এতো বছর ধরে মনে রেখেছেন, হতভাগা 'ডি সরকার' কী খেতে ভালোবাসতো!

কাকা আজ বলে নয়, চিরকালই নিজেকে 'আমি' না বলে বলতো 'ডি সরকার'। এখনো সেই অভ্যাসটাই রয়েছে দেখা যাচ্ছে। তখন বলতো—

'ডি সরকারের দ্বারা ওটি হবে না।...ডি সরকার যা বলে তা করে ছাড়ে।...ডি সরকারকে তোমরা চেনোনি বাবা!'

সবই দম্ভোক্তি। সেই মানুষের এই আচরণ!

যুধাজিতেরও অবশ্য সেই মুহূর্তে মনটা যথেষ্ট সিক্ত হয়ে গিয়েছিলো। তবে পরে ভেবেছিলো, মাতাল নেশাখোর লোকেদের এমন হয়। নার্ভ দুর্বল হয়ে গিয়ে বেশী আবেগপ্রবণ হয়ে যায়। তা সেটা বোধাহয় ঠিকই। লোকটা ওই কান্নার মধ্যেই ডাক দিচ্ছিলো, 'বউমা! বউমা! দেখে যাও। দেবী, দেবী, মহীয়সী দেবী।'

তো সেই প্রথম দিনের পরও, মাঝে মাঝেই এমন আবেগউচ্ছ্বাস দেখা গেছে লোকটার! হঠাৎ হঠাৎ ডাক পাড়ে 'বউমা। বউমা।'

মেখলা এসে দাঁড়ালে বলে ওঠে, ইস। কী সুইট ডাক। বউমা। ছেলেবেলায় আমার গ্র্যাণ্ডফাদারকে এমন ডাকতে শুনেছি।

মেখলা একটু হেসে বলে, কী বলছিলেন?

বলছি যে—তোমার মাদার-ইন-লয়ের নিকট থেকে এইসব রান্নার রেসিপি শিখে নিচ্ছো তো? এই মোচার ঘন্ট, ধোঁ-ধোঁকার তরকারি, পলতাপাতার বড়া, ডালচাপড়া।

মেখলা হাসে, ওঃ। ওসব খুব শক্ত রান্না।

আহা! ট্রাই করে করে দেখতে হবে। শক্তকে কায়দা করে ফেলতে হবে। এসব হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশান, বুঝলে!

আবার মাঝে মাঝে হঠাৎ হঠাৎ 'ওঃ মাই সুইট গার্ল' বলে প্রায় জড়িয়ে ধরে ডাক দেয়, বউদি। বউদি। আপনার এই 'বউমা'। ভেরি গুড গার্ল। দারুণ ভালো মেয়ে!

বনছায়া হেসে ফেলে বলেন, শুধু 'আমার' বৌমা কেন? তোমারও বৌমা।

দ্যাটস রাইট! দ্যাটস রাইট। আমার দাদার পুত্রের বধূ!

সাজসজ্জা অদ্ভুত, কথাবার্তাও অদ্ভুত। তবে চেহারাটি এখনো পূর্ব গৌরবের আভাস বহন করে। যুধাজিতের বাবার সঙ্গে চেহারার মিলটি খুব বেশী। ভাইয়ের সঙ্গে যতোটা, ছেলেদের সঙ্গে বরং ততোটা ছিলো না তাঁর।

প্রথম দিকে মেখলাকে একসময় বলেছিলো যুধাজিৎ। আমার বাবাকে তো শুধু ফটোতেই দেখছো।

বাবা অনেকটাই কাকার মতো দেখতে! তবে খুব সৌম্য ভাব ছিল।

আর সেই একদিন।

যেদিন ডি সরকার একটু বেশী 'পান' করে ফেলে, তার সেই বিবাহ-বিচ্ছিন্না 'বদমাস' 'শয়তান' স্ত্রীর উদ্দেশে যথেচ্ছ গালাগাল করছিলো, যথেচ্ছ অশালীন ভাষায়।...সেইদিন যুধাজিৎ বলেছিলো, টুসকি! ভেবে দেখছি সত্যিই তোমার ওপর অবিচার করা হচ্ছে। অথচ আগে তো স্বপ্নেও ভাবিনি। এমন একটা পরিস্থিতি হয়ে পড়বে! তোমার পক্ষে এইসব বেহেডপানা সহ্য করা সত্যিই খুব শক্ত বুঝছি। তাই ভাবছি ওঁকে যদি কোনো 'হোমে'-টোমে ট্রান্সফার করতে পারা যায়—'

মেখলা একটু অবাক হয়ে বলেছিলো, কোনো হোমে-টোমে!

মানে এ ছাড়া আর তো কোনো উপায়ও দেখছি না। অবশ্য মার ব্যাপারটাও একটা প্রবলেম! রাজী করানো শক্ত হবে। সেটা ভাবনা।

মেখলা বলেছিলো, তা সেই শক্ত কাজটাতেই হাত দিতে চাইছো কেন?

মানে তোমার কথা ভেবেই। তোমার অসুবিধেটা তো বুঝতে পারছি—

তার মানে—প্রধান প্রবলেম হচ্ছি আমি!

মেখলা স্থিরচোখে একটু দেখে বলেছিলো, আমায় তুমি এতো ছোটোলোক ভাবতে বসলে কেন বল তো? একটা জীবনে বিধ্বস্ত অনুতপ্ত হতভাগ্য মানুষ তোমাদের কাছে আশ্রয় নিতে এসে একটু শান্তির মুখ দেখতে পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেছে, তাকে তুমি ভাগাবার তাল করছো আমার অসুবিধে সুবিধে ভেবে? ছিঃ! আমার কিচ্ছু অসুবিধে হচ্ছে না।

বলছো?

বলছিই তো। তবে আমার ছুতো করে পাপের ভাগী আমায় করে, যদি নিজে ফ্রী হবার মতলবটি এঁটে থাকে, তো আলাদা কথা!

চমৎকার! যা মুখে আসছে বলে নিচ্ছো দেখছি।

বলবোই তো। আমায় ছোটলোক বানিয়ে নিজে ঘাড়ের বোঝা হালকা করার অভিসন্ধিটি আমরা শাশুড়ী বৌতে মিলে ভেস্তে দেবো তা জেনে রেখো।

টুসকি!

ফের। এ বাড়িতে টুসকি চলবে না বলে রেখেছিলাম না?

চলবে। চলবে। একশোবার চলবে।...টুসকি! টুসকি! টুসকি!

এই, এটা কী হচ্ছে? নামিয়ে দাও বলছি! শীগগির নামিয়ে দাও।

মোটেই না। এইভাবে কোলে করে দোলাতে দোলাতে তোমার প্রাণের ফ্রেণ্ড শাশুড়ীর কাছে নিয়ে যাবো।

যাও। দেখি কতো হিম্মত!

তারপর টুসকি গল্প করেছিলো, জানো, কাকা আমার কাছে ওঁর জীবনের কতো যে দুঃখের গল্প করেছেন! বলেছেন, 'জীবনের সেই প্রথম দিকে না বুঝে যে ভুল করে বসেছিলাম, এসব হচ্ছে সেই পাপের শাস্তি।'...আমি অবশ্য বলি ভুল আর পাপ এক নয়।...তো বলেন, 'না না। নিশ্চয় পাপ। না হলে এতো দুর্গতি ঘটে?....আসলে শিশু তো নয়। একটা অ্যাডাল্ট লোক যদি স্বেচ্ছায় স্বর্গ থেকে ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে নরকে পড়ে, তার ভাগ্যে ক্ষমা জুটবে কেন? নরকের রাজা তাকে হাতে পেয়ে আচ্ছা করে গরম তেলে চোবাবে না?'...ওঁর সেই বৌ নাকি একটা বদলোকের সহায়তায় ওঁর সর্বস্ব কেড়ে-টেড়ে নিয়ে মিথ্যে একটা চুরির কেস সাজিয়ে ওঁকে ছমাস জেল খাটিয়েছিলো।...জেল

থেকে ছাড়া পেয়ে ফিরে আসার পর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেয়নি, প্রচণ্ড শীতে ঠাণ্ডায় রাস্তায় বসে থাকতে বাধ্য করেছিলো।....সেই লোকটা নাকী একদিন ইচ্ছা করে ঝগড়া বাধিয়ে কাকার নাকে ঘুষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়েছিলো। আরো অনেক দুঃখের কথা বলেছেন আমার কাছে।

যুধাজিৎ হেসেছে, তাহলে দুনিয়ায় শুধু 'বধূ নির্যাতনই' হয় না। উল্টোটাও হয়, কী বলো?

ক্রমশঃই দেখছে যুধাজিৎ সত্যিই ওই অভাগা, যুধাজিতের ভাষায় 'পাগল ছাগল', লোকটাকে মেখলা বেশ ভালোবেসে ফেলেছে। বন্ধুর মতো গল্প করে। শাশুড়ির সঙ্গে মিলিত চেষ্টায়—খাওয়া-দাওয়ার যত্ন করে। এবং শাশুড়ীর সঙ্গে মজা করে ক্ষেপায় রাগায়...

বলে, 'আপনার এই ঠাকুরপোটি হচ্ছেন একটি 'বুড়ো খোকা'। একটি 'ভ্যাবলা গাবলা'।

এসবের মধ্যেই যেন জীবনের একটা আলাদা রস পেয়ে গেছে মেখলা। নিজেই বলে কোনো সময়, 'কেবলমাত্র 'তুমি আর আমি' এ জীবনটা কী বেশীদিন হালকা থাকে? ক্রমেই ভারী হয়ে ওঠে না? প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠে না?' বলে, 'কেবলমাত্র দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরে থেকে জীবন কাটিয়ে দেবো ভাবতে গেলে নিঃশ্বাস নেওয়া যাবে কোন খোলা জানলা থেকে?....গুরুজনদের ভালোবাসতে পারলে যে আশীর্বাদ জোটে গো তার মূল্য অসীম।...আমাদের বাড়িতে কেবলই দেখেছি বড়দের সঙ্গে একটা বিচ্ছিন্ন ভাব...আর সর্বদাই অসন্তোষ।....তোমাদের এখানে আমি যেন একটা খোলা হাওয়ার স্বাদ পাই।'

অথচ মেখলা নীহারিকার মেয়ে।

আসলে একটি উদার হৃদয়ের ভালোবাসা ওকেও উদার করে তুলেছে। বনছায়াকে দেখে অবাক হয়ে ভাবে মেখলা, মানুষ কতোখানি নির্মল হতে পারে।....যুধাজিৎকে দেখে ভাবে, মানুষ কতোখানি উদার হতে পারে। আর তখনই বুঝতে শিখে যায় সত্যিকার সুখ পাবার এটাই বোধহয় আসল পথ।....

কিন্তু নীহারিকা ঃ

মেয়ের বিয়ের পর হঠাৎ 'কোন চুলো' থেকে ওই এক উনচুটে খুড়শ্বশুর এসে হাজির হওয়ায় রেগে জ্বলে মেয়েকে সুশিক্ষা দিতে এসে, মেয়ের নির্বোধ এক বগগামিতে হতাশ হয়ে এখন প্রায় মেয়ের ওপর বীতশ্রদ্ধই হয়ে উঠেছে।

মেয়েকে নীহারিকা উপদেশ দিয়েছিলো, 'পয়লা রাত্তিরেই বেড়াল কাটতে হয়।' এই বেলা ওই আপদকে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে পড়ে লাগ। না হলে—শেকড় গেড়ে বসে যাবে। আমার মহাপুরুষ জামাইটি আর সে শেকড় উপড়োতে পারবে না।...তায় আবার তার মার 'ঠাকুরপো' বলে যা আদিখ্যেতা। জামাই শ্বশুরবাড়ির দিকে মহাপুরুষ হলে তা নিয়ে ধন্যি ধন্যি। কিন্তু নিজের বাড়ির দিকে তেমনটি হলে ব্যঙ্গার্থে 'মহাপুরুষ'!

তবে নীহারিকার সেই চিরকেলে কপাল। কেউ তো কখনো 'আপন' হলো না। নিজের পেটের ছেলেমেয়েরাও কোনোদিন মাকে 'আপন' ভাবলো না। তা নইলে—মেয়ে কিনা তাঁর হৃদয় উজাড়করা উপদেশবাণীগুলি সব শুনেটুনে বলে উঠলো কিনা, 'তোমার এই প্রচণ্ড বুদ্ধিমতো চলে, তুমি তো চিরদিন হাত-পা আছড়েই মরলে মা। 'একদিনের জন্যেও সুখ পেলাম না' বলে তো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে চিরকাল। আমাদের আর সেই বুদ্ধিতে চালাতে চেষ্টাটা নাই করলে!'

এরপর আর কেউ একদণ্ড সেখানে থাকে?

মেয়ের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে আর অপমানাহতের জ্বালায় জ্বলতে জ্বলতে চলে এসেছিলো নীহারিকা জামাইবাড়ি থেকে।

কিন্তু নীহারিকা নামের মেয়েটা যে নিজের ভাগ্যের দোষ দেয়, সেটা কী অকারণ ? ভাগ্য তাকে পদে পদে লাঞ্ছিত করে আসেনি ? নীহারিকার দু-দুটো ছেলে বড় হয়ে উঠে কোথায় মায়ের পৃষ্ঠবল হয়ে উঠবে, তা নয় বড় হয়ে দুটোই হাতছাড়া হয়ে গেলো। একটাকে ভূতে ধরলো, অন্যটাকে 'পেতনী'তে !...দুটোর কোনটায় লোকের কাছে মুখোজ্জ্বল ? এ তো আর সেকাল নয় যে, ছেলে 'স্বদেশী করে' বলায় একটা গৌরব থাকবে। 'ছেলে পার্টি করে' শুনলে লোকে নাক বাঁকায়।....আর অন্য ছেলেটা ! একটা বড়লোকের আহ্লাদী মেয়েকে বিয়ে করে ঘরজামাই হয়ে গিয়ে বাড়িঘর মা বাপ আত্মজন ছেড়ে শ্বশুরবাড়ি পড়ে আছে শুনলে ? সে কথা না তোলাই ভালো। অথচ শিলাদিত্যের উপায় কী ? তাঁদের তো একটা মাত্রই সন্তান। সর্বস্বের উত্তরাধিকারিণী।....প্রেমে পড়ে গুবলেট করে বসলো বলেই না একটা গেরস্থ ঘরের বেকার ছেলেকে জামাই করতে বাধ্য হয়েছে ভদ্রলোক।

তারপর কী নীহারিকার ভাগ্যে ?

না, স্বামী বয়েস থাকতে পঙ্গু হয়ে বিছানা নিয়ে বসে আছেন, আর তিয়াত্তর বছরের শ্বশুর সুটেড্-বুটেড্ হয়ে কোর্ট কাছারি গিয়ে উপার্জন করে সংসারকে দাঁড় করিয়ে রেখেছেন। এর থেকে লজ্জার আর কী আছে ?

আর শেষ পর্যন্ত ? শেষ পর্যন্ত কিনা এই ? মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা।

বোকাহাবা নয়নতারা চিরদিন সংসারে 'ভালোমানুষ' সেজে বসে থেকে নীহারিকাকে টেক্কা দিয়ে চলে গেলেন ! শুধু তাই নয় চলে গেলেন, নীহারিকাকে 'দুয়ো' দিয়ে পাঁচ মিনিটের বুক ধড়ফড়ানিতে। একফোঁটা ওষুধ পর্যন্ত না খেয়ে।

অথচ সারাজীবন কতো বুক ধড়ফড়ই করেছে নীহারিকার।

এতেও যদি নীহারিকা আপন ভাগ্যকে ধিক্কার না দেয়, কিসে দেবে ?

সত্যি ড্যাংডেঙিয়েই চলে গেলেন নয়নতারা। সকালবেলা চায়ের পেয়ালাটা হাতে তুলে নিয়েই হঠাৎ বলে উঠলেন, 'বুকের মদ্যে কেমন হাঁচোটে-পাঁচোট করে উঠলো ক্যান '....অ বৌমা, তোমার শ্বশুররে একবার কও তো আজ আর কোর্টে যাওয়া না করতে।

নীহারিকা বললো, কী আশ্চর্য ! কোর্টে যেতে বারণ করবো ? এইটুকুর জন্যে ? রাতের খাওয়াটা হয়তো হজম হয়নি, উইণ্ড হয়েছে। একটা টাইকো সোডা ট্যাবলেট খেয়ে ফেলুন।

রাকো বৌমা তমার টাইকো। শ্বশুরকে কও—'অক্ষণি চানের ঘরে না সেঁদোতে '....আর খোকারে একবার ধরে ধরে এখানে নে এসো মা। ভেতরডা ভালো বুজচি না '

ব্যস।

সেই 'ভালো না বোঝাটাই' নয়নতারা গাঙ্গুলী নামের মানুষটার জীবনের ওপর বিদারণ রেখে টেনে দিলো। এপার থেকে ওপারে নিয়ে গিয়ে ফেললো। শুধু জীবন ছেড়ে দিয়ে যাওয়া দেহটার ঠোঁট দুটো একটুক্ষণ নড়লো। শব্দহীন নড়া।

কে জানে ইষ্টনাম উচ্চারণের চেষ্টা করলো সেই ঠোঁট, না কী কাউকে কিছু বলতে চেষ্টা করছিলো ?

চোখ দুটো একবারের জন্যে ঈষৎ বিস্ফারিত হয়ে এদিক ওদিক ঘুরলো ! সত্যব্রত বলে উঠলেন, 'কী ? ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছো তাহলে ?.....আচ্ছা ! গিয়ে আমার জন্যে একটু জায়গা ঠিক করে রেখো !'

তারপর আর কী ?

এরকম অকস্মাৎ মৃত্যুতে যেমন যা হবার, তাই হলো ! তবে এ তো আর হাহাকারের শোক নয়, স্তব্ধতার পাথর বুকে চাপানো শোক !

টেলিফোনে খবর পেয়ে সন্ধ্যাতারা কাঁদতে কাঁদতে আর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে একবার

আছড়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠেছিলো বটে, 'মা গো ! কিছু না বলে চলে গেলে ?'......পরক্ষণেই থেমে গেলো।

সত্যব্রত মেয়ের মাথায় একটা হাত রেখে আস্তে বললেন, যা বলেছিলো তাই করলো দেখলি ? বলেছিলো—'কাউকে ভোগাবো না ! সিঁথেয় সিঁদুর নিয়ে যাবো !' কথাটি ঠিক ঠিক রাখলো।

আদিত্যও অবশ্য প্রথমটা হাউহাউ করে কেঁদে উঠেছিলো। ধরে ধরে আনতে হয়নি, নিজেই এসেছিলো এখানে। দোতলার এই দালানেই তো শোয়ানো হয়েছিলো নয়নতারাকে চায়ের টেবিলের পাশেই।

আদিত্য নিজের বুকের ওপর ধাঁই ধাঁই কিল বসাতে বসাতে বলেছিলো, 'ঠিক হয়েছে। উচিত হয়েছে। যেমন ব্যাভার করে এসেছি, তার উপযুক্ত হয়েছে। একটা কথাও না বলে চলে যাওয়া হলো। এককোঁটা জলও খাওয়া হলো না এই পাষণ্ডটার হাতে।'

বাপ্পা এসে টেনে তুলে গভীর গম্ভীর মৃদু একটু ধমক দিলো, আঃ বাবা ! কী ছেলেমানুষী হচ্ছে ? থামুন।

অতএব থেমে পড়তে হলো !

ভাগ্যিস এ সময় বাপ্পা আর বাপ্পার খিদমদগারিটি ছিলো বাড়িতে। বাপ্পা তো ধুয়ো তুলেছিলো, 'এবার যাই'.....আর তারক বলেছিলো, 'তার আগে তারককে একবার তার দেশ গাঁ-টা ঘুরে আসতে হবে। মায়ের কাছে বাক্যিদত্ত।'

ওই বলাবলিটাই চলছিলো। থেকেও গিয়েছে এখনো পর্যন্ত।

নীহারিকা মনে মনে বলেছে, থাকবেই তো। ভাগ্যবতীর ভাগ্য তো ! সবটি ঠিকঠাক হবে !

তা হলোও। বাপ্পার আর তারকের উপস্থিতি এবং টেলিফোনের দৌলতে 'হলো না' এমন কিছু রইলো না।

টুসকি এলো বরকে শাশুড়ীকে সঙ্গে নিয়ে। 'ঘরজামাই' হয়ে শ্বশুরবাড়িতে পড়ে থাকা নির্লজ্জ ছেলেটাও এলো। এলেন নীলুমামা। এমন কী নয়নতারার হাঁপানী রুগী যে জামাই সাতজন্মে আসতে পারে না, সেও চলে এলো ! এলো পাড়াপড়শী, 'এ, ও, সে', লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো বাড়ি। সবাই বলতে লাগলো, 'এমন মানুষ হয় না।'.....বলতে লাগলো 'কী সৌভাগ্যবতী !'

নয়নতারার মেয়ে-জামাই তো আসবেই।

এলো পর্যন্ত পাপিয়া ?

হ্যাঁ, সেও এসে পড়েছিলো বৈকি !

নয়নতারার ভাগ্যের আর এক পরাকাষ্ঠা—সময়টা ছিলো সকাল। যে যেখানে থাকুক, বাড়িতেই উপস্থিত ছিলো।

চওড়া লালপাড় গরদের শাড়ি পরে সিঁথিতে চওড়া করে সিঁদুর লেপে পায়ে আলতা দিয়ে ফুলের মালা গলায় দিয়ে রাজরাজেশ্বরীর মতো চলে গেলেন নয়নতারা।

অদ্ভুত একটা ঈর্ষার দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলো নীহারিকা।

আর তখনি হঠাৎ মনে এলো, ওই মানুষটাকে চিরদিন কেন হিংসে করে এসেছি আমি ? কী জন্যে ? আমি কী গোড়া থেকেই জানতাম মানুষটা এইভাবে আমায় দুয়ো দিয়ে চলে যাবে ?....মনে মনে তো ভেবে রেখেছিলাম, একদিন আমার হাতে পড়তেই হবে। ওঁর প্রতি সত্যব্রত নামের মানুষটার নিবিড় গভীর ভালোবাসাটাই কী ঈর্ষান্বিত করেছে নীহারিকাকে ? সত্যব্রতর ছেলের মধ্যে সেই ঐশ্বর্য

নেই বলে ?

কথা উঠলো মুখাগ্নিটা করবে কে ? যথার্থ অধিকারীর যখন সামর্থ নেই !

সেটা যখন নেই, তার প্রতিনিধি হিসেবে তার জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকেই যেতে হবে।

বাপ্পা বলে উঠলো, আমি এসব মানি না। শিলু তো রয়েছে।

কিন্তু শাস্ত্র পুঁথির র‍্যালা তো অনেক। শিলাদিত্য নাকি থেকেও নেই ! তার অর্ধাঙ্গিনীর গর্ভে এখন গাঙ্গুলী বাড়ির ভাবী বংশধর উঁকি দিয়েছে। অতএব নাকি শিলাদিত্য বাতিল। এটাই শাস্তর।

বাপ্পা বললো, আশ্চর্য ! এর কোনো মানে হয় ?

মেখলা বললো, এই যাবতীয় নিয়মনীতির যদি মানে হয় ; ওটারও মানে হয়।

বামুন-টামুন দিয়ে হয় না ?

মেখলা রেগে উঠে বলে, কী যে বলিস দাদা। ছিঃ !

শিলাদিত্যর অনুপযুক্ততার কারণের কথাটা উঠতেই সে লজ্জা পেয়ে সরে পড়েছিলো। সামনে ছিলো শুধু এই মেয়ে দুটো ! সন্ধ্যাতারা তো চোখের জল মুছতে মুছতে মার কপালে চন্দন পরাচ্ছে।

বাপ্পার মুখ অবশ্যই কান্নাচাপা থমথমে। তাছাড়া—ওই চন্দন-পরা মুখটাকে 'আগুন ধরানো' ভাবতেই শিউরে উঠছে সে ! তার ভাগ্যে এ কী শাস্তি।.....মনে পড়ে যাচ্ছে ছেলেবেলার ছবিগুলো।....মনে পড়ে যাচ্ছে কী এক মূঢ় নেশায় সে এই স্নেহনীড় থেকে নিজেকে খসিয়ে নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে।.....তার জন্যে যে এই কঠিন কাজটা বরাদ্দ হলো, সেটা কী তার প্রায়শ্চিত্ত ?......তবু থমথমে গলায় বললো, 'বললাম তো আমি এসব মিথ্যে ব্যাপারগুলো মানি না !'

পাপিয়া একটু এগিয়ে এসে বললো, জানি ! হয়তো আমরা কেউই মানি না। কিন্তু দিদিকে তো মানেন ?.....তাঁর কাছে তো এসব 'সত্য' ছিলো ? আপনি রাজী না হলে শেষ অবধি দাদুকে দিয়েই এই কঠিন কাজটা করাতে হবে। এইসবই নিয়মনীতি !'

বাপ্পা চোখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে চাপাস্বরে উচ্চারণ করলো, 'ঠিক আছে।'

কিছুক্ষণ বাদে, যখন আদিত্য ব্যতীত বাড়িতে উপস্থিত সমস্ত পুরুষমানুষরাই নয়নতারার শোভাযাত্রার সামিল হয়ে বেরিয়ে গেছে, বাড়ি সুনসান, পাপিয়া বলে উঠলো, দাদুকে দেখে এতো কষ্ট লাগছে ! বেচারী ! হঠাৎ একসময় খুব আস্তে বলতে শুনলাম 'চুয়ান্ন বছরের সঙ্গী' ! বাপ্পাদা যা একগুঁয়েমি করছিলো ! আমার তো ভয়ই হচ্ছিলো, সত্যিই না বুড়ো মানুষটাকে ওই ভীষণ কাজটা করতে হয়। আমাদের 'শাস্তর' তো ছেলেবুড়ো কাউকে মায়া করে রেয়াৎ করে না ! বাপ্পাদা যখন বললো, 'ঠিক আছে', যেন বাঁচলাম।

মেখলা এতো দুঃখের সময়ও মুখে একটু হাসির আভাস এনে বললো, আমিও মনে মনে বললাম, 'বাঁচলাম ! ঠিক আছে'।

পাপিয়া একটু তাকিয়ে বললো, তার মানে ?

মানেটা ভাব বসে বসে।

পাবনার গাঙ্গুলী বাড়ির 'বড়বৌয়ে'র শ্রাদ্ধশান্তি যথোপযুক্ত সমারোহেই হলো।.....কর্ণধার হিসেবে বাড়ির নাতজামাইটি হাল ধরলো শক্ত হাতে। এলেন চিরকেলে হাল ধরতে নীলুমামা। আর কী আশ্চর্য রকমের যে ভাব হয়ে গেলো 'ভাগ্নেজামাইয়ের' সঙ্গে 'শ্বশুর মামুর'। কারুকে কিছু দেখতেই হলো না।

সবকিছু মিটে যাবার পর তারক বললো, যাই। একবার দেশ-গাঁটা ঘুরে আসি। মা বুড়িকে কথা

দিয়েছিলুম। এর পর আর কী কেউ বড়দাবাবুকে ঠেকাতে পারবে? পায়ের চাকা নেচে উঠবে?

টুসকি বললো, ছাড় তো। আবার কে নাচাতে দিচ্ছে?

বাপ্পা বললো, দিচ্ছে না মানে? এবার তো বেরিয়ে পড়ছিই!

টুসকি ধীর শান্ত গলায় বলে, বেরিয়ে পড়তেই হবে? তার মানে—দাদুকে আবারও শামলা এঁটে কোর্টে উঠতে হবে তাঁর অসমর্থ ছেলেটার সংসারটি প্রতিপালন করতে।

বাপ্পা একটু থতমত খেলো।

তারপর আবছা গলায় বললো, তা ইয়ে—আমি কী করবো?

তুই কী করবি? বলতে মুখে একটু আটকালো না দাদা? তুই এ বাড়ির বড়ছেলে নয়? একটা শিক্ষিত জোয়ান ছেলে নয়? তোর কোনো দায়িত্ববোধ নেই? 'শিক্ষিত' শব্দটা থাক, ওর মানে খুঁজে পাওয়া ভার। তো বিদ্যেসাধ্যি তো আছে কিছু? তা সেটাও যদি নাই থাকতো? তাতেও দায়িত্ব কমতো না। মুখ্যুরা মোট বয়েও সংসার চালায়। বিয়ে না করলেই ভাবতে হবে, আমার আবার কিসের দায়? 'আমি আমার নিজস্ব। মুক্তজীব।' পরিবারের ওপর কোনো দায়-দায়িত্ব নেই? মা-বাবার ওপর অন্ততঃ। শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলাম দাদা, তুই দিব্যি মনে মনে ভেঁজে রেখেছিস, ঝামেলা-টামেলা তো সব মিটলো এবার। এখন আমি কেটে পড়তে পারি।

বাপ্পা যেন আর আগের মতো অন্যকে অবজ্ঞা দেখিয়ে নস্যাৎ করে দিতে জোর খুঁজে পায় না মনের মধ্যে। তাই নির্বোধের সুরে বলে, বলে নে যা পারিস। তবে একটা মানুষ যে কেন নিজের জীবনটাকে নিজের মতো করে পাবে না, তাও বুঝতে পারি না।

টুসকি বললো, নিজেকে 'মানুষ' ভাবলে অবশ্যই বুঝতে চেষ্টা করতিস কেন পাবে না। তবে নিজেকে 'অমানুষ' ভাবলে আলাদা কথা।

এ বাড়িতে তো আরো একটা ছেলে আছে বাবা!

তাকে তুই মানুষের দরে ফেলছিস? তাহলে আর তোকেও কিছু বলার নেই। যা নিজের জীবন নিয়ে ভেগে পড়। গাঙ্গুলী বুড়োর ভাগ্যে যা হয় হোক।

ভেবে ভেবে দেখে বুঝেছি দাদা, একসময় 'সর্বহারা' কোম্পানীর যে আদর্শের মশালের পিছনে আত্মহারা হয়ে ছুটে গিয়েছিলি, টের পেয়ে গেছিস সে মশাল নিভে গেছে। আছে শুধু পলতে-পোড়া গন্ধটা। তবু সেদিক থেকে পিছিয়ে আসতে পারছিস না আত্ম অহমিকায়। নিজেকে 'পলাতক সৈনিক' ভেবে লজ্জা আসছে। ভেবে দেখছিস না আসলে 'যুদ্ধ'টাই ছিলো একটা বিরাট ফাঁকিবাজী।.....যারা নেহাৎ তোর মতোই খাঁটি, তারা আজ হতাশায় ভুগছে, হয়তো যন্ত্রণাও পাচ্ছে। তবু ওই 'মান খাটো' হবার ভয়ে—নিরুপায় হয়ে অন্যায়ের সঙ্গে, নীচতা ক্ষুদ্রতার সঙ্গে আপোস করে জীবনের ভুলের ঋণ শোধ করে চলেছে।

বাপ্পা এখন তার অভ্যস্ত ব্যঙ্গের গলায় বলে, তোর এতো দিব্যজ্ঞান এলো কোথা থেকে তাই ভাবছি।

কোথা থেকে? সেটা আমিও ভেবেছি। আর ভেবে দেখে বুঝেছি তোদের আদর্শচ্যুত নেতাদের চোখের চামড়াহীন নির্লজ্জতা দেখে। অবিরত চামড়াহীন চোখগুলো চোখে কাঁটা ফুটিয়ে ফুটিয়েই চোখ ফুটিয়ে বসেছে। যাক, আমার এখন এক ভাবনা, আর বেশীদিন তো থাকা চলবে না, শ্বশুরবাড়ির ডিউটিটি তো দিতে যেতে হবে। তুই 'লম্বা' দিলে এই বাড়িখানায় থাকবে—শুধু মা-বাবা আর দাদু। কিন্তু দাদু কী আর সেই দাদু আছে রে? চুয়ান্ন বছরের জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে ফেলে, যেন নিজেকেও হারিয়ে ফেলেছে।

চিরকালের দাপুটে তারকের মা দাপটের গলায় ছেলেকে বলে, আমার হয়েছিলো মূলেই ভুল। তোকে একটা বেইমান ছেলের চরণে উচ্ছুগ্যু করে রেখে নিচ্চিন্দি থেকেছি, খেয়াল করিনি তুইও একখান বেইমান হয়ে উঠছিস।

তারক রেগে বলে, বেইমান মানে?

মানে আবার কী? মা-বাপের আশায় ছাই দেওয়া মানেই বেইমানী।

তারক ব্যঙ্গের গলায় বলে, তা তোমার আর এই হতোভাগা তারকের বেইমানীতে কী এসে যাচ্ছে? মহারানীর তাঁবেদারীর চাকরিটির দৌলতে তো দিব্যি রাজার হালে আছে। রাতদিন ধোপকাপড়, সাবান পাউডার, গন্ধতেল, গিন্নীর রান্নাঘরের ভালোমন্দটি খাওয়া! তুলোর গদি, নাইলন মশারি। তারকের চোদ্দ পুরুষেরর সাধ্যি ছিলো এতো সুখ ঐশ্বর্য দেওয়া!

তারকের মা একটি গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বলে, যা সব বল্লোনা করলি তারোক, তা সবই ঠিক, তবে ওসব সুখ-ঐশ্বযিতে যেন আর আহ্লাদ নাই রে। চব্বিশ ঘণ্টা হৈ-হুল্লোড়, চব্বিশ ঘণ্টা দহরম-মহরম। কাজও নাই—কামাইও নাই। তো সেই সব কাজ কী আমার 'নিজস্ব' বলে কিছু? মাজেমদ্যে কেবলই মনে আসে, এর থেকে গাঁয়ে ঘরে শোউরের ভিটেয় একখানা মাটির ঘর তুলে খুদের ভাত খেয়ে পড়ে থাকতে বুজি সুখের ছেলো।...মেটে দাওয়ায় দুদণ্ড পা ছড়িয়ে বসে খুঁজে বার করতুম আগের 'আমিটা' কেমন ছেলো।

উরেব্বাস! এ যে একেবারে বই-কেতাবের কতা গো মা! কেমন আর ছেলো! হাড়-দুঃখী হা-অন্ন। নইলে আর গাঁ ছেড়ে কি খাটতে বেরোতে হয়?

জানি সব। মানিও সব। তবু যেন মন বলে, দেশেঘরে বুজি শান্তি স্থিরতা আছে।

কচু আছে; ঘোড়ার ডিম আছে। তোমার ওসব স্বপনো ছবি তোমার মনের মধ্যেই আছে। ধান্দাবাজে ভরে গেছে রাজ্যিটা। গাঁ-ঘরেই বেশী গো মা। মেয়েপুরুষে ধান্দাবাজ। 'শান্তি' স্বস্তি কতাগুলো কোথাও আর নাই।

তারকের মা হতাশ সুরে বলে, পিরথিবিটাই যেন পচে গেছে রে তারক! আমাদের জীবদ্দশায় আর ভালো হবার আশা নেই।

সন্ধ্যাতারার জীবনের ওপর দিয়ে এতো কাণ্ড ঘটে গেলো, অথচ সন্ধ্যাতারার একমাত্র ছেলেটার কোনো পাত্তাই নেই। কেন নেই সেটাই আশ্চর্য। নিরুদ্দেশ তো হয়ে যায়নি, এ, ও, সে-র কাছে প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় 'অমুক জায়গায় দেখলাম খোকনকে।....অমুক জায়গায় দেখা হলো তোমার খোকার সঙ্গে!'

সন্ধ্যাতারা কাতর হয়ে বলে, একবার জিগ্যেস কর না তাকে কেন এমন করে আমাদের ত্যাগ করলো?

সে আর কী জিগ্যেস করবো অমন রাস্তার মধ্যে?

ঠিকানাটাও তো একটু জেনে নিতে হয়!

সে জানতে চেষ্টা করে দেখেছি, সদুত্তর দেয় না!

আবার যদি দেখা হয় বোলো, একটি বারের জন্যে যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।

তা একই লোকের সঙ্গেই যে বারে বারে দেখা হয় এমন তো নয়। তাই সন্ধ্যাতারার শুধু নির্জনে রোদন।....আসল কষ্ট হচ্ছে আসল লোকের অনমনীয়তা। স্বামী বলে,অমন ছেলের মুখদর্শন করতে চাই না। খুঁজে আনবার চেষ্টা করতে আমার ভারী গরজ পড়েছে। 'দাদুভাই দাদুভাই' করে হেদিয়ে হেদিয়ে শকটা ত্বরান্বিত হয়ে গেলো বাবার, সেই কুলাঙ্গার ছেলের আর নাম করবো

আমি ? তুমি কী ভাবো এসব খবর সে পায়নি ? এক শহরে বসবাস, যখন তখন চেনা জনের সঙ্গে দেখা হয় !

অবশ্য সন্ধ্যাতারার স্বামী যদি তার বাবার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করার দায়ে সন্ধ্যাতারার ছেলেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, সেটা একটু বেশীই হয়। মৃত্যুপথযাত্রী হয়েও দীর্ঘদিন টিঁকে ছিলেন বেলেঘাটার মুখার্জিবাড়ির কর্তা শুভ্রাঙ্ক মুখার্জি।.....যাই যাই করেও যেন যাচ্ছিলেন না ! 'দাদুভাইয়ের কোনো খবর পেলিনা ? এটি তাঁর মুখের নিত্যবুলি হলেও, সেই বুলিটা ছিলো যেন অভ্যস্ত একটি নিত্য নিয়মের মতো। অনুভূতির ধার কমে গিয়ে ক্রমশঃই ভোঁতা হয়ে আসছিলো।.....সর্বক্ষণের বাক্যিই ছিলো শুধু 'বড়বৌমা' 'বড়বৌমা' !.....

বড়বৌমা ছাড়া আর কারুর সেবা পছন্দ হয় না। অন্য বৌদির কেউ কিছু করতে এলেই বলে উঠতেন, তুমি কেন ? বড়বৌমা কোথায় ?

লোকটা যে বার্ধক্য আর ব্যাধির ভারে অবোধ হয়ে গেছে, কোনটা বলা উচিত, আর কোনটা অনুচিত সে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে, একথা কেউ ভেবে দেখে না। 'বড়বৌমা' কই ? শুনলেই অন্য বৌমা ছিটকে চলে গিয়ে দেওয়ালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'কেনই বা আমাদের যাওয়া। শুধু ধাষ্টামো !'

অর্থাৎ 'বোধে'র জানলা দরজা খোলা কারুরই নেই।

সন্ধ্যাতারার কপাল ! শুভ্রাঙ্ক মুখুয্যের যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, প্রায় গোনা দিনের পর্যায়ে পড়ে গেছে, তখন কিনা নয়নতারা গাঙ্গুলী বিনা নোটিশে জবাব দিয়ে বসলেন।

নিরুপায় সন্ধ্যাতারাকে তার 'বড়বৌমাত্বর' খোলস থেকে বেরিয়ে গিয়ে 'টুনি' হয়ে আছড়ে পড়তে হলো সেখানে।

এবং নিতান্ত নিরুপায়তাতেই থাকতেও হলো ক'দিন।...ফিরে এলো অবশ্য নয়নতারার শ্রাদ্ধশান্তি মেটার পরদিনই।....

সদ্য বিপত্নীক বৃদ্ধ সত্যব্রত একবার শুধু বলেছিলেন, 'তাঁর তো আরো দু-তিনটি পুত্রবধূ রয়েছে—'

সন্ধ্যাতারা করুণ বচনে বলেছিলো, 'তারা কেউ তেমন পারে না বাবা।'

তবে আর কী করা ? তবে বেশী 'পারাটাও' নিজের পক্ষে একটা অসুবিধের রে টুনি।

তবু চলে এসেছিলো টুনি।

কিন্তু তেল ফুরলে প্রদীপ আর কতোক্ষণ জ্বলে ? গোটা কয়েকদিন পরেই নিভলো। তাও সলতে পুড়ে পুড়েও দুদিন জ্বলেছে ক্ষীণভাবে। একটা শ্রাদ্ধবাড়ি থেকে ফিরে আর একটা শ্রাদ্ধকার্যের আয়োজনে লাগতে হলো বেচারী সন্ধ্যাতারাকে ; আর তাই সন্ধ্যাতারা এই মৃত্যুর জন্য মনে মনে নিজেকেই দায়ী করে বসেছে। ভেবেছে আমি চলে না গেলে বাবা এক্ষুণি চলে যেতেন না।

মায়ের মৃতদেহের পায়ে মাথা খুঁড়ে সন্ধ্যাতারা কেঁদে বলেছিলো, 'নিজের সংসার ফেলে দুটো দিনও তোমার কাছে থাকতে পারিনি বলে অভিমান করে একটি কথা না বলে চলে গেলে মা ?'

আবার এখানেও একটি মৃতদেহের পায়ের কাছে মাথা রেখে ডুকরে উঠে বলেছিলো, 'আপনাকে ফেলে রেখে চলে গিয়েছিলাম বলে, অভিমান করে চলে গেলেন বাবা !'

তার নিজের যে কোথাও কোনো অভিমানের দাবি থাকতে পারে একথা কোনোদিন ভাবতে

শেখেনি সন্ধ্যাতারা নামের নির্বোধ মেয়েটা।.... এক একটা নির্বোধ এই রকমই হয়। দাবিহীন মন নিয়ে জন্মায়, আর সকল অঘটনেই নিজেকে অপরাধী ভেবে যন্ত্রণা পায়।

সন্ধ্যাতারার স্বামী তার বাবার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করে আনবার দায়ে সন্ধ্যাতারার ছেলেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে, সন্ধ্যাতারা সেই দায় নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়ে নিজেই নিজেকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে রেখেছে।..... খেয়াল করে না, তার এই অহেতুক অপরাধবোধ সংসারের অন্য সদস্যদের পক্ষে অপমানজনক।

'আমি চলে না গেলে বাবা এক্ষুণি চলে যেতেন না—' এই বিষণ্ণ উক্তিটিই অন্যদের মনে জ্বালা ধরিয়েছে।

কেউ বলেছে, 'ওঃ, আমরা ওনার শ্বশুরঠাকুরকে অনাহারে ফেলে রেখে মেরে ফেলেছি!'.... কেউ বলেছে, 'আহা, আমাদের অবেহেলাতেই এই অকালমৃত্যু।'..... আর কেউ খুব সংক্ষেপে বলেছে, 'আদিখ্যেতা।'

কালের আবর্তনে কীভাবে যে মনের পরিবর্তন হয়ে চলে! একদার শ্রদ্ধা সমীহ ভালোবাসা ক্রমশঃই যেন শুকিয়ে এসেছে। কারণ তাদের ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে উঠেছে। তারা নিজ নিজ মা-বাপের এই অহেতুক দাস্য মনোভাব দেখে দেখে বেজার হয়েছে, মা-বাপের জ্ঞানচক্ষু ফোটাতে চেষ্টা করে চলেছে। অকারণ এমন দাস্য মনোভাবে থাকার মানেটা কী? তাছাড়া ছেলেমেয়েরা না কী সহপাঠীদের কাছে লজ্জা পায় 'ভেড়ার গোয়ালে' পড়ে থাকার জন্যে। বন্ধুরা অবাক হয়ে বলে, এক বাড়িতে চার গিন্নী! ভাবাই যায় না। তার ওপর আবার গিন্নীদের শ্বশুর। কী করে থাকিস রে? স্রেফ মধ্যযুগীয় প্যাটার্ন।

অতএব গিন্নীদের কিশোর-কিশোরী কী সদ্য তরুণ পুত্রকন্যারা সর্বদা সবকিছুতেই 'সেকেলে' আর 'বাজে' দেখতে থাকে, এবং সংসারে এক-নায়কত্বর বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে থাকে। যে লোকটার বয়েসের গাছপাথর নেই, বিছানায় শুয়ে জীবন কাটাচ্ছে, কতোদিন ধরে তার নির্দেশে সংসার চলবে? তিনি এখনো নির্দেশ দেবেন আত্মীয়জনের বিয়ে-টিয়ে উপলক্ষে কোন বাড়িতে কোন ওজনের লৌকিকতা দেওয়া হবে, বাড়িতে কাউকে নেমন্তন্ন করা হলে কী রকম মেনু হবে। আর বাড়ির কে কখন কী কারণে কোথায় যাচ্ছে আসছে, তাঁর কাছে হিসেব পেশ করতে হবে।

তা তিনি কী নিজে এসব দাবি করেছেন কখনো?

তা বলা চলে না। তাঁর প্রাণতুল্য বড়বৌমাই সেধে সেধে তাঁর কাছে বসে সরল খবর পেশ করার কাজটি দখল করে রেখেছেন এযাবৎ।

তার মানে সকলের থেকে উঁচিয়ে 'সুয়ো' হওয়া।

ছোটরা এইটি ধরে ফেলেই ক্রমশঃ ওরা আড়ালে আড়ালে, বড়মার সমালোচনায় মুখর হয়েছে। বড়মার যে সমস্ত ভালোমানুষিই অভিনয়, তা বুঝে ফেলে ক্রমশঃই তাঁর প্রতিটি ব্যাপারে তির্যক দৃষ্টি হেনে ভিতরের অর্থ আবিষ্কার করতে চেষ্টা করতে শুরু করেছে।

আসলে বিদ্বেষ জিনিসটা এমন যে, একবার শুরু হলে রোগজীবাণুর মতো বাড়তেই থাকে।... ইস, আমরা কী বোকা ছিলাম তাই ওঁর ছদ্মবেশটি ধরতে পারিনি এতোদিন।.... দাদুর কাছে সবসময় বসে বসে গুজগুজ করার সপক্ষে থাকাই কী?....আহা! এই মানুষটিই তো এই সংসারখানাকে পেতেছিলেন, আর একদা কতো শক্তিসামর্থ্যের সঙ্গে সবকিছু নিজে করেছেন!..... এখন অনড় হয়ে বসে আছেন, কিন্তু সংসারে কী হচ্ছে না হচ্ছে জানতে ইচ্ছে হয় তো! জানবার জন্যে হাঁ করে থাকেন, আর আমাকে দেখলেই জিগ্যেস করেন, 'বৌমা, কে এসেছে? তখন কে এসেছিলো? কে টেলিফোন

করেছিলো ?....তাই সে সব বলে বলে বোঝাই। আর কার ওঁর সঙ্গে কথা বলবার সময় আছে বল ?'.....এরা বলে—সময় থাকলেই বা কার দায়ে পড়েছে ? বুড়ো হয়েছে বুড়োর মতো থাকো। সব খোঁজার দরকারটা কী ? দরজায় বেলটা বাজলো কী ডাকাডাকি, নতুন গলা পাচ্ছি মনে হচ্ছে। কে এলো রে ? তোমার কাছে দরকার থাকলে তোমার কাছে আসবে।.....তা নয়, বৌমা তক্ষুণি চললেন, 'কে এলো' তার বাবাকে জানাতে।

পলিটিকস। বুঝলি সব পলিটিকস। দাদুকে 'হাত করে' রাখার ফন্দী।

এই প্রজন্মের এই কটা ছেলেমেয়ে তাদের বোকা হাবা বাবা-মায়ের থেকে অনেক চালাক-চতুর হয়ে উঠে ধরে ফেলছে—সন্ধ্যাতারা নামের মহিলাটি 'বোকা' 'সরল' ভঙ্গীর আড়ালে কী পরিমাণ পলিটিসিয়ান।

ক্রমশঃ তাদের মায়েরা এবং ক্রমশঃ বাবারাও বুঝতে পেরে যাচ্ছে।.....বেশীটা ধরা পড়লো বৃদ্ধ গৃহকর্তার মৃত্যুকালীন পরিবেশে। সন্ধ্যাতারা কেঁদে কেঁদে যে নিজের ত্রুটি অপরাধ স্বীকার করে বলতে লাগলেন, 'তিনি চলে না গেলে, এই মৃত্যু ঘটনাটি ঘটত না', এটি অন্য সকলের পক্ষে কম অপমানকর ?

সেই অপমানের একটা জ্বালা নেই ? সে জ্বালার প্রতিক্রিয়া নেই ?

সন্ধ্যাতারার ছেলের অপরাধ অথবা সন্ধ্যাতারার নিজেরই অপরাধ যদি গৃহস্বামীর মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করেছে তো সেই মৃত্যু এবং তার প্রাসঙ্গিক ঘটনাসমূহ ত্বরান্বিত করে ফেলেছে বেলেঘাটার মুখুয্যেবাড়ির মজবুত বনেদে ফাটল ধরাতে।

একদা সেই একটা ছেলে যে অবাক হয়ে বলে উঠেছিলো, যে বাড়ির লোকেরা নেহাৎ একটা পথচলতি লোক চা না খেয়ে দরজা থেকে ফিরে গেলে মনে দুঃখ পায়, সেই বাড়িটা একবার দেখতে হবে আমায়।....সেটা কতোদিন আগে ?.....খুব অনেক অনেক আগে কী ?

তা হয়তো নয়।

তবু হয়তো এইরকমই হয়। নদীর পাড়ে একবার ভাঙন ধরতে শুরু করলে, অবিরতই প্রত্যক্ষে অলক্ষ্যে ক্ষয় চলতেই থাকে।.....ছেলেমেয়েগুলো নিমিত্ত মাত্র। ভিতরে ভিতরে অসন্তোষের ক্ষয় শুরু হয়েছিলো হয়তো অনেক দিন থেকেই। সংসারে প্রাধান্য কার-না কাম্য ? কে চায় চিরদিন বশংবদ হয়ে থাকতে ? পুরুষ যদিবা চায়, মেয়েরা নয়।

কিন্তু পাপিয়া ?

হ্যাঁ, বাদে পাপিয়া।

এই মেয়েটা এ সংসারের সেই আগের ছাঁচে অনেকখানিটা ঢালাই হয়ে গিয়েছিলো বলেই কী এদের থেকে ব্যতিক্রম ? না কী তার নিজস্ব প্রকৃতিতে ? অথবা—অপরের গর্ভজাত হয়েও বড়মাকে চিরদিন মায়ের বড়ো ভেবে এসেছে বলেই সত্যকার মানুষটাকে বোঝে। ছলনা, অভিনয়, দেখানেপনা—এসব যে সন্ধ্যাতারার পক্ষে সম্ভব নয়, সেটায় সে বিশ্বাসী।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির ফলে পাপিয়ার ছেলেবেলা থেকেই বিশ্লেষণধর্মী মন। কার চরিত্রে কী দোষ কী গুণ, তার চোখে ছেলেবেলা থেকেই 'ধরা পড়ে' এসেছে। তবে—সেই ধরা পড়াটা অপর কারুর চোখে ধরা পড়তে দেয় না।

বাড়ির সকলেরই ধারণা, পাপিয়া উদোমামা নিরাসক্ত, অন্যমনস্ক। বাড়িতে কোথায় কী হচ্ছে খেয়ালই করে না।

খেয়াল চিরদিনই করে। আর ওই 'বড়মা' নামক মানুষটা যে নির্ভেজাল তা জানে। আর মানুষটা বোকাসোকা সরল আর আবেগ-ভালোবাসাপ্রবণ তা বুঝে তাঁর প্রতি এতো মমতাশীল।

সন্ধ্যাতারার ওপর পরপর তিন তিনটে শোকদুঃখের আঘাতে মানুষটা যে নেহাৎ 'বেচারী' মতো হয়ে গেছে তা বুঝে পাপিয়া আরও মমতা অনুভব করে।

তা তিন তিনটেই তো আঘাত।

অশীতিপর শ্বশুরের মৃত্যুতে যে 'শোক' কথাটাই হাস্যকর একথা সন্ধ্যাতারার কাছে সত্য নয়।.... 'মাতৃশোকটি ?' সেও তার কাছে যতোটা গভীর সত্য, সংসারের আর পাঁচজনের কাছে তেমন গভীর কিছু না। বয়স তো হয়েছিলো প্রায় সত্তরের কাছ বরাবর, বৃদ্ধ স্বামীকে রেখে 'কেটে পড়া', এ তো হিন্দুঘরের মেয়ের কাম্যই।

বাকি থাকছে বাকি ঘটনাটি।

একমাত্র সন্তান 'খোকনের' নিষ্ঠুর ব্যবহার।

তো তাতেই বা কার এতো সহানুভূতি ?

মারা তো আর যায়নি ছেলে। একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়নি। শুধু তোমাদের ডোণ্ট্ কেয়ার করে নিজ পছন্দে বিয়ে করে—বৌ নিয়ে অন্যত্র ঘর বাঁধতে গেছে।....তো এটা আবার এমন কী ? এ যুগে তো আকছারই এমন দেখা যায়।.....

তাছাড়া যেমন গুণের ছেলে তৈরী করেছ ! তেমন তো হবেই।

নাঃ, সন্ধ্যাতারার মর্মবেদনা কেউ বুঝতে আসে না। বাদে ওই পাপিয়া নামের মেয়েটা ! তা সেও একদিন বলেছে, 'সেধে দুঃখু টেনে আনো কেন বড়মা ? তোমার অভাবে দাদু চলে গেলেন ? যাবার বয়েস হয়নি তাঁর ? তাছাড়া এইরকম মরো মরো হয়ে আরো টিঁকে থাকাটাই কী প্রার্থনার ?'

আর আজ হঠাৎ একটু হেসে বললো, পাতানো বাবার জন্যে তো এতো হা-হুতাশ ! সত্যিকার নিজের বাবার জন্যে মন কেমন করে না ?

মন কেমন করে না ? বাবার জন্যে আমার মন কেমন করে না ?

এই তো। কাঁদুনে পুতুলের কাছে কিছু বলার জো নেই। তো মন কেমন যখন করেই, তখন তাঁর কাছে গিয়ে কিছুদিন থাকলেও তো পারে। আহা বেচারী। বুড়ো বয়েসে বৌ মরা, বড়ো কষ্টের গো।

সন্ধ্যাতারা মলিনভাবে বলে, গিয়ে কিছুদিন থাক' ! তোর তো সর্বদা বাইরে কাজ ! ওই বারোমেসে পেটরোগা আর হাঁপানী রুগী মানুষটাকে কার কাছে রেখে যাবো বল ? কে ওঁর দায়িত্ব নিতে চাইবে ?.....বলেই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'মানে সকলেরই তো নিজের কাজ আছে।'

হ্যাঁ। এখন সকলেরই নিজের নিজের 'ঘরে' কাজ আছে। বাড়ির কর্তার শ্রাদ্ধ শেষে নিয়মভঙ্গের পরদিনই দেখা যাবে সাবেকি রান্নাঘরকে কানা পরিয়ে তার তিন তিনটে ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে।

পাপিয়া স্তব্ধ হয়ে যায়। এটা তো তার খেয়ালে ছিলো না। হয়তো সম্যক জানাও ছিলো না। এখন অনুভব করছে, যেটাকে সামান্য একটু চিড় খাওয়া বলে মনে হয়েছিলো, দেখা যাচ্ছে সেটি রীতিমত একটি ফাটল।

সত্যব্রত কী টুসকির ধারণামতো আবার জীবনযুদ্ধে নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছেন ?

নাঃ। এখনো পর্যন্ত তা দেখা যাচ্ছে না।

বরং মনে হচ্ছে যেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে চাইছেন!

নীলুর কাছেই প্রস্তাব।

বাবা নীলাম্বর, কথাটা তোমায় বলতে লজ্জা করছে। তুমি এতো করছো তবু আবার তোমাকে ছাড়া বলবার মতো কাউকে খুঁজেও পাচ্ছি না!

নীলাম্বর তটস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে। তাকিয়ে দেখে মানুষটার দিকে।

এমন ভালো করে দেখাটা বোধহয় এখন এই প্রথম। নয়নতারা চলে যাবার পর থেকে সত্যব্রত বেশী সময় তিনতলায় ছাদের ঘরেই থাকছেন। চুপচাপ।

সকালবেলা 'খবরের কাগজ এসেছে কিনা' এটুকুও কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন না, নিজেই একসময় নেমে এসে দেখে নিয়ে যান। কেউ দেখা করতে এসেছে শুনে চুপচাপই নীচের তলায় নেমে আসেন।

তা দেখা করতে তো আসবেই লোকে। আসবে না?

শোকে সান্ত্বনা দিতে আসা তো একটা সামাজিক কর্তব্য। সেই সামাজিক নিয়মের দায় তো পোহাতেই হবে। উভয় পক্ষের কাছেই 'দায়' মনে হলেও।

কেউ বলেন, 'তিনি তো দিব্যি চলে গেলেন। ভুগলেন না, কাউকে ভোগালেনও না। আপনারই বুড়ো বয়সে কষ্ট।'

সত্যব্রত চুপ করে থাকেন।

কেউ বলেন, 'এ আপনার পক্ষে একরকম ভালোই হলো। তিনি পূণ্যবতী স্বর্গে গেলেন। আপনাকে বন্ধনমুক্ত করে গেলেন! এখন আপনি তো বলতে গেলে মুক্ত জীব!'

সত্যব্রত চুপ করে থাকেন!

তবে একদিন একজনের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে খুব চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সান্ত্বনাকারীরা আর কতোকাল আসবে?

'শোকটা' যেখানে গুরুত্বহীন। লোকের আসা কমে যায়।

শুধু নীলু আসে। সান্ত্বনা দিতে নয়, কর্তব্য করতে।

কে যে তাকে এ সংসারের কর্তব্যভারের অংশীদার করে রেখেছিলো কে জানে। ওই নিয়ে তো ওর বাড়িতে স্ত্রী-পুত্র বিরোধীপক্ষ।

নীলাম্বর তাকিয়ে দেখলো।

কী আশ্চর্য! মানুষটার গায়ের সেই উজ্জ্বল গৌর রংটা কোথায় হারিয়ে গেলো? মনে হচ্ছে আগুনের আঁচে ঝলসে গেছে। চামড়ায় কোঁচকানোর শুষ্কতা।

নয়নতারা চিতার ধারেপাশে বসে থেকে ছিলেন না কী?

কিন্তু চিতায় আবার আজকাল আগুন থাকে না কী? চুল্লী তো বিদ্যুতের! অথচ সত্যব্রতর চামড়া ঝলসে গেছে। কুঁচকে গেছে।

সে নিয়ে অবশ্য কিছু বললো না নীলাম্বর। শুধু বললো, কী বলুন মেসোমশাই।

কী বলবো তাই ভাবছি।

কী আশ্চর্য, আমার কাছে এতো কুণ্ঠিত হচ্ছেন?

না—মানে ব্যাপারটা তো ঠিক ইয়ে নয়। তবে তুমি এখন রিটায়ার করেছো বলেই বলতে পারছি।

নীলু ভেবে পায় না, তার রিটায়ারের প্রসঙ্গে কোন ধরনের কথা আসতে পারে!

এ সংসারের জন্যে আর্থিক সাহায্য? অসম্ভব।

সত্যব্রতর কাছ থেকে তেমন প্রস্তাব আসতেই পারে না।

তাই নীলু আর প্রশ্ন না করে শুধু তাকিয়ে থাকে পরবর্তী কথার অপেক্ষায়।

সত্যব্রত এবার বলে ফেলেন, তুমি আমায় একবার পাবনায় নিয়ে যেতে পারো নীলাম্বর!

পাবনায়! নীলু হতভম্ব হলো। পাবনায় কোথায় যাবেন মেসোমশাই?

পাবনাতেই যাবো। পাবনা শহরে।

সত্যব্রতর কথায় এখন একটু জোর ফোটে।

না—মানে সেখানে এখন আর কে আছে?

সত্যব্রত একটু থেমে বললেন, আকাশ বাতাস মাটি, এরা তো আছে।

তাও যে কতখানি কী আছে, তা বলা শক্ত মেসোমশাই। দেশের স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের বোধহয় সবই বদলে গেছে। আকাশ বাতাস মাটি গাছপালা এরাও।

জানি। তবু কতোটা বদলে গেছে সেটাই একবার দেখতে যেতাম। পাবনার যে গাঙ্গুলীবাড়িতে সবসময় অনাহূত রবাহূত কতো কতো জনের জায়গা হতো, তার ভাঙা দেয়ালের খাঁজে খোঁজে একটা ভাঙাচুরো লোকের জায়গা হয় কিনা দেখতে ইচ্ছে।

কিন্তু সেই ভাঙা দেওয়ালই কী আর আছে?

সত্যব্রত একটু চুপ করে থেকে বলেন, শুনলাম আছে! খুব বেশীদিন তো নয়! একটা শক্ত বনেদের বৃহৎ বাড়ি, ভেঙে নিশ্চিহ্ন হতে একশো দুশো বছর লেগে যায়। শুনলাম এখন যারা সেই বাড়ির অধিকারী তারা বাড়িটাকে টুকরো ভাগে ভাগ করে ভাড়াটে বসিয়েছে!

নীলু আবার সত্যব্রতর মুখের দিকে তাকায়। চোখাচোখি হয় না। তাঁর দৃষ্টি অন্যদিকে। হয়তো বা দিগন্ত ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে।

এসব আপনি জানলেন কী করে মেসোমশাই?

জানলাম। মানে একজন জানিয়ে গিয়েছিলো।

তারপর একটু শান্ত গলায় বলেন, আমাদের পাশের বাড়ির হরষিত ডাক্তারের ছেলে। এসেছিলেন একদিন।

হ্যাঁ, সেইদিনই অভ্যাগতকে দেখে একটু চঞ্চল হয়েছিলেন সত্যব্রত। কথা কয়েছিলেন তাদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ। আর প্রায় অভাবনীয়, টুসকিকে ডেকে বলেছিলেন, ওকে একটু চা খাওয়ানো সম্ভব হবে রে টুসকি?

নীলু বলল, আপনি কী তাহলে নিজের ভিটেয় নিজের ভাড়াটে হয়ে থাকতে চান মেসোমশাই?

সত্যব্রত আস্তে বলেন, কী চাই তা আমি নিজেও জানি না বাবা। তবে শুধু হয়তো এখান থেকে একটু পালাতে চাই। একদিন দুদিন যা হোক। সর্বক্ষণ—এই একটা শূন্যতা—

থেমে গেলেন।

তারপর আবার আস্তে বললেন, তোমার মাসীমার খুব ইচ্ছে ছিলো পাবনাকে আর একবার দেখতে। 'বাংলাদেশ' খুলে যাওয়ার পর থেকেই প্রায়ই বলতেন—

নীলু কী বলে উঠবে, 'তা আপনি এখন কোন প্রাণে একা যাবেন? অথবা বলে উঠবে, তবে চলুন। আপনি গেলেই হয়তো—তাঁর যাঁওয়া হবে।'

তা তো আর বলা যায় না। দুটোর একটাও নয়।

তাই বলে, 'কবে যেতে চান বলুন। আমি সবসময় রেডি।'

॥ চব্বিশ ॥

বাবা টেলিফোন করে আমায় যেতে বলেছেন? আজকালের মধ্যেই?

চিরকেলে ভয়তরাসে সন্ধ্যাতারার মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে যায়। উদ্বেগের আর আবেগের গলায় বলে, কেন বল তো ছোটোবাবু?

সমবয়সী ছোট দ্যাওর অরুণাঙ্ককে সন্ধ্যাতারা ঠাকুরপো বলে না, বলে 'ছোটোবাবু'। একদা নতুন বিয়ে হয়ে এসে এই সমবয়সী ছেলেটাই ছিলো তার খেলুড়িতুল্য। যদিও তখনকার দিনে বিরাট যৌথ সংসারে বৌদের সম্পর্কে 'খেলা' কথাটা ওঠার প্রশ্ন ছিলো না। এদের তো দাপুটে পিসশাশুড়ীর ভয়ে ভাইপো-বৌরা ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতো। তবে সন্ধ্যাতারা তখন নতুন বৌ, আর নেহাৎ ভালোমানুষ হাবাগোবা এবং কর্মে অপটুত্বের নিদর্শনে হাস্যকর। তাই ওকে সেই জাঁদরেল মহিলাটিও ক্ষমাঘেন্না করে শাসনে শিথিল ছিলেন। তাই ছোটোখাটো সংসার থেকে আসা মেয়েটা একটু সুযোগ পেলেই, বৃহৎ বাড়ির কোনো একখানে লুডোর ছকখানা পেতে চুপিচুপি ডাকতে আসতো, 'এই ছোটোবাবু, লুডো খেলবে? এসো না ভাই একটু।'

তবে ব্যাচিলার বড় জ্যাঠশ্বশুর দরাজ স্বভাব মৃগাঙ্কমোহনেরও এই ছেলেমানুষ বৌটার প্রতি একটু বেশীমাত্রায় মমতার প্রশ্রয় ছিলো। কাজেই সে খেলায় তেমন বাধা আসতো না। মৃগাঙ্কমোহনের এবং তাঁর বালবিধবা পিঠোপিঠি দিদি নিরুপমার নেতৃত্বে পাঁচ ভাইয়ের 'ষষ্ঠির কৃপায় সমৃদ্ধ' সংসারটি তো ছিলো জনারণ্যতুল্য।....

বাপ্পাদিত্য শিলাদিত্য শৈশবের স্মৃতি প্রসঙ্গে বলে, 'উঃ! ছেলেবেলায় পিসির বাড়িটায় বেড়াতে গেলে, কী ভালোই যে লাগতো! সবসময়ই যেন বিয়েবাড়ি। আর ছাদটা? যেন মাঠ। ফুটবল খেলা যেত।'

তা খেলতোও। সে বাড়িতে ছেলেপুলে তো ছিলো অগুনতি। মৃগাঙ্কমোহনই না হয় অকৃতদার, তবে বাকি চার ভাই শশাঙ্ক, বরঙ্ক, উতঙ্ক এবং শুভ্রাঙ্ক তো কৃতদার। কাজেই শাখাপ্রশাখায় ঘন অরণ্য।

সন্ধ্যাতারা প্রথম প্রথম দেখে হাঁপিয়ে উঠতো।

কিন্তু সে বাড়ি কী বেলেঘাটার এই বাড়িটা?

নাঃ, সে তো মানিকতলার সেই চকমিলোনো বিরাট তিনতলা বাড়িখানা। যার ছাদের আলসেয় পরীপুতুল বসানো ছিলো। মৃগাঙ্কমোহনের মৃত্যুর পর সেখানে ভাঙন ধরালো, এবং সেই বৃহৎ বৃক্ষের শাখাপ্রশাখারা কী ভাবেই যে চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে....হারিয়ে গেলো! একদা যারা প্রতিক্ষণ একই বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়েছে, একই হাঁড়ির অন্নে বর্ধিত হয়েছে, ক্রমশঃ তাদের মধ্যে বৎসরান্তে একবারও দেখা হয়েছে কিনা সন্দেহ।

বছরে একবার 'বিজয়া দশমীর কৃত্য'র দায় সারতে বিজয়া কাবার হয়ে যাবার হয়তো এক-দু-মাস পরেও কোলাকুলির প্রহসনটা বজায় রেখেছিলো। ক্রমশঃ সেটাতেও কখন একসময় ছেদ পড়েছে।

মৃগাঙ্কর সর্বকনিষ্ঠ ভাই শুভ্রাঙ্ক যেমন তখন এই বেলেঘাটার বাড়ি কিনে নতুন সংসারের পত্তন করেছিলেন, তেমনি অন্য ভাইরাও তো দিকে দিকে নিজভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সামাজিক অঙ্কশাস্ত্রের নিয়ম অনুসারে তাদের পরবর্তীরা এখন পরস্পরের 'দূর সম্পর্কের জ্ঞাতি'তে পরিণত হয়েছে।

শুভ্রাঙ্কর সংসারেও তো তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বড় বড় ফাটল দেখা যাচ্ছে। এখানেও সেই একই খেলার পূর্বাভাস উঁকি মারছে।

তবে রান্নাঘরের গোটা চারেক ব্রাঞ্চ খোলা হয়েছে বলেই যে পরস্পরের মধ্যে 'কথা বন্ধ' অথবা তিক্ততা বিরক্তি তীব্রতা দেখা গিয়েছে, ঠিক তেমনও নয়। শুধু যেখানে একটা নিশ্চিন্ত নিকটত্বের স্বাদ ছিলো, সেখানে বাঁধন ঢিলে হয়ে দূরত্বের ভাব। আর সকলের মধ্যেই যেন একটু লজ্জিত লজ্জিত ভাব। অন্ততঃ পুরুষদের মধ্যে। আর সত্যি বলতে—যেন 'বড়গিন্নী' সন্ধ্যাতারার কাছেই।

তাই মনে হলো কথা বলার একটা সুযোগ পেয়ে 'ছোটোবাবু' অরুণাঙ্ক যেন খুশীই হয়েছে। সন্ধ্যাতারার কাছে এসে বললো, 'এই দ্যাখো বড়বৌদি, এক খবর। তোমার বাবা তোমায় একবার তোমাদের নলিন সরকার স্ট্রীটে যেতে বললেন।'

এ বাড়ির টেলিফোনটার মালিক ওই অরুণাঙ্কই। বড় চাকরি করে! অফিস থেকেই পাইয়ে দিয়েছে। অফিস যাতায়াতের জন্যে গাড়িও পেয়েছে একটা।

আর এই সব পাওয়া-পায়ির পর থেকেই ওই অরুণাঙ্কর বৌয়ের মধ্যেই প্রথম রান্নাঘরের ব্রাঞ্চ খোলার তাগিদ উঁকি মেরেছিলো। তো সে কথা যাক, একান্নে থাকার সময় খেতে বসে সকলের সঙ্গে সকলের একবার দেখা হওয়ার যোগাযোগ থাকে এবং সেই যোগাযোগের কালে সন্ধ্যাতারার ভূমিকা থাকে প্রধান। মানে 'থাকতো'। বাড়ির সকলের 'খাওয়া'টি ভালো হলো কী হলো না, এটাই তো ছিলো সন্ধ্যাতারার ধ্যানজ্ঞান। এখন সন্ধ্যাতারার মনের মধ্যে বড় শূন্যতা। সে নিজে ভাবে, 'বাবা চলে যাওয়াতেই এমন হয়েছে। সবসময় তাঁকে নিয়েই থাকতুম।'....আসলে কিন্তু সেটাই সব নয়। সবাইকে ঘিরেই যে সন্ধ্যাতারার জীবন আবর্তিত হয়েছে।

সন্ধ্যাতারার উদ্বিগ্ন প্রশ্নে 'ছোটোবাবু' বলে, 'কারণ' কিছু বললেন না। আমি তো বললাম তোমায় ডেকে দিই।...তো তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, তার দরকার নেই। বলে দিও যদি পারে তো যেন আজ কী কাল একবার আসে।'

আবার এও বললেন, 'তেমন কোনো অসুবিধে থাকলে দরকার নেই।'....তো এই তো এখন সকাল। ইচ্ছে করলে আজই চলে যেতে পারো। তোমার কাণ্ডারীটি তো বাড়িতেই রয়েছে মনে হচ্ছে।

কাণ্ডারী মানে পাপিয়া।

পাপিয়াই যে স্বেচ্ছায় তার বড়মার দায়িত্বটি নিজের ঘাড়ে তুলে নিয়েছে, এটা সকলেরই জানা। পাপিয়ার মা অর্থাৎ মেজগিন্নী অবশ্য ক্রমশঃ আর সেটা তেমন মধুর চোখে দেখেন না। তবে একদম কৃতী হয়ে যাওয়া স্বাধীন মেয়েটাকে বলাই বা যায় কী! একমাত্র চিন্তা তার একটা বিয়ে হয়ে যাওয়া। তো সে আশায় ছাই দিয়ে মেয়ে বলে কিনা, 'সকলকেই যে 'বিয়ে আর ঘরসংসার করা'র ছাঁচে ঢালাই হতে হবে তার কী মানে আছে?'

অতএব সেই মেয়ে যদি বাড়ির মধ্যে স্পেশাল একজনের কাণ্ডারী হয়, নিজের মা-বাপের থেকে সেই 'অন্য একজন'কে অধিক ভালোবাসে তাতেই বা কী বলার আছে? করবার তো কিছু নেই।

কাজেই সন্ধ্যাতারার কাণ্ডারীর কাছে এসে টেলিফোন বৃত্তান্ত পেশ করা।

সে বললো, হয়েছে তো? এবার বাবার কাছে লজ্জায় মাথাটি কাটা গেলো তো?....বলি না, বেচারী বুড়োমানুষটাকে একবার দেখতে যাওয়া উচিত! সকলের সম্পর্কে এতো কর্তব্যজ্ঞান তোমার, অথচ—ওনার বেলায়—

আচ্ছা পাপিয়াই বা নিজেকে অপর পক্ষের উকিলের ভূমিকায় দাঁড় করায় কেন? পাপিয়া কী সেই গাঙ্গুলীবাড়িটার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে?

সন্ধ্যাতারা বিমনাভাবে বলে, আমার যাওয়া মানেই তো তোর কাজ বাড়ানো। আর তো কাউকে সঙ্গে পাবার মতো দেখি না।

আমার কাজ বাড়ানোর ভয়ে তুমি—অ্যাঁ ? ভীষণ চটাচটি হয়ে যাবে কিন্তু বড়মা ! কথা ফিরিয়ে নাও। চটপট। এ কথা বরদাস্ত করতে রাজী নই।

আচ্ছা বাবা। ফিরিয়ে নিলাম। তো চল তবে বড়মাকে ঘাড়ে করে।

চটপট রেডি হয়ে নাও। এই এক্ষুণি বেরোতে যাচ্ছিলাম।

এক্ষুণি ? রেডি হয়ে নেবো ?

একদম এই দণ্ডে !

কিন্তু তোর জ্যেঠুকে না খাইয়ে—

জ্যেঠুকে খাইয়ে ? তবেই হয়েছে। তাহলে আজ আর হবার কোনো আশা নেই।...আমার তো ডিউটি রয়েছে।...ঠিক আছে, সেটা আমি ম্যানেজ করে ফেলছি।

বলেই গলা তুলে বলে ওঠে, বাড়ির মহিলারা ! একটু কান পেতে শুনুন ! বাড়ির হেড্ তাঁর বুড়োবাবাকে একটু দেখতে যাচ্ছেন। বাবা ডেকেছেন। এখন আপনারা যে পারবেন ওই 'হেড্'-এর 'হেড'টিকে একটু খেতে টেতে দেবেন।...চলছি। আমার দাঁড়াবার সময় নেই।

পাপিয়ার মা কাছে এসে বলে, কথাবার্তার কী ছিরি হচ্ছে তোর আজকাল ?

পাপিয়া স্থির গলায় বলে, বাড়ির যেমন ছিরি হয়েছে, আজকাল তার উপযুক্তই কথা হবে, এতে আর আশ্চর্য কী মা ? তবে ভেবে পাই না হঠাৎ 'লজ্জা' জিনিসটা বাড়ি থেকে উপে গেলো কী করে ?...বড়মা। ওয়ান, টু, থ্রী।...ভীষণ তাড়া।...

সত্যব্রত একটু কুণ্ঠিত হাসি হেসে বলেন, ইস ! ফোন পেয়েই 'পত্রপাঠমাত্র' চলে এসেছিস ? কী মুশকিল।

পাপিয়া তাঁকে প্রণাম করে বলে ওঠে, মুশকিল ? আপনার যদি মুশকিল মনে হয় দাদু তো বলুন। আবার পত্রপাঠ ফিরিয়ে নিয়ে যাই আমাদের বাড়ির বৌটিকে।.....তার একটা মানমর্যাদা আছে তো ?

সত্যব্রত কতোদিন পরে যেন একটু প্রাণ খুলে হাসেন। বলেন, তোর এই মেয়েটা তো আচ্ছা টুনি। উকিলজব্দ করা মেয়ে। কথা ফেরত নিচ্ছি বাপু। আসলে এক্ষুণি এসে পড়তে পারবে, তেমন প্রত্যাশা তো ছিলো না। তাই দেখে আহ্লাদের চোটে উল্টোপাল্টা বলে বসেছি।

আচ্ছা এখন মেয়ের সঙ্গে 'সোজা' কথা-টথা শুরু করুন। আমাকে এক্ষুণি বিদায় নিতে হচ্ছে।....সন্ধ্যের পর আসছি বড়মা। দাদু, চলি।

সত্যব্রত বলেন, আজই চলে যাবি ?

সন্ধ্যাতারা আঁচলে চোখ মুছে বলে, যেতে কী ইচ্ছে করে বাবা ? তবে ওদিকে আপনার জামাইয়ের জন্যেই। শরীর তো ভালো না।

ঠিক আছে। ঠিক আছে। নিশ্চয় যাবি। সেটাই আসল কর্তব্য।

ডেকেছিলেন কেন বাবা ?....বাপের পায়ের কাছে বসে পড়ে সন্ধ্যাতারা।

সত্যব্রত আবারও তেমনি কুণ্ঠিত হাসি হাসেন—আরে ও এমন কিছু না। মানে একরকম পাগলামিই। আসলে যাচ্ছি তো মাত্র দুদিনের জন্যেই। তবু হঠাৎ মনে হলো, 'ভাবছি তো দুদিন। কিন্তু যদি আরো বেশীদিন হয়ে যায়। যদি আদৌ না ফিরি। মেয়েটাকে একবার দেখে যাব না ?'

সন্ধ্যাতারা অবাক হয়ে বলে, কোথায় যাবার কথা বলছেন বাবা?

এই দ্যাখো। বলিনি বুঝি? কী ভুলো কাণ্ড! যাচ্ছি—কোথায় জানিস? পাবনায়।

পাবনায়!

সন্ধ্যাতারাও নীলুর মতোই হতচকিত হয়ে বলে, পাবনায়। সেখানে সহজে যাওয়া যায়?

আরে! সহজ হয়ে গেছে বলেই তো—এখন তো আর যাওয়া নিষিদ্ধ নয়। নিয়মমাফিক একটা পাসপোর্ট করিয়ে নিলেই—

কিন্তু সেখানে আর এখন আপনার কে আছে বাবা?

আবারও নীলুর মতোই প্রশ্ন করে টুনি।

আর উত্তরটাও তার মতোই দেন সত্যব্রত, কে আছে? কী জানি! তবে তার আকাশ-বাতাস, জল-মাটি, ঘাস-পাতা, এরা তো আছে। তাই ভাবছি কী জানিস টুনি, গিয়ে পড়লে সেই তারা যদি না ছাড়ে, আটকে ফেলে! তাহলে তো ফেরা হবে না। থেকেই যেতে হবে।

থেকেই যেতে হবে? সেইখানেই থেকে যাবেন? আমাদের সবাইকে ফেলে?

টুনি টুনির উপযুক্তই ডুকরে ওঠে।

সত্যব্রত ঈষৎ গম্ভীরভাবে বলেন, সবাইকে ফেলে? হ্যাঁ, শুনে তোদের কষ্ট হতে পারে। কিন্তু সবাইকে ফেলে চলে যাওয়াই তো এই জগৎসংসারে নিয়ম রে টুনি। সে যাওয়াটা কী আটকানো যাবে? আটকানো কী গেলো?

নীহারিকা বললো, দেখো এখন বাবার এই পাগলামি! তুমি এসেছো, যদি বলেকয়ে বোঝাতে পারো। প্রথমটা তো বলেছিলেন, দিন দুয়েকের জন্যে একবার ঘুরে আসি। দেখি পাবনাটা সেই পাবনার কতোটুকু কী রেখে দিয়েছে। কিন্তু ভাবে-ভঙ্গীতে মনে হচ্ছে ইচ্ছেটা অন্য।

সন্ধ্যাতারা মলিন হয়। আমি বুঝিয়ে সুজিয়ে বাবার মত বদলে দেবো? কী যে বলো বৌদি! আমার কী সাধ্য?

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য পাঁচজনের কাছে কীরকম দেখাবে সেটা কেউ খেয়াল করছে না। লোকে তো ভাববে—শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর ছেলের বৌ বুড়ো শ্বশুরকে অযত্ন অবহেলা করে সংসার থেকে বিতাড়িত করেছে।

সন্ধ্যাতারা থতমত খায়, কী যে বলো বৌদি। এইসব আবার ভাবতে যাবে লোকে?

এইরকমই তো ভাবে লোকে। জানো না?

যারা ভাবে তাদের কথা ছেড়ে দাও। তবে বাবা সেখানে থেকে যাবেন, তাই কী আর সত্যি হতে পারে? এখন মনপ্রাণ খারাপ, একটু ঝোঁকের মাথায় ওইসব অসম্ভব ভাবনা ভাবছেন। এতো বছর পরে কী আর ওঁদের সেই পাবনা সেইরকমই আছে? আর থাকবেনই বা কোথায় কীভাবে? দেখবে কে? অবস্থা দেখে ঠিকই ফিরে আসবেন তোমার নীলুদার সঙ্গেই।

নীহারিকা বলে, এলেই ভালো। তবে কিনা এই গাঙ্গুলীবাড়িরই ঝাড়টি তো একগুঁয়ের রাজা! শত অসুবিধে সত্ত্বেও হয়তো জেদ বজায় রাখতে থেকে যাবেন। ঝাড়ের একখানি বাঁশকে তো দেখছি হাড়ে হাড়ে।

সন্ধ্যাতারা আস্তে বলে, বাপ্পার কথা বলছো?

তাছাড়া?

ও কী সত্যিই আবার চলে যাবে?

জানি না। ও জানে আর ওর বিবেক জানে।....রাতটা থেকে যাবে তো টুনি?

অর্থাৎ নিজেই নিজের তোলা প্রসঙ্গয় ফুলস্টপ মেরে দেয় নীহারিকা।

টুনি ইতস্তত করে বলে, পাপিয়া বলেছে, সন্ধ্যেয় ও আসবে। রাতে থাকলে, ওকে আবার কাল সকালে আসতে হয়। তাছাড়া—বাবা তো কালই কখন যেন বেরোবেন বললেন।

অর্থাৎ টুনিও সরাসরি 'নাঃ। রাত্তিরে থাকা চলবে না' না বলে ঘুরিয়ে কথা বলে! শিখে যাচ্ছে ক্রমশঃ।

আদিত্য টুনি ঘরে ঢুকতেই বলে ওঠে, বাবার প্যাঁচটি একবার দেখলি তো টুনি?

প্যাঁচ। প্যাঁচ মানে?

প্যাঁচ মানে প্যাঁচ। তা ছাড়া আবার কী? এতোকাল পরে কিনা হঠাৎ পাবনার জন্যে ভালোবাসা উথলে উঠলো! কেন? কী জন্যে? অ্যাঁ, কী জন্যে? মানে বুঝি না কিছু?

এর আর মানে কী দাদা?

টুনি হতাশ গলায় বলে।

আদিত্য হঠাৎ ঘাড় ঘুরিয়ে নিজের চোখটা রগড়ে বলে, মনে হচ্ছে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া এই সংসারখানা ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য। অথচ আসলে লোকটা পারফেক্ট ভদ্রলোক।.....তাই সরে পড়ছে। তা নইলে বুড়ো বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হলে কে আবার সংসার ত্যাগ করে?.....

হঠাৎ সুর পাল্টে বলে, হবে না কেন? হবেই তো। লক্ষ্মীছাড়া ছেলে আর মহারানী বৌমার সংসারে দুজনে যেভাবে জীবন কাটিয়েছেন, তাতে এখন এই একা হয়ে যাওয়ায় এই ডিসিসান নেওয়াই স্বাভাবিক।

আচ্ছা দাদা, পাগলের মতো কী যা তা বলছো? কী আবার দুঃখে জীবন কেটেছে ওঁদের? তবে তোমাদের ছেলেটা একটু দুঃখু দিয়েছে বটে। সে তার আদর্শের নেশার ঝোঁকে। আসলে বাবার এখন মনপ্রাণ খারাপ, তাই প্রাণ ছটফট করছে—

সবাই তোর মতন এতো সোজা হিসেবের কারবারি হতে পারলে সংসারটা স্বর্গ হয়ে উঠতো রে টুনি। তা তো হচ্ছে না।.....কষ্ট দুঃখু? ওসব কোনো ব্যাপারই নয় টুনি। আসল প্রশ্ন হচ্ছে 'সম্মান'। 'সম্মানহীন' জীবন হচ্ছে মৃত্যুতুল্য! বুঝলি? এই যে লক্ষ্মীছাড়া আদিত্য গাঙ্গুলী। ওই মহামহিম পাবনার গাঙ্গুলীবাড়ির রক্ত যার মধ্যেও বইছে। সে জানে সেটা। সারাজীবন হাড়ে হাড়ে সেই মৃত্যু অনুভব করে আসছে। কিন্তু তার জন্য কোনো 'পাবনা' নেই। তাই তার আশ্রয় এই বিছানা....বুঝলি?

তোমার কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছি না দাদা।

ও তুই বুঝবি না। বোঝবার ক্ষমতাই নেই।

বলেই হঠাৎ শুয়ে পড়ে দেয়ালমুখো হয়ে।

টুনি একটুক্ষণ বোকার মতো বসে থেকে বলে, বাপ্পা তো এখনো এখানেই আছে শুনলাম। তো কই দেখতে পাচ্ছি না তো।

দেখতে পাবে? তাঁকে? ওইসব ভয়ানক কাজের লোকদের কী সহজে দর্শন মেলে রে টুনি? পাবি। সারাদিন থাকলে একবার হয়তো দেখতে পাবি। দয়া করে বাড়ির অন্নটুকু গ্রহণ করেন।.....আর তেমনি হয়েছে ওই পাজী রাস্কেল তারকটা!

হঠাৎ আবার উত্তেজিত হয়ে উঠে বসে আদিত্য। বলে, ওর জন্যেই এতো বাড় বেড়েছে বাবুর!.....বাপ মরো মরো শুনেও একবার দেখতে আসে না, সেই ছেলে করবে দেশোদ্ধার। হুঁঃ!

ভেতরে মমতা না থাকলে আর দেশোদ্ধার করতে হয় না।

টুনি বলে, আমি বোকাহাবা মানুষ, অতো সব বুঝি না দাদা, তবে আমার ওই পাপিয়া বলে, সেকালের পরাধীন দেশের 'দেশোদ্ধার' আর একালের 'দেশোদ্ধার'—এ আকাশ পাতাল তফাৎ বড়মা। একালে এই দেশের কাজে নাকি দেশের মানুষের জন্যে অতো মায়া-মমতা-ভালবাসার দরকার হয় না। এসব অন্য ছাঁচের ব্যবস্থা। বরং মায়া-মমতা মানুষ-মনুষ্যত্ব ধর্ম-অধর্ম পাপ-পুণ্যি, এইসবকে 'বাজে' জিনিস ভেবে উড়িয়ে দিয়ে কাজ করতে হয়।.... মাথায় ঢোকে না বাবা! মানুষ কী গরু-মোষ ছাগল-ভেড়া যে শুধু তাদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থা করলেই চলবে? আর কিছুর দরকার নেই। মায়া-মমতা, মনের উন্নতি—

আরে দূর। আছিস কোথায়? ওসব হচ্ছে বাজে সেন্টিমেন্ট। ওসব সাফ করে ফেলে মানুষগুলোকে যন্ত্র করে তুলে চাবি ঘুরিয়ে কাজ চালানোই হচ্ছে ওদের দেশোদ্ধারের রীতিনীতি। বললাম তো ও তুই বুঝবি না। তবে তোদের ওই মেয়েটা বড় খাসা মেয়ে, বুঝলি? ওই তোর পাপিয়া। অমন একখানা মেয়ে বাড়িতে থাকলে—

বলেই থেমে গিয়ে অন্য সুরে বলে, এসে চা-টা পেয়েছিস?

এ মা। তা আবার পাইনি! সে তো আসতে মাত্রই বৌদি—কতো যত্ন করে—

ওঃ। কতো যত্ন করে দেখে যায়। ভালো অ্যাকটিং দেখাও একটা ভাগ্য!....দেখ না শ্বশুর বুড়ো বাড়ি ছাড়বার সময় কতো যত্ন করে খাওয়াবে। রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করে চলেছে আজীবন।....আমার কপালগুণে আবার এই নাটকের অন্য পার্টনারটি একদম আগমার্কা অনেস্ট। সেটাই আমাকে হাত-পা বেঁধে রেখে দিয়েছে সারাজীবন।....খুব অসুবিধে বুঝলি! একটা পাথরের বিগ্রহের সঙ্গে তো আর লড়াই করা যায় না। লোকটা ভিলেন হলে কতো সুবিধে হতো!

সন্ধ্যাতারা শঙ্কিত হয়।

মনে মনে ঠিক করে ফেলে, দাদার মাথাটা বেশ একটু গোলমেলে হয়ে গেছে। না হলে এমন সব মানে ছাড়া কথা বলছে কেন? হায় ভগবান। এ আবার কী করছো? নাঃ। দাদার কথাগুলোর—কোনো মানে নেই।

তা জগতে মানে ছাড়া কাজ যে কতোই ঘটে! তা নইলে পাপিয়া মুখার্জি নামের জুনিয়ার ডাক্তার ওই মেয়েটা কেন তার কর্তব্যকর্মের মধ্যে বারে বারে ঘড়ি দেখে, কখন আন্দাজ তার বড়মাকে আনতে যাওয়া শোভন হবে। এর কী মানে?

অথচ আবার এসে পড়ে শোভন অশোভনতা প্রশ্ন ভুলে, বেপরোয়া ঘণ্টা খানেকের বেশী সময় নীচের তলার ঘরটায় বসে থাকে। এরই বা কী মানে?

দরজাটা খুলে দিতে হয়েছিলো বাপ্পাকেই। কারণ তারক দুদিনের জন্যে দেশে গেছে।

কিন্তু দরজা খোলা পাওয়ার পর পাপিয়া নীচের তলায় বসবার ঘরটাতেই বসে পড়েছিলো কেন? ওর তো ওর সেই বড়মার উদ্দেশেই পাশের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাবার কথা!

কিন্তু ভিতরে যদি অন্য এক 'কথার সমুদ্র' তোলপাড় করে ওঠে, ন্যায্য নিয়মবন্ধ কথারা কী সেখানে ঠাঁই পেতে পারে?

বাপ্পা বলে উঠলো, কী? বড়মাকে নিয়ে যেতে বুঝি?

তা ছাড়া আর কী?

এর পর তো বাপ্পার আর কোনো কথা বলার কথা নয়। কিন্তু বাপ্পাও অপ্রয়োজনীয় কথার বীজ পুঁতে বসলো। বললো, বাড়ির লোকটিকে বুঝি একরাতের জন্যেও পরের বাড়িতে ফেলে রাখা

যায় না ?

পাপিয়া হঠাৎ বিনা আমন্ত্রণে সোফায় বসে পড়ে বলে উঠলো, তা আসবার জন্যে একটা দৃশ্যমান কারণের দরকারও তো থাকে।

বাপ্পা ওর এই নির্ভীক উজ্জ্বল দীঘল চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে যেন একটু কেঁপে ওঠে। তবে সেটা সামলে নিতে দেরী হয় না। বলে, দরকার কী সত্যিই আছে ?

কারো কারো কাছে থাকতেও পারে। সকলের 'দরকার' এক পথে চলে না।

বাপ্পাও সামনের সোফাটায় বসে পড়ে। হয়তো অবচেতনায়, অন্যমনস্কভাবে। বসে পড়ে বলে, অবস্থাটা আমার পক্ষে খুব কিছু স্বস্তির নয়। বেশ অস্বস্তির ....আমি তো বেতালা বিদঘুটে কাঠখোট্টা মানুষ। আমার কাছে কারুর কোনো প্রত্যাশা-ফ্রত্যাশা নেই বাবা।

তোমার কাছে কেউ কিছু প্রত্যাশা করছে, বলেছে তোমায় ?

পাপিয়া তেমনি সোজাসুজি তাকিয়ে থাকে।

বাপ্পার চেহারায় এখন আবার আগের ঔজ্জ্বল্য, আগের লাবণ্য। বাপ্পার দিকে তাকালে কোনো তরুণী মেয়ের মধ্যে আকর্ষণ সঞ্চয় না হয়ে উপায় নেই। তাছাড়া এ মেয়ে তো কবেই মনে মনে সমর্পিত হয়ে বসে আছে।

বাপ্পা ফট করে বলে ওঠে, তাহলে বারবার আসার আর দেখা করার দরকারটা কী ?

বললাম তো সেটা আমার নিজের ব্যাপার.....

আমার এতে—মানে আমি এতে—একটা অস্বস্তি ফীল করি।

কেন বলো তো বাপ্পাদা ?

পাপিয়া একটু কৌতুকচাপা গলায় বলে, কতোজনই তো বাড়িতে আসে। ইহসংসারে এতো লোক থাকতে, আমার মতো একটা তুচ্ছ মানুষ এলে অস্বস্তির কী আছে ?

বাপ্পা উঠে দাঁড়ায়, দু-পা হাঁটাচলা করে নেয়।

তারপর বলে ওঠে, 'তুচ্ছ' যে নও তা নিজেই খুব ভালো জানো।

মোটেই জানি না। চিরকালই নিজেকে খুব তুচ্ছ বলেই ভেবে থাকি। তা নইলে এমন হ্যাংলা স্বভাব হয় ?

আশ্চর্য। পাপিয়াই বা এমন বদলে যাচ্ছে কী করে ? এমন সাহসী আর বেপরোয়া কথাই-বা শিখছে কোন ফাঁকে ? বরাবর পাপিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা পাড়ার সেই ছেলেটা, সহপাঠীও, সেই শৌভনিক ! সে কী পাপিয়ার বাক্যরচনা প্রণালীর শিক্ষাগুরু ? তার তো এইরকমই কথাবার্তা।

এই ক'দিন আগে শৌভনিকের বিয়ে হয়ে গেলো। নেমন্তন্নর চিঠিটা দিতে এসে বলেছিলো, আর কতোদিন হ্যাংলার মতো মগডালের ফলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বয়েসটা পার করে দেওয়া যায় বল ? হাতের নাগালের একটা ডাল ধরেই ঝুলে পড়া গেলো। যা হাতে এসে যায়। টক, তেতো যা জোটে।

পাপিয়া বলেছিলো, বাঁচলাম বাবা ! একটা অস্বস্তি দূর হলো।

অস্বস্তির বালাই ছিলো কিছু নাকি ?

তা মনিষ্যির প্রাণ তো বটেই। একেবারে ইঁটকাঠ তো নই !

ও দাবি ছাড়। ইঁটকাঠের ওপর আরো একটা জিনিস আছে, তার নাম পাথর।

এই শৌভনিক, শুনতে ভালো দেখাচ্ছে বলে বানিয়ে বানিয়ে কতকগুলো বাজে কথা বলিস না তো। বৌকে বলে দিয়ে আসবো।

হ্যাঁ। তুই না হলে আর এতো খাটুনি স্বীকার করাতে যাবে কে ? তবে বলে এলেও কিছু হবে

না। বৌ জানে।

চমৎকার। এক পাড়ায় বাস। নতুন বৌয়ের কাছে এই বেচারীকে এমন 'দাগী আসামী' মার্কা করে চিনিয়ে দেবার মানে?

এই 'প্রাণ'টা যে একটা দাগা-খাওয়া প্রাণ সে খবরটা জানিয়ে দিয়ে একটু সিমপ্যাথি পাওয়ার আশায় আর কী!

ওঃ। কী বুদ্ধি। সিমপ্যাথি পাবার উপায় একখানা আবিষ্কার করেছিস বটে!

পাবো না?

মাথা খারাপ।

কেন? এই অভাগাকে 'আহা বেচারী' ভেবে যদি মায়াদয়া করে তার 'ত্রুটি'টা একটু মেনে নেয়।

থাম। বেশী বকিস না! 'ত্রুটি'। 'ত্রুটি'টা হতে দিবি নাকি? দু'দিন বাদেই তো দেখা যাবে প্রেমের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছিস!

বলছিস? আহা! তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আর 'ঈশ্বর' নামের যদি কেউ কোথাও থাকে তার কাছে প্রার্থনা করি—যেন তুই চটপট আমার এই লালকালিতে লেখা 'পত্তর'টার একটা রিটার্ন দিতে আসিস!

চলে গিয়েছিলো হাসতে হাসতে। তবু কোথায় যেন একটু বেদনার মোচড় ছিলো।

কিন্তু পাপিয়া কী করবে? পাপিয়া যে নিজেই সেই অভাগা সহপাঠীটির ভাষায় কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।

নিজেকে 'তুচ্ছ' না ভাবলে কী আর এমন হ্যাংলা স্বভাব হয়?

তুমি এসে এখানেই বসে থাকলে? বাড়ির মধ্যে যাবে না?

যদি নাই যাই?

তাহলে আমাকেই চলে যেতে হয়।

তাই বুঝি? তাহলে বিদেয় হই—বলে পাপিয়া উঠে দাঁড়ায়।

এখন বাপ্পা অপ্রতিভভাবে বলে, তা বলে এক্ষুণি চলে যেতে বলিনি।

বিদেয় হও—বলা পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত বলছো?

কী আশ্চর্য! তুমি যে কেন আমার অস্বস্তিটা বুঝতে পারছো না।

পাপিয়া শান্ত গলায় বলে, বুঝতে পারছি। আর পারছি বলেই উঠে যাচ্ছি।

আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে যেতে যেতে মনে মনে বলে, শৌভনিক রে। তোর 'পত্তরে'র রিটার্ন পাবার আশা ছাড়। তারপর আবারও সেইভাবে বলে, হয়তো সেটাই ঠিক। ওই লোকটা বিয়েটিয়ে করে বোকাটে একটা ঘরসংসারী জীব হয়ে গেছে, এ দৃশ্যটাও তো ঠিক মনে এঁকে ফেলতে পারা যায় না।

কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের ছবিটাই কী কখনো কোনো সময় এঁকে ফেলতে চেষ্টা করেছে পাপিয়া?

না। পাপিয়ার কাছে এই 'নিজে' বলে কোনো শব্দই কী ছিলো কখনো? পাপিয়ার ধ্যানজ্ঞান লক্ষ্য ছিলো তাকে একটা 'আস্ত মানুষ' হয়ে উঠতে হবে। মানুষের সেবা করবার শক্তি অর্জন করতে হবে। আর সেই সেবা করবার ইচ্ছে থেকেই বেছে নিয়েছিলো শিক্ষার এই লাইনটা। ডাক্তারি! ডাক্তার হলে সে সুযোগ সহজে হাতের কাছে এসে যায়।

সেই লক্ষ্যেই তো অগ্রসর হচ্ছিলো?

হঠাৎ কেন শান্ত অরণ্যে ঝড় উঠলো? কেন সেই ঝড়ে সব ওলোটপালোট হয়ে গেলো? সেই

ওলোটপালোটের মধ্যেই না হঠাৎ নিজের 'নিজে'টাকে আবিষ্কার করে বসলো পাপিয়া।.....দেখে অবাক হয়ে গেলো কোন শৈশব বাল্য থেকে অজান্তে নিজেকে বিকিয়ে রেখে বসে আছে পাপিয়া! অথচ নিজেরই জানা ছিলো না। সেই ছেলেবেলায় আকর্ষণের মানে জানতো না, ভালোলাগার কারণ বুঝতো না। শুধু ছিলো তারা।

পাপিয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে যাবার পর ভয়ানক একটা অস্থিরতা বোধ করল বাপ্পা! যেন কোথায় কী একটা ভেঙেচুরে গেল। অথচ অনুভবে আসছে না সেটা কী? সত্যিই কী ছিলো কোথাও কিছু?

হঠাৎ খুব একটা রাগ এলো বাপ্পার নিজের বাড়ির ওপর।...যেন সবাই মিলে বাপ্পাকে একটা ফাঁদে ফেলে দিয়ে মজা দেখছে।

কী দরকার ছিলো আদিত্য গাঙ্গুলী নামের লোকটার এমন গা ছেড়ে বিছানায় পড়ে থাকবার? এটা যেন লোকটার অপরকে জব্দ করার একটা ফন্দি।....কী দরকার ছিলো নয়নতারা গাঙ্গুলীর এমন আচমকা সরে যাওয়ার? বাপ্পার উপস্থিতির মধ্যে? পালিয়ে গেলে কী এভাবে আটকে পড়তো হতো?...আর কী দরকার ছিলো এই সময়ই সত্যব্রত গাঙ্গুলীর 'পাবনা-প্রেম' জেগে ওঠবার?

আর সবথেকে রাগ হতে থাকলো শিলাদিত্যের ওপর।

তুই তো বেশ যা ইচ্ছে করে দায়িত্বমুক্ত হয়ে পার পেয়ে গেলি। যতো দায় দাদার। কেন?

এ প্রশ্নে আদিত্য বলেছে, ওর কথা তুলে লাভ কী? 'অমানুষের' কাছে আবার কার কী প্রত্যাশা? তবে তুমিও যদি 'অমানুষের' লিস্টে নাম রাখতে চাও, বলবার কিছু নেই!

এ কী ভয়ানক অবস্থায় পড়া! কেন সবাই তাকে বেঁধে মারবে। আর বাপ্পাকে নিরুপায় হয়ে সেই মারটা খেতে হবে পড়ে পড়ে? বাপ্পা ভেতরে বাইরে যতো অসহায়তা বোধ করে ততো রেগে উঠতে থাকে।....আর হঠাৎ কখন মনে মনে বলতে শুরু করে, 'এতো সব ঝঞ্ঝাটের মধ্যে তুমি কেন আবার অদ্ভুত একটা ঝঞ্ঝাটের মূর্তি নিয়ে আমার সামনে দাঁড়ালে বল তো? আমার স্বভাবটাই উল্টে-পাল্টে যেতে বসেছে। আমি কিছুতেই আমার এই অস্বস্তিটাকে ঝেড়ে ফেলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। অথচ আগে সবকিছুই তা পেরেছি।....আবার ভাবে আসল কথা—এখানে আমার কোনো কাজ নেই, তাই এমন অসহায়তা অনুভব করছি। না না! এ চলতে পারে না। এ হতে দেওয়া যায় না। আবার আমায় কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।....আমায় চলে যেতে হবে।

পুরুলিয়ার সেই আদিবাসী লোকগুলোর মুখ মনে পড়ে যায় বাপ্পার। বাপ্পা তাদের 'সাক্ষর' করে তুলতে চেষ্টা করছিলো। তাদের মধ্যে চেতনা এনে দেবার ভাষা আয়ত্ত করছিলো। তারা বাপ্পাকে ভালোবেসেছিলো, বিশ্বাস করেছিলো।

বাপ্পাদিত্য গাঙ্গুলী! তুমি কী সেই সরল লোকগুলোর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে? তা হতে পারে না!

এই, এই, গাড়িটাকে একটু থামাও না—চটপট।

খ্যাঁচ্ করে গাড়িটাকে থামিয়ে যুধাজিৎ ঘাড় ফিরিয়ে বলে, কী হলো?

আরে কতোখানি এগিয়েই এসে গেলাম। মেখলা বলে ওঠে, ওই যে ফুটপাথের ওপারে ওই দোকানটার সামনে একজনকে দেখতে পাচ্ছো, একটা হাত ব্যাণ্ডেজ করা গলায় ঝোলানো, কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট পরা। আঃ! কোন দিকে তাকাচ্ছো? ওই স্টেশনারি দোকানটার সামনে! তাকাও না—দেখতে পাচ্ছো না?

যুধাজিৎ বলে, হুঁঃ। পাচ্ছি। তো ওকে তোমার দরকার?

ভীষণ দরকার। কিছুতেই ফসকানো চলবে না।

কী ব্যাপার ? প্রাক্তন প্রেমিক নাকী ?

আঃ। অসভ্যতা কোরো না তো। আমি এগোচ্ছি। তুমি এসো।

মেখলা নেমে পড়ে ডান হাতখানা উঁচু করে এগোতে থাকে কোনো একটা কিছু নাম ধরে ডাকতে ডাকতে। রাস্তার বহুবিধ শব্দে সেই ডাক-এর মর্মোদ্ধার করতে পারে না যুধাজিৎ ! তবে না পারলেও বুঝতে পারে লোকটাকে মেখলার সত্যিই 'ভীষণ দরকার'। তা না হলে রাস্তার মাঝখানে একটা একহাত ভাঙা লোকের বাকি হাতখানা বেপরোয়া চেপে ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে আসে।

নলিন সরকার স্ট্রীট থেকে বেলেঘাটায় মুখুজ্যেবাড়ির দরজা পর্যন্ত সারাক্ষণ সন্ধ্যাতারা চোখ মুছেছে, নাক মুছেছে, আর মাঝে মাঝে একটা কথাই উচ্চারণ করেছে, 'বাবা আর ফিরেছেন !'

আপন হৃদয়ভারে ভারাক্রান্ত সঙ্গী মেয়েটা তখন বলে উঠছে বটে, 'ওকথা কেন ভাবছো বড়মা ? সেখানে থাকা সম্ভব হবে এমন মনে হচ্ছে তোমার ?'

সন্ধ্যাতারার চোখের জল আরো উপছে উঠেছে, 'বাবাকে তুই চিনিস না পাপিয়া। বাবার কাছে 'অসম্ভব' বলে কিছু নেই।'

অন্যসময় হলে পাপিয়া তার চিরঅবোধ বড়মাকে নানা কথায় ভুলিয়ে চাঙ্গা করে তুলতে চেষ্টা করতো, কিন্তু এখন নিজের মধ্যেই জোরের অভাব। তাই আলগা আলগাভাবে এক একবার বলছে, 'তুমিই তো বলো আগে থেকে 'অশুভ' চিন্তা করতে নেই। তবে নিজেই তা করছো কেন বল তো ?

আবার উথলে উঠছে সন্ধ্যাতারা, আমি যে দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছিরে পাপিয়া। বাবা আর ফিরবেন না।

দিব্যচক্ষে ? তোমার তাহলে দিব্যদৃষ্টি আছে বল ?

অবস্থায় পড়ে আসে সে দৃষ্টি। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, বাবা শত অসুবিধেতেও পাবনাতেই থেকে যাবেন !

পাপিয়া তেমনি নির্লিপ্ত গলায় বলে, তাহলে ধরে নিতে হবে সেই থাকাটা ওঁর কাছে সুখের হবে !

তা তো হবে। কিন্তু আমাদের ?

আবার অশ্রুধারা দুর্বার।

পাপিয়াও যেন হঠাৎ কেমন নির্বিকার।

কাঁদতে দিচ্ছে সন্ধ্যাতারাকে। চুপচাপ জানলার বাইরে তাকিয়ে।

বাড়ির কাছাকাছি আসবার আগে বলে, এবার নিজেকে একটু সামলাও বড়মা। এভাবে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ঢুকলে জ্যেঠু আপসেট হয়ে যাবেন ! তাছাড়া অন্য সবাইও তো—

অন্য সবাই। জ্যেঠু ! তাই তো, কী মুশকিল।

সন্ধ্যাতারা তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে। সফলও হয়।

কিন্তু আবার একটা ভয়ানক বেসামাল হয়ে পড়বার অবস্থা ঘটবে তা কী স্বপ্নেও ভেবেছিল সন্ধ্যাতারা ? অথবা তার পাহারাদার পাপিয়া মুখার্জি ?

ট্যাক্সিটা মোড় ঘুরতেই পাপিয়া অবাক গলায় বলে, বাড়ির সামনে মেখলাদের গাড়িটা দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে !

হ্যাঁ, রাস্তায় ধরে ফেলা হাতভাঙা লোকটাকে হাত ধরে হিড়হিড় করে টানতে টানতে, শেষ

পর্যন্ত গাড়ির মধ্যে ভরে ফেলে, সে গাড়িকে এই বাড়িটার সামনে এনে ফেলতে সক্ষম হয়েছিলো টুসকি!

তবে খুব সহজে কী?

'কালো প্যান্ট সাদা শার্ট' গলায় একটা হাত-ঝোলানো লোকটা বাকি হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা কী কম করেছিলো?

কিন্তু পেরে ওঠেনি।

যুধাজিৎ বলেছিলো, বৃথা চেষ্টা করবেন না দাদা। মহিলাটি যে কী ডেঞ্জারাস জাঁদরেল, সে ধারণা নেই আপনার। তাছাড়া দেখছেন তো এই দেড় মিনিটেই আশপাশে লোক জমতে শুরু করছে। করবে না? একদম হিন্দি সিনেমার একখানা ঘোরালো 'সিন'। চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে পুলিশ ডাকতে তো পারবেন না।

দৃশ্যটা অবলোকন করে শেষ পর্যন্ত গাড়িতে উঠেই পড়তে হয়েছিলো গলায় হাত-ঝোলানোকে। বলেছিলো, এই হাতটা যে বড়ই বেকায়দায় ফেলেছে, তা না হলে—তারপর মুখ ফিরিয়ে বলেছিলো—একখানা গাড়িবান বর বাগিয়ে তোর খুব উন্নতি হয়েছে দেখছি।

যুধাজিৎ বলেছিলো, দেখলেন তো? বলিনি দারুণ ডেঞ্জারাস মহিলা।

গাড়িটা চলছে।

কালো প্যান্ট সাদা শার্ট ব্যস্ত গলায় বলে ওঠে, ও মশাই, কোনদিকে চলছেন?

ঠিক দিকেই।

দিকটা ঠিক করবে কে? থামুন! এই সামনের মোড়ে আমায় নামিয়ে দিন।

সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় মানে?

মানে দেখছেনই তো হুকুমের চাকর। হুকুম না পেলে—

বাজে কথা রাখুন। গাড়ি থামান। না হলে—

মেখলা একটু হেসে বলে, না হলে কী করবে? 'আমায় কিড্‌ন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছে—' বলে চেঁচাবে?

তোর মতলবটা কী?

ধরতে পারছো না?

ধরতে পারলেই কী ভেবেছিস ধরা দিতে যাবো?

মেখলা জোরের সঙ্গে বলে, কেন নয়? ধরে যখন ফেলেছি, ঠিক জায়গায় জমা দিয়ে তবে আর কাজ।

বাজে কথা রাখ। গাড়ি থামাতে বল। হুকুমের চাকরটি তো আবার মালকিনের হুকুম ভিন্ন কিছু করবেন না। বল, আমায় নামতে হবে।

মেখলা এখন হঠাৎ সুর বদলে কাতর গলায় বলে, আচ্ছা তোমাদের মনে কী মায়াদয়া বলে কিছুই নেই? মা-বাপ ভাই বোন অন্যসব আপনজন কেউ কিছু না? সবার উপরে 'প্রেমই সত্য' তাহার উপরে নাই? আমার মায়ের পেটের দাদাটির হচ্ছে পার্টিপ্রেম, আর তোমার হচ্ছে পত্নীপ্রেম। অবস্থা একই।

পত্নীপ্রেম?

গলায় হাত-ঝোলানো কালো প্যান্ট সাদা শার্ট হঠাৎ বেমক্কা একটা জোর হাসি হেসে বলে ওঠে, কী বললি? পত্নীপ্রেম? হা হা। মাথা নেই তার মাথাব্যথা!

মেখলা চমকে উঠে বলে, 'নেই' মানে ?

নেই মানে নেই ! আর কোনো কথা নেই।

মেখলা একটু থতমত খেয়ে যায় ! একটুক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর দ্বিধা জড়ানো গলায় আস্তে বলে, তাহলে তো যেতেই পারো—

যেতেই পারি ? সেখানে এই 'নিখিগ্নে' মুখটা দেখাতে যেতেই পারি ? চোখের চামড়া বলে একটা জিনিস নেই ? যার জন্যে এই এতোদিন—

হঠাৎ থেমে যায়। একখানা হাত তুলেই মুখ ঢাকে।

যুধাজিৎ গাড়ির গতিটা একটু কমিয়ে আনতে আনতে স্থির শান্ত গলায় বলে, সেখানে ওটা কোনো প্রবলেমই নয়।

না না। দোহাই আপনার। আমায় ছেড়ে দিন।

আর কোথায় ছেড়ে দেব ? এসেই তো গেছি। দিলে বাড়ির মধ্যেই ছেড়ে দিতে হবে। তাই দেওয়া হবে।

টুসকিদের গাড়ি ? চিনতে পারছিস তুই ?

ওমা। চিনবো না ? মানুষ চেনাই শক্ত বড়মা। আর সবই সহজে চেনা যায়।

এই দার্শনিক উক্তিটি করে ট্যাক্সিভাড়া মেটানোয় মন দেয় পাপিয়া। ততক্ষণে ভিতরে ঢুকে যায় সন্ধ্যাতারা। সহজেই ঢোকে। দরজা খোলাই ছিলো।

ঢুকে এসে সামনের ঘরের দরজা থেকেই সাড়া নেয় সন্ধ্যাতারা। গাড়িতে কে এসেছে রে ?.....আর তারপর ঘরের দরজার মধ্যে পা ফেলার পর ? হঠাৎ প্রায় আর্তনাদের মতো একটা শব্দ ঘরের বাতাসে আছড়ে পড়ে যেন দেয়ালে দেয়ালে ধাক্কা মেরে ছড়িয়ে পড়ে—'কে ? কে ? অ্যাঁ—খোকন। তুই ! কী হয়েছে তোর ? কী দেখাতে এলি আমায় ?'

বনছায়ার অনেকগুলো উদ্বিগ্ন প্রশ্নে যুধাজিৎ অবহেলাভরে বলে, এমন কিছুই হয়নি গো মা। শুধু আমার ওই শালাবাবুটি একটা রিকশাগাড়ির হ্যাণ্ডেলে ধাক্কা খেয়ে নিজের একখানি হ্যাণ্ড জখম করে বসেছেন।.....তাই বললাম তোমার বৌমাকে, তোমার খোকনদা হাতখানাকে ভাঙলেন ভাঙলেন, কিনা রিকশার ধাক্কায় ? ছিঃ, একখানা জম্পেস কিছু জুটলো না ? লরী ট্রাক মোটরগাড়ি, নিদেনপক্ষে—মোটরবাইক, অটোও—তা নয় রিকশার হ্যাণ্ডেল ! মানসম্মান বলে কিছু থাকলো ?

বনছায়া ষাট ষাট করে বলেন, কী যে বলিস !....ট্রাক লরী ! মোটরগাড়ি ! দুর্গা দুর্গা। ভগবান অল্পের ওপর দিয়ে ফাঁড়া কাটিয়ে দিয়েছেন। যা সব দস্যি দস্যি গাড়ির নাম করলি, তাই হলেই বুঝি ভালো হতো ? তাতে আরো কতো বড়ো বিপদ হতে পারতো তা ভাব ? তোদের এ যুগের 'মানসম্মানের' মাপকাঠিকে বলিহারী ! 'অ্যাক্সিডেন্ট' হতে হলে—বড় গাড়ি না হলে মানসম্মান থাকবে না ? এমন কথা সাতজন্মে শুনিনি বাবা।

যুধাজিৎ বলে ওঠে, কেন শুনবে না গো মা। চিরকাল কথা নেই, 'মারি তো গণ্ডার। লুঠি তো ভাণ্ডার !' 'বড়র' প্রতিই তো সম্মান লোকের।

সে সম্মান কী 'মাপে বড়র' প্রতি ?

তা 'বড় মাপের'টি আর সর্বদা জুটছে কই ? তাই 'বড় মাপের মানুষ' খোঁজার দিকে যেতে জানে না লোকে ! মাপে বড় জিনিসের দিকে ঝোঁকে।

সবসময় তোর তত্ত্বকথা। তো কই বৌমা, এসো, ভালো করে সব শুনি তোমার কাছে ঘটনাটি।

জিতুর তো খাপছাড়া খাপছাড়া কথা। আহা ! বড়ো একটি ভালো কাজ করেছ আজ মা ! মায়ের বাছাকে মায়ের কাছে ধরে এনে দিতে পেরেছো। তোমার পিসির খাঁ খাঁ করা শূন্য প্রাণখানা ভরলো, জুড়লো। একই শহরের মধ্যে থেকে ছেলেটার মুখ দেখতে পাচ্ছিলেন না মানুষটা ! ভাবা যায় ? আর ছেলেকেও বলিহারী দিই। কী পাষাণপ্রাণ গো !

যুধাজিৎ হেসে হেসে বলে, তোমার ছেলের মতো এমন 'কাদার প্রাণ' আর কটা খুঁজে পাবে মা ? দিকে দিকে তাকিয়ে দেখো ? সব প্রাষাণপ্রাণ !

তা সে তো একশোবার। ভগবানের অশেষ কৃপা আমার ওপর। তাই তোর মতো ছেলে পেয়েছি।

দেখেলে ? দেখলে মেখলা ? 'গুড়বয় হয়ে' মরলাম গাটা আমি। আর ক্রেডিটটা জুটলো মহাত্মা ভগবানের !

সেটাই নিয়ম। কিন্তু মা, আসছি আপনার কাছে। তবে তার আগে কাকার সঙ্গে দেখা করে আসি। এতোক্ষণ ছিলাম না। বার কয়েক নাকী খোঁজ করেছেন !

বনছায়া ওর চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলেন, মেয়েটার গুণের তুলনা হয় না। মনে মনে ভয় ছিলো, তোর কাকাকে স্বচক্ষে দেখতে পারবে কিনা। যতই হোক একটু খামখেয়ালি বিদঘুটে মতো তো ?

একটু ?

আহা, না হয় অনেকটুকুই। তো সে ভয়ও তো থাকতে দেয়নি বৌমা। কী রকম আপন করে নিয়েছে মানুষটাকে। ভালোবাসা ! ভালোবাসাই পারে পরকে আপন করতে, 'অসহ্য'কে সহ্য করাতে !....আবার সেইটুকুর বিহনেই—আপনকে পর করায়।

কারেক্ট। সেইটুকুর বিহনেই ল্যাংড়া গাছে 'আমড়া ফলায়। যেমন 'শ্রীমতী বনছায়া দেবী' নামের ল্যাংড়া আমের গাছটিতে শ্রীমতী শুভশ্রী দেবীরূপ আমড়ার ফলন।

আঃ। দিদিকে অতো ঠাট্টা করিস কেন বল তো ?

ঠাট্টা ? পিওর সত্য। জামাইবাবু হেন মহাপুরুষটার ভাগ্যে কিনা ওই টক আমড়া।.....কথাটা বলেই যুধাজিৎ একটু হাসে। বলে, তবে আমড়া গাছে ল্যাংড়া ফলার দৃষ্টান্তও যে নেই তা নয় মা।.....গলাটা একটু নামিয়ে বলে, সে দৃষ্টান্ত তোমার ঘরেই মজুত।.....যাক গে, নাম করে বলাটা ঠিক নয়। যতই হোক মাননীয়া গুরুজন তো।

বনছায়া সরল তবে অবোধ নন। তাই কথাটা ধরতে দেরী হয় না। আর তাই আস্তে বলেন, দোষ দেওয়া যায় না রে। তার ভেতরেও তো অনেক জ্বালা।.....তো ছাড় ও কথা। কই বৌমা এলো না ?

জ্বালাবিহীন হৃদয় বনছায়া যে কী করে অন্যের 'জ্বালা'টা বুঝে ফেলেন, এটাই আশ্চর্য। আরো আশ্চর্য, সেই জ্বালার প্রতি সহানুভূতির 'অনুভূতি'।

যুধাজিৎ সর্বদা দেখা এই আশ্চর্যের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েও, স্বভাবসিদ্ধভাবে বলে ওঠে, বৌমা ? তিনি বোধহয় তাঁর 'ফ্রেন্ড' কাকাশ্বশুরের কাছে, তাঁর হতভাগ্য হাতভাঙা দাদার দুর্দশা-কাহিনীটি শোনাতে বসে গেছেন। এক পোড়-খাওয়া ভ্রান্ত পথিকের কাছে, আর এক সদ্য পোড়া ভ্রান্ত পথিকের কাহিনী। দুজনের জীবনের হিস্ট্রীতে একটা সাদৃশ্য আছে। করুণ করুণ দুঃখময়।

তা কাহিনীটি সত্যিই বড় করুণ।

'ভালোভাবে থাকতে চাই, বাঁচার মতো করে বাঁচতে চাই।' এই শ্লোগানটি মনে গেঁথে, বেলেঘাটার মুখুয্যেবাড়ির বড় নাতি স্বর্ণাক্ষ মুখার্জির মুখুয্যেবাড়িখানাকেই ত্যাগ করে চলে যাওয়ার ভ্রান্ত বুদ্ধি

তাকে যে পথে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিলো তা ক্রমশঃই মৃত্যুর পথ। কারণ তার পথসঙ্গিনীটি ভালোভাবে বাঁচতে হবে—এই মন্ত্রটাকেই আরো জোরে আঁকড়ে ধরে নিজের পথ দেখতে বসেছিলো।....

বুঝে ফেলেছিলো 'নৌকো' বাঁধতে হলে বড় গাছে বাঁধাই বুদ্ধির কাজ।

ফলশ্রুতি ডিভোর্স।

এবং পরবর্তী ঘটনা, বাড়িওয়ালার বড়লোক শালার ছেলেটিকে বেছে নেওয়া।

ভুক্তভোগী কাকাশ্বশুর বলে ওঠেন, সেম ! সেম ঘটনা !.....হয়তো পৃথিবীর সব ধ্বংসের ইতিহাসেই থাকে একই ঘটনা। লোভ আর বিশ্বাসঘাতকতা।

ওদিকে সন্ধ্যাতারা তখন ক্ষণে ক্ষণে ডুকরে উঠছে, 'এই ভাঙাহাতে, তুই এক হাতে—এক হাতেও রেঁধে খেয়েছিস ?....রাস্তার দোকানের ডালরুটি খেয়ে খেয়ে রাত কাটিয়েছিস ?.....মাংস পরোটার পয়সা জোটেনি বলে ডালরুটি !.....ওরে খোকন, শুনে শুনে যে আমার কপাল চাপড়ে মরতে হচ্ছে করছে।....ওরে নিষ্ঠুর নির্মায়িক ছেলে, একবার তোর মায়ের মুখটা মনে পড়েনি ?.....মনে পড়েনি এ সংসারে তোর সব বজায় আছে।

সেইটাই অনুভবে আসেনি মা। মনে হয়েছিলো, কী আর থাকবে ? সবকিছুই তো নিজের হাতে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে এসেছি।

তুই সবাইকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছিস বলেই কী তোকে সবাই ছুঁড়ে ফেলে দেবে খোকন ? এতো ভুলবুদ্ধি কেন ?

ভুল তো গোড়া থেকেই মা।

তবু মনেপ্রাণে তো বুঝিসনি বাবা সেকথা। একবারও তো ভাবিসনি 'আমার যদি কেউ না থাকে, তবু মা আছে।' ওই গুণের সাগর মেয়েটা যাই তোকে দেখে ফেলে ধরে নিয়ে এলো তাই না আবার তোকে ফিরে পেলাম বাবা। তা না হলে—হয়তো তোর মার কাঁদতে কাঁদতেই জীবন অবসান হতো। আশ্চয্যি, এই শহরের মধ্যে রয়েও তুই হারিয়ে বসে রইলি। রাতদিন মাথা খুঁড়েছি, কেউ তোকে খুঁজে আনতে পারলো না।

যার উপর অভিমানভরা কটাক্ষপাত সেই 'কেউ'টার 'প্রতীক', সদ্যপ্রয়াত শুভ্রাঙ্ক মুখুয্যের অপরাধী বড়ছেলেটি আস্তে বলেন, একটা অ্যাডাল্ট মানুষ যদি ইচ্ছে করে হারিয়ে যায়, কে তাকে খুঁজে বার করে এনে দিতে পারে ? পারে শুধু দৈব।......সেটাই ঘটেছে। ওসব 'কে, কী বৃত্তান্ত, কী হলে কী হতে পারতো, আর কী না হলে কী হতো না' এসব মিথ্যে আলোচনায় লাভ নেই। ওসব ছেড়ে ছেলেটার শরীরটা যাতে সারে, তার চেষ্টা করো দিকি। কী চেহারা হয়েছে ! চিনতে পারা যায় না।

সত্যিই তাই। 'স্বর্ণাঙ্ক' নামের অধিকারী ছেলেটার যা চেহারা দাঁড়িয়েছে তাতে চিনতে পারা শক্ত। তবু মেখলা চিনতে পেরেছিলো। এবং সেই পাবার সূত্রেই না পলাতক আসামীর এই নাটকীয় প্রত্যাবর্তন।

চেহারা দেখে বাড়ির অন্য সদস্যরা আড়ালে 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' বলে হাসাহাসি করলেও, ওপরে আহ্লাদে আদরে বিগলিত ভাবই দেখাচ্ছেন।

সন্ধ্যাতারা বলে, খোকন! তোর সাতবেলা এঘরে ওঘরে নেমন্তন্নর চাপে মায়ের ঘরে আর খাওয়াই হচ্ছে না।

প্রথমটায় অবাক হয়েছিলো খোকন, 'এঘরে ওঘরে, তোমার ঘরে' এসবের মানেটা কী মা ?

খোকনের হাঁপানী রুগী বাবা শান্ত গলায় বলেছিলেন, থাকতে থাকতেই মানে বুঝতে পারবি বাবা!

তা অবশ্য পারে খোকন। ক্রমেই পেরে যায়।

আর অবাক কথা, এই একদা যে ঠাসবুনুনি অখণ্ড সংসারের চেহারাখানা তার চিত্তে বিরূপতাই এনে দিয়েছে, মনে হয়েছে 'ভেড়ার গোয়াল'! মনে হয়েছে কতকগুলো বোধহীন সৌন্দর্যজ্ঞানহীন কাদার তালের মতো মানুষের সমষ্টিমাত্র, আর মনে হয়েছে 'এভাবে বাঁচার কোনো অর্থ হয় না—' সংসারের সেই পরিচিত চেহারাখানা না দেখতে পেয়ে ভিতরে ভিতরে একটা গভীর শূন্যতাবোধ করছে ছেলেটা। যেন তার কিছুদিনের অনুপস্থিতির অবকাশে, কী একটা বড় জিনিস হারিয়ে গেছে।

এ বাড়ির সব ছেলেমেয়েদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অথচ 'খোকন' নামধারী ছেলেটা হঠাৎ হঠাৎ যেন নিজেকেই এর জন্যে দায়ী করে।.....'আমার ওভাবে চলে যাওয়াই হয়তো কারণ! হয়তো ওই ঘটনাটাই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট করে দিয়েছে। একাত্মতার যে ভাবটি অভ্যাসগতভাবে ধারাবাহিক ধারায় বহে আসছিলো, সেখানে আমার এই অন্যায় অসঙ্গত অসভ্য ব্যবহার ঘূর্ণীস্রোত বইয়েছে।'

ঠিক এই ভাষায় না ভাবতে পারলেও এইরকম একটা অপরাধবোধের ভার সঞ্চিত হয়েছে এ বাড়ির স্বর্ণাঙ্ক নামের ছেলেটার মধ্যে।....আমিই সব বেঠিক করে দিয়েছি।.....অথচ নিজের জীবনটাকেও বেঠিক করে বসেছি, তচনচ করে ফেলেছি। এখানে এসে সেই পুরনো ছবিখানা ফিরে পেলেই কী আমি আমার পুরনো 'আমি'টাকে ফিরে পেতাম?....সেই সদ্য নিঃশঙ্ক হাওয়ায় ভাসা আদরের দুলাল জীবনটা। পেতাম না। আমার এই ভাঙাচোরা দাগটা কী মুছে যেতো?

নাঃ। একটা আস্ত জিনিস ভেঙে গেলে, আর কিছুতেই আগের চেহারা ফিরে পায় না।

খোকন টের পায় মা আবার তার জীবনটাকে গড়ে তোলবার স্বপ্ন দেখছে। খোকন কী সেই স্বপ্নের অংশীদার হতে যাবে?.....

তা হয়তো হতে পারে। মেরুদণ্ডহীন ছেলেটা আবার একটা কাউকে অবলম্বন করতে চাইবে। কিন্তু সন্ধ্যাতারার স্বপ্নছবিটি কী তাতে রূপ নিয়ে গড়ে উঠতে পারে?

তা পাবার নয়।

ভাঙাগড়ার খেলারও যে একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা আছে। তাই আবারও একদিন দেখা যাবে বেলেঘাটার এই মুখুয্যেবাড়িটার মধ্যে যারা অনেকদিন ধরে এক ছাতের তলায় মাথা রেখে বাস করছিলো, তারা বাসাভাঙা পাখির মতো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে চলে গেছে এই ছাতের তলাটাকে পরিত্যাগ করে। যেমন একসময় এদেরই আগের পুরুষ পুরনো বাসা ভেঙে ছড়িয়ে পড়েছিলো সেই মানিকতলার চকমিলোনো বাড়িটা থেকে।....বৃহৎ বৃক্ষের শাখা-প্রশাখারা ছড়িয়ে পড়ে, কেউ আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আবার মাটিতে ঝুরি নামিয়ে নামিয়ে প্রতিষ্ঠিত চেহারা নিয়ে দীপ্যমান হবে। কেউ হয়তো ঝড়ে ভেঙে ধুলোয় মাটিতে মিলিয়ে যাবে।

শাখা-প্রশাখারা ক্রমশঃ আর কেউ কাউকে চিনতে পারবে না। খেয়ালও করবে না একদা একদিন তাদের মূল কাণ্ডটি একই ছিলো।...

আবার দূরকালে কেউ একদিন তার শিকড়ের খোঁজে অস্থির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবে।....তার মনে হবে শিকড়টাকে জানা হচ্ছে সবথেকে জরুরি। যেন সেইখানেই রয়েছে তার অস্তিত্বের স্বীকৃতি।

অভাবিত ঘটনাচক্রের দুরন্ত ঝড়ে শিকড় উপড়ে বহুদূরে ছুটে এসে পড়া পাবনার উকিল- পাড়ার সত্যব্রত উকিল কী একচল্লিশ বছর পরে আবার তাঁর সেই শিকড়ের মাটিতে গিয়ে পড়ে, তাঁর সেই অস্তিত্বের স্বীকৃতিটি খুঁজে পেয়ে গেলেন? দেখলেন তাঁর কিছুই হারায়নি।....সেই তাঁর আকাশ বাতাস

মাটি গাছপালারা তাঁকে চিনতে পেরে উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো, 'সে কী? চলে যাবে কী বলো? থাকো। থাকো!'

নীহারিকা বিপন্ন গলায় বললো, বাবা সেই তাঁর কী যেন ডাক্তারের ছেলে পেণ্টু না ঘণ্টুর ভরসায় সেখানে রয়ে গেলেন? বলছো কী নীলুদা? তুমি শুনলে সে কথা? জোর করলে না?

নীলু একটু হেসে বলেন, তুই চিরদিনই ছেলেমানুষ থেকে গেলি নীরু। আমি জোর করবার কে?

আদিত্য বলে ওঠে, অতো বেশী উত্তেজিত হবার ভান দেখাচ্ছো কেন বলতো? ধরা পড়ে যাবে যে?

তোমার এ কথার অর্থ?

চিরটাকাল আমার কথা শুনে এলে অথচ আজ পর্যন্ত তার অর্থটা বুঝে ফেলবার বুদ্ধিটা জন্মালো না? আশ্চর্য তো। বাবার ডিসিসানে ভালোই তো হলো। ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারলো!... ওহে নীহারিকা দেবী, তুমি কী ভেবেছিলে, পাবনার সত্যব্রত গাঙ্গুলী পাবনায় গিয়ে পড়ে, আবার তোমার এইখানে ফিরে আসবে?

ওঃ। তুমি তাহলে জানতে আর ফিরে আসবেন না।

অফ কোর্স। জানতামই তো।

অথচ যেতে দিয়েছিলে? বাধা দাওনি।

বাধা দেবো? কেন বাধা দেবো? যে মানুষটা প্রাণপণ চেষ্টায় 'চিরআকাঙ্ক্ষিত স্বর্গে'র কাছে পৌঁছে গেছে, তাকে আবার টেনে আস্তাকুঁড়ে নামিয়ে আনার জন্যে?

কী? এখানটা আস্তাকুঁড়?

আমার তো তাই ধারণা।

তবু নিজে এখানেই পড়েও তো আছো।

উপায় কী? আমার তো আর দ্বিতীয় কোনো জায়গা নেই। তাই পড়ে মার খেয়ে চলেছি সারাজীবন।

তুমি। তুমি সারাজীবন পড়ে মার খেয়েছো? ওঃ। ইচ্ছে করে পঙ্গু সেজে বিছানায় গা ঢেলে, রাজাই আরামে চালাচ্ছো, কোথা থেকে তার রসদ আসছে, তা না দেখবার জন্যে বেঁহুশের ভান করে দিব্যি মজা মারছো—আর তবু বলছো কিনা—বলছো কিনা....এখানটা এখানটা—নীহারিকা হাঁপাতে থাকে। আস্তাকুঁড়। চিরকাল তুমি আমায় অপমান করে এসেছো। কেন? কেন? আমি এর শোধ নেবো। এক্ষুণি নেবো জব্দ করে যাবো তোমায়—

ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় নীহারিকা। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই একটা ধাক্কা খায় বাপ্পার সঙ্গে। বাপ্পা ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেতো।

কী ব্যাপার? এ ভাবে যাচ্ছো কোথায়?

কোথায় যাচ্ছি? মরতে। মরতে যাচ্ছি। ছেড়ে দে আমায়। সরে যা আমার সামনে থেকে। গাড়ির চাকার তলায় গিয়ে পড়বো আমি—

বাপ্পা কিন্তু স্থির গম্ভীরভাবে বলে, সেটা বরং পরে ধীরেসুস্থে যেও। এখন এক্ষুণি একটা নার্সিংহোমে যেতে হবে।

বাপ্পার কণ্ঠে যেন একটা অমোঘ স্বর।

নার্সিংহোমে! হঠাৎ বুকটা কেঁপে ওঠে নীহারিকার। বাকি দুই সন্তানের মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। অস্ফুট স্বরে একটা কিছু প্রশ্ন করে। হয়তো সেই প্রশ্নটা হচ্ছে, কেন? কী হয়েছে?

বাপ্পা সেইভাবেই যেন একটা ধাতব কণ্ঠে বলে, শিলু একজন লোককে পাঠিয়েছে তোমায় জানাতে—ওর স্ত্রীকে নার্সিংহোমে দেওয়া হয়েছিলো, ইয়ে বোধহয় বাচ্চাটাচ্চা হতে, হঠাৎ অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়ে—

কী ? কী বলছিস ? থেমে গেলি কেন ? কার অবস্থা খারাপ ?

ওর স্ত্রীর। বোধহয়—বোধহয় এতোক্ষণে—

আবারও চুপ করে যায়।

কিন্তু আর বলবার কী আছে ?

যা বোঝবার তা তো বোঝাই হয়ে গেছে।

তার মানে পরম দুঃখের সময় মাকেই প্রথম মনে পড়ে গেছে নীহারিকার ছেলের। যেন অনুভব করেছে— সেখানেই আশ্বাস আর আশ্রয়।

কিন্তু নীহারিকা ! তুমি কী ? অ্যাঁ ? কী তুমি ? এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্যে, তোমার মধ্যে এমন একটা পুলকের ভাব ফুটে উঠতে চাইছে কেন ?

কী আশ্চর্য ! তোমার ছেলেটা কতখানি হারিয়ে ফেললো, সে কথা মনে পড়লো না তোমার ? তুমি কী পেয়ে গেলে সেই হিসেবটাই বড়ো হয়ে উঠলো ?

নীহারিকা যখন পৌঁছলো, শিলাদিত্যর শাশুড়ী তখন সেই নার্সিংহোমেই আছড়া-আছড়ি করে চলেছেন, ওরে আমি কী কাজ করলাম। কী কাজ করলাম। কেন আমি সর্বনেশে ডাক্তারদের কথা শুনলাম।.....খুকুর যে আমার চিরদিন ছুরিতে বড় ভয়। ও যে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলো, 'মা ভীষণ ভয় করছে। ভীষণ ভয় করছে—' তবু আমি তাকে ছুরির নীচে সঁপে দিয়ে গেলাম। ওরা আমার খুকুকে কেটেকুটে মেরে ফেললো।

উন্মাদিনীর মতো সেই আছড়া-আছড়ি। এলোপাথাড়ি বিলাপ।

এ যুগে শিক্ষিত আর বিত্তবানেদের ঘরে কেউ 'সিজিরিয়ান' শিশু ভিন্ন অন্য কিছু ভাবতেই পারে না। কারণ অন্য কিছুটা—ইচ্ছে নেহাৎই সেকেলে গ্রাম্যতা। যে আসছে, সে যেন বিনাযুদ্ধে আসতে পায়, যুদ্ধক্লান্ত না হয়। কাজেই এখানেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। ভাগ্যের পরিহাস। শিশুটা বিনাযুদ্ধে বিনা আয়াসে পৃথিবীর আলো দেখবার সুযোগ পেয়ে যাবার পরক্ষণেই তার জননীর চোখের আলোটি মুছে গেলো চিরতরে।

যে দুটো প্রাণ অনেকগুলো দিন ধরে একই আহার আর একই শ্বাসপ্রশ্বাসে বর্ধিত হচ্ছিলো, তাদের মধ্যে একজন অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর জগতে এসে পড়লো, অপরজন আচমকা আলোর জগৎ থেকে হারিয়ে গিয়ে তলিয়ে গেলো অজানা অন্ধকারে।

সেই হঠাৎ হারিয়ে যাওয়ার প্রবল ধাক্কায় বেসামাল তার মা, লোকলজ্জা বিস্মরণ হয়ে, সভ্যতার শর্ত অবহেলা করে আর্তনাদ করে চলেছেন, ওরে খুকু, তোকে হারিয়ে ফেলে শূন্য প্রাণে কোন মুখে ফিরে যাবো আমি ! আমাকেও তোমরা ওর সঙ্গে চিতায় দিয়ে এসো—গো !

শোকের বিলাপ এমন একটা ব্যাপার যে সহজে থামতে চায় না। কথার পিঠে আরো কথা এসে যায়।....

দুজন নার্স মহিলাকে বুঝিয়ে-বাঝিয়ে নিবৃত্ত করতে চেষ্টায় বিফল হয়ে প্রায় ধমক দিয়ে চলে গেছে। বোধহয় বাড়ির লোককে বলতে গেছে নিয়ে যাবার জন্যে।....এই সময় একজন আয়া কী ভেবে—এই ঘটনার নায়ক সদ্যোজাত শিশুটাকে তোয়ালে মুড়ে পুঁটুলি পাকিয়ে কাছে নিয়ে এসে বলে, শুনুন। একে দেখুন। এর দিকে তাকান। একে নিয়েই আপনার খাঁ খাঁ করা মন আবার ঠিক হয়ে

যাবে।

এ সান্ত্বনায় অগ্নিতে ঘৃতাহুতি পড়ে।

উন্মত্ত শোকে কাণ্ডজ্ঞানহীন মহিলা নতুন করে চীৎকার করে ওঠেন, কী? ওই কালশত্রুটাকে আমি বুকে করে ঘরে নিয়ে যাবো? নিয়ে যাও ওকে আমার সামনে থেকে। ওই সর্বনেশে রাক্ষসটার মুখ দেখতে চাই না আমি! ও যম। সাক্ষাৎ যম! ও জন্মমাত্রই আমার সোনার পুতুলটাকে গ্রাস করে ফেললো! ছোঁব না ওকে আমি।....সরিয়ে নিয়ে যাও।

আত্মহারা শোকের বিকার হয়তো এইরকম এলোমেলো কথা বলায়, পরবর্তী কালের কথা ভুলিয়ে দেয়।...এই হাহাকারই হয়তো ক্ষণপরেই প্রশমিত হয়ে যেতো, ওই তোয়ালেমোড়া পুঁটুলিটাকেই 'ওরে আমার খুকুর স্মৃতি—' বলে বুকে তুলে নিয়ে হৃদয়ের শূন্যতা ভরাতে চেষ্টা করতো, ওকেই 'নয়নের মণি, প্রাণের পুতুল' করে আঁকড়ে থাকতো। কিন্তু সেই 'ক্ষণটি' আর এলো না। বিহ্বল শোকের অসতর্কতার অবসরে 'বল ততক্ষণে অপরের কোর্টে চলে গেছে।'

নীহারিকা এই দুরন্ত নাটকের দৃশ্যের মাঝখানে এসে পড়ে, প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো, আস্তে এগিয়ে এলো। অতঃপর— স্থিরস্বরে—'ঠিক আছে। গাঙ্গুলীবাড়ির ছেলে গাঙ্গুলীবাড়িতেই মানুষ হতে চলুক—' বলে সেই তোয়ালেমোড়া পরম ঐশ্বর্যের পুঁটুলিটাকে কোলে জড়িয়ে ধরে গাড়িতে গিয়ে উঠে বসলো! কী প্রবলভাবে জিতে যাওয়া। শোকাহতা নারী যদি অমন এলোমেলো না হতেন, নীহারিকার কী সাহস হতো কোলে নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়বার? বলে ওঠবার 'ঠিক আছে, গাঙ্গুলীবাড়ির বংশধর সেই বাড়িতে মানুষ হতে চলুক'।

এরপর—ওই অপর পদবির পরিবারের পক্ষ থেকে সেই ঐশ্বর্যের অধিকারের কোনো দাবি উঠলে কী সে দাবি গ্রাহ্য হবে? আইনের কাছে? সমাজ-সংসারের কাছে?

অথচ পরিস্থিতি তো অন্য হবারই কথা।

নীহারিকার তো অনধিকারিণীর ভূমিকায় শিশুটাকে একবার মাত্র চোখে দেখেই নিঃশ্বাস ফেলে চলে আসবার কথা। নীহারিকার ছেলেরই কী সাহস হতো 'বংশের ছেলে' বলে দাবি করে নিজের মার কোলে তুলে দেবার?...ওই ছেলেটার জন্যেই চিরভীতিকর ওই মহিলাটির কাছে আত্মোৎসর্গ করে পড়ে থাকতে হতো। থাকতে হতো কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে।

অদ্ভুত একটা মোহের আর স্বার্থের জালে আটকা পড়ে গিয়ে আপন কেন্দ্রচ্যুত হয়ে যাওয়া ছেলেটা এখন সভয়ে সেই 'জাল'টার দিকে তাকিয়ে দেখে। ভাবে কী অদ্ভুত! ওর মধ্যে আটকা পড়ে থেকেছিলাম আমি এতোদিন? হারিয়ে যাওয়া নিজেকে যেন খুঁজে পেয়ে যায় ছেলেটা। তাই তার একান্ত নিজস্ব ওই প্রাণকণিকাটুকুকে নীহারিকার কোলে চেপে গাড়িতে উঠতে দেখে নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলে।

কে বলতে পারে ওই অতি ক্ষীণপ্রাণ কণিকাটুকুই ভবিষ্যতে একদিন এই স্রোত শুকিয়ে যাওয়া বালুনদীতুল্য গাঙ্গুলীপরিবারে আবার প্রাণের জোয়ার এনে দেবে কিনা। এক থেকেই তো একশো হয়।

এমন তো হয়ও। বৃহৎ বৃক্ষটার কাণ্ডখানায় কুড়ুল পড়লেও—হয়তো পাখিতে ঠোকরানো, মাটিতে পড়ে যাওয়া একটা ভাঙাচোরা ফলের বীজটুকু থেকে জন্ম নেওয়া একটু চারাগাছ ভবিষ্যতে মহীরুহ হয়ে ওঠে। আবার সমৃদ্ধ করে তোলে সেই ভূমি।

কিন্তু এ বাড়ির আর একটা ছেলে? সেই হারিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসা ছেলেটা? ফিরে

এসে আবার হৃতসৌন্দর্য ফিরে পেয়ে সুকান্তি হয়ে ওঠা ছেলেটা! সে তো তার পরিবারের মধ্যেই ছিলো। তার ভাইয়ের ওই শোকের সময়! তার মায়ের এক পরম প্রাপ্তির সময়!

নাঃ, সে ছেলেটাকে আর তার পরিবারের পরিবেশে দেখা যায় না।....এখন দেখা যাচ্ছে...সেই তার একদার রুক্ষ মলিন ধূলি-ধূসরিত পরিবেশে। সেই গায়ে অদ্ভুত একটা ঢোলা জামা, পায়জামা, মাথায় রোদ বাঁচাতে শোলা হ্যাট। তাকে ঘিরে সেই কতকগুলো দেহাতি আদিবাসীর ভিড়।....তার সেবায় নিয়োজিত সেই তারক!

তাহলে কী বলতে হবে, জলের মাছ আবার জলে ফিরে এসে বেঁচে গেছে?

কিন্তু তাই কী? যে ছেলেটা আবার এই পরিবেশে ফিরে এসেছে, সে কী আগের সেই তাজা টগবগে উদোমাদা ছেলেটা? নাঃ। এ যেন সেই 'সন্ন্যাসী আবার ধীরে, পূর্বপথে যায় ফিরে, খুঁজিতে নূতন করে হারানো রতন/সে শকতি নাহি আর, নুয়ে পড়ে দেহভার, অন্তর লুটায় ছিন্নতরুর মতন।'

একদা যে উজ্জ্বল আদর্শের লক্ষ্যে ছুটে চলেছিলো, সেই আদর্শের আলো ক্রমশঃ আলেয়ার মতো মিলিয়ে যাচ্ছে।....আর অজানিতে কখন একটুক্ষণের জন্য যে পরশ পাথরের স্পর্শ পেয়েছিলো, অসতর্কে তাও গেছে হারিয়ে। এখন শুধু আবার মরুবালুর ওপর দিয়ে হেঁটে চলা। চলা ছাড়া গতি নেই।

চলে আসার আগে টুসকি অবাক আর আবেগে বলেছিলো, আবার তুই আমাদের কাছ ছেড়ে সেই জঙ্গলে চলে যাচ্ছিস দাদা?

'দাদা' বলেছিলো, 'তা এখন আর যেতে বাধা কী? শিলুই যখন বাড়িতে এসে গেছে।

টুসকি খুব কড়া গলায় বলেছিলো, তার মানে সেই চিরকেলে কথা! কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস। ছোড়দা বেচারীর বৌটা মরে গেলো—আর তুই সেই সুযোগটি কাজে লাগিয়ে—

বাপ্পা একটু অসহায় গলায় বলেছিলো, কিন্তু ওর দুর্ভাগ্যের জন্যে তো আর আমি দায়ী নই। তবে হ্যাঁ, ওই বাচ্চাটাকে আমার 'পরিত্রাতা' ত্রাণকর্তা বলে মনে হয়েছে। আমি ওর কী নাম দিয়েছি জানিস—

জানি। যীশু।

জানিস? খুব সুন্দর নাম নয়?

সুন্দর কিন্তু নতুন কিছু না। এখন কলকাতার ফুটপাথেও ও নাম খুঁজে পাওয়া যায়।

কোনো কিছুই চিরকাল নতুন থাকে না। তবু সুন্দর চিরদিনই সুন্দর।

হুঁ। তুই আজকাল অনেক কথা শিখেছিস দাদা। আগে এতো জানতিস না। কিন্তু তুই একটা স্কুলে মাস্টারী ধরেছিলি না?

ধরেছিলাম বটে।

সেটার কী হবে?

বাপ্পা হেসে উঠেছিলো, এটা আবার একটা প্রশ্ন? আমি জায়গা খালি করে চলে গেলে, আর একজন বেশী যোগ্য লোক এসে বসে পড়বে সেখানে!

টুসকি বলে উঠেছিলো, কতো সহজেই হিসেবটা কষে ফেললি রে দাদা। কিন্তু জীবনের সব হিসেবই কী ওইভাবে কষে ফেলা যায়? যেখানে তুই ছিলি, তুই জায়গা ছেড়ে দিয়ে চলে গেলেই যোগ্যতর ব্যক্তি সেখানে বসে পড়তে পারে?

বাপ্পা বলে উঠেছিলো, আঃ। 'বিদায়ভোজ' বলে নেমন্তন্ন করে ডেকে এনে, এতো গোলমেলে কথা জুড়লি কেন বল তো? কী খেতে দিবি দে। পেটের মধ্যে ইঞ্জিন চলছে।

বাজে কথা বলে, কথা ঘোরাসনে দাদা। আরও যে কোথাও কিছু দায়িত্ব ছিলো তোর, সেটা

ভেবে দেখেছিস ?

বাপ্পা হঠাৎ অদ্ভুত একটা তাচ্ছিল্যের গলায় বলে, আমি আবার কে একটা লোক বাবা, যে আমার কারো প্রতি দায়িত্ব ! কোথায় আকাশে উড়তে যাওয়া এক মহামান্যজন, আর কোথায় জঙ্গলে ঘুরতে যাওয়া একটা হতভাগা প্রাণী !

টুসকি যেন চমকে ওঠে ! টুসকি এই গলার স্বরে তার বাবার স্বর শুনতে পায়। আহত অভিমানে তিক্তস্বাদ একটি স্বর। যা আদিত্য গাঙ্গুলীর অভ্যস্ত স্বর।

দাদার গলায় হঠাৎ এ স্বর এলো কী করে ?....

টুসকি জানে না এলো কী করে ! কিন্তু সেই স্বরের অধিকারী নিজেই কী জানে ?

তবু এসে গেছে। হয়তো রক্তের ঋণ ! যে ঋণ অলক্ষিতে পাওনা আদায় করে নেয়। এ কথা বাপ্পা নামের ছেলেটা নিজে জানে না।

তবে সে শুধু জানে প্রতিনিয়ত একটা অস্বস্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে পূরো একটা রাত বিনিদ্র কাটিয়ে যেদিন সকালে উঠে স্থির করে ফেললো, সোজাসুজি গিয়ে বলে উঠবে, তুমি আমায় কী জব্দতেই ফেলেছো। আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছো। আর পারা যাচ্ছে না—

ঠিক সেইদিনই—হ্যাঁ সেইদিনই সকালবেলাই—তার রাতের ঘুমের বিঘ্নকারিণী এসে বসে পড়ে বলেছিলো, এই চিরহ্যাংলা মেয়েটা তোমায় অস্বস্তি আর জ্বালাতনের হাত থেকে রেহাই দিয়ে বিদেয় হয়ে যাচ্ছে বাপ্পাদা। শুধু শেষ হ্যাংলামি—দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় তুমি আমায় 'সী-অফ' করতে যেও। যাত্রাকালে মুখটা একবার দেখে যাবো !

বাপ্পা বিচলিত হলো। বাপ্পা হতভম্ব হলো।

বললো, দেশ ছেড়ে চলে যাবার সময় মানে ? কোথায় যাচ্ছো ?

পাপিয়া হাতের ব্যাগ থেকে দু-একটা কাগজপত্র বার করে আস্তে ওর সামনে নামিয়ে রাখলো।

কাগজগুলোয় একটু চোখ ফেলেই ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হলো না।

'ডক্টর মিস পি মুখার্জি তাঁর অধীত বিদ্যার উপর উচ্চতর শিক্ষা আহরণের জন্য বিদেশ যাত্রা করছেন। যাত্রার সহায় একটি ভালো স্কলারশিপ্।'

দেখে বাপ্পাদিত্য গাঙ্গুলী নামের শুধু বি. এ. পাশ ছেলেটার টানটান হয়ে থাকা মনে হঠাৎ মনে হয়েছিলো কেউ তার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিলে। ঝনঝনিয়ে উঠেছিলো স্নায়ুশিরা। আর সেই টানটান সুরেই বলে উঠেছিলো, ওঃ আকাশে উড়ে সাগর পার হতে যাবার সময় একটা দীনহীন লোকের ঊর্ধ্বমুখে ফ্যালফেলিয়ে তাকিয়ে থাকার দৃশ্যটা বুঝি খুবই জরুরি ?

কী ?

চমকানিটা সুস্পষ্ট !

বিস্ময়াহত দুটো চোখ কেমন বোকার মতো তাকিয়ে দেখেছিলো এই অকারণ রূঢ়তার দিকে।

চোখ দুটোয় যেন নিঃশঙ্ক একটা পাখির আচমকা বাণ খাওয়ার বিস্ময়-বেদনার মর্মান্তিক অভিব্যক্তি।

কিন্তু সেই চোখ দেখেও নিজেকে সামলে নিতে পারেনি বাপ্পা। কেউ কোনো অপমান করেনি, তবু তীব্র একটা অপমানের জ্বালা ! যেন করেছে কেউ তাকে খুব একটা অপমান।

সেই জ্বালার দাহ ফুটে উঠেছিলো তার স্বরে, 'সী-অফ'। ওসব শৌখিন ব্যাপার আমার পক্ষে সম্ভব হবে না ! আমি কী এখানে বসে থাকছি, তখনো ?

বড্ডো বেশী ভালো মেয়েটা আর কোনো কথা বলেনি। নিঃশব্দে চলে গিয়েছিলো ! আর তাকায়ওনি। চলে গিয়েছিলো চোখ নীচু করে।

সেই চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে দেখেই আদিত্য গাঙ্গুলীর ছেলে বাপ্পাদিত্য গাঙ্গুলী এদিকে চলে এসে অকারণ তীব্রতায় ডাক দিয়ে বলে উঠেছিলো, তারক ! আর কতোকাল এখানে বসে থাকা হবে ?

তারক বড়ো নিশ্চিন্ত ছিলো বড়দাদাবাবুকে নিয়মিত একটা স্কুলে মাস্টারী করতে যেতে দেখে। তাহলে নৌকোখানা নোঙর বেঁধেছে। এখন হতচকিত হয়ে বলে, আর থাকা হবে না ?

তোমাকে কেউ যাবার জন্যে অনুরোধ করছে না। ইচ্ছে না হলে যাবার দরকার নেই। আমার তাতে কিছু এসে যাবে না।

বলেছিলো। অনায়াসেই বলেছিলো।

আর মা যখন ডুকরে উঠে বলেছিলো, আবারও তুই সেই চলে যাবার কথা তুলছিস বাপ্পা ?

তখনও ঠিক তেমনি অনায়াস অবহেলায় বলেছিলো, ব'ং, আর এখন যাওয়ায় অসুবিধেটা কী ? শিলু তো থাকছে ?

'অসুবিধেটা'ই কী সব রে ?

তা সেটাই তো প্রধান।

নিষ্ঠুর হবারও একটা নেশা আছে। ঘরে বাইরে। তাই সমাজে সংসারে রাজ্যে রাষ্ট্রে এমন অকারণ নিষ্ঠুরতার চাষ। 'শান্তি স্বস্তি সুখ স্থিতি', এগুলো জুটলেই সে ওই নেশায় মেতে উঠে ভাঙচুর করতে বসে। কখনো 'শান্তির ইতিহাস' রচনা করতে দেয় না।

আসলে মানুষ জাতটা একটা আজব জীব। বলা হয় বটে, সে নাকি কেবল সুখের সন্ধানে ফেরে, 'সুখের পিপাসাতেই হন্যে হয়ে বেড়ায়', কিন্তু দেখা যায়, ঠিক তার বিপরীতটাই। সে নিজের হাতে নিজের সুখের ঘরে আগুন লাগায়, শান্তির কুঁড়েয় 'বাড়ি' মেরে ভেঙে তচনচ করে।....কেন করে তা সে নিজেই জানে না।

আসলে হয়তো এই আজব প্রাণীটার 'সুখ' জিনিসটা সয় না।....এই 'সত্য'টাই বোধকরি তার সকল 'ভাঙনের' অন্তর্নিহিত ইতিহাস। সুখের উপকরণ এনে এনে জড়ো করে, আবার তাকে ভেঙেচুরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে। আর সেই সঙ্গে ভাঙে নিজেকেও।....

ভাঙতে ভাঙতে ক্রমশঃই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হতে থাকে। অথচ মজা এই, মনে ভাবে, 'এটাই হচ্ছে 'বড় হবার' সাধনা। সাধনা—বড় হবার, বিস্তৃত হবার, নিজেকে বিস্তার করবার। তাই অবিরত নিজেকে ঘিরে বৃত্ত রচনা করতে করতে, সেই বৃত্তবলয়ের চাপে সঙ্কুচিত হতে হতে হারিয়ে ফেলে খোলা আকাশের স্বাদ।....'

[সমাপ্ত]